৩য় বর্ষ | ১৮৩৭ শক, ১৩২২ সাল, বৈশাখ। | ৮ম সংখ্যা।

আমাদের অধঃপতন।

যে সময় হইতে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নিজেদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে ও দেশবাসীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলাম; সেই সময় হইতে আমাদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন পূজা-বন্দনা নিরত সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলাম। নিজেদের বহুমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থরাজিকে কীটদষ্ট পুরাতনযুগজীর্ণ পুঁথি বলিয়া উপেক্ষা করিয়া, কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় ও নবদ্বীপের ন্যায়দর্শনকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজের জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ছাতিরপলা অথবা [illegible] শিখিবার জন্য অন্য দেশে ছুটিয়া চলিলাম। রীতিমত অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে—আমাদের সেই সময় হইতে।

হায় আমরা অবনতির এতদূর নিম্নস্তরে নামিয়াছি যে, পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অজ্ঞাত কুলশীল পাচকের হস্তে প্রকাশ্য হোটেলে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে দ্বিধামাত্র বোধ করি না।

আমরা নিজ পিতামহের নাম বলিতে হইলে, মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে ঢোক গিলিয়া বিব্রত হইয়া পড়ি; কিন্তু "এলিজাবেথ" [illegible] জলের ন্যায় এক মুহূর্ত্তে বলিতে

পারি। তার দুঃখের কথা কি বলিব—আমরা দেশের বিখ্যাত প্রাচীন কবিদের নাম পর্য্যন্ত জানি না—কিন্তু বিদেশের অতি নগণ্য কবির স্কুল পরিচয় ও কবিতা আমাদের কণ্ঠস্থ।

কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি, তবে আমাদের নিজেদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যতদূর পার—পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হও—তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু নিজেদের জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া বিদেশীর সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কেহ যেন সে শিক্ষায় মনোযোগ না দেন—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

হায় ছিল একদিন, যে দিন তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের যজ্ঞধূমাচ্ছন্ন পবিত্র তপোবনে, দেশের নৃপতি পদব্রজে গমন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

ছিল একদিন, যে দিনে এই ব্রাহ্মণ দেবকুল উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থি দান করিয়া, পৃথিবীতে ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া অভূতপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ছিল একদিন—যেদিন মণিমরকতমণ্ডিত পারিষদমণ্ডলী সুশোভিত রাজসভায় ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলে নৃপতি রত্নসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ পদরজ গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনকে সফল জ্ঞান করিতেন। সে দিন আজ অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। তবু প্রাণে আজ যেন একটু আশার সঞ্চার হইতেছে। আজ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে যেন পূর্ব্বগৌরব অনুভব করিতেছেন। এখন আমাদের সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সংস্কৃতভাষার আদর বাড়িতেছে, আজ আমরা অনুষ্টুপ, মন্ত্র, শিলালিপি প্রভৃতি ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তিসকল মৃত্তিকা খনন করতঃ আবিষ্কার করিয়া বিশেষ আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। আজ আমরা আমাদের মাতৃভাষার ও দেবভাষার উন্নতিকল্পে দেশের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিতেছি। আজ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈদেশিক বেশভূষা ছাড়িয়া সামান্য ধুতি চাদর পরিয়া বাহির হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গুরুজনের পদধূলি গ্রহণ করিয়া নিজেকে পবিত্র মনে করিতেছেন, দেবমন্দিরে প্রণাম করিয়া নিজেকে কৃতার্থ ভাবিতেছেন, আজ গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিতে তাঁহাদের কত আগ্রহ। দেশস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী "ব্রাহ্মণ সম্মিলনী" করিয়া একত্রিত হইতেছেন; কিসে জাতি ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, কিসে সমাজের উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে আজ তাঁহারা যথেষ্ট চিন্তা ও কার্য্য করিতেছেন। সমাজের বরপণ মেলবন্ধন প্রভৃতি কুনিয়মের ধ্বংস করিবার নিমিত্ত সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়াছেন।

গত "ব্রাহ্মণসম্মিলনীর" সময় আমি কলিকাতায় ছিলাম। কি ব্রাহ্মণ, রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত ও বিদ্যার্থী, ধনী ও নির্ধন প্রভৃতি সকলে মিলিয়া কত উৎসাহের সহিত উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছেন। কত যুবক, বিনা পণে বিবাহ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আজ আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ" এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—উত্থান ও পতন স্রষ্টার অভিপ্রেত নয়। তাঁহারই অসীম কৃপা ও সূক্ষ্মনীতির বলে আমাদের ধ্বংসোন্মুখ ব্রাহ্মণজাতি, অধঃপতনের নিম্নসোপান হইতে উন্নতির দিকে। দেশব্যাপী ধর্ম্মানুরাগ

জাগিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় এইটা শুধু ক্ষণিক উত্তেজনা নয়—ইহার ভিতর ঐকান্তিকতা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। আমাদের মেঘান্ধকারাচ্ছন্ন ঝটিকাক্ষুব্ধ দুর্য্যোগের ভীষণ রাত্রি বুঝি পোহাইল, ঐ বুঝি নবারুণ-কিরণরঞ্জিত হইয়া আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত আসিতেছে, মর্ম্মের ভিতর আশার তন্ত্রী ঝঙ্কার করিয়া বলিতেছে আমাদের সংকল্প সিদ্ধ হইবে!

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

শিবলিঙ্গোৎপত্তি বিবরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বামনপুরাণের ষষ্ঠাধ্যায়ের তাৎপর্য্য—যেমন সর্ব্ববিজয়ী কন্দর্প মহেশ্বরের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া কুসুমশর প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহেশ্বর ও মদনকে প্রহারোদ্যত দেখিয়া পলায়ন পূর্ব্বক দুর্গম দেবদারুবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, মদনও তৎপশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। এই দেবদারুবনমধ্যে ঋষিগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা বৃষধ্বজকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। শিব কহিলেন হে ঋষিগণ! আমাকে আমার ইচ্ছামত ভিক্ষা আপনারা দান করুন। ঋষিগণ শিবের ভাব গতিক দেখিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন, তখন শিব সেই পুণ্য আশ্রমে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভার্গব প্রভৃতি ঋষির স্ত্রীগণ মহাদেবকে মনোহর বেশে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া কামপীড়িতা হইলেন, কেবল অরুন্ধতী ও অনসূয়া ধৈর্য্যহীনা হয়েন নাই। সেই কাম পীড়িত ঋষিপত্নীগণ উন্মত্ত হইয়া স্বাশ্রম ত্যাগ করিয়া শিব যে দিকে গমন করিতেছেন; সেই দিকেই গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে ঋষিগণ দেখিলেন করিণীরা যেমন মত্ত করীর অনুগমন করে তাঁহাদের পত্নীগণও সেইরূপ মহেশের অনুবর্ত্তী হইয়াছে। তখন ভার্গব প্রভৃতি ঋষিগণ সমবেত হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, উন্মত্ত দিগম্বরের লিঙ্গ খসিয়া পড়ুক। ঋষিগণের অমোঘ বাক্যে শিবলিঙ্গ ভূতলে পতিত হইয়া ধরণী বিদারণ করতঃ পাতালে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, শিব ও অন্তর্হিত হইলেন। শিবলিঙ্গ পাতাল ভেদ করিয়া আবার ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিতে লাগিল—পৃথিবী কম্পিত হইয়া পড়িল, তখন ব্রহ্মা জগৎ বিক্ষুব্ধ দেখিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। সভক্তি প্রণাম পুরঃসর কহিলেন প্রভো! কি নিমিত্ত অদ্য ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ হইতেছে? বিষ্ণু কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহর্ষিগণের শাপে মহাদেবের লিঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইয়াছে সেই লিঙ্গ ভরেই পৃথিবী বিকম্পিত হইতেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণুর মুখে এই অদ্ভুতবাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, জনার্দ্দন! যেখানে লিঙ্গ পতিত হইয়াছে, চল, আমরা সেই স্থানেই গমন করি।

অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু সেই স্থানে গমন করিলেন, এবং দেখিলেন যে শিবলিঙ্গের আদি ও অন্ত নাই। তখন বিষ্ণু অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে লিঙ্গের শেষ সীমা দেখিবার জন্য গরুড়বাহনে পাতালে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বত্রগামী ব্রহ্মাও পদ্মবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক উর্দ্ধদিকে ধাবমান হইলেন, পরন্তু ব্রহ্মা লিঙ্গের শেষ সীমা না পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণুও লিঙ্গের আদ্যন্ত না পাইয়া নিবৃত্ত হইলেন। (এস্থলে স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে একটু বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মা শিবলিঙ্গের আদ্যন্ত দর্শন করিতে পারিলেন না; কিন্তু বিষ্ণু ও দেবগণের নিকট একটু প্রতিপত্তি ও স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সুরভিকে দেবগণের নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে অনুরোধ করিয়া দেবগণের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন যে আমি লিঙ্গের শেষ সীমা দর্শন করিয়াছি। সুরভিও ব্রহ্মার অনুকূলে সাক্ষ্যপ্রদান করিলেন;—কহিলেন যে ব্রহ্মা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য—পরক্ষণেই দৈববাণীর দ্বারায় সুরভি ও ব্রহ্মার বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় দেবতাগণের অভিশাপে গোমাতা সুরভির মুখ অপবিত্র হইল এবং ব্রহ্মার অপূজ্যত্ব হইল। এই বিশেষ স্কন্দপুরাণ ব্যতীত অন্য পুরাণে নাই) তখন পিতামহকে কহিলেন আমরা ত এ লিঙ্গের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং এক্ষণে সদাশিবের স্তব করা কর্ত্তব্য। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েই মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শূলপাণে! তোমাকে নমস্কার, বৃষভধ্বজ! তোমাকে নমস্কার, জীমূতবাহন, তুমি কবি, তুমি সার্ব্ব, তুমি ত্র্যম্বক, তুমি শঙ্কর, তুমি মহেশ্বর, তুমি ঈশান, তুমি হর, তুমি স্বর্ণাক্ষ, তুমি বৃষাকপি, তুমি দক্ষযজ্ঞ ক্ষয়কর, তুমি কাল, তুমি রুদ্র, তোমাকে নমস্কার। পরমেশ্বর! তুমিই এই জগতের আদি, তুমি এই জগতের মধ্য ও তুমিই এই জগতের অন্ত। বিভো! জগতের সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছ তোমাকে নমস্কার। সেই দেবদারুবনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এইরূপ স্তব করিলে মহেশ্বর সুন্দররূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন ব্রহ্মন্! বিষ্ণো! আমি এক্ষণে ঋষিশাপাভিভূত মদনানলসন্তপ্ত ও নিতান্ত অসুস্থ আছি। দেবগণের অধীশ্বর হইয়াও তোমরা কি নিমিত্ত এ অবস্থায় আমার স্তব করিতেছ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন দেবদেব! আপনার এই যে লিঙ্গটী ভূতলে পতিত হইয়াছে তাহা পুনর্গ্রহণ করুন, আমরা এই প্রার্থনায় স্তব করিতেছি, মহেশ্বর কহিলেন যদি দেবগণ, দানবগণ, মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ সকলেই আমার লিঙ্গের পূজা করে তাহা হইলেই আমি এই লিঙ্গ প্রত্যাহরণ করিব—নচেৎ প্রতিগ্রহ করিব না। তাহাতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন "এবমস্তু" তাহাই হইবে। তখন সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং ব্রহ্মা পূজা করিবার নিমিত্ত কণক পিঙ্গলবর্ণ একটী লিঙ্গ গ্রহণ করিলেন, এবং তিনি চতুর্ব্বর্ণের নিমিত্ত পৃথক, পৃথক বর্ণের, শিবলিঙ্গের বিধান করিয়া দিলেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ পূজা করিবেন। ব্রহ্মা এই শিবলিঙ্গ পূজার নিমিত্ত চতুর্ভাগে বিভক্ত শাস্ত্রও প্রস্তুত করিলেন। এই শাস্ত্রের মধ্যে প্রথমাংশের নাম শৈব, দ্বিতীয় অংশের নাম পাশুপত, তৃতীয় অংশের নাম কালবদন, চতুর্থ অংশের নাম কপালিন। বশিষ্ঠের প্রিয় পুত্র স্বয়ং শক্তি, শৈব অর্থাৎ শৈব মতানুসারে শিব-

লিঙ্গোপাসক ছিলেন। তাঁহার শিষ্যের নাম গোপায়ন। তপোধন ভরদ্বাজ মহা পাশুপত ছিলেন। সোমকেশ্বর রাজা ঋষভ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তপোধন ভগবান আপস্তম্ব কালবদন মতাবলম্বী ছিলেন। ক্রৌথদেশের অধীশ্বর বকনামক বৈশ্য তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। ধনদনামক ঋষি কপালিন মতাবলম্বী ছিলেন, কুন্দোদর নামা শূদ্র তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণাবলম্বী শিবমত, ক্ষত্রিয়ের রজোগুণাবলম্বী পাশুপত মত, বৈশ্যের রজস্তমঃসমবায়ানুসারী কালবদনমত এবং শূদ্রের তমোগুণানুসারী কপালিন মত প্রচারিত হইয়াছে। ব্রহ্মা এইরূপে চতুর্ব্বর্ণের লিঙ্গার্চ্চন বিধান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ভগবান মহেশ্বরও সেই অনন্ত লিঙ্গ সংযত করিয়া লইলেন এবং সেই চিত্র বনে একটী সূক্ষ্মলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক যথাভিলষিত স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। *

শ্রীসত্যনারায়ণ সাংখ্যস্মৃতিবেদান্ততীর্থরত্ন।

সাধকের গান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব-ব্যতীত,
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে?
মন অগ্রে শশী বশীভূত—
কর তোমার শক্তিসারে।
আছে কোঠার ভিতর চোরকোঠারী
ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড় দর্শনে তত্ত্ব পেলেম্‌না
আগম নিগম তন্ত্র ঘু'রে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক—
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরমযোগী
যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে,—
আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গব হাঁড়ি
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥"

যাঁহার অন্তঃকরণ বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়মিত নহে, যে স্রোতোবাহী ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়নায় সঞ্চালিত হন, তিনি ভগবানকে লাভ করিতে পারেন না। অন্ধকার গৃহে অভীষ্ট দ্রব্যলাভের ব্যর্থানুসন্ধানের ন্যায় ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল চেষ্টাও বিফল হইয়া থাকে। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাঙ্গতিম্॥"

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করে

* লেখক শিবলিঙ্গোৎপত্তিসম্বন্ধে যাহা বিবরণ দিয়াছেন, তাহার একটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যা প্রকাশ না করিলে সাধারণের এ বিবরণে সবিশেষ শ্রদ্ধা না হইতে পারে, এজন্য আমরা সময়ান্তরে তাহা প্রকাশ করিব। ইতি ব্রাঃ সঃ সঃ।

সে কখনও সিদ্ধি, সুখ ও উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে পারে না।

বাস্তবিক যাঁহারা বিষ্ণু এবং ভূয়োদর্শনে যাহাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত, লোক সহানুভূতি লাভের ইচ্ছায় যাঁহাদের সঙ্কল্প এবং উদ্দেশ্য বিকৃতিপ্রাপ্ত না হয়, সেই ধনমানাদি নিস্পৃহ সেবকল্প মহাপুরুষগণের আদিষ্ট বিধিনিষেধের অনুবর্ত্তী হইয়া অভীষ্টলাভে যত্ন করা দম্ভাহঙ্কার শূন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই একান্ত কর্ত্তব্য।

রামপ্রসাদও জগদম্বাকে লাভ করিবার উপায় বিশেষের অবতারণা করিবার জন্যই বলিয়াছেন, "মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে ইত্যাদি।

"সে যে ভাবের...ধর্ত্তে পারে ?"

গমন গ্রহণাদি কার্য্য শারীর শক্তিদ্বারা সম্পাদিত হয়। কোন জড়বস্তু বিষয়ক চিন্তা বা কোন জড় তত্ত্বের উপলব্ধি মানসিক শক্তির কার্য্য। যে শক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি হয় তাহাকে ভাব বলে।

"ভাবেন লভাতে সর্ব্বং ভাবেন দেবদর্শনম্।
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ ভাবাবলম্বনম্॥"
(রুদ্রযামল)

ভাবের দ্বারা সমস্তই লাভ হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা দেবদর্শন হয়, ভাবদ্বারা পরম জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) লাভ হয়। অতএব ভাবাবলম্বন করিতে হইবে।

"ভাবঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং গূঢ়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়স্থিতম্।"
(রুদ্রযামল)

বুঝিতে পারিলাম—ভাববৃত্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়েই আছে, অর্থাৎ দর্শনস্পর্শনাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ব্যাপারেই ভাবের বিকাশ হইতে পারে। তোমার দৃষ্টিতে ৺ জগন্নাথের মূর্ত্তি কাষ্ঠনির্ম্মিত অতি কদর্য্য পুত্তলিকামাত্র; কিন্তু ভক্তের চক্ষে তিনি পরম সুন্দর। তুমি শ্যামামূর্ত্তিতে শিহরিতগাত্রে কঠোরতা ও হিংসার পূর্ণতা দেখ, ভক্ত তাঁহাকে "সৌম্যা সৌম্যতরা, শেষ-সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী" বলিয়া মনে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করেন, তুমিও যাঁহাকে দেখ, ভক্তও তাঁহাকেই দেখেন তবে উপলব্ধি বিষয়ে এত বিভিন্নতা হয় কেন? ভক্ত দেখেন ভাবের আবেশে আর তুমি দেখ শুষ্ক—সংসার মোহে মুগ্ধ হৃদয়ের সহিত।

ভাব তিনপ্রকার। পশুভাব, বীরভাব এবং দিব্যভাব। ভাবের, পক্বতা অপক্বতা ভেদেই এই তিনপ্রকার ভেদ করা হইয়াছে।

"পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধিঃ পশ্বাচারনিরূপণম্।
বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সাক্ষাদ্রুদ্রো ন সংশয়ঃ
দিব্যভাবে দেবতায়া দর্শনং পরিকীর্ত্তিতম্।
বীরভাবে মন্ত্রসিদ্ধিরদ্বৈতাচারলক্ষণম্॥"
(রুদ্রযামল)

পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধি হয়। বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি এবং অদ্বৈতাচার জন্মে। দিব্যভাবে দেবতার দর্শনলাভ হইয়া থাকে।

"আদৌভাবংপশোঃপ্রাপ্য রাত্রিকর্ম্ম বিবর্জ্জয়েৎ
দিবসে দিবসে স্নানং পূজানিত্যক্রিয়ান্বিতঃ॥
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দমনং দমনং শমনসা চ।
যোগশিক্ষা নিবিষ্টাত্মা ভবেৎ যোগপরায়ণঃ॥
সর্ব্বকালঞ্চ কর্ত্তব্যো যোগঃ সর্ব্বসুখপ্রদঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুর্নিত্যস্তরুণঃ পাতকাপহঃ॥"
(রুদ্রযামল)

সিদ্ধিলাভেচ্ছু ব্যক্তি প্রথম পশুভাব আশ্রয় করিয়া "রাত্রিকর্ম্ম" পরিত্যাগ করিবে। দিবা ভাগেই স্নান পূজাদি নিত্য ক্রিয়ান্বিত হইবে। ইন্দ্রিয় সংযম ও যোগশিক্ষা পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা অভীষ্টদায়ক সদ্যঃ পাপনাশক যোগ সাধন করিবে।

"জ্ঞানীভূত্বা পশোর্ভাবে বীরাচারং ততঃপরম্।"
(রুদ্রযামল)

সংযম, নিয়মানুগামিতা ও যোগানুষ্ঠান নামক পশুভাব আয়ত্ত হইলে, যখন চিত্ত বিক্ষেপাবরণ মুক্ত হয়, যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাবল্যহেতু কামগন্ধশূন্য চিত্ত অভ্রান্তরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্য হয়, তখন সাধক বীরভাব অবলম্বন করিবে। বীরভাবের মূলসূত্র "বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ" অর্থাৎ বিকারের কারণ বর্ত্তমানেও যাহাদের চিত্ত বিকৃতি না হয়, যাঁহারা নিজ বশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় রাজ্যে বিচরণ করিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত না হন, তাঁহারাই বীর। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে—
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

পর্ব্বতাদি হইতে নানারূপে নিস্যন্দিত নদীনদ সমূহ যেমন অচলভাবে অবস্থিত জলরাশি পরিপূরিত সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ অবিদ্যাবিজৃম্ভিত সমস্ত কামনা বা বাসনা যাঁহার সেই সমুদ্র স্থানীয় অনন্ত আত্মাতে প্রত্যাহারের দ্বারা বিলীন হইয়া যায় (কিন্তু তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না) তিনিই মোক্ষ পাইতে পারেন; যিনি কামকামী বিষয়বাসনাপরবশ তিনি কখনও মুক্তি পাইতে পারেন না।

বীরভাবে পঞ্চতত্ত্বাদি দ্বারা কঠোর আত্ম-পরীক্ষা এবং তৎসঙ্গে অদ্বৈতভাবে "মন্ত্রের সাধন"। যাহারা জ্ঞানযোগী তাঁহাদের পক্ষে অদ্বৈতভাব। ভক্তিযোগীর পক্ষে সেব্য সেবকস্বরূপ দ্বৈতভাব। ইহা অতি গোপনীয় এবং সাধারণ জনগণের অনধিগম্য বলিয়া বিশেষরূপে বিবৃত করা গেল না।

দিব্যভাব বীরভাবের পরিণাম বা চরমোৎকর্ষ।

"দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্ব্বভূত সমঃ ক্ষমী॥"
(মহানির্ব্বাণ)

দিব্যভাবাবলম্বী ব্যক্তি দেবতুল্য, সর্ব্বদা শুদ্ধান্তকরণ, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের অতীত অনুরাগ বিহীন, সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং ক্ষমাশীল। এই অবস্থায় অভীষ্টদেবতার দর্শন লাভ হয়। যিনি জগদম্বাকে লাভ করিতে চান—তাঁহাকে ভাবাবলম্বন করিতে হইবে। কারণ শুষ্ক তর্কাদির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় না, তাঁহাকে লাভ করাত দূরের কথা। তাই প্রসাদ বলিতেছেন 'সে যে ভাবের বিষয়' ইত্যাদি। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানাবিষ্টচেতা যে সকলব্যক্তি আজকাল বেদ উপনিষদাদি ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তাহাদের যুক্তিতর্কাদিতে যে কেবল জড়তত্ত্বানুসন্ধিৎসা এবং জড় বিষয়ক জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার কারণ যে বৃত্তিদ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রবেশ লাভ হয়, সেই বৃত্তিটীর—সেই ভাব বৃত্তিটীর—অভাবাভাব বলিতেপারি কি?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পশ্বাচারী সাধক অর্থাৎ যিনি সাধনমার্গে নূতন প্রবিষ্ট—তিনি যোগী হইবেন—সর্ব্বদা যোগানুষ্ঠান করিবেন। যোগের মধ্যে স্থূল কল্পে দুই প্রকার ভেদ আছে; এক আত্মযোগ, দ্বিতীয় ঈশ্বরযোগ। নিজে নিজের অন্নময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে সমাধি লাভের পর আত্মাতে মন বিলীন হইলে সেই যোগের নাম আত্মযোগ। আর ঈশ্বরের স্থূলাবস্থা অবধি সূক্ষ্মাবস্থা পর্য্যন্ত সমাধি করিয়া যে ক্রমে আত্মার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়—তাহার নাম ঈশ্বর-

যোগ। আত্মযোগী হইতে ঈশ্বরযোগী শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার যোগীর মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরগতপ্রাণ অর্থাৎ ঈশ্বরে একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, তাঁহারাই—সেই পরম ভক্ত ঈশ্বরযোগীরাই আমার (ঈশ্বরের) বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতম। রামপ্রসাদ ভক্তিরসের রসিক ছিলেন, এই সঙ্গীতে তিনি ভক্তির-সাত্মক ঈশ্বর যোগের অবতারণা করিয়াছেন।

"মন অগ্রে......ভোর হলে সে লুকাবেরে।"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

"নাড়ীনামপি সর্ব্বাসাং মুখ্যা গার্গি চতুর্দ্দশ।
তাসাং মুখ্যতমাস্তিস্রস্তিসৃষ্বেকোত্তমোত্তমা॥
মুক্তিমার্গেতু সা প্রোক্তা সুষুম্না বিশ্বধারিণী।
ইড়াচ পিঙ্গলাচৈব তস্যাঃ সব্যেচ দক্ষিণে॥
ইড়া তস্যাঃ স্থিতা সব্যে পিঙ্গলাচৈব দক্ষিণে।
ইড়ায়াং পিঙ্গলায়াঞ্চ চরতশ্চন্দ্রভাস্করৌ॥
ইড়ায়াং চন্দ্রমাঃ জ্ঞেয়ঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ॥
চন্দ্রস্তামস ইত্যুক্তঃ সূর্য্যোরাজস উচ্যতে॥"

হে গার্গি! সমস্ত নাড়ীর মধ্যে চতুর্দ্দশটীই প্রধান এই চতুর্দ্দশটীর মধ্যে তিনটী মুখ্যতমা; ঐ তিনটীর মধ্যে আবার একটী সর্ব্বোত্তমা, তাহার নাম সুষুম্না। তাহার বামদিকে ইড়া এবং দক্ষিণে পিঙ্গলা। ইড়ার মধ্যে চন্দ্র এবং পিঙ্গলার মধ্যে সূর্য্য বিচরণ করেন। চন্দ্র তমোগুণাত্মক এবং সূর্য্য রজোগুণাত্মক। ব্যাখ্যায়মান গানের পূর্ব্বোক্ত চরণদ্বয়ের মধ্যে শশী, অর্থ—ইড়াসঞ্চারী তমোগুণাত্মক চন্দ্র অর্থাৎ তামসিকবৃত্তিসমূহ। কোঠা শরীর, এবং চোরকোঠারী ইড়া নাড়ী। ইহার অর্থ—যোগাধিকার লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ ইড়াসঞ্চারী চন্দ্রকে অর্থাৎ সমস্ত তামসিক বৃত্তিগুলি বশীভূত অর্থাৎ আয়ত্ত (জব্দ) কর, তোমার জীবনশর্ব্বরী প্রভাত হইলে অর্থাৎ মৃত্যু হইলে সেই চোর কোঠারীতে অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে সে গুলি লীন হইয়া যাইবে। যোগতত্ত্ব অতিগুহ্য অথচ দুর্জ্ঞেয়, তোমার আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তবে এইমাত্র বুঝিতে পারি যে যোগীর পক্ষে সর্ব্বপ্রথমই আবরণাত্মক তামসিক বৃত্তিগুলি জয় করা একান্ত প্রয়োজন। তমোগুণ জিত না হইলে প্রকৃত রূপে চেষ্টাই আরব্ধ হইতে পারে না।

"ষড় দর্শনে.........বিরাজকরে পুরে।"

গীতায় ভগবদ্ বাক্য—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

অর্থাৎ তুমি আমার যেরূপ দর্শন করিলে এইরূপ কেবল চতুর্ব্বেদাধ্যয়ন, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, দান কিম্বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞদ্বারা মানব দর্শন করিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! হে পরন্তপ! কেবল মাত্র অনন্য অর্থাৎ মদেকনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারাই আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে, প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং আমাতেই নিবিষ্ট বা বিলীন হইতে পারে। রাম প্রসাদও অন্যত্র বলিয়াছেন—

"বেদে দিলে চক্ষে ধুলা,
ষড় দর্শনে সেই অন্ধগুলা,
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠামুলা,
খেলা ধুলা কে ভাঙ্গিল।"

বাস্তবিক দর্শনাদি শাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ বাদী—কেহ ঈশ্বরকে সগুণ সক্রিয় বলেন,

কেহ বলেন—নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন—কেহ করেন না। এইরূপ বিরুদ্ধমতের কারণ এই যে—যুক্তি তর্কাদি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণযোগ্য নহে। চিনির মিষ্টতা অনুভববেদ্য, যুক্তিদ্বারা বুঝাইবার নহে। ভক্ত বলিয়াছেন—"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" বিশ্বাসী ভক্তের নিকট পরমেশ্বর নিত্য সিদ্ধ প্রত্যক্ষ বস্তু, কিন্তু কূটতর্কী পাণ্ডিত্যাভিমানী অবিশ্বাসীর নিকট তাঁহার সত্তারই অভাব। তাই রামপ্রসাদ বলিতেছেন,—সেই আমার চিরাম্বেষিতের অনুসন্ধানে আগম, নিগম ও দর্শনাদি শাস্ত্র তন্ন তন্ন করিলাম, কিন্তু এই সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাঁহার সুমীমাংসিত অতর্ক্য স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলাম না। কিন্তু এখন বুঝিয়াছি—তিনি আমার অন্তরেই আছেন। আরও বুঝিয়াছি—তিনি "ভক্তিরসের রসিক।" ভক্তিতেই তাঁহাকে লাভ করা যায় ও প্রত্যক্ষ করা যায়। কস্তুরিকা মৃগ স্বীয় নাভিকমলস্থ কস্তুরীর গন্ধে উন্মত্ত হইয়া—কোথা হইতে সে গন্ধ আসিতেছে—স্থির করিতে না পারিয়া তাহা পাইবার জন্য ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়, অজ্ঞ মানবও হৃদয়বিহারী জগজ্জীবনকে নিজহৃদয়ে সন্ধান না করিয়া বাহিরে খুঁজিয়া বেড়ায়। সাধনমার্গে উন্নতিশীল ব্যক্তি এ তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। রামপ্রসাদ অন্যত্রও বলিয়াছেন—

"মা আমার অন্তরে আছ,
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা।"

তিনি যে কেবল ভক্তিসুলভ—তাহা আমরা ভগবানের বাক্যেই বুঝিতে পারি—
"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

"সে ভাব লোভে .....চুম্বকে ধরে।"

যে ভাগ্যবান্ মহাপুরুষে ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে—তিনি সর্ব্বভূতে মৈত্রী এবং করুণাসম্পন্ন। সুখ, দুঃখ, মান, অপমান এবং নিন্দা স্তুতিতে সমজ্ঞানী। তিনি হর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ পরিশূন্য। অতএব ভক্ত হওয়া সহজ কথা নহে। রামপ্রসাদ বলিতেছেন "সেই পরম দুর্লভ ভাব লাভ করিবার জন্য যোগী যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া যোগসাধন করিয়া থাকেন, চুম্বক যেমন কর্দ্দমাদি পরিশূন্য লৌহকে স্বভাবতঃই আকর্ষণ করে, ঈশ্বর ও সেইরূপ নির্ম্মলচেতা ভক্তকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন।" দৃষ্টান্তটী অতি সুন্দর। লৌহকে আকর্ষণ করা চুম্বকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু সেই লৌহ কর্দ্দমাক্ত থাকিলে চুম্বকের আকর্ষণ বিফল হয়—অর্থাৎ কর্দ্দমাক্ত লৌহ চুম্বকের আকর্ষণ সত্ত্বেও তাহাতে যাইয়া সংলগ্ন হইতে পারে না, কর্দ্দমপরিশূন্য হইলে তাহাতে সংলগ্ন হয়। ঈশ্বরও জীবকে সততই তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত মায়ার আবরণ থাকে সে পর্য্যন্ত জীব তাঁহার আকর্ষণ সত্ত্বেও তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। কর্দ্দমশূন্য লৌহের ন্যায় জীব যখন মায়ামুক্ত হয় তখনই প্রাণে প্রাণে তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করিতে পারে এবং ক্রমে তাহাতে যাইয়া সংলগ্ন হয়।

ভক্তি এবং জ্ঞানের প্রবলাবস্থায় মায়ার আবরণ ঘুচিয়া যায়। জ্ঞানী ঈশ্বরেতে নিজের অস্তিত্বটা ঢালিয়া দেন—ঈশ্বরে মিশাইয়া যান। আর ভক্ত তাঁহার সমীপে থাকিয়া সখ্য মধুরাদি ভাবে তাঁহার উপাসনাতে বিমলানন্দ অনুভব করেন।

"প্রসাদ বলে.........মন ঠারে ঠোরে"

সাগরে যাইতে হইলে জাহাজ নৌকা প্রভৃতির সাহায্যে যাইতে হয়, ঈশ্বরকে

লাভ করিতে চান—যিনি সেই অমৃত সাগরে যাইতে অভিলাষী তাঁহাকে দাস্য সখ্যাদি কোন একটী ভাব অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা নহে। ঈশ্বর পুরুষও নহেন স্ত্রীও নহেন, তিনি কাহারও পিতাও নহেন মাতাও নহেন, অথচ তিনি সকল রূপেই বিরাজমান অর্থাৎ তাঁহাকে যে যে ভাবে চায় সে সেই ভাবেই পায়। জলের নির্দ্দিষ্ট কোন আকৃতি নাই অথচ সর্ব্বপ্রকার আকৃতিই আছে, যে পাত্রে রাখা যায় তাহারই আকার ধারণ করে। ঈশ্বরকে যে যেভাবে চায় সে সেই ভাবেই পায়। প্রসাদ বলিতেছেন "মন! আমি যে মাতৃভাবে কাহাকে পাইতে চাই—তাহা কি আর ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে? অর্থাৎ আমি যে সেই দ্বেষ্যপ্রিয়পরিশূন্য ভূমা জগৎপতিকে মাতৃভাবে পাইতে চাই তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?" এখানে বলা অবশ্যক যে দাস্য সখ্যাদি সেব্যসেবকাত্মক ভাবগুলিও পশুভাবে এবং বীরভাবের অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা উক্ত ভাবদ্বয়ের একতরের অবলম্বনে অদ্বৈতাচারমূলক জ্ঞানযোগের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ভক্তিপথের পথিক হন—তাঁহারা সেব্যসেবকাত্মক এই ভাবগুলির কোন একটীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দিব্যভাব বীরভাবের পরিণতি বা চরমোৎকর্ষ।

"কেবল আশার আশা
ভবে আসামাত্র সার হ'ল।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে ভ্রমর
ভুবে র'ল॥
মা, নিম খাওয়া'লে চিনি ব'লে
কথায় ক'রে ছল।
এখন মিঠার লোভে তিক্তমুখে সারাদিনটা গেল
মা, খেলবে ব'লে ফাঁকি দিয়ে নামালে ভূতল। এবার যে খেলা খেলিলে মাগো—
আশা না মিটিল॥
প্রসাদ বলে ভবের খেলা যা হবার হ'ল।
এখন সন্ধ্যা বেলা কোলের
ছেলে ঘরে নিয়ে চল॥"

"কেবল আশার ....সার হ'ল।"

যাহার আশায় এ সংসারে বারম্বার আসা যাওয়া করিতেছি, যাহাকে পাইবার জন্য অনন্তকাল হইতে এই মহা আবর্ত্তনে ব্রতী হইয়াছি—তাহাকে পাইলাম কৈ? কেবল যে আশার ছলনায়ই মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। শুনিয়াছি,—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি,
অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং তদ্দুঃখমিতি"।

যিনি অনন্ত তিনিই সুখস্বরূপ, তুচ্ছ বিষয়ানুসরণে সুখ নাই। সুখানুকৃতি যে বিষয় সমূহে সুখের আধার বলিয়া বিবেচনা করি সেই সমস্তই বিনাশশালী ক্ষণস্থায়ী, সে সমস্তই দুঃখের স্বরূপ। হায় মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন চিত্রিত পদ্ম হইতে মধুলাভের প্রত্যাশায় ব্যর্থশ্রম করে—বারম্বার বিফল মনোরথ হইয়াও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না প্রত্যুত তাহাতেই মিলিয়া থাকে—সেইরূপ অমিতসুখস্বরূপিণী তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখের আশায় ব্যর্থ বিষয়সুখে মগ্ন হইয়া আছি। বারম্বার প্রতারিত হইয়াও—সর্ব্বদা অতৃপ্তি, অশান্তিতে দন্দহ্যমান হইয়াও তাঁহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

তৃষ্ণা-সূচী-বিনির্ভিন্নং মিশ্রং বিষয়-সর্পিষা।
রাগদ্বেষানলে পক্বং মৃত্যুরশ্নাতি মানবম্॥

কুলার্ণবতন্ত্রে।

তৃষ্ণারূপ সূচীদ্বারা ছিন্নভিন্ন, বিষয়রূপ ঘৃত মিশ্রিত, অনুরাগ এবং বিদ্বেষরূপ অগ্নিতে পচ্যমান মানবকে মৃত্যু গ্রাস করিয়া থাকে। বাস্তবিক আমরা সুখতৃষ্ণায় পথভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বদা বিষয় রাজ্যে বিচরণ করি, এবং অনুরাগ ও বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া জীবনও অশান্তিময় করিয়া তুলি, ইত্যবসরে মৃত্যু আসিয়া অলক্ষিত ভাবে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

"মা নিম খাওয়ালে——সারা দিনটা গেল।"

গৃহকার্য্যে ব্যতিব্যস্তা জননী উৎসঙ্গাভিলাষী সন্তানকে মিষ্ট জিনিষ দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, তোমার কোলে যাইবার জন্য সমুৎসুক এ হতভাগাকেও তুমি সেইরূপ করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছ। আমার প্রাণ চায়—তোমাকে, কিন্তু পাষাণী তুমি—তুচ্ছ বিষয় সুখে আমাকে ভুলাইয়া রাখিয়া নির্ম্মম হইয়া আছ, আর আমি হতভাগা সুখের আশায়—সুখস্বরূপিণী তোমাকে পাইবার জন্য পথভ্রষ্ট হইয়া পাপের পিচ্ছিলবর্ত্মে আছাড় খাইতেছি। তোমার ছলনায় মিঠার লোভে নিম খাইয়া সারা জীবনটা তিক্ত রসাস্বাদনেই যাপন করিতে বসিয়াছি।

"মা, খেলবে বলে———আশা না পূরিল।"

সেই একদিন ছিল—যখন আমিত্বপরিশূন্য আমি তোমারই ক্রোড়ে সুখসুপ্ত ছিলাম খেলার ছল দিয়া আমাকে ভূতলে নামাইয়াছ—তোমা হইতে পৃথক্ সত্তার অনুভূতি দিয়া আমাকে সংসারী করিয়াছ; কিন্তু মা, এখেলায় ও আশা মিটিল না। প্রাণের সেই উৎকট পিপাসার ত নিবৃত্তি হইল না। বুঝিতে পারিলাম—তোমাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রের অতুল ঐশ্বর্য্যও শান্তি নাই—আর তোমাকে লইয়া তোমার ক্রোড়ে থাকিয়া শাকান্নে দিনপাত করা ও মহাসুখ, কারণ তুমিই ত সুখ স্বরূপিণী।

"প্রসাদ বলে————ঘরে নিয়ে চল।"

মা, ভবের খেলায় সুখ হইল না, তোমাকে ছাড়িয়া সংসারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি মাত্র। এখন এ বৃদ্ধ বয়সের নিরানন্দময় জীবনসন্ধ্যায় আজীবন মুগ্ধকরী আশার আলোকছটা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। এখন নৈরাশ্যের অন্ধকার-মৃত্যুর করালচ্ছায়ার সহিত একীভূত হইয়া হৃদয় রাজ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর ছলনা করিয়া ফাঁকি দিয়া লুকাইয়া থাকিও না। যাহাদের সঙ্গে খেলিয়াছি একে একে তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছে, আর কেন? এখন সন্ধ্যাবেলা কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল। প্রবৃত্তির পথে সুখ নাই একথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি—ভোগের নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু বুঝিলে কি হইবে মা! প্রবৃত্তির পথ হইতে সরিয়া যাই এমন শক্তি আমায় নাই। আমাকে তুমি কোলে তুলিয়া না লইলে—আমি যাইতে পারিব না। তাই বলি মা! এখন সন্ধ্যাবেলা কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিকিশোর আগমবাগীশ।

ব্রহ্ম-জ্ঞান।

এই যে ধনধান্যপূর্ণ জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা প্রকৃত সত্য নহে। আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী—ব্রহ্ম দ্বারা ইহা বাহিরে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সুবর্ণময় অলঙ্কারের বাহিরে ও ভিতরে যেরূপ সুবর্ণ ব্যতীত আর কিছুই সত্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত এই জাগতিক পদার্থের কোন অস্তিত্ব নাই, আত্মা ও ব্রহ্ম এক সুতরাং সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন—ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শন। যিনি পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন, এবং সর্ব্বভূতের বিনাশে অবিনাশী বলিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার এই জ্ঞানই যথার্থ ব্রহ্ম জ্ঞান। একই চন্দ্র যেরূপ বিভিন্ন জলাধারে পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, সেই রূপ একই পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিতি করিয়া, এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পান, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহাকে সর্ব্বত্রই একরূপে দর্শন করেন, ইহাই প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞান। ব্রহ্মই জীব রূপে সর্ব্ববস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত জগৎ যথানিয়মে শাসিত ও পরিচালিত করিতেছেন, সর্ব্বাত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত বস্তু আচ্ছাদিত—সর্ব্বত্র পরমেশ্বর সত্বামাত্র বর্ত্তমান। পরব্রহ্মের সংকল্প প্রসূত স্থাবর জঙ্গমময় এই জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত—ব্রহ্মের সত্বাই জগতের সত্বা, আত্মাই সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত জগতই আত্মরূপ, একমাত্র আত্মার সত্বাবেই দেহেন্দ্রিয়াদির সমস্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম সর্ব্বজগতের অন্তর ও বাহিরে বর্ত্তমান, তিনি চল ও নিশ্চল, তিনি অনৈশ্বর্য্য হইয়াও ঐশ্বর্য্যবান্, অণিমা, লঘিমা প্রাপ্তি, প্রকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা, তাঁহার ঐশ্বর্য্য। অণিমা পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মতা লাভের ক্ষমতা। লঘিমা তুলার ন্যায় লঘু হইবার শক্তি। প্রাপ্তি—এক স্থানে থাকিয়া অন্যস্থানের বস্তুকেও হস্তদ্বারা পাইবার ক্ষমতা। প্রকাম্য—ইচ্ছামত বিষয় পাইবার শক্তি। মহিমা—পর্ব্বতাদির ন্যায় বৃহত্তরতা লাভের ক্ষমতা। ঈশিত্ব—সকলকে নিজের শাসনে রাখিবার ক্ষমতা। বশিত্ব—ভূত, ভৌতিক সমস্ত পদার্থকে নিজের বশে রাখিবার শক্তি। কামাবসায়িতা -সর্ব্বত্রইচ্ছার অব্যাহত গতি। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জ্ঞানী যোগীর এই ভগবৎ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। "যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

(কেনোপনিষৎ)

ব্রহ্ম বিজ্ঞান চৈতন্য ও আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্ম কেবলই বিজ্ঞানময়। ব্রহ্ম— সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ। ব্রহ্ম প্রজ্ঞান স্বরূপ। ঊর্ণনাভ যেরূপ অপর কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়া আপনিই জালরাশি সৃষ্টি করে এবং পুনশ্চ সেসমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাকে, পৃথিবীতে যেরূপ ঔষধি সমূহ প্রাদুর্ভূত হয়, এবং জীবৎপুরুষ দেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোমসমূহ—সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই সংসারে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ

জীবোপভোগ্য অব্যাকৃত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। অন্ন হইতে প্রাণ হিরণ্য গর্ভ, হিরণ্য গর্ভ হইতে মন (অন্তঃকরণ) তাহা হইতে সত্য নামক সূক্ষ্ম পঞ্চভূত—তাহা হইতে পৃথিব্যাদি লোক সমূহ (লোকেতে আবার কর্ম্ম) এবং শুভকর্ম্মে আবার অমৃত, অর্থাৎ কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হয়। সেই অক্ষয়পুরুষ পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ এবং তাহা হইতেই বিবিধ পদার্থ সমূহ সমুৎপন্ন ও তাহাতে বিলীন হয়—সেই অক্ষয় পুরুষ দিব্য, মূর্ত্তিমান্। "লীলা ও ক্রিয়া ভেদে মূর্ত্তিমান" তিনি অজ (জন্মরহিত) প্রাণ ও মনোহীন বিশুদ্ধ এবং কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অক্ষয়পদবাচ্য—অব্যক্ত হইতেও পর। দ্যুলোক তাঁহার মস্তক; চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক শ্রোত্রদ্বয়, বেদসমূহ বাগ্‌বিস্তার (বাগিন্দ্রিয়) বায়ু প্রাণস্বরূপ এবং সমস্তজগৎ তাঁহার অন্তঃকরণ, আর পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয় হইতে জাত, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। ব্রহ্মজ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ। রজ্জুতে যেরূপ ভ্রমাত্মক সর্প প্রতীতি হইয়া থাকে, জাগতিক সর্ব্ববিধ আব্রহ্মবুদ্ধিও তদ্রূপ। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য পদার্থ, ইহাই বেদের উপদেশ। ব্রহ্ম মহৎ, অলৌকিক ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, এবং দূর হইতে দূরবর্ত্তী, অথচ সমীপেতে প্রকাশমান। বিশেষতঃ দর্শনক্ষম চেতনপদার্থে তিনি এই শরীরেই, গুহাতে, হৃদ্‌পদ্মে, নিহিত আছেন। ব্রহ্ম সত্য ধর্ম্মে পরিব্যাপ্ত—এই কারণে বৃহৎ মহৎ দিব্য স্বপ্রকাশ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অচিন্ত্যরূপ, স্থূল, সূক্ষ্ম সর্ব্ববস্তুরই কারণ। তিনি আদিত্য চন্দ্রাদির আকারে নানা ভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।

অজ্ঞানীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অগম্য, এইব্রহ্ম দূর হইতে দূরে অথচ সমীপে,—কারণ তিনি জ্ঞানিগণের আত্মস্বরূপ, আত্মা অপেক্ষা নিকটে আর কেহ নাই। জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, ধ্যান যোগে আত্মদর্শন ঘটে। সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগদাশ্রয়ী ভূত ব্রহ্মকে জানেন যে—ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া এই জগত প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার পর লোকের, বিশ্বাস ও তদুপযোগী ক্রিয়া অনুষ্ঠান এবং জীবের ব্রহ্মভাবে নিশ্চয় ও তদনুসারে যে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধ, ইহাই জীবের যমযাতনা নিবৃত্তির এবং পরমশ্রেয়ের—মোক্ষলাভের প্রধান উপায়। জীব যতকাল ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ থাকে, ততকাল স্বর্গাদি সুখ সম্ভোগ সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভের আশা থাকে না। আত্মা যে জড় দেহ হইতে পৃথক—তাহা হৃদয়ঙ্গমের নামই বিবেক এবং ইহাই মোক্ষ লাভের প্রধান সহায়। এই ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে শরীর পাতের পূর্ব্বেই সেই জ্ঞানিজন সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। এবং অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করেন আর যাঁহার এই জ্ঞান না জন্মে তিনি ঐ ফলে স্বর্গাদি ভোগস্থানে শরীর লাভের অধিকারী হন। অথচ ইহলোকে শরীরপাতের পূর্ব্বে যদি ব্রহ্মকে বুঝিতে শক্ত না হন, তাহা হইলে বিবিধলোকে শরীর লাভ হয়, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী অলিঙ্গ (সর্ব্বপ্রকার চিহ্নবর্জ্জিত) পুরুষ (পরমাত্মা) অব্যক্ত অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ। চক্ষুরাদি (ইন্দ্রিয়) দ্বারা এই আত্মদর্শন উপলব্ধি হয় না। যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাভিমুখে অবস্থিতি করে, তখনই তাহার ব্রহ্ম দর্শন হয়—তখনই তিনি দেখিতে পান—যে

সহবর্ত্তী ও সমানস্বভাব জীবাত্মা ও পরমাত্মা জীবদেহে সংযুক্ত রহিয়াছে। জীব স্বাদু কর্ম্ম-ফল ভোগ করেন, আর পরমাত্মা ভোগ না করিয়া দর্শন মাত্র করেন জ্ঞানী সাধক তখন পাপপুণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লেপ হইয়া ব্রহ্মের সহিত নিরতিশয় সাম্য (অভেদ-ভাব) প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতস্থ প্রাণের প্রাণ স্বরূপ, তিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন, তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও জ্ঞান ধ্যানাদি-ক্রিয়াবান্, তিনি আত্ম-ক্রীড়, আত্মরতি।

নারিকেল ফলের অন্তর্ব্বর্ত্তী বীজ যেমন বাহ্যদলসমূহে আবৃত থাকে, সেই রূপ ব্রহ্ম ও জাগতিক আবরণে আবৃত, পরব্রহ্ম প্রকৃত্যাশ্রিত হইয়া রজোগুণাবলম্বনে স্বয়ং ব্রহ্মা উপাধিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং সত্ত্বগুণাবলম্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট সকলকে পালন করেন এবং তমো গুণাবলম্বনে অখিলভূতকে ভক্ষণ করেন। ঐ একমাত্র পরব্রহ্ম সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণ জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন করেন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং পরিশেষে সংহর্ত্তা ও সংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হন। ব্রহ্মের দুই রূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। সেই ক্ষর ও অক্ষরস্বরূপ ঐরূপদ্বয় সর্ব্বভূতে অবস্থিত। অক্ষর পরম ব্রহ্ম, ক্ষর এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মের রূপান্তরমাত্র,—ব্রহ্মেরই শক্তি। দেবগণ অপেক্ষাকৃত ন্যূন শক্তি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি মনুষ্য, পশু পক্ষিপ্রভৃতি ন্যূনতর শক্তি। অবিদ্যা আবরণের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা উপলব্ধি হয় মাত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—পরম ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মেরই শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি, ঘনীভূত ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ ব্রহ্মরূপ। ঐ একই ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিমূর্ত্তিতেই এক মূর্ত্তি। এই সগুণ বা কারণ ব্রহ্মে এই ব্রহ্মাণ্ড ওতঃপ্রোত অর্থাৎ বস্ত্রে তন্তুর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত, তাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন ও তাহাতে অবস্থিত এবং তিনিই এই জগৎ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর লীলা ও কার্য্যাদির জন্য প্রয়োজনানুরূপ গুণ আশ্রয় করিয়া কার্য্য ও লীলামাত্র প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের কোন গুণভেদ নাই। ইঁহারা সর্ব্বগুণময় অথচ সর্ব্বগুণাতীত পর-ব্রহ্মেরই রূপ। কেবল কার্য্যানুরোধে প্রয়োজনানুরূপগুণাবলম্বনে একে ত্রিরূপ ত্রিমূর্ত্তি; প্রত্যুত কোন ভেদ নাই। যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন, যিনি ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ, যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত এবং যাহাতে লয়-প্রাপ্ত হয়; সেই ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—একরূপে বিষ্ণু বা মহেশ্বরই পরম ব্রহ্ম। সেই শ্রুতি প্রতিপাদ্য বা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই বিষ্ণু বা মহেশ্বর, বিষ্ণুই সদসতের পরমপদ। বিষ্ণু হইতেই সমস্ত এই চরাচর জগৎ অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণু ও পরমব্রহ্মের লক্ষণে ভেদ নাই। বিষ্ণুই মূলপ্রকৃতি, তিনিই ব্যক্ত-রূপী ব্রহ্মাণ্ড। এই সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত—তাঁহাতেই লীন হয়। তিনিই ক্রিয়া, তিনিই সকলের কর্ত্তা, তিনিই যজ্ঞরূপে যজ্ঞেশ্বর।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম একেরই দুইটী ভাব মাত্র। বিষ্ণু সগুণ এবং তিনিই নির্গুণ, নির্গুণ ব্রহ্ম সৃষ্টি ও লীলাবশে গুণ এবং ক্রিয়াযুক্ত হন।

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্ম্মি সৃষ্টি স্থিতি কাল সংলয়ঃ

বিষ্ণু পুরাণ ১১ ২

যিনি প্রকৃতির ক্ষোভ হইতে জাত, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতুভূত পুরুষ ঈশ্বর—তিনিই ং অক্ষর ব্রহ্ম।

পর ব্রহ্মই মায়া উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ ব্রহ্ম হন। নির্গুণ ও সগুণ যে একই বস্তু ;—শাস্ত্র তাহাই প্রতিপাদন করেন,—

"সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুঃ—"

নির্গুণ ব্রহ্ম লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন

লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ
ক্রিয়াঃ। ভাগবৎ ৩।৭।২

অনন্তসমুদ্রের যে প্রশান্ত অবস্থা ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব। আর সমুদ্রের যেলহরী সঙ্কুল বীচি বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত কখন বীচি বিক্ষুব্ধ তাই একই ব্রহ্ম কখন সগুণ কখন বা নির্গুণ একই ব্রহ্মের এই দুই বিভাব। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার এই তিন ভাবে একই ব্রহ্ম,—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মা সত্বগুণপ্রধান, পালন কার্য্যে বিষ্ণু রজোগুণপ্রধান, সংহার কার্য্যে মহেশ্বর তমোগুণ প্রধান। ইহাই একে ত্রিমূর্ত্তি তিনে এক, একে তিন।

"ভক্ত-চিত্ত-সমাসীন-ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবাত্মকঃ।
(সূত সংহিতা) ৩।১৮

তিনি ভক্তের চিত্তে অধিষ্ঠিত, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক। পুনর্ব্বার—

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ
কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদভেদমুপেয়ুষে—

•সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি অদ্বিতীয়, পরে গুণত্রয়ের উপাধি ভেদে তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে ত্রিমূর্ত্তিতে ভিন্নরূপ হও, বস্তুতঃ তিনে এক ; একে তিন। তোমাকে নমস্কার। পুনর্ব্বার—

"আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং
দ্বিজ।
সৃজন্, রক্ষন্, হরন্, বিশ্বং দধে সংজ্ঞাং
ক্রিয়োচিতাম্॥"
ভাগবৎ ৪।৭।৪৮

আমি গুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার নিষ্পন্ন করি, সেই সেই ক্রিয়ার অনুযায়ী আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর উপাধি হইয়াছে মাত্র। এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না, কিন্তু সাধকের জ্ঞানের দ্বারা দর্শন লাভ হয়। ঊর্ণনাভ যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে,সেইরূপ এই ব্রহ্মা,বিষ্ণু, মহেশ্বর (তিনে এক) প্রাকৃতিক জগত জালে নিজেকে আবৃত করিয়াছেন, ভেদ জ্ঞানের হেতু কর্ম্ম সমূহ যখন অক্ষীণ অবস্থায় থাকে, তখনই জীবগণের বিষ্ণু ও ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে. যে জ্ঞানে সমস্ত ভেদ বিলয় প্রাপ্ত হয়, যাহা সত্তামাত্র ও বাক্যের অগোচর এবং যাহাকে কেবল আত্মাই জানিতে পারে ; সেই জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান। অবিকাররূপ একমাত্র অগ্নি, বিকারভেদে বহুপ্রকারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী একরূপ হইয়াও অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, যাহা শ্রেষ্ঠ পরম পদ, যাহা পরব্রহ্মেরই স্বরূপ, তাহাই বিষ্ণু ও মহেশ্বর। এই বিষ্ণু বা মহেশ্বর ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ, মহাভূতির আশ্রয়। এজগতে যাহা কিছু অতীত অথবা ভাবী পদার্থ, সে সমস্তই এই কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণুতে লীন। বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। বিষ্ণুই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের স্রষ্টা এবং সমস্ত শক্তি, জ্ঞান, বল ও ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন।

বেদ ই এই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসূতি। বেদ

অপৌরুষের বাক্য। পৌরুষের বাক্যে অর্থের বন্ধন আছে, যেহেতু পুরুষ স্বয়ং বদ্ধ, যে বদ্ধ তাহার বাক্যও বদ্ধ, সুতরাং ব্যাকরণ অভিধান তাহার শক্তি গ্রাহক, কিন্তু অপৌরুষের বাক্য ব্রহ্মবাক্য। ব্রহ্ম নিত্য মুক্ত, সুতরাং বেদের অর্থও নিত্য মুক্ত। বেদকে ব্যাকরণ বা অভিধান বন্ধন করিতে অপারগ। বেদ—"সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসসাদ"; বেদার্থ, সাধনসাধ্য, শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা অনুভূত হয়। স্বয়ং তপোমার্জ্জিত হইয়া তপঃসিদ্ধবুদ্ধি গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে বেদার্থ অবগতি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

কাত্যায়নী ব্রতচ্ছলে গৃহনির্গতা রাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণ সহ মহারাসে ব্যাপৃতা, তখন আয়ান রাধিকার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ, কৃষ্ণা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রমদাকুলের উত্তমোত্তমা রাধিকাকে একাগ্রহৃদয়ে জগদম্বার চরণ যুগে ফল পুষ্পাদি নানা উপহারে পরমানন্দে পরমেশ্বরীর পূজায় নিরতা দেখিয়া আয়ান তদ্‌গত চিত্ত ও ভক্তিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, পিতা মাতৃরূপে প্রকাশ হইয়াছেন। পিতার এই মাতৃরূপই সকলরূপের শ্রেষ্ঠ, আর পিতার তত্ত্বপ্রচারার্থ মাতৃরূপেরই প্রকাশ, কারণ ঐ তত্ত্ব মা ব্যতীত আর কেহ জানেন না; তাই পিতার তত্ত্ব এবং মায়ের স্নেহ পিতার স্নেহের অপেক্ষাও অধিক মধুর। মাতৃরূপ দেখিয়া আয়ান মুগ্ধ জগৎমুগ্ধ, আজ জগৎ দেখিতেছেন, সে—যিনি বৃন্দাবনের বনক্ষেত্রে তিনিই আবার শুম্ভনিশুম্ভের রণক্ষেত্রে, আর যিনি শুম্ভের রণক্ষেত্রে, তিনিই আবার কুরুক্ষেত্রে জনকই জননী, আর জননীই জনক। দুয়ে এক একেই দুই। এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই; "একমেবা দ্বিতীয়ম্"। মায়ের এরূপ মাধুর্য্যে জগত উদ্ভাসিত। চতুর্ভুজে,—দক্ষিণে—নিম্নে বর,—ও উর্দ্ধে—অভয় বামে—নিম্নে—ছিন্নমস্তক—উর্দ্ধে অসি—এবং নরমুণ্ডমালায় বক্ষঃস্থল সুশোভিত; উত্তমাঙ্গের মধ্যস্থলে ধৃত সমুজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্র, অতিভয়ঙ্কর—দীর্ঘায়ত নয়নত্রয়—বিলসিত বদনমণ্ডল,—কুণ্ডলশোভিত গণ্ডদ্বয়। আবার আর একদিন লীলাবতারের আবরণ উন্মোচন করিয়া জনক, জননী হইয়া দিগম্বরীরূপে, মহাকাল—মহাকালী হইয়া শিবামূর্ত্তিতে অর্জ্জুনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সেই বিশ্বগ্রাসকারিণী মহাপ্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি, আবার—

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ

গগনপথে একসময়ে উদিত সহস্রসূর্য্যের প্রভাও মায়ের রূপের প্রভার তুল্য হয় না। মা আমার স্মেরাননা সুখপ্রসন্নবদনা শান্তিরূপিণী নিত্যকালী—এবং পিতৃরূপে নিত্য কৃষ্ণ।

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
দাঁইহাট
কান্দির ব্রাহ্মণসভার সহকারী সভাপতি।

'কাদম্বরীর'—মহাশ্বেতা। (১)

সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরীর তুলনা নাই। ইহার মধুস্রাবিণী ভাষা স্বচ্ছ নদীস্রোতের মত পাঠককে ভাসাইয়া লইয়া যায়; ইহার সুকুমার ললিত পদবিন্যাস শ্রোতৃবৃন্দকে প্রতিপদে চমৎকৃত ও মোহিত করিয়া দেয়, ইহার নবনব ভাবভঙ্গী পূর্ণ বিকসিত শতদলের ন্যায় সহৃদয়ের মানসসরে ফুটিয়া উঠে। তরঙ্গিণীশংক্রুত অপ্সরাসঙ্গীতের মত ইহার ঝঙ্কার, মনোরমা নবপ্রণয়িনীর নূপুর শিঞ্জিতের সদৃশ ইহার ধ্বনি, অমরাবতীস্থ নন্দনকাননের অম্লানবাসন্তীসুষমার তুল্য ইহার কল্পনা। কাদম্বরী সাহিত্যাকাশের ধ্রুবতারা। সহস্র বৎসর ধরিয়া কোটী কোটী মানব ইহার পানে স্থির লক্ষ্যে চাহিয়া আছে; তবু ইহার নূতনত্ব কমে না, দর্শনলালসা মেটেনা। এই এক কাদম্বরী হইতে একইভাবে একইরূপ প্রভাতরলজ্যোতি ঐশীকরুণার মত নামিয়া আসিয়া সংস্কৃত সাহিত্যটিকে চির আলোকিত করিয়া রাখিতেছে, প্রকৃতির মধুময়ী বৃষ্টির মত স্বচ্ছকিরণধারা ঝরিয়া ঝরিয়া নিরস হৃদয় ক্ষেত্রটিকে সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া দিতেছে; স্বয়ংবেদ্য ব্রহ্মরসাস্বাদবৎ অমৃতবর্ষিণী রসধারা সহৃদয়ের চক্ষুকর্ণ মনপ্রাণ ভরিয়া অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, তার কি তুলনা আছে? সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী যেন আজি প্রেমময়ী হইয়া কাদম্বরীরূপে বিরাজমানা। (২) মৌলিক অপূর্ব্ব ঘটনা ইহার পাঞ্চভৌতিক শরীর, চরিত্রের বিশ্লেষণ ইহার বেশভূষা, উপমা, রূপক উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি, অপহ্নুতি ও ব্যাজোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার ইহার সুবর্ণভূষণ।

কাদম্বরীগ্রন্থের নায়ক নায়িকা প্রভৃতির নামকরণ প্রকৃতই সার্থক। প্রধানা নায়িকা

কাদম্বরী নায়িকা।

কাদম্বরীর নামানুসারে কবি কাব্যের নাম 'কাদম্বরী' রাখিয়াছেন। কাদম্বরী গন্ধর্ব্ব কুমারী এবং প্রধানা নায়িকা; গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ইহার জনক, অপ্সরা 'মদিরা' ইহার জননী। কাদম্বরীর আভিধানিক অর্থ "সুরা"। সুরারমত ইঁহার সমুজ্জ্বল বর্ণ, সুরার মত ইঁহার ঢলঢল লাবণ্য, সুরার মতই ইঁহার যৌবনশোভা উন্মাদক ও মোহকরী—এই জন্য—কিম্বা, "কাদম্ব কলহংসইব রৌতি" কলহংসের গুঞ্জনধ্বনির মত ইঁহার স্বর মিষ্ট—এইজন্য কবি নায়িকার নাম কাদম্বরী রাখিয়াছেন। কাদম্বরীর প্রণয়পাত্রের নাম "চন্দ্রাপীড়"—ইনি এই গ্রন্থের প্রধান নায়ক। চন্দ্র যাঁহার শিরোভূষণ তিনি 'চন্দ্রাপীড়', অথবা চন্দ্রদেবই অভিশপ্ত হইয়া রাজপুত্ররূপে জন্মিয়াছেন বলিয়া চন্দ্রাপীড়। কাদম্বরী রজোগুণোদ্ভবা—তাই ইঁহার বর্ণ নবোদিত বালতপনবৎ লোহিতোজ্জ্বল, তাই ইঁহার লাবণ্য মুক্তাফলবৎ স্বচ্ছ, তাই ইঁহার সৌন্দর্য্য দীপাবলিতেজে উজ্জ্বল নাট্যশালার মতযুবজনপ্রিয়। তাই ইনি পরিপূর্ণ চন্দ্রকলার মত অগাধগাম্ভীর্য্য সমুদ্রবৎ অক্ষুব্ধ চন্দ্রাপীড়ের চিত্ত উদ্বেলিত করিতে পারিয়াছিলেন।

---

(১) "কাদম্বরী" বাণভট্ট বিরচিত সংস্কৃত গদ্যকাব্য।

(২) কথা সরিৎসাগর হইতে কথঞ্চিত ঋণী মাত্র—লেখক।

"ইতঃ স্তুতিঃ কা খলু চন্দ্রিকায়াঃ।
যদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি॥"
নৈষধচরিত।

কবি যথার্থই কাদম্বরীকে যোগ্যা বুঝিয়াই রাজরাজেশ্বর চন্দ্রাপীড়ের অনুরাগিণী করিয়াছেন। মণি মাণিক্যভূষিতা সুচতুরা রাজলক্ষ্মী রাজারই ভোগ্যা হইয়া থাকেন। মানুষীতে এরূপ আলোকসামান্য রূপসৌন্দর্য্য সম্ভবে না বলিয়াই কবি গন্ধর্ব্বাপ্সর মিশ্রিতরক্ত একই কাদম্বরীতে বহাইয়াছেন। হাবভাব বিলাস চাতুর্য্য দেখিলে ইঁহাকে মানবী বলিয়া বোধ হয় না। এ সকল ভাবনিচয় ভারতীয় সংযমপূত ললনায় ঠিক সামঞ্জস্য পাইবেনা বুঝিয়াই কবি ইঁহাকে মানবী করেন নাই। রূপেগুণে, ভাবভঙ্গীতে কলাচাতুর্য্যে, বিলাসবিভবে কাদম্বরী অপূর্ব্ব নায়িকা।

"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ"—
—অভিজ্ঞান শকুন্তল।

মহাশ্বেতা দ্বিতীয়া নায়িকা, কাদম্বরীর প্রাণপ্রিয়তমা সখী। ইনিও গন্ধর্ব্বনন্দিনী।

মহাশ্বেতা

শ্বেতদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মত তুষার শুভ্র বসনা, বীণাপাণি সরস্বতীর মত সঙ্গীত কলানিপুণা বিদুষা—এই কারণে ইঁহার নাম "মহাশ্বেতা"। ইনি সত্ত্বগুণজা—তাই ইঁহার বর্ণ এবং শুভ্র ও স্বচ্ছ; প্রকৃতিও স্নিগ্ধকোমল। রজোত্থ আড়ম্বপূর্ণ সম্পৎ, রজোরাগজ অনুরাগ, রজোদ্ভব অসার সুখ ইঁহার কঠোর সংকল্পের কোন বিঘ্ন সম্পাদন করিতে পারে নাই সত্ত্বগুণজা বলিয়াই মহাশ্বেতা পবিত্র প্রণয়বতী, সঙ্গীতবাদ্যনিরতা, শিবার্চ্চনাবহিতচিত্তা ও তপস্তেজঃ সমুজ্জ্বলা। মহাশ্বেতা প্রেমে সাবিত্রীর মত, বৈরাগ্যে গার্গীর মত, জ্ঞানে অরুন্ধতীর মত, গৃহকর্ম্মে দ্রৌপদীর মত, ধৈর্য্যে বসুন্ধরার মত, তেজস্বিতায় সতীর মত ছিলেন। ইঁহার কি তুলনা আছে? পুরাণের পরে এরূপ রমণী চিত্র আর কোন সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় নাই। প্রবৃত্তি—নিবৃত্তির, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের, করুণা ও তেজস্বিতার এরূপ মিলনীস্থান এমত হৃদয়গ্রাহিণী করিয়া উপস্থাপিত করিতে কোন কবিই পারগ হয়েন নাই। শুভ্রশীতল বর্ণ, কোমল স্বভাবা মহাশ্বেতা মহর্ষি শ্বেতকেতুতনয় পুণ্ডরীকের অনুরাগিণী, ইহা যথার্থই বড় শোভন হইয়াছিল। স্বভাবসারল্য বিলাসবিভবহীন তপোবনেই অবস্থিতি করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের উত্তরে—কিংপুরুষবর্ষে—হেমকূট নামক বর্ষপর্ব্বতে, গন্ধর্ব্বাধিপতি চিত্ররথের অধীন থাকিয়া

মহাশ্বেতা গল্পভাগ।

—গন্ধর্ব্বরাজ হংস রাজত্ব করিতেন। কাদম্বরীর পিতা চিত্ররথ ইঁহার অভিন্নহৃদয় প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ হংস মহাশ্বেতার জনক, হিমকরশুভ্রা, অপ্সরকুলজা 'গৌরী' মহাশ্বেতার জননী। পিতার তেজস্বিতাদিগুণ ও মাতার সৌন্দর্য্য মহাশ্বেতাতে একাধারে বর্ত্তমান ছিল। শৈশব হইতেই মহাশ্বেতা কখন দেবী মুর্ত্তির মত রাজ দম্পতির দুগ্ধধবল দৃষ্টির দ্বারা স্নাত হইয়া, কখন বীণার মত গন্ধর্ব্বগণের অঙ্কে অঙ্কে আরূঢ় থাকিয়া, নানাবিধ রাজভোগে বর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। ক্রমে যখন যৌবনের বাল সূর্য্যাকরে মহাশ্বেতার শৈশবকাল কুয়াসার মত অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল, তখন নবযৌবন আসিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ মহাশ্বেতার চরণে বিলাস মন্থর গতি দেখা দিল, চক্ষুতে কটাক্ষ চঞ্চল দৃষ্টি খেলিল, কপোলে আরক্ত আভা ফুটিয়া

। নবপল্লব আসিয়া কুসুমকে ঘিরিয়া ফেলিল।

একদিন মধুমাসে মহাশ্বেতা তাহার মাতার সহিত অচ্ছোদ সরোবরে স্নানার্থ গমন করিলেন। স্নানান্তে মহাশ্বেতা অচ্ছোদ সরসীর তীরে সখীগণ সহ সচল বিদ্যুল্লতার মত খেলাইয়া বেড়াইতে ছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে দর্পণবৎ স্বচ্ছ হাস্যরাশির দ্বারা শুভ্র মুখখানিকে দ্বিগুণতর শুভ্র করিতেছিলেন—সেই শুভমুহূর্ত্তে তপস্যার্থ আগত সাক্ষাৎ মদনদেবের মত কপিঞ্জলসহায় পুণ্ডরীক তাঁহার নয়নগোচর হইলেন। মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকের সেই অলৌকিকরূপ, অতুলনীয় তপঃপ্রভাব দেখিয়া কুসুমগন্ধে মধুকরীর মত আকৃষ্টা হইয়া পড়িলেন। পুণ্ডরীকও সমানবয়স্ক, অভিন্নহৃদয় বন্ধু কপিঞ্জলের সহিত অচ্ছোদসরোবরে স্নানার্থ আসিয়াছিলেন। পুণ্ডরীক স্বর্গে জনক শ্বেতকেতুর আশ্রমে বেদপাঠ করিয়া থাকেন, মর্ত্তে আসিয়াছেন শুনিয়া নন্দনলক্ষ্মী অনুরূপপাত্র বুঝিয়া স্বহস্তে ইঁহার কর্ণে পারিজাতমঞ্জরী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। পুণ্ডরীক রূপে, গুণে, প্রভাবে, লাবণ্যে আদর্শ নায়ক। ইহার চরণে যে মহাশ্বেতা আপনার প্রাণমন পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ দান করিয়া কৃতার্থ হইবে, ইহার আশ্চর্য্য কি ?

পুণ্ডরীক দর্শন।

এদিকে মহাশ্বেতার অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছলিত পূর্ণবিকসিত যৌবন, পরিমলপূর্ণ অম্লানকুসুমবৎ অনিন্দ্যরূপ, লজ্জারাগরঞ্জিত অদৃষ্টপূর্ব্ব মুক্তাফলচ্ছায়া তরল লাবণ্য—পুণ্ডরীকের চিত্তে কামের অনলশিখা জ্বালিয়া দিল। ব্রাহ্মণকুমারের অনুরাগভরা দৃষ্টি মহাশ্বেতার মুখোপরি নিখাত করিয়া তাঁর অমানুষীরূপ সুধাপানে ব্যাপৃতা রহিল। উভয়ে উভয়ের রূপে মুগ্ধ রহিলেন। দৈহিক মিলন অপেক্ষা শতগুণ যে মানসমিলন, তাহাই সংসাধিত হইল। মদনদেবকে সাক্ষী করিয়া অন্তরে অন্তরে পরস্পর পরস্পরের নিকট আত্মবিক্রয়রূপ পরিণয় বন্ধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

মহাশ্বেতা আপনার পবিত্রপ্রাণ পুণ্ডরীককে অর্পণ করিয়া, তাহার বিনিময়ে প্রিয়তমস্পর্শপবিত্রীকৃত পারিজাতমঞ্জরী গ্রহণ করিয়া রূপদর্শন বিহ্বল পুণ্ডরীকের করতলভ্রষ্ট জপার্থ অক্ষমালা কুড়াইয়া লইয়া যখন ফিরিবার উপক্রম করিতেছিলেন, সেই সময় বন্ধু কপিঞ্জল কর্তৃক যথোচিত ভর্ৎসিত হইয়া পুণ্ডরীক অক্ষমালার প্রার্থনায় মহাশ্বেতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। অন্ধপ্রেমিক অক্ষমালাবোধে মহাশ্বেতার গলদেশস্থ একাবলীহার কণ্ঠে দিয়া ফিরিলেন। প্রেমের অধিদেবতা কর্তৃক এইরূপে মাল্য বিনিময় কার্য্য সমাধা হইল। বসন্তকালে অচ্ছোদ সরসীর রমণীয় তীরতলে বিবাহযোগ। যুবকযুবতীর উপর প্রেমদেবতার শরক্ষেপ কখন ব্যর্থ হয় না। ধৈর্য্য, সংযম, লজ্জা, ভীতি সকলই বালির বাঁধের মত ভাসিয়া যায়; ব্রহ্মচর্য্য, পাণ্ডিত্য, উপদেশ কোন ফলই দর্শাইতে পারে না। কপিঞ্জলকে লুকাইয়া পুণ্ডরীক আপনার সম্ভ্রম প্রভৃতি গণনা না করিয়া মহাশ্বেতার নিকট তাহার প্রাণতুল্যা সখী তরলিকার হাত দিয়া একখানি প্রেম পত্রিকা প্রেরণ করিলেন।

পুণ্ডরীকের কার্য্য।

মহাশ্বেতা অনিচ্ছায় অঙ্কুশাঘাতভীত করিণীর মত মাতার অনুগামিনী হইলেন। পুণ্ডরীকাধ্যুষিত সেই পুণ্যতীর্থ ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছা বশতঃ চরণযুগল মঞ্জীরশব্দে না যা

মহাশ্বেতার ভাব।

করিয়া বারণ করিতে ছিল। চরণ আর চলে না, পথ আর ফুরায় না। নিজের হৃদয়টিকে প্রিয়তমকে যৌতুক-স্বরূপ দিয়া তাঁহার হৃদয়টিকে সঙ্গে লইয়া মহাশ্বেতা অনেক কষ্টে আপনার গৃহে পৌঁছিলেন। যে গৃহ কলহাস্যে—হংসমালাগুঞ্জনে—সখীজন আলাপে—একদিন মুখরিত ছিল, সে গৃহ আজ নিরানন্দ নিস্তব্ধ বলিয়া বোধ হইল। আলোকমালা সমুজ্জ্বল হাস্যময়ী নাট্যশালা মুহূর্ত্তে অন্ধকারময়ী হইয়া উঠিল। সময় আর কাটে না, চক্ষু পুণ্ডরীক ব্যতীত আর কিছু দেখিতে চাহে না. মনও পুণ্ডরীক বিষয়িণী চিন্তা করিতে ভাল বাসে। অনিশ্চিত পুণ্ডরীকাশায় প্রেমবিহ্বলা রমণী একবিন্দু বারিকাঙ্ক্ষিনী চাতকীর মত ঊর্দ্ধে লক্ষ্যে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তরলিকা আসিয়া যখন পুণ্ডরীকের প্রেমপত্র হাতে দিল—তখন মহাশ্বেতা তরলিকাকে আলিঙ্গনবদ্ধা—করিয়া কতবার সেই পত্র পড়িলেন, কতবার পুনঃ পুনঃ পুণ্ডরীকের কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুণ্ডরীক কি বলিলেন, তাঁহাকে কেমন দেখিলে, তিনি কতক্ষণ তোমার নিকট ছিলেন, কতপথ অনুগমন করিয়াছিলেন—বারংবার এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মহাশ্বেতার আপাততঃ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। ঘৃতাহুতি পাইয়া অগ্নি দ্বিগুণ জ্বলিয়াই উঠে। শুষ্কক্ষেত্রে সবেমাত্র বারি বিন্দু পাত হইয়াছে, ফল সমাপ্তি না হইলে তৃপ্তির শেষ কোথায়?

মহাশ্বেতার বাসনা—পক্ষিনীর মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পুণ্ডরীকের হৃদয় পিঞ্জরে প্রবেশ করে, বজ্রীয় হোমশিখার মত আকাশপথ চাহিয়া পুণ্ডরীকাধ্যুষিত স্বর্গধামে গমন করে। মহাশ্বেতা মনের সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া কোনমতে পুণ্ডরীক হইতে আপনার চিত্তটীকে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইলেন না। তখন প্রণয়-পরবশা যুবতী আপনার হৃদয় সিংহাসনে পুণ্ডরীককে পতিরূপে বসাইয়া তাঁহাকেই পূজা করিতে লাগিলেন, স্বেদজলক্রান্ত কম্পিত দেহযষ্টি কোনমতে বিধৃত করিয়া অলস ভাবে শয্যা গ্রহণ করিলেন।

এমন সময়ে মদনেরসখা বসন্তের মত কপিঞ্জল আসিয়া তথায় মহাশ্বেতার সম্মুখে উপস্থিত। মহাশ্বেতা তাঁহাকে মহাসমাদরে বসাইয়া স্বয়ং নিরাসনে সম্মুখে উপবিষ্টা।

কপিঞ্জলের দৌত্য। কপিঞ্জল মহাশ্বেতার সম্মতি লইয়া বলিতে লাগিলেন।

মহাশ্বেতা, রাজকন্যা সুচতুরা বিলাসিনী সুন্দরী রমণী কোথা? আর স্বভাবসরল বনবাসনিরত জটাবল্কলধারী মুনিপুত্রই বা কোথা? একদিকে মনিমাণিক্য-ভূষিতা রাজলক্ষ্মী, অন্যদিকে ধনসম্পত্তিরহিত দরিদ্র! তোমাহইতে বন্ধুর মন ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, অনেক উপদেশ অনেক ভর্ৎসনা করিয়াছি, কিছুতেই কিছু হইল না। তাহার মন কোন মতেই শান্ত করিতে পারিলাম না। বন্ধু আমার ধীর জ্ঞানী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ঋষিকুমার হইয়া তুচ্ছ রমনীপ্রেমে আজি উন্মত্ত প্রায়। সকলই দুর্ভাগ্য! কি করি? কাজেই লতাকুঞ্জগৃহে নবপল্লবশয্যায় শয়ন করাইয়া তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিতে লাগিলাম। ক্রমশই তোমার জন্য বন্ধু আমার এমন অবস্থায় উপনীত হইতে বসিয়াছেন যে, হয়ত তোমার আশায় নিরাশ হইলে তাঁহার প্রাণ

ত্যাগ হইবার সম্ভাবনা। আমি বন্ধুর জীবনাশঙ্কায় আজ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তোমার আশায় এখনও বন্ধু কোন মতে অতৃপ্ত জীবনকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। মহাশ্বেতে! আমার বন্ধুর,—তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী ঋষিনন্দনের অমূল্য জীবন ভিক্ষা দাও। তোমার স্পর্শরূপমৃতসঞ্জীবিনী ভিন্ন তাহার জীবনরক্ষার আর কোন উপায়ই নাই। জলদ্ব্রহ্মতেজা শ্বেতকেতু তনয়, বেদবেদান্তাভিজ্ঞ, তপশ্চর্য্যানিরত পুণ্ডরীক আজ মদন শরাহত হইয়া মৃতপ্রায়। আর আমি তোমার নিকট তার জীবনরক্ষার্থ প্রার্থী। একি কম লজ্জার কথা! এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই কর। এই পর্য্যন্ত বলা হইলে পর বন্ধুগত-প্রাণ কপিঞ্জল দরদরধারে রোদন করিতে লাগিলেন, মহাশ্বেতার একটী মুখের কথার উত্তর প্রত্যাশায় কপিঞ্জলের হৃদ্‌পিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। মহাশ্বেতার মাতা কন্যাকে দেখিতে আসিতেছেন, শুনিয়া কপিঞ্জল চলিয়া গেলেন।

মাতা কন্যার অসুখ দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া গেলেন। মহাশ্বেতার মনে কপিঞ্জলের কথাগুলি শেলসম বিদ্ধ রহিল, তাঁহার জন্য আজ ঋষিকুমার মৃতপ্রায়—এ সংবাদ শুনিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন মহাশ্বেতা তরলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তরলিকা, কি করি! লজ্জাভয় জলাঞ্জলি দিয়া, গুরুজনের মতের অপেক্ষা না করিয়া ইতর রমণীর মত প্রণয়িসকাশে যাইব? বংশ মর্য্যাদা, সামাজিকতা, সদাচারের মস্তকে পদাঘাত করিব? আর নহিলে যে আমারই জন্য অকলঙ্কচরিত্র পুণ্ডরীকের প্রাণত্যাগ হয়! মুনিকুমারের অমূল্য জীবনের বধ জন্য পাতকিনী হইবই বা কিরূপে? বল—তরলিকা, এক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য? নিজের কুল মর্য্যাদা লজ্জাভয়, এগুলি কি ঋষি হত্যার চেয়েও বড়?

পুণ্ডরীকের জীবন রক্ষাকরাই কর্ত্তব্য ইহাই তরলিকার মত শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া মহাশ্বেতা ভাবিলেন—"নিজের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি, আদর্শ পুণ্ডরীকের মত পতির সমাগমলাভ, যৌবন সহজপ্রণয়লালসার পূরণ মহাশ্বেতা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু এই তুচ্ছ হতভাগিনী রমণীর জন্য একটি অমূল্য আদর্শ প্রাণ নষ্ট হইতে বসিয়াছে—ইহাই বা অগ্রাহ্য করি কিরূপে?

নীলাঞ্চলাবৃতগাত্রা মহাশ্বেতা তখন অভিসারিকা, জনসঙ্কুল পথদিয়া চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত নিশীথে পুণ্ডরীক জীবনরক্ষার্থ যাত্রা করিলেন। প্রিয়তম ঋষি কুমারের জীবন সংশয়, নতুবা প্রতিপদেই মহাশ্বেতার গমন পক্ষে বিঘ্ন সঙ্কুল বলিয়া বোধ হইত। এ চিত্র কি অপূর্ব্ব! কি সার্থক এ রমণী সৃষ্টি! প্রেম প্রবণতার সহিত বিচার শক্তির এরূপ একত্রাবস্থান, প্রণয়বিহ্বলতার সহিত ধীরতার এরূপ একস্থানে মিলন প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। রমণীর কুসুম কোমল হৃদয়ও যে বজ্রবৎ কঠোর—ইহা মহাশ্বেতা চরিত্রে স্পষ্টই দেদীপ্যমান। ক্ষণেক পথ অতিক্রম হইলে পর দূর হইতে একটি অস্পষ্ট ক্রন্দন ধ্বনি আকাশের গায় ভাসিয়া মহাশ্বেতার দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল, তীব্র তড়িৎ যেন অন্তরাত্মাকে নিস্পন্দ করিয়া দিল।

যখন মহাশ্বেতা কুঞ্জগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন—তখন দেখিলেন যে,

পুণ্ডরীক

পুণ্ডরীকের নিশ্চল তারক চক্ষু দুইটি আকাশস্থ চন্দ্র লক্ষ্যে স্থির, করযুগল শিথিল বক্ষের উপর

সন্নিবেশিত। মহাশ্বেতাকে দেখিবামাত্র কপিঞ্জল "অব্রহ্মণ্য" বলিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মহাশ্বেতা বুঝিলেন—তাঁহার কামনাময় ইন্দ্রধনু জন্মের মত মুছিয়া গিয়াছে; তাঁহার উচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হৃদয়ের মাঝখানে রহস্যময় ছায়াপথের মত কি একটি জিনিষ সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যৌবনেই মহাশ্বেতার আশাভরসা লোপ পাইল, অপ্রত্যাশিত শোকের আঘাতে প্রণয়-কোমল হৃদয় একেবারে দ্বিধা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল; ফুটিতে না ফুটিতে গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ঝলসিত হইল। তখন মহাশ্বেতা চিত্রপুত্তলিকাবৎ স্থিরা, পাষাণপ্রতিমাবৎ নিস্পন্দ হইয়া তরলিকার স্কন্ধে দেহভার রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন।

অকস্মাৎ এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া পুণ্ডরীকের আত্মাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার আকাশ পথে চলিয়া যাইলেন। তাহা দেখিয়া কপিঞ্জল ও বদ্ধপরিকর হইয়া "দুরাত্মন্ কোথা যাইতেছ" বলিতে বলিতে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের অনুসরণ করিলেন। কপিঞ্জল তখন শোকোন্মত্ত, তাঁহার আর স্মরণ রহিল না যে, মহাশ্বেতার কি হইবে? তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে দৈববাণী শোনা গেল "মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকের দেহ রক্ষাকর! পুণ্ডরীক দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার হইবে।"

মহাশ্বেতা কপিঞ্জলকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। একবার ভাবিলেন যে, সহমরণে যাইয়া এ জন্মের দুঃখ শোকের সমাপ্তি করি, আবার ভাবিলেন—"না, তাহা হইতে পারে না। পুণ্ডরীকের দেহ রক্ষা আমাকে করিতে হইবে।" দৈববাণীর উপর বিশ্বাস রাখিয়া মহাশ্বেতা ব্রহ্মচর্য্যপালনেই সঙ্কল্প নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখিয়া যৌবনের অপূর্ব্ব মাধুরী লুকাইলেন, আর্দ্রবল্কলে সুকুমার শরীর ঢাকিয়া রাখিলেন, সুচিক্কণ তরঙ্গিত কেশ পাশ কাটিয়া তৎস্থালে জটা রচনা করিলেন; মহামূল্য বেশভূষা, হীরক খচিত স্বর্ণালঙ্কার দূরে ফেলিয়া বৈধব্যের সাজে সাজিলেন। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলে মিলিয়া এই কঠোর সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু মহাশ্বেতা যোগিনী তপস্বিনীর বেশে অচ্ছোদ সরোবরতীরে শিবারাধনায় সময় কাটাইতেই চিত্তস্থির করায় তাঁহাদের যত্ন নিষ্ফল হইল। সুকুমার শিরীষপেলব-অঙ্গ তপস্যার যোগ্য নহে তবুও মানসিক-বলে মহাশ্বেতা অসম্ভব সাধনে সংকল্প করিলেন।

কখন মহাশ্বেতা বনভূমি হইতে সুরভি পুষ্পনিচয় চয়ন করিয়া তাহাতে চন্দন মাখাইয়া দেবাদিদেবের চরণপদ্মে অর্পণ করিতেন কখন সান্ত্বনাস্থল বীণাটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহা হইতে চিত্তবিনোদক রাগরাগিণী বাহির করিয়া শোকসঙ্গীতে বনভূমি মাতাইয়া দিতেন। কখন বা স্বচ্ছ সলিল অচ্ছোদ-সরসীর লতাকুঞ্জে বসিয়া এক মনে পুণ্ডরীকের রূপ ধ্যান করিয়া সময় কাটাইতেন, যখন চক্ষু মুদিয়া তপস্বিনীবেশে আর্দ্রবল্কলধারিণী মহাশ্বেতা পূজায় বসিতেন, তখন বোধ হইত, যেন ভগবতী উমা পতির প্রসন্নতালাভের জন্য তপস্যার্থ আবির্ভূতা।

এই ভাবে কতদিন কতমাস কত বৎসর কাটিয়া গেল—মহাশ্বেতা সমানই অক্লান্তা! পুণ্ডরীক যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, তখন আকাশে ষোলকলা শশী পূর্ণহাস্তে বিরাজ

মান ছিল, পূর্ণচন্দ্রের সে শোভা সে হাসি পুণ্ডরীককে আরও বিহ্বল করিয়া তুলিল পুণ্ডরীকের মনে হইল, পূর্ণহাস্তের অন্তরালে ব্যঙ্গের বিষজ্বালা, অমৃতপুরপ্রবাহ মধ্যে কর্ম্মনাশানদী স্রোত লুকায়িত রহিয়াছে—তাই অন্তিমশয়নে মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ কুমার চন্দ্রদেবকে অভিশাপ দিলেন—দেখ চন্দ্র, তুমি যেমন আমার বিরহজ্বালা বাড়াইয়া দিয়া মৃত্যুপথারূঢ় আমার প্রতি অমৃতরশ্মির বিনিময়ে ঝলকে ঝলকে কালকূট বৃষ্টি করিলে, আর আমার আশাসমুজ্জল অতৃপ্ত জীবনের অবসান করিয়া দিলে তোমাকেও তদ্রূপ আমার মত এই প্রকার কষ্ট পাইয়া অতৃপ্ত জীবন ত্যাগ করিতে হইবে।

পুণ্ডরীক কর্ত্তৃক অভিশপ্ত চন্দ্র ও প্রতিশাপ দিলেন—যেমন নিরপরাধ আমাকে অভিশাপ দিলে; এই পাপের ফলে তোমাকে পুনরায় এই ভাবে আরও শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারাইতে হইবে।

ঋষিকুমারের অভিশাপে আকাশের চন্দ্রকে ভূতলে আসিয়া তারাপীড়ের ঔরসে বিলাসবতীর গর্ভে চন্দ্রাপীড়রূপে ভারতবর্ষের উজ্জয়িনীনগরে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। চন্দ্রাপীড় রাজকুমারোচিত বিদ্যাশিক্ষা শেষ

চন্দ্রাপীড়।

করিয়া যখন রাজপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার অভিলাষ জন্মিল যে, মৃগয়া করিতে দূরদেশে যাইতে হইবে। মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়ন তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখা ও অনুচর বর্গকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রপীড় মৃগয়ায় গেলেন। কিন্নরমিথুন অন্বেষণে ক্রমশই গভীর অরণ্যে যখন প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি একাকী, ইন্দ্রায়ুধ নামক অশ্বই একমাত্র সহায়। দূর হইতে সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া চন্দ্রাপীড় সঙ্গীত লক্ষ্যে অচ্ছোদ সরসীতীরে পৌঁছিলেন। ব্রতকর্ষিতাঙ্গী হৃদয়া শিবার্চ্চনতৎপরা মহাশ্বেতা সেই বনে বনদেবীরূপে বিরাজমানা। রাজপুত্রকে মহাশ্বেতা অতিথিরূপে পাইয়া যথাযোগ্য আতিথ্য সৎকার করিলেন। আপনার দুঃখ কষ্ট গণনা না করিয়া চন্দ্রাপীড়ের সহিত মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাপীড়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আপনার নির্জ্জন বনবাস,তপস্বিনী ভাবে অবস্থান ও শিবার্চ্চনতৎপরতার কারণ ব্যক্ত করিলেন। মহাশ্বেতা যখন তাঁর দুর্ভাগ্যময় অতীত বৃত্তান্ত, দুঃখময় জীবনের ইতিহাস মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিলেন, বর্ণনার ফলে বহুবৎসর নিরুদ্ধ শোকধার সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল; বাষ্পপূর্ণ নয়ন হইতে মুখমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ছিন্নহার মুক্তাফলের মত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এতদিন ধৈর্য্য ও বৈরাগ্যের আবরণে যাহা অবরুদ্ধ ছিল, আজ তাহা অপসারিত হইয়া গেল।

মহাশ্বেতার বৈধব্যদশা দেখিয়া প্রাণসখী কাদম্বরী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন না। কাদম্বরীর পিতা মাতা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কাদম্বরীর দৃঢ় সঙ্কল্প টলিল না। তখন মহাশ্বেতাও কাদম্বরীকে অনুরোধ জানাইয়া তরলিকাকে প্রেরণ করেন। সেইদিন তরলিকা আসিয়া জানাইল যে, কাদম্বরী তাহার সখী মহাশ্বেতার বৈধব্যদশা থাকিতে নিজে পতি সমাগম সুখে লালায়িতা হইবেন না। তখন মহাশ্বেতার মনে হইল যে, চন্দ্রাপীড়কে কাদম্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করাইতে পারিলে নিশ্চয়ই সখী রাজকুমারের রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া

পড়িবে; ইহাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। তখন মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়কে কহিলেন—"রাজকুমার! চিত্রকূট পর্ব্বত, গন্ধর্ব্বনগর, সখী কাদম্বরী ও রমণীয় স্বর্গলোক দর্শনের যদি কৌতূহল থাকে, যদি আমার অনুরোধ অলঙ্ঘনীয় বলিয়া বোধ হয়, বিশেষ কার্য্যের যদি ক্ষতি না হয়, তবে আমার সহিত তথায় চলুন।" চন্দ্রাপীড়কে লইয়া মহাশ্বেতা সখীর নিকট গেলেন।

কয়েকদিন তথায় কাটিয়া গেলে পর রাজা তারাপীড়ের নিকট হইতে রাজকুমার পত্র পাইলেন যে, পত্রপাঠ মাত্র যেন উজ্জয়নীতে ফিরিয়া আসেন। তখন কাদম্বরী দর্শন লালসা কোনরূপে সংযত করিয়া পিতার আদেশ মত চন্দ্রাপীড় উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন প্রিয়বন্ধু বৈশাম্পায়নকে আদেশ দিয়া যান, তিনি শীঘ্রই অনুচরবৃন্দ লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুন।

চন্দ্রাপীড়ের উজ্জয়িনী যাত্রার পরই বৈশম্পায়ন একদিন অচ্ছোদসরসী সলিলে অবগাহন করিয়া অত্রস্থ মহাদেব আরাধনা করিতে গেলেন? অচ্ছোদসরসীর রমণীয় তীরতল, উন্মাদক-লতাকুঞ্জবন দেখিয়া বৈশাম্পায়নের অন্তরে কি যেন অস্পষ্ট স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কি এক মোহকর অজ্ঞাত কারণে আকৃষ্ট হইয়া বৈশাম্পায়ন সে স্থান ছাড়িয়া কোনমতে যাইতে চাহিলেন না। অনুচরবৃন্দকে বিদায় দিয়া সেই নির্জ্জন অরণ্যে একাকী উন্মাদের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কাদম্বরার নিকটে বিদায় লইয়া মহাশ্বেতাও নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। মহাশ্বেতাকে দেখিয়াই বৈশম্পায়নের জন্মান্তরানুবদ্ধ নিবিড়বাসনা, পূর্ব্বজন্মচিত

বৈশম্পায়ন।

অতৃপ্ত প্রেম লালসা ঘৃতাহুতি পাইয়া অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল। উদ্বোধের কারণ উপস্থিত হইলেই পূর্ব্বজন্ম সংস্কার উন্মুখ হইয়া উঠে। অনন্যদৃষ্টি বৈশম্পায়ন ভীত লজ্জিত বিষণ্ণ ও মত্ত হইয়া মহাশ্বেতার প্রণয়ভিক্ষা চাহিলেন। কাতরকণ্ঠে প্রার্থিত প্রণয় ভিক্ষার কোন সান্ত্বনা মূলক উত্তরের পরিবর্ত্তে উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য পাইয়া বৈশম্পায়ন ম্লানমুখে ফিরিয়া গেলেন। বৈশম্পায়ন কোন মতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না।

একদিন গভীর রজনীতে চন্দ্রালোকোদ্দীপ্ত মুক্ত আকাশ তলে, মসৃণিত শিলাতলে মহাশ্বেতা বিশ্রম্ভশায়িতা। এমন সময়ে চোরের মত কামুক বৈশম্পায়ন নিঃশব্দপদসঞ্চারে তথায় আসিয়া উপস্থিত। সেই উন্মাদ, নতজানু, তৃষ্ণাতরলচক্ষু, পতিব্রতা মহাশ্বেতার নিকট আপনার পাপ বাসনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাপীড়ের আবাল্য সঙ্গী প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া মহাশ্বেতা কিছুই জানেন না। কামুক পাছে দেবনিবেদিত অঙ্গস্পর্শ করে এই ভয়ে পুণ্ডরীকচিন্তনরতা তপঃকৃশাঙ্গী মহাশ্বেতার সতীত্ব মহিমোদ্দীপ্ত রোষানল জ্বলিয়া উঠিল, বাতাহতকদলীবৎ সেই সুকুমার যৌবনোৎফুল্ল অঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; মহাশ্বেতা ক্রোধরূক্ষ স্বরে কামুককে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন—"পাপিষ্ঠ, এই পাপ বাসনা ব্যক্ত করিবার সময়ে আকাশের বজ্র কেন তোমার মাথায় পড়িল না? জিহ্বা কেন শতধা বিচ্ছিন্ন হইল না? ভগবতী বসুন্ধরা, এই ঘৃণ্য পাপ দেহ রসাতলে না পাঠাইয়া অদ্যাপি বহন করিতেছেন কেন? পক্ষিজাতির মত কামচারী এই পাপাত্মার পক্ষিযোনিপ্রাপ্তিই যোগ্য

অভিশাপ।

পরিণাম। ভগবন্, আমি যদি ভুলেও পুণ্ডরীক ব্যতীত অপর পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার বাক্য যেন অন্যথা না হয়।”

শুকজীবন।

তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল তরুর মত কামপীড়িত বৈশম্পায়নের দেহ অচেতনবৎ ক্ষিতিতলে নিপতিত হইল। সতীর বাক্য অন্যথা হয় না। বৈশম্পায়নের শুকরূপে জন্মলাভ ঘটিল। সদ্যোজাতশুক ব্যাধকর্ত্তৃক পাতিত হইয়াও স্বকৃত দুষ্কৃতিভোগের জন্যই জীবিত রহিল। জৈবলিঋষি যখন শুকের জীবনেতিহাস ছাত্রগণের নিকট কহিলেন, শুকের পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি স্পষ্টই উদ্রিক্ত হইল। তখন সেই শুক দুর্ব্বলপক্ষে ভর দিয়া মহাশ্বেতার আশ্রমাভিমুখে উড্ডীয়মান হইল। পুত্র-বাৎসল্যে কাতরপ্রাণ শ্বেতকেতু পুণ্ডরীকজননী লক্ষ্মীদেবীকে, কামমুগ্ধচিত্ত শুকপাক্ষরূপী সন্তানকে অবিলম্বে পিঞ্জরে রুদ্ধ করার জন্য আদেশ করিলেন। কৃতকর্ম্মের যতদিন ভোগ অবশিষ্ট আছে; ততদিন যন্ত্রনা সহ্য করিতেই হইবে।

মহাশ্বেতা কি করিয়া জানিবেন যে, দেহান্তরের প্রগাঢ় ভালবাসা বিস্মৃত হইতে না পারিয়া পুণ্ডরীক—প্রেমপ্রার্থীরূপে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন। মহাশ্বেতা অনন্যমনে মদনপ্রণয়িনী রতির মত পতির জীবনলাভের আকাঙ্ক্ষায় শিব আরাধনা করিতে থাকিলেন। দৈববাণী কখন ব্যর্থ হয় না, জন্মান্তর কৃত কর্ম্মফল কখন ভোগ ব্যতীত বিরত হয় না। ঈশ্বরারাধনারূপ কঠোর সাধনা কখন বৈফল্যকে বরণ করে না।

অনেকদিন হইয়া গেল, বৈশম্পায়ন ফিরিতেছে না দেখিয়া তাঁহার পিতা শুকনাস বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন পিতামাতার আজ্ঞায় শুকনাসের অনুরোধে চন্দ্রাপীড়কে বৈশম্পায়নের অন্বেষণে পুনরায় মহাশ্বেতার আশ্রমে যাইতে হইল। আশ্রমে আসিয়া চন্দ্রাপীড় যখন বন্ধুর দুর্দ্দশার কথা শুনিলেন, তখনই তাঁহারও বক্ষ স্ফুটিত হইয়া গেল। অকালে,

চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু।

যৌবনে চন্দ্রাপীড় কাদম্বরী দর্শন-লালসা কুল প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রিয়তমের আগমন সংবাদ শুনিয়া কাদম্বরী বড় সাধে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, নেত্রের অমৃতশলাকা, স্বজীবনের অবলম্বন, প্রাণের রসায়ন, যৌবনের দেবতা চন্দ্রাপীড় আর জীবিত নাই। কাদম্বরী সমস্ত আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া সহমরণ যাত্রার আয়োজন করিবেন বুঝিয়া চন্দ্রাপীড়দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তখন সান্ত্বনা দিলেন যে,চন্দ্রাপীড় জীবিত হইবেন। ঐ দেহ কাদম্বরীস্পর্শে অবিকৃত থাকিবে। এই সংবাদ ক্রমে উজ্জয়িনীতে পৌঁছিল। রাজা রাণী প্রভৃতি সকলে তথায় আসিলেন। কাদম্বরী রাজকন্যা হইয়াও সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিরাগিণী তপস্বিনী সাজিলেন। দুইটী সখী শিথিল বৃন্ত কুসুমের মত কোনমতে জীবন বৃক্ষে বিযুক্ত রহিল।

যখন বৈশম্পায়নের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াই পুণ্ডরীক-দত্ত শাপের অলঙ্ঘ্যতার জন্যই চন্দ্রাপীড়ের হৃদয় স্ফুটিত হইল, তৎক্ষণাৎ চন্দ্রাপীড় সহচরী রাজকন্যা পত্রলেখা ইন্দ্রায়ুধনামক অশ্বকে লইয়া অচ্ছোদসরোবরে নিমজ্জিত হইয়া গেল। ক্ষণপরে অচ্ছোদসলিল হইতে যেন স্নাত হইয়াই কপিঞ্জল মহাশ্বেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া

কহিলেন, "মহাশ্বেতা! আমাকে স্মরণ পড়িতেছে কি?"

মহাশ্বেতা আপনার সৌভাগ্যতপনোদয়ের অরুণস্বরূপ কপিঞ্জলকে মহাসমাদরে অভিবাদন করিলেন। বন্ধুর জন্য মহাশ্বেতা এতবৎসর অপেক্ষা করিতেছেন, সর্ব্বসুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া যোগিনী তপস্বিনী সাজিয়া পতির জীবন লাভের জন্য আরাধনায় মন দিয়াছেন জানিয়া কপিঞ্জলের অন্তর সহানুভূতি ও গভীর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, মহাশ্বেতা সত্যই দেবী। এরূপ পত্নীলাভ বন্ধুর বাস্তবিকই মহাপুণ্যের ফল।

কপিঞ্জল তখন মহাশ্বেতাকে কহিলেন, মহাশ্বেতা, আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পশ্চাৎ অনুগমন করিয়া জানিলাম, তিনি স্বয়ং চন্দ্রদেব। তিনি বিনয়নম্রস্বরে আমাকে কহিলেন—"কপিঞ্জল, পুণ্ডরীক মৃত্যুর সময়ে আমাকে বিনাদোষে অভিশাপ দিয়াছেন, তৎফলে আমাকে ভারতবর্ষে উজ্জয়নাধিপতি তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড়রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দিয়াছি যে তোমাকেও ইহাপেক্ষা শোচনীয়ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। আমি চন্দ্রাপীড় হইয়া জন্মিতেছি, পুণ্ডরীক ও উজ্জয়িনী অধিপতির মন্ত্রী শুকনাশেরপুত্র বৈশম্পায়নরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। তুমি এক্ষণে মহর্ষি শ্বেতকেতুর আশ্রমে গমন কর। কি জানি, যদি পুনরায় আর কোন দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়।"

কপিঞ্জলের কাহিনী

চন্দ্রদেবের পরামর্শমতে আমি মহর্ষি শ্বেতকেতুর আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার মন তখন কিরূপ ব্যগ্র কিরূপ শোকাকুল, কি প্রকার উন্মত্তপ্রায় তাহা বুঝিতে পারিতেছই। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেছিলাম. দুর্ভাগ্যবশতঃ একজন বৈমানিক দেবতাকে লঙ্ঘন করিয়া ফেলি। তিনি আমাকে শাপ দিলেন, "যেমন তুমি তুরঙ্গমের মত লম্ফ দিয়া আমাকে লঙ্ঘন করিলে, তেমনি তোমাকে তুরঙ্গম জন্মলাভ করিতে হইবে।" আমার অজ্ঞানতাবশতঃ এই দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে যখন আমূল-ঘটনা বিবৃত করিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইলাম, তখন তিনি কহিলেন, "তোমার প্রভুর যখন মৃত্যু হইবে তখনই অশ্বযোনি হইতে তুমি মুক্তি পাইবে"। আমি তখন এইটুকু অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলাম যে, "বন্ধু আমার যেস্থানে জন্মগ্রহণ করিবেন—সেই স্থানেই যেমন আমার জন্ম হয়।" তিনি স্বীকার করিলেন। মহাশ্বেতা, আমিই এতকাল ইন্দ্রায়ুধ নাম ধরিয়া চন্দ্রাপীড়ের বাহনরূপে ছিলাম। নির্জ্জনবনে তোমার শোকসঙ্গীত শুনিয়া মন্ত্রাকৃষ্ট সর্পের মত উৎকর্ণ হইয়াছিলাম। তাহার ফলেই চন্দ্রাপীড় প্রথম তোমার আশ্রমে আসেন। পুণ্ডরীকই বৈশম্পায়ন-জন্মে তোমার নিকট আসিয়াছিলেন; পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রণয় স্মৃতি-বশেই তোমার সমীপে প্রেম-ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তুমি না জানিয়া তাঁহাকে কঠোর অভিশাপ দিয়াছ, তাহার ফলেই তিনি শুকপক্ষী হইয়া জন্মিয়াছেন। তোমার কোনও দোষ নাই সকলই বন্ধুর কৃতকর্ম্মফল। মহর্ষি শ্বেতকেতুর নিকট যাই, দেখি—তিনি যদি শাপ বিমোচনের কোন ব্যবস্থা করেন। পুণ্ডরীকজননী লক্ষ্মীদেবীকেও সংবাদ দিয়া আসি। শীঘ্রই শাপ মোচন হইবে বলিয়া বোধ হয়। কবে শাপ বিমোচন হইবে,

কিরূপে পুণ্ডরীক দেহপ্রাপ্তি ঘটিবে, কি প্রকারেই বা তোমাকে লাভ করিয়া বন্ধু কৃতার্থ হইবেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে যাই। আর পুণ্ডরীক শাপের ফলেই তোমার আশ্রমে যখন চন্দ্রাপীড় বিগতপ্রাণ হয়েন, তাহার পরই আমি অচ্ছোদ সরোবরে প্রবেশ করিয়া অশ্বদেহ ত্যাগ করিয়া স্বদেহ প্রাপ্ত হই। এক্ষণে তোমার সখী কাদম্বরীও পতিদেহ রক্ষা করিতেছেন, করুন। চন্দ্রাপীড় পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইয়া কাদম্বরীলাভে সমর্থ হইবেন।"

দেখিতে দেখিতে কপিঞ্জল শূন্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তখন মহাশ্বেতা পুণ্ডরীক উদ্দেশ্যে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "নির্ম্মলস্বভাব ঋষিকুমার এই হতভাগিনী পাপীয়সী মহাশ্বেতার জন্যই আজ পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার জন্যই তাঁহাকে নিদারুণ কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইল, আমার জন্যই তাঁহাকে বৈশম্পায়ন জন্মে ঐরূপ অন্ধ উন্মত্তবৎ হইতে হইল। আমার জন্যই শোচনীয় অভিশপ্ত মৃত্যুকে আবার আলিঙ্গন করিতে হইল। পাপিষ্ঠা মহাশ্বেতাকে তিনি জন্মান্তরেও ভুলিতে পারেন নাই, আর আমি তাঁহার কি দুর্দ্দশাই না করিলাম। আমার জন্য উহাকে কত দুরবস্থায় পড়িতে হইল। হায়, কঠিনপ্রাণা আমি, আমার ত মৃত্যু হইল না।"

চন্দ্রাপীড় শাপের অলঙ্ঘ্যতার ফলে দেহত্যাগ করিয়া শূদ্রক নামে নরপতি হইলেন। কাদম্বরীগত প্রাণ চন্দ্রাপীড়ের শূদ্রক জন্মে ও রমণী সম্ভোগ লালসা একেবারেই জন্মে নাই। পুত্রবিপৎকাতরা স্নেহময়ী জননী লক্ষ্মী দেবী চণ্ডাল কন্যারূপে শুকপক্ষীরূপী বৈশম্পায়নকে শূদ্রক রাজার সভাতলে লইয়া গেলেন। সেই স্থানেই শাপ বিমোচন ঘটিবে, এই ভরসায় লক্ষ্মী দেবীকে চণ্ডাল কন্যার বেশে রাজসভাতলে যাইতে হইল। শুকপক্ষীকে মানবী ভাষায় কথা কহিতে দেখিয়া শূদ্রক তাহাকে রাজসভায় বসাইলেন, তাহার অতীত-বৃত্তান্ত-শ্রবণ-লোলুপ সভাসৎ সমক্ষে জীবনেতিহাস বর্ণনা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। শুকপক্ষী যেমন তাহার জীবনী শেষ করিল, অমনি শূদ্রকের অন্তঃকরণে পূর্ব্বজন্মানুস্মৃতি স্পষ্টই জাগিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে রাজা শূদ্রকের প্রাণত্যাগ ঘটিল, শুকপক্ষীর প্রাণশূন্যদেহ ও পিঞ্জর মধ্যে পড়িয়া রহিল। চণ্ডালকন্যারূপিণী লক্ষ্মী দেবীও অন্তর্হিতা হইলেন।

বসন্তকালে মধুমাসে কাদম্বরী মৃতপতি ক্রোড়ে লইয়া অজস্র রোদন করিতেছেন তৃষ্ণাতরল চক্ষু দুইটী পতি মুখে সংলগ্ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে নবীন মলয় বাতাসের আকর্ষণে কামবিহ্বলা, প্রেমোন্মত্তা কাদম্বরী-কর্তৃক চন্দ্রাপীড়ের মৃত দেহ গাঢ় আলিঙ্গিতা হইল। কাদম্বরীর সেই সজীব উন্মাদক মৃত সঞ্জীবনস্পর্শেই যেন মৃতদেহে প্রাণ আসিল। চন্দ্রাপীড় নিমীলিত চক্ষু চাহিয়া দেখেন, কাদম্বরীর আলিঙ্গনে তিনি নিবদ্ধ। "ভগবন্ এ সুখস্বপ্ন যেন বৃথা হয় না।" তখন দুইজনে পরস্পর আলিঙ্গন বদ্ধ নিস্পন্দ—এমন সময়ে পুণ্ডরীক কপিঞ্জলের হাত ধরিয়া আকাশ পথ দিয়া নামিতেছেন। মহাশ্বেতার-অন্ধকারময় জীবনে নবজোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। তখনই সচকিতে কাদম্বরী মহাশ্বেতা কণ্ঠলগ্না হইয়া আপনার সুখের মধ্য দিয়া সখীর সুখ সজীবভাবে অনুভব করিলেন। পুণ্ডরীক আসিবামাত্র চন্দ্রাপীড় তাঁহাকে কঠোর সাধনা মূর্ত্তিমতী দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন।

মহর্ষি শ্বেতকেতু বলিয়া পাঠাইলেন যে, বৈশম্পায়নবোধে পুণ্ডরীককেই যেন 'শুক নাশ' পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বিদিতসকল-বৃত্তান্ত লোকগণ বৈশম্পায়নের সত্তাই পুণ্ডরী-কের সত্তার ভিতর প্রত্যক্ষ করিতে লাগি-লেন। বলাই বাহুল্য, পুণ্ডরীকের সহিত মহাশ্বেতা, চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরী পরি-ণীতা হইলেন। তারাপীড়, বিলাসবতী, শুকনাশ ও তৎপত্নী, চিত্ররথ ও মদিরা, হংস ও গৌরী প্রভৃতি সকলে আসিয়াই বিবাহ কার্য্য মহাসমারোহে নিষ্পন্ন করিলেন। উৎ-সবের ধুম পড়িয়া গেল; আমোদের উচ্ছ্বাস মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিল। কতকাল অতৃপ্ত চারিটী প্রাণীর মুখে আজ হাসি দেখা দিল।* শাপভ্রষ্টা 'রোহিণী' তাঁহার অলৌকিক স্বার্থত্যাগ নিজের জীবনে পরিস্ফুট করিয়া 'পত্রলেখা' জীবনে ও তাহার প্রতিবিম্ব মর্ত্ত্যে রাখিয়া গেলেন।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

ব্রাহ্মণ।

(১)

জীর্ণ,শীর্ণ বর্ণাশ্রম নিলয়—ভারতে,
সংস্কার সাধনে পুনঃ অতীত সুষমা;
ফুটাইতে তুমি মাত্র আছ এ জগতে,
অতুলিত শক্তিধর! তাই ডাকি তোমা॥

(২)

প্রমোদ মদিরা পানে লভিয়া বিকার,
ভুলিয়া রয়েছ তুমি আপনার বল।
ভোলেনি ভারত কিন্তু সে শক্তি তোমার—
বর্ণাশ্রম রক্ষণের সে পূত কৌশল।

(৩)

তাই তব পদরেণু চুমি অনিবার,
ডাকে ওহে মহাশিল্পি! ত্যজিয়া আরাম;
অনাচার ঝটিকায় বিকৃত আকার,—
সংস্কার আশ্রম গৃহ, রাখ নিজনাম॥

---

* মহাশ্বেতার জীবনী সংশ্লিষ্ট বলিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে কাদম্বরী জীবনী বিবৃত করিতে হইল॥

(৪)

দশবিধ সংস্কার পদ্ধতি লিখিত,
　　এখনও আছে এই বর্ণাশ্রমাবাসে।
না বুঝি প্রণালী তার একাল শিক্ষিত
　　বাতুল প্রলাপ বলি মুহুর্মুহুঃ হাসে

(৫)

সে দশ সংস্কার গুণ এ বিশ্বমাঝারে,
　　তুমি বিনা বুঝাইতে পারে কোন জন।
তাই হিন্দু-প্রাণ তোমা ডাকে সকাতরে,
　　সংস্কার প্রণালী শীঘ্র দেখাও ব্রাহ্মণ॥

(৬)

তব প্রদর্শিত সেই প্রাচীন পদ্ধতি,
　　বিধিমতে অনুষ্ঠিত হইলে আবার।
বর্ণাশ্রমালয়ে পুনঃ অতীত বিভূতি,
　　জাগিয়া উঠিবে নাশি যত অনাচার॥

(৭)

ভারত ভূস্বর্গ বলি হইবে কীর্ত্তিত,
　　শ্মশানে নন্দন বন প্রতিষ্ঠিত হবে।
রবেনা অকালমৃত্যু, না কর পীড়িত—
　　ত্রিবিধ পীড়ায় এই বর্ণাশ্রমি-জীবে॥

(৮)

ওঙ্কার ঝঙ্কারে মুগ্ধ হবে চরাচর,
　　বিষাদ আঁধার আর রবে না হেথায়।
সামস্বর প্রভাকর কিরণে আবার
　　আর্য্য চিত্ত সরসিজ ফুটিবে ধরায়॥

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি।

উত্থান ও পতন।

(দ্বিতীয় প্রসঙ্গ)

প্রথম-প্রসঙ্গে উত্থান পতনের আলোচনা সমষ্টিভাবেই করা হইয়াছে; ব্যষ্টিভাবে করিতে হইলে মনুষ্যের জন্ম, প্রবৃত্তি ও শক্তি কিরূপ, এবং কি প্রকারে সেই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে; তাহাই সমালোচ্য, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফললব্ধ দেহধারী মনুষ্য-মাত্রেই স্বভাবতঃ সংসারী। সংসারে প্রবেশ করিয়াই মনুষ্য হৃদয়ে কামনার উদ্রেক হয়, এবং এই কামনা যতই প্রবল হইতে থাকে, ততই মনুষ্য সত্যপথে না যাইয়া পাপ পথে অগ্রসর হয়। এই জন্যই নৈয়ায়িকগণের মতে সংসার শব্দের অর্থ "মিথ্যা-জ্ঞান-জন্য বাসনা।" স্থূলদর্শীর পক্ষে এই অর্থ সমীচীন না হইলেও সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাই সংসার শব্দের সদর্থ বিবেচনা করেন। প্রথমতঃ জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কর্ম্ম হইতেই জন্মের ইতর বিশেষ হয়। পরে মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র মনুষ্য বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হয়, এবং পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া তাহার আত্মীয়—পর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সত্য মিথ্যা, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকেনা। ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যকরী শক্তির বৃদ্ধির সহিত তাহার অনুভব শক্তি ও কামনা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সে চতুষ্পার্শ্বে যাহা কিছু দর্শন করে, বা যাহা কিছু শ্রবণ করে, তাহাই শিক্ষা করে; এবং এই শিক্ষার গুণে অনেক সময়ে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া সে ভালকেও মন্দ এবং মন্দকেও ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই প্রকার বারবার করিতে করিতেই অভ্যাস, এবং অভ্যাসই তজ্জন্মার্জ্জিত সংস্কারে পরিণত হয়। এই সংস্কার দুষ্ট হইলেই জ্ঞানি-জনে কুসংস্কার বলিয়া থাকেন। ইহা একবার মনুষ্য হৃদয়ে বদ্ধমূল ও পল্লবিত হইলে, তাহাকে উৎপাটিত করা বড়ই কঠিন। জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত কোন কোন দিকে অঙ্গচ্ছেদ হইলেও, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন এক প্রকার অসম্ভব। এইরূপে পরিবর্দ্ধমান মনুষ্য আপন চিত্তকে সংস্কাররূপ এক প্রকার কঠিন আবরণে আবৃত করে, এবং তখন সেই চিত্ত, অন্তর্নিহিত মহাশক্তি সত্ত্বেও, গুটিপোকার মত আবরণ মধ্যস্থ থাকিয়া আপনশক্তির কিছুমাত্র পরিচয় দিতে পারে না। জন্ম জন্মান্তর ব্যাপী সুপরিচালিত আয়াসফলে মনুষ্য এই আবরণ ছেদ করিয়া দিতে সমর্থ হইলেও, অর্জ্জিত কুসংস্কার গুলি সেই জীবনে তাহার একটি অপরিহার্য্যগুণ বিশেষ হইয়া উঠে, এবং ইহা চিত্তের সহিত এরূপ ক্লিপ্ত হয় যে দেহ ভস্মীভূত হইলেও তাহার চিত্ত সংস্কারচ্যুত হইতে পারে না। সঞ্চরণশীল বায়ুর পুষ্পাদি হইতে গন্ধবহনের মত, জীবাত্মা দেহ হইতে নির্গমন কালে মনুষ্যের চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া নূতন দেহে লইয়া যায়। সুতরাং এই কলুষিত চিত্ত পরজন্মেও দেহীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ইহাকেই আমরা মনুষ্যের স্বভাব বলি, এবং এই স্বভাবানুসারেই মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও কর্ম্মানুষ্ঠান। অতএব প্রতিপন্ন হইল, কর্ম্ম ও কর্ম্মাসক্তি প্রবৃত্তি মূলক মাত্র।

কর্ম্ম ও কর্ম্মাসক্তি প্রবৃত্তিমূলক হইলেও সুখভোগই মনুষ্যের লক্ষ্য, দুঃখভোগ কখনই তাহার লক্ষ্য নহে। অপর পক্ষে, সুখ এবং দুঃখ উভয়ই মনের দ্বারা অনুভবনীয় হইলেও আত্মধর্ম্ম নহে। আত্মধর্ম্ম না হইলেও ধর্ম্ম হইতে সুখের এবং অধর্ম্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুখ দুঃখের জন্য কারণগুলি জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও, দুঃখের ছায়ামাত্র দেখিলেই মনুষ্য তাহা পরিহার করে। প্রকৃতিগত এইরূপ হইলেও সচরাচর মনুষ্যকে দুঃখের পথেই বিচরণ করিতে দেখা যায়। এই অস্বাভাবিক কার্য্যের একমাত্র কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত চিত্তমালিন্য এবং তজ্জনিত ঘোর অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতাবশতই সুখ দুঃখের প্রকৃত কারণগুলির সম্যক উপলব্ধি করণে মনুষ্য অসমর্থ হয়, এবং সুখের পথ দুঃখের, ও দুঃখের পথ সুখের বলিয়া গ্রহণ করে। আমাদের শাস্ত্রে দ্বিবিধ সুখের কথা উল্লিখিত আছে—"নিত্য" ও "জন্য" নিত্যসুখ পরমাত্মার একটী বিশেষ গুণ, এবং ইহার একটি বিশেষ ধর্ম্মও বটে। এই সুখের অন্তর্ব্বর্ত্তী করিতে পারিলেই মানবজন্ম সার্থক হয়; কিন্তু এরূপ শক্তিমান পুরুষ অল্পই জন্মিয়া থাকেন। দেবর্ষি নারদ, শুকদেব প্রভৃতি মহাত্মগণ নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে বহুজন্মের তপস্যা ব'লেই তাঁহাদের জ্ঞান চক্ষু সম্যক প্রস্ফুটিত হওয়াতেই তাঁহারা এরূপ পারিয়াছিলেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব। সাধারণ মনুষ্য কেবল মাত্র জন্য সুখের অধিকারী হইতে পারে। ইহাও ত্রিবিধ। প্রথম সাত্ত্বিক; আত্মপ্রসাদনই ইহার লক্ষ্য, এবং ইহাতেই আত্মার পরিতৃপ্তি। বাহেন্দ্রিয় বা রিপুগণের তৃপ্তি সাধনের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই। এই সুখ পাইতে হইলে প্রাণীর পীড়াদায়ক কোন কার্য্যই করিতে হয় না এবং শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতে হয়। প্রথমাবস্থায় কষ্টকর হইলেও, পরিণামে ইহা অমৃতোপম হয়। নিষিদ্ধকার্য্যবর্জ্জন পূর্ব্বক বৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে সাত্ত্বিক জ্ঞান ও সাত্ত্বিক বুদ্ধির প্রকাশ হয় তাদৃশ সাত্ত্বিক জ্ঞান ও সাত্ত্বিকীবুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত কার্য্য হইতেই সাত্ত্বিকসুখের উৎপত্তি। দ্বিতীয় প্রকারের সুখ—রাজসিক। পার্থিববিষয়ে ইন্দ্রিয়সংযোগে ইহার উৎপত্তি। সুতরাং অধিকাংশস্থলে ইহা প্রাণীর পীড়াদায়ক হয়, এবং ইহাতে কেবল ইন্দ্রিয়েরই পরিতৃপ্তি হয়। স্থূলদৃষ্টিতে ইহা সুখের বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতই ইহা দুঃখের অবস্থা। এই জন্য প্রথমে ইহা অমৃতোপম হইলেও পরিণামে বিষবৎ হইয়া উঠে। ইহা আত্মোন্নতির প্রতিবন্ধক এবং পতনের পূর্ব্বাভাষ। মনুষ্য চেষ্টা করিলে এই অবস্থা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যিনি এইরূপ সুখে প্রমত্ত হয়েন, তাঁহাকেই সুখের তৃতীয়—অর্থাৎ জঘন্য তামসিক অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। তামসিকসুখ ঘোর অজ্ঞানতার ফল, এবং নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ ইহার নিত্য সহচর। এই অবস্থায় রিপুগণ সম্পূর্ণ প্রবল হয়। রাজসিক সুখের অবস্থায় মানুষের বরং কথঞ্চিৎ দূরদৃষ্টি থাকে, তামসিক সুখের অবস্থায় তাহার চিত্ত ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতেও চাহেনা, কর্ম্মের ফলাফল এবং বস্তুও বিষয়ের। কার্য্য কারণ ভাবও বুঝেনা, এবং পাপানু-

ষ্টানেও বিচলিত হয়না। তাহার কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি পাপাচরণে উল্লসিত, এবং অন্তরিন্দ্রিয় গুলি ব্যথিত ও জড়াবস্থ। বলা বাহুল্য এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—পাপ ও পতন। বর্ত্তমান কালে আমরা অনেকেই এই তৃতীয়শ্রেণী সুখের প্রয়াসী হইয়া, আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিবসে—কেহ অল্পমাত্রায়, কেহ বা বহুমাত্রায়—সত্যভ্রষ্ট হইতেছি; দেহধ্বংশের সহিত জীবলীলার শেষ, এবং ঐহিক ভোগ সুখই পুরুষার্থ, এই ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিত্য নানা প্রকার অকার্য্য করিতেছি; অধিকন্তু এই সকল অকার্য্য সঙ্গোপনে করিতে পারিলেই আপনাকে বিজয়ী মনে করিতেছি, এবং এইরূপ বিজয় সংঘাষে এক প্রকার প্রসন্নতাও অনুভব করিতেছি। বিচারশক্তি বিলুপ্ত হওয়ায়, ইন্দ্রিয় পরিতোষকেই—আত্মার পরিতোষ বলিয়া মনে করিতেছি এবং আত্মগ্লানি অনুভব করিতে পারিতেছিনা। আত্মসেবা বিস্মৃত হইয়া শরীরসেবাই আমাদের লক্ষ্য হইয়াছে; এবং এই আসুরভাবের মোহান্ধকারে পড়িয়া আমরা এরূপ জ্ঞানশূন্য ও অন্তর্দৃষ্টি হীন হইতেছি যে এই পতনকেই উত্থান মনে করিয়া পরস্পর পরস্পরের গুণ কীর্ত্তনও বিজয় ঘোষণা করিতেছি।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ সুখ দুঃখের স্থূল-লক্ষণ বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং"—অর্থাৎ আত্মনির্ভরতাই সুখ এবং পরমুখাপেক্ষিতাই দুঃখ। আমরা কিন্তু ইহার, বিপরীতই বুঝিয়া থাকি, বাল্যকাল হইতেই দেহধারণ জন্য অনেক বিষয়েই আমরা পরমুখাপেক্ষী হইতে শিখিতেছি। আপন আপন হস্ত পদাদির বলে আমরা যে সকল অভাব দূরীকরণে সমর্থ, তাহা অপর কোন ব্যক্তিদ্বারা সম্পন্ন করাইয়া সুখ এবং স্বয়ং সম্পাদনে দুঃখ বোধ করিতেছি ফলতঃ আমাদের সমাজ মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতা বিশেষ বিস্তৃত ভাবেই প্রবেশ করিয়াছে, এবং ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সকলেই অপরের দ্বারা আপন আপন কার্য্য সম্পাদনে বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। একটু অনুধাবন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অভিমান এই বিসদৃশ বোধের উৎপাদক। এরূপ ব্যবস্থার অনুকূল পক্ষগণ ইহাকে অভিমান না বলিয়া 'আত্মসম্মান' বলিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখা যাউক আত্মসম্মান কাহাকে বলে, এবং আমার কার্য্য আমি স্বয়ং সম্পন্ন করিলে আমার আত্মসম্মান নষ্ট হয় কি না। আত্মসম্মান কথার অর্থ—'আত্মার সমাদর'। চিত্তই এস্থলে আত্মা—সেই চিত্ত বা আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টাই তৎপ্রতি সমাদর প্রদর্শন। জঘন্য বৃত্তিসমূহের পরিচালনা দ্বারা আত্মাকে সম্যক প্রকারে ব্যথিত ও উৎপীড়িত করিলে আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় না বরং আত্মকে অবজ্ঞাই করা হয়। আমি স্বকীয় আত্মাকে সর্ব্বসমক্ষে সর্ব্বতোভাবে লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত করিলেও, অপরে আমাকে অর্থাৎ আমার আত্মাকে সমধিক সম্মান করিবে, এরূপ আশা দুরাশা ভিন্ন আর কি হইতে পারে! আত্মসম্মান একটি মহৈশ্বর্য্য। বহুমূল্য রত্নরাজিও ইহার নিকট নিষ্প্রভ। যাঁহার আত্মসম্মান বোধ আছে, তিনি কখনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাপ কার্য্যে প্রশ্রয় বা যোগ দিতে পারেন না, তাঁহার চিত্ত উদারতাময়, এবং তিনি কাঁহারও নিকট, সম্মান পাইবার ভিখারী হয়েন না, অমুক ব্যক্তি আমাকে অসম্মান করিল এ কথাও

মুখে আনেন না। চুম্বকের লৌহাকর্ষণ মত সম্মান স্বতঃই তাঁহাতে আকর্ষিত ও লিপ্ত হয়। অপর পক্ষে অভিমান এক প্রকার দর্প; ইহা ক্ষুদ্র ও তমসাবৃত চিত্তের লক্ষণ। অভিমানী ব্যক্তির আত্মা প্রভাহীন; সুতরাং নিজে নিষ্প্রভ হইয়া কৃত্রিম আলোকে দীপ্তিমান হইবার ইচ্ছা তাহার বলবতী হয়; বাহ্যসৌন্দর্য্যে অন্তরের ক্লেদ, এবং পার্থিবধনের প্রভাবে আপন গুণ হীনতা সঙ্গোপন করিতে ব্যগ্রতা জন্মে। রত্নরাজি জ্যোতিবিশিষ্ট হইলেও, তাহার আধার বা অধিকারী কখনই জ্যোতিষ্মান্‌ হয় না। ধনের সম্মান সংসারে চিরকালেই আছে, এবং চিরকালই থাকিবে; কিন্তু ইহা ধনের সদ্ব্যবহারেই সন্নিবদ্ধ। ধন ও মান লইয়াই সংসার। আমাদের শাস্ত্রে বলে অধম প্রকৃতির লোক কেবল ধনাকাঙ্ক্ষী; মধ্যম প্রকৃতির লোক ধন ও মান উভয়ই প্রার্থনা করেন; কিন্তু উত্তম প্রকৃতির লোক কল্যাণকেই মহাধন বলিয়া জানেন এবং আত্মসম্মান সুদৃঢ় রাখিয়া বহিঃ সম্মান আকর্ষণ করেন।

আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপন উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই মনুষ্য প্রকৃতই উন্নত হয়। এই উন্নতি দ্বিবিধ—সংসারিক ও আধ্যাত্মিক। উন্নতির এই দ্বিবিধপথই মনুষ্যের পক্ষে প্রশস্ত হইলেও একই সময়ে কেহই এই দুই পথের পথিক হইতে পারেনা। সংসারিক উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হইবে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ ততই তোমাহইতে দূরে পড়িবে। এবং অপর পক্ষে অধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যাইবা মাত্র তোমার সাংসারিক উন্নতির পথ রোধ হইবে। এই দুইএর সামঞ্জস্য এক প্রকার অসম্ভব। প্রাচীন আর্য্যসমাজে এই জন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতিশীল ব্যক্তিগণকে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহারাই ‘ব্রাহ্মণ’। সংসারিক উন্নতি শীল ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের কর্ম্মভেদে, তিন ভাগে, বিভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ এই তিন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের নেতা এবং উপদেষ্টা। আজন্ম পূতাচারী, অধ্যয়নশীল, পরার্থ পরায়ণ—‘ব্রাহ্মণ’ সমাজের গুরু! তাঁহারা সম্মানের ভিখারী ছিলেন না; সম্মান স্বতঃই তাঁহাদিগের অনুগমন করিত। পার্থিব ভোগসুখে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনার্থ যে সকল ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ নীতি এবং রাজনীতি তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াগিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি জগতে অতুলনীয়! পরোপকার তাঁহাদের জীবনের ব্রত এবং আত্মার উন্নতি সাধন তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। সেই আদর্শ ব্রাহ্মণসমাজের অবনতির সহিত ভারতবর্ষীয় চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের পতন হইয়াছে।

তৎপরে সংসারিক উন্নতির কথা। কিরূপ আকৃতি বিশিষ্ট পুরুষ সংসারে উন্নতিশীল হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

“পঞ্চদীর্ঘং চতুর্হ্রস্বং পঞ্চসূক্ষ্মং ষড়ুন্নতং।
সপ্তরক্তং ত্রিগম্ভীরং ত্রিবিশালং প্রশংস্যতে।”

অর্থাৎ—বাহু, নেত্র, কুক্ষী, নাসা, এবং স্তনমধ্যবর্ত্তী স্থান দীর্ঘ; গ্রীবা, কর্ণ, পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব; আঙ্গুলি পর্ব্ব, দন্ত, কেশ, নখ, ও ত্বক্‌ সূক্ষ্ম; নাসা, নেত্র, দন্ত, ললাট, শিরঃ, ও হৃদয় উন্নত; করতল, পাদতল, নেত্র, অন্তর—নখ, তালু, অধর ও জিহ্বা রক্তবর্ণ; স্বর, বুদ্ধি ও নাভি গম্ভীর; এবং উরঃ, শিরঃ ও ললাট বিশাল হওয়া আবশ্যক। একাধারে এই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকা অসম্ভব না হইলেও দুর্লভ। তবে ইহার মধ্যে কোন

কোন লক্ষণ পুরুষে লক্ষিত হইলেই তাহাতে সংসারিক কোন কোন বিষয়ের উন্নতি সূচিত হয়। তবে এই লক্ষণগুলি উন্নতির সূচনা মাত্র। বীজ যেমন জলসেচন দ্বারা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বর্দ্ধিত ও অবশেষে ফল ফুল শোভিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে জন্মাবধি এইরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত হইলেও কেবলমাত্র পুরুষকার দ্বারা ফললাভ সম্ভবে না। নতুবা উষর ক্ষেত্রে বীজ বপনের মত—সুলক্ষণাক্রান্ত হইলেও ফললাভ হয় না। সুলক্ষণাক্রান্ত পুরুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও মনুষ্য মাত্রকেই জীবশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পদবাচ্য হইতে পারে না। পৃথিবীতে কত মনুষ্য পশুবৎ বা ততোধিক ঘৃণিত আচরণে মনুষ্য নাম কলঙ্কিত করিতেছে। "অমুকের পুত্র মানুষ হইয়াছে" এরূপ উক্তি আমরা স্ত্রীপুরুষ সকলের নিকট নিত্য শুনিতে পাইলেও, বাক্যটি অতি সারবান্। "মানুষ হইলেই" মনুষ্যোচিত কতকগুলি গুণসম্পন্ন হইতে হয়। এই গুণ কেবল অর্থোপার্জ্জনে সীমাবদ্ধ নহে। অর্জিত অর্থ প্রাণিবর্গের উপকার-সাধনার্থ বিনিয়োগ, আত্মরক্ষা পূর্ব্বক কায়-মনো-বাক্যে যথাশক্তি সমাজের রক্ষণ ও পালন, এবম্প্রকার কর্ম্মদ্বারা সংসারিক উন্নতি হয়। কিন্তু আমাদের সমাজ পতিত বা পতনোন্মুখে হওয়ায় কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জন-শীল ব্যক্তিকেই আমরা "মানুষ" বলিয়া থাকি, এবং সমাজে উচ্চাসন দিয়া থাকি। এতদ্দ্বারা সংসারে অর্থের প্রয়োজনা-ভাব কেহ যেন না বুঝেন। অর্থই সমাজের বল, এবং অর্থই জীবন ধারণোপায়। আমাদের শাস্ত্রে কহে,"সা শ্রীর্যানমদং কুর্য্যাৎ।" শ্রীমান ব্যক্তি কোমল প্রকৃতি ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইলে প্রকৃতই শ্রীমান হয়। কিন্তু ধনীর কল্পিত গুণ কীর্ত্তনে মুক্তকণ্ঠ হইয়া আমরা তাহার চিত্তে মত্ততা আনয়ন করি, এবং তাহার, দোষগুলি তাহাকে দেখিতে দেই না। এই-রূপে ধনবান ব্যক্তি দুরাত্মা হইয়াও আপনাকে মহাত্মা বলিয়া মনে করেন। গুণের মর্য্যাদা হ্রাস করিয়া অর্থের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করাই তামসিকতার পরিচয়। তামসিকতাই অজ্ঞানতা, অজ্ঞানতাই পাপ, এবং পাপই পতন।

এক্ষণে মনুষ্যের শক্তির কথা আলোচনা করা যাউক। এই শক্তি ত্রিবিধ, প্রথম প্রভাব শক্তি; প্রভুত্ব হইতেই এই শক্তির উৎপত্তি, এবং প্রভুত্বের উপাদানও বিবিধ। ধনবল, জনবল, জ্ঞানবল, বংশ-মর্য্যাদা-বল, এ সমস্তই প্রভাব শক্তি। প্রভুত্ব ধর্ম্মভাবে পরিচালিত হইলেই প্রভুশক্তি অক্ষুন্ন থাকে। সম্রাট হইতে ক্ষুদ্র গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেরই কিছু না কিছু প্রভুত্ব থাকা সম্ভব। কিন্তু প্রভুত্বের ক্ষেত্র ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎই হউক, প্রভুত্ব পরিচালনার স্থূল নিয়ম একই—অর্থাৎ অধীনস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, তাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও সাধ্যমত উন্নতি সম্পাদন। দ্বিতীয়—উৎসাহ শক্তি। অধ্যবসায় দ্বারা অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশকেই উৎসাহ শক্তি বলে। উৎসাহবলে নিষ্প্রভ শক্তি-গুলিও প্রভাবশালী হইয়া উঠে এবং তদভাবে বিকাশোন্মুখ গুণসকল নিস্তেজ, হীনবীর্য্য ও কার্য্যাক্ষম হয়। উৎসাহহীন মনুষ্য উন্নতির সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সত্বেও সমাজের নিম্নস্থান অধিকার করেন, এবং সমাজের কোন প্রকার হিতকর কার্য্যের সহায়তায় অসমর্থ হন। তৃতীয়—মন্ত্রজ শক্তি। সদ্গুরু হইতে প্রাপ্ত সুসংস্কৃত মন্ত্রের সুসাধনায় ইহার

উৎপত্তি। মন্ত্রজ শক্তি, আত্মোন্নতির মূল ও আত্মোন্নতির অর্থ—দেহ, বুদ্ধি, মন, প্রাণ সম্বলিত আত্মাকে সর্ব্বপ্রকার পীড়া হইতে উদ্ধার করণ। আত্মা ব্যাধিশূন্য হইলেই মোহ বর্জ্জিত এবং পরমানন্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এইরূপ উন্নতিশীল ব্যক্তি বর্ত্তমান কালে সুদুর্লভ হইলেও, বৈদিক, তান্ত্রিক ও পৌরানিক কালে ভারতবর্ষে ইহার অভাব ছিল না। সাংসারিক উন্নতি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অতীন্দ্রিয়শক্তিবলে সংসারের উন্নতি সাধনে তাঁহারা উদাসীন ছিলেন না। আত্মোন্নতির অবনতির সহিত মন্ত্রশক্তির কুব্যবহার আরম্ভ হইল, এবং মন্ত্রবলে অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন একশ্রেণী লোকের উপজীবিকা হইয়া উঠিল। মন্ত্রশক্তি এইরূপে অসদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়াতেই ক্রমে ইহা নিষ্প্রভ, জনবর্গের নিকট হতাদর এবং বিলুপ্ত হইল। অধিক কি, এরূপ শক্তি কেবল মাত্র কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই এক্ষণে অনেকের বিশ্বাস। তর্ক বা প্রমাণাদিদ্বারা সেই বিশ্বাস খণ্ডন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ মন্ত্রশক্তির অভাবে আত্মোন্নতির গতি রোধ হইলেও, সাংসারিক উন্নতির গতি রোধ হইবার কথা নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় আর্য্য অধিবাসিগণ কোন বিষয়েই পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশস্থ সভ্য জাতিগণের সমকক্ষ নহেন। উৎসাহশক্তির অভাবই তাহার একমাত্র কারণ, উৎসাহ শক্তিই পুরুষকার ও প্রভাবশক্তির উৎপাদক। যেস্থলে উৎসাহশক্তি নাই তথায় পুরুষকার বা প্রভুত্ব থাকিতে পারে না। প্রভাব শক্তি পাইতে হইলে উৎসাহশক্তির আবাহন করিতে হয়। এই আবাহনে বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন নাই, অধিকার ভেদও নাই, কালাকালও নাই। ইহা মনের ধর্ম্ম, এবং ইহার উদ্দীপন কেবল আত্মপ্রযত্ন সাপেক্ষ। উৎসাহবৃত্তি বিস্ফুরিত করিতে পারিলে, সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্বেও মনুষ্য আপন অবস্থার উন্নতি করিতে পারে। পতিত মনুষ্য বা মনুষ্য সমাজের উন্নত হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। পতিতকে উদ্ধার করাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি শক্তি ও বৃত্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমান আছেন। আমরা সেই শক্তি ও মনোবৃত্তির কুব্যবহার দ্বারা যদি আরও অধঃপতিত হই সে দোষ আমাদের—ঈশ্বরের নহে। শক্তি ও মনোবৃত্তি সুপরিচালিত করিবার জন্য শাস্ত্রীয় আচারপরায়ণ হইয়া ভক্তিদ্বারায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপা, অনন্তবীর্য্যা, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে, এবং কোটী কোটী কণ্ঠে সমস্বরে বলিতে হইবে।

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥"

শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য

গুরু-শিষ্য সংবাদ।

অশৌচ শঙ্কর।

শিষ্য—গুরুদেব! এক্ষণে একটী অশৌচের মধ্য অপর অশৌচ প'ড়িলে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে—জানিতে ইচ্ছা করি। মধ্যে মধ্যে যুক্তি প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

গুরু—বৎস! একটী অশৌচের মধ্যে অপর অশৌচ প'ড়িলে তাহাকে অশৌচশঙ্কর বলে। শঙ্কর অতি জটিল। আমার কথায় সন্দেহ হইলে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিবে। আমিও তাহার উত্তর অতিবিস্তৃত ভাবে দিব। কথায় কথায় যুক্তি দেখাইতে হইলে অযথা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে। ফলকথা—তুমি যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলে—যথামতি যুক্তি প্রদর্শন করিব।

শিষ্য—তাত! আপনি যুক্তির কথা বলিলে যেন বিরক্ত হন। ঋষিরা কি বিনা যুক্তিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? কিছুই যুক্তি ছাড়া লিপিবদ্ধ হয় নাই, ইহাই আমার ধারণা।

গুরু—তাত! তোমার কথা ঠিক ও বটে, অঠিক ও বটে। তাঁহারা অযুক্ত কিছু বলেন নাই, ইহা ঠিক। তাঁহারা অনেক কথা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, ইহাই আমার ধারণা। আমরা তাহার যুক্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া—অপযুক্তির আশ্রয় ও গ্রহণ করি। সেই কারণে আমি যুক্তির পক্ষপাতী নই। তথাপি কালানুসারে যুক্তির উল্লেখ করিতে উদাসীন হইব না।

শিষ্য—পিতঃ! অশৌচশঙ্করের আর কি প্রত্যক্ষ করিবেন?

গুরু—বৎস! সে কথা পরে বলিব, আদৌ অশৌচ শঙ্করের কথা বলি। অশৌচ শঙ্করের প্রস্তাবের পূর্ব্বে একটী কথা বলি—আমরা নিরগ্নি, আমাদের মরণের পর অশৌচ হয়, যাহারা সাগ্নি, তাহাদের শবদাহের পর অশৌচ হয়। অশৌচ না জানিলে অশৌচ হয় না। তবে অশৌচ হওয়ার যোগ্যতা হয়। স্বল্প কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাশ, অতীসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, অক্ষিনাশ ইত্যাদি রোগী মহাপাতকী ও বৃহৎ কুষ্ঠ, অর্শপ্রভৃতিরোগযুক্ত অতিপাতকী, ইহারা প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে অশৌচ জন্মাইতে পারে না। অর্থাৎ ইহাদের মরণে অশৌচাদি হয় না। এবং ঐহিক মহাপাতকীপ্রভৃতির মরণে অশৌচ হয় না। কিন্তু ইহাদের উত্তরাধিকারিগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে ও অশৌচ হয়। যাহাদের অশৌচের অনুভব করিবার শক্তি হয় নাই, এরূপ শিশুর অশৌচ হয় না। প্রসূতির অশৌচ সত্ত্বে তাহাদের সংসর্গে থাকিলেও শিশুর অশৌচ হয় না। তাই শুচি ব্যক্তি অশৌচকাল মধ্যে প্রসূত সন্তানের সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই ব'লিয়াছি—অশৌচ দুই প্রকার কালনাশ্য ও ক্রিয়ানাশ্য। কালনাশ্য অশৌচের মধ্যে অশৌচান্তর হইলে শঙ্কর হয়। এক সময়ে অনেক অশৌচ পাতে গুরু অশৌচে লঘু অশৌচ নষ্ট হয়। এই গুরুত্ব কালগত ও ক্রিয়াদিগত। স্বজাত্যুক্ত অশৌচ—ত্রিরাত্রাদি অশৌচ অপেক্ষা কালে গুরু। সুতরাং স্বজাত্যুক্তাশৌচে ত্রিরাত্রাদি অশৌচ নষ্ট হয়। সপিণ্ডমরণাশৌচ অপেক্ষা পিতা মাতা ও ভর্ত্তার মরণাশৌচ গুরু। কেননা পিতা ও মাতা

পুত্রের, এবং ভর্ত্তা স্ত্রীর মহাগুরু। এইরূপ মহাগুরু মরণাশৌচকে "অষবৃদ্ধিমদাশৌচ" বলা হইয়াছে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এরূপ মহাগুরু মরণে অক্ষারলবণ ভোজন করিতে হয়; সুতরাং সপিণ্ডাশৌচ অপেক্ষা মহাগুরুর মরণাশৌচ গুরু। তাই সপিণ্ডাশৌচ—পিতা মাতা ও ভর্ত্তার মরণাশৌচের ক্রিয়াগত গুরুত্ব বশতঃ যায়; কিন্তু মহাগুরুর মরণাশৌচ সপিণ্ড মরণাশৌচে যায় না। কিন্তু যদি সপিণ্ডাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে মহাগুরু নিপাত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচে পরাশৌচের অন্ত হইবে—অর্থাৎ সেখানে মহাগুরুমরণাশৌচ স্বাবধি হইবে না। সপিণ্ডমরণাশৌচের অন্তে তাহার অন্ত হইবে এবং উভয়েরই শ্রাদ্ধ একদিনে হইবে। কিন্তু সপিণ্ডাশৌচের পরার্দ্ধে অষবৃদ্ধিমদাশৌচ হইলে স্বাবধি দশাহাশৌচ হইবে। কথাটী আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি।—ব্রাহ্মণের ১০ দিন অশৌচ। কোন একটী সপিণ্ডমরণের দশাহা-শৌচের ৫ দিনের মধ্যে পিত্রাদি মহাগুরুর মরণ হয়, তাহা হইলে পিত্রাদি মরণে আর পৃথক্ অশৌচ হইবে না। পূর্ব্বাশৌচে পরা-শৌচ যাইবে। কিন্তু পূর্ব্বাশৌচের ৬ দিন হইতে ১০ দিনের মধ্যে পিত্রাদির মরণ হইলে পিত্রাদি মরণ দিন হইতে ১০ দিন অশৌচ হইবে। শঙ্কর স্থলে কখন কখন পূর্ব্বাশৌচ বাড়িয়া যায়, কখন কখন পরাশৌচ কমিয়া যায়। উভয়াশৌচ ঠিক থাকিবে না—ইহা নিশ্চিত।

সমকালীন জনন মরণাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ গুরু; অতএব সপিণ্ডমরণাশৌচে সপিণ্ড জননাশৌচ যায়। মরণাশৌচের গুরুত্ব ও ক্রিয়াগত। মরণাশৌচে অস্পৃশ্যত্ব ও অক্ষারলবণাশিত্ব আছে, জননাশৌচে তাহার কিছু নাই, সুতরাং মরণাশৌচ গুরু। পাপের গুরুতা না থাকিলে অস্পৃশ্যত্বাদি হইবে কেন? কিন্তু দশাহ জননাশৌচ ত্রিরাত্র-মরণাশৌচ হইতে গুরু। কালের গুরুত্বই সর্ব্বপ্রধান। অতএব এইরূপ ভাবে বলিলে বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে।

১। দীর্ঘকালীন অশৌচে স্বল্পকালীন অশৌচ যায়।

২। সমকালীন মরণাশৌচে সমকালীন জননাশৌচ যায়।

৩। সপিণ্ড মরণাশৌচে পূর্ব্বার্দ্ধপাতী পিত্রাদি মহাগুরু মরণাশৌচ যায়।

৪। পরার্দ্ধপাতী অষবৃদ্ধিমদাশৌচে সপিণ্ড মরণাশৌচ যায়, তথায় সপিণ্ড মরণাশৌচ বাড়ে এবং অষবৃদ্ধিমদাশৌচ ঠিক থাকে।

৫। সপিণ্ড মরণাশৌচের উপান্তদিনের অর্থাৎ অশৌচান্তদিনের পূর্ব্বদিনের মধ্যে অন্য সপিণ্ড মরিলে আর পৃথক অশৌচ হয় না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ৯ দিনের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের ১১ দিনের মধ্য, বৈশ্যের ১৪ দিনের মধ্যে এবং শূদ্রের ২৯ দিনের মধ্যে অন্য সপিণ্ড মরিলে আর পৃথক অশৌচ হয় না, পূর্ব্বাশৌচেই পরা শৌচ যায়।

সপিণ্ডমরণের অশৌচান্তদিনে অর্থাৎ কামানর দিনে অপর সপিণ্ড মরিলে দুদিন মাত্র বাড়িবে—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ১২ দিন ক্ষত্রিয়ের ১৪ দিন বৈশ্যের ১৭ দিন এবং শূদ্রের ৩২ দিন অশৌচ হয়। আর যদি অশৌচান্তদিনের ভোরবেলায় অরুণোদয় কালে সূর্য্য না উঠিতে অশৌচান্তর পাত হয়, তাহা হইলে সকল জাতিরই স্ব স্ব অশৌচ অপেক্ষা ৩ দিন বেশী হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ১৩ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১৫ দিন, বৈশ্যের ১৮ দিন এবং শূদ্রের ৩৩ দিন অশৌচ হয়।

জননাশৌচের শাঙ্কর্যাও এইরূপ। যেমন পিত্রাদির মরণাশৌচ—অঘবৃদ্ধিমদাশৌচ, সেই-রূপ স্বপুত্রজননাশৌচও অঘবৃদ্ধিমদাশৌচ একথা বারান্তরে বলিয়াছি।

৬। সপিণ্ডজননাশৌচে পূর্ব্বার্দ্ধপাতী স্বপুত্র জননাশৌচ রূপ অঘবৃদ্ধিমদাশৌচ যায়। স্বপুত্রজননাশৌচ সপিণ্ডজননাশৌচের পরার্দ্ধ-পাতী হইলে স্বপুত্রজননাশৌচে সপিণ্ডজনন-শৌচ যায়। এরূপ স্থলে স্বপুত্রজননাশৌচ দশাহাদি হইয়া থাকে। অঘবৃদ্ধিমদাশৌচেই কেবল পূর্ব্বপরার্দ্ধপাত নিয়ম।

৭। সপিণ্ড জননাশৌচের উপান্তদিনের মধ্যে সপিণ্ডান্তরের জননাশৌচ হইলে পূর্ব্বা-শৌচে পরাশৌচ অতীত হয়। অশৌচান্তদিনে অন্য সপিণ্ড জন্মিলে পূর্ব্বাশৌচ দু'দিন বাড়ে, সেই বৰ্দ্ধিত ২ দিনেই পরাশৌচেরও অন্ত হয়। অশৌচান্তদিনের অরুণোদয়কালে অর্থাৎ ভোরবেলা অন্য সপিণ্ড জন্মিলে পূর্ব্বাশৌচ ৩ দিন বাড়ে। ইতিপূর্ব্বে মরণাশৌচের এই প্রকার ব্যবস্থা বলিয়াছি।

পিতার বা মাতার মরণের স্বজাত্যুক্তাশৌ-চের উপান্তদিনের মধ্যে মাতার বা পিতার মৃত্যু হইলে পূর্ব্বাশৌচেই পরাশৌচ যায়। পিতার বা মাতার মরণের অশৌচান্তদিনে মাতার বা পিতার মরণ হইলে দু দিন মাত্র বাড়িবে। এবং অশৌচান্তদিনের ভোর বেলায় পূর্ব্বোক্ত অন্যতরের মৃত্যু হইলে ৩ দিন মাত্র বাড়ে।

প্রথম স্বপুত্র জননাশৌচের উপান্তদিনের মধ্যে দ্বিতীয় স্বপুত্র জন্মিলে পূর্ব্বাশৌচেই পরাশৌচ অতীত হয়। একটী পুত্রের জননা-শৌচান্তদিনে অপর পুত্র জন্মিলে ২॥দিন অশৌচ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অশৌচান্তদিনের ভোরবেলায় জন্মিলে ৩ দিন বাড়ে। পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধের কথা সবিশেষ বলি—ব্রাহ্মণের ১০ দিন অশৌচ। সেই ১০ দিনের প্রথম ৫ দিন পূর্ব্বার্দ্ধ ও দ্বিতীয় ৫ দিন পরার্দ্ধ। ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন অশৌচ প্রথম ৬ দিন পূর্ব্বার্দ্ধ এবং সপ্তম দিন হইতে ১২ শ দিন পর্য্যন্ত পরার্দ্ধ। বৈশ্যের ১৫ দিন অশৌচ প্রথম ৭॥ সাড়ে সাত দিন অর্থাৎ সাতটী অহোরাত্র ও একটী দিবা পূর্ব্বার্দ্ধ, অপর অষ্টম দিবসের রাত্রি হইতে পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত পরার্দ্ধ। শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ, প্রথম ১৫ দিন পূর্ব্বার্দ্ধ, শেষ ১৫ দিন পরার্দ্ধ।

মহাগুরু মরণজনিত স্বজাত্যুক্তাশৌচের মধ্যে সপিণ্ড মরিলে আর পৃথক্ অশৌচ হয় না। সেই অশৌচেই উভয় অশৌচের অন্ত হয়, সেইরূপ স্বপুত্র জননাশৌচের মধ্যে সপিণ্ড জন্মিলে পৃথক্ অশৌচ হয় না, স্বপুত্র জননাশৌচে সপিণ্ডজননাশৌচ যায়। স্বপুত্র জননের অশৌচান্ত দিনে অন্য স্বপুত্র জন্মিলে দু দিন অশৌচ বাড়ে। ভোরবেলায় অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অপর স্বপুত্র জন্মিলে ৩ দিন অশৌচ বাড়ে জন্মিয়া বাঁচিয়া থাকিলে এইরূপ অশৌচ হয়। মরিলে অন্যবিধ অশৌচ হয়—সে কথা ক্রমে বলিব।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

বীরভূম ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

সমাগত ভূদেবমণ্ডলী! যথাযোগ্য নমস্কার ও সম্ভাষণান্তে আমি আপনাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। আমাদের কি আনন্দের দিন! বীরভূমে আজ শ্রীশ্রী৺ব্রাহ্মণ সম্মিলন হইতেছে। নানাস্থান হইতে মহর্ষি-কল্প পণ্ডিতমণ্ডলী ও রাজর্ষি-কল্প ব্রাহ্মণ ভূস্বামিবৃন্দ, সমাজযন্ত্রের যাঁহারা যন্ত্রী, দেশের যাঁহারা প্রাণস্বরূপ, সেই সর্ব্বজনবরেণ্য, ত্রিলোকবন্দনীয় ভূদেবগণ বীরভূমে সমাগত হইয়াছেন। বীরভূমি আজ পবিত্র হইল! আমরা আজ কৃতার্থ হইলাম।

জীবনে অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছি, অনেক দৃশ্যদর্শন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য কখনও নয়নপথবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। কি উদার ও মহান্ এই দৃশ্য! দেখিলে অতি বড় পাষণ্ডের হৃদয়ও ভক্তি-রসে আপ্লুত হয়! নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়া বক্ষ ভাসাইয়া দেয়!! মস্তক আপনাপনি অবনত হইয়া আইসে! কোন স্মরণাতীতকালে সূর্য্যবংশাবতংস পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি ভগীরথ সুরধুনীর পবিত্র প্রবাহ মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়া ছিলেন। সে দিনও যেমন ছিল; ভাগিরথীর পুণ্য সলিল আজিও তেমনি মনোহারী, লোকপাবনকর ও ভুক্তিমুক্তি বিধায়িরূপে ভারতবরেণ্য হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মণ্য মহিমাও তদ্রূপ। কোন স্মরণাতীত দিবসে সৃষ্টির আদিম বাসন্তী প্রভাতে মন্দাকিনীর সুবিমল সুধা ধারা বক্ষে বহিয়া, সত্বগুণময় ভর্গবভূতি যে ব্রহ্মণ্যবিগ্রহ মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ! আপনাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে আজিও সেই দেবতাই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যে নগ্নপদ বল্কল পরিহিত, উপবীতসম্বল জাতি নয়ন পথারূঢ় হইলে সুররাজ ইন্দ্র ঐরাবত হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া প্রণত হইতেন; আমি আজ সেই জাতিকেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহার অধিক আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?

কিন্তু এই আনন্দের দিনেও একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছি। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য যে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধই ইহার কারণ যে ইংলণ্ডেশ্বর ভারত সম্রাটের ছত্র ছায়াতলে আমরা এতদিন নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতেছি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালনের সুযোগ লাভ করিয়া আসিতেছি, সেই পরাক্রান্ত ন্যায়বান নৃপতিও এই যুদ্ধে সংলিপ্ত রহিয়াছেন। যুদ্ধে বীরজাতি ইংরাজের জয় যদিও সুনিশ্চিত, তথাপি রাজভক্ত ভারতবাসী আমরা সহজেই একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। প্রার্থনা করিতেছি - এক্ষণে দেবতার কৃপায় আমাদের এ উদ্বেগ প্রশমিত হউক। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হইলে কার্য্যে কাহারও প্রবৃত্তি থাকে না। কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মণজাতির এই দুর্দ্দিনে এতদ্রূপ অনুষ্ঠান ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই, তাই, ব্রাহ্মণ সম্মিলনের আয়োজন।

গত বৎসর এই সম্মিলন হইয়াছিল মহানগরী কলিকাতায়, পরমপবিত্র মহাপীঠ তীর্থ কালীঘাটে। মফঃস্বলে ইহার অধিবেশন

এই প্রথম। মহর্ষি প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ অধ্যুষিত, জয়দেব চণ্ডীদাসের লীলানিকেতন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের মিলনানন্দ প্লাবিত বীরভূমির, নন্দেশ্বরী পীঠক্ষেত্র, অবশ্য ব্রাহ্মণসম্মিলনের অযোগ্য স্থান নহে। আমি কিন্তু আর এক বিষয়ের কথা বলিতে ছিলাম। কলিকাতা আমাদের দেশের রাজধানী। কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিলে তথায় প্রয়োজনীয় যাহা কিছু অনায়াসে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তদুপরি বিগত সম্মিলনে আপনারা যাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সমস্ত মহাত্মগণ সকলবিষয়েই উপযুক্ত ও কৃতী। বীরভূমে তাহার একান্ত অসম্ভব। আপনাদের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসমূহ বীরভূমে একরূপ দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হব না। দ্বিতীয় কথা—বীরভূমি অধুনা বড় কাঙ্গাল—বড় দরিদ্রের দেশ। ইহাতেও বা একরূপ চলিতে পারিত; কার্যাভার যোগ্যব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইলেও হয়ত বা তাহা কোনরূপে নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। আপনাদের অভ্যর্থনা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে, আমার ন্যায় একজন অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মণের শ্রীচরণ প্রক্ষালন ব্রত গ্রহণ করিয়া জগতে ব্রাহ্মণ-সেবার প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন; আমি সেই ভূদেবতাগণের অভ্যর্থনা করিবার ভার-প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহ জীবনে এরূপ সৌভাগ্যলাভ অবশ্য দুর্লভ। তজ্জন্য আমি আজ নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাঁহারা আমাকে এই কার্য্যের অধিকার দান করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি কিন্তু ত্রুটি বিচ্যুতির আশঙ্কা পদে পদে, তাই ভীত হইতেছি পাছে অপরাধী হই। তবে ভরসা, আপনাদের অনুগ্রহ। আশ্বাসের বিষয় ব্রাহ্মণ চির-ক্ষমাশীল। করুণাসিন্ধু আপনারা, বীরভূমের সমুদয় তথ্য জানিয়া শুনিয়াই আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আজিকার দিনেও অনুগ্রহ করিয়া স্বাগত সম্ভাষণের পর আমাদের প্রদত্ত পাদ্য, অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য বন্দনাদি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

বীরভূমির শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অধুনা ঘরে পরে সকলেই মুখ ফিরাইয়া থাকেন। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। বীরভূমি আজ অন্ধকারময় বলিয়া মনে হইলেও, সে স্থান একটা অতীত গৌরবের স্মৃতি-ধূমে সমাচ্ছন্ন। ধূমান্তরালে ক্ষীণ মৃদু আলো, সে আলোকে অন্বেষণ করিলে এখনও যে কিছু না মিলিতে পারে—এমন নহে। একজন বিভিন্ন স্থানীয় সাহিত্যসেবী লিখিয়াছেন—"বীরভূম জেলায় অনেকগুলি মুনি-তপোবন আছে। বক্রেশ্বরাদি উষ্ণপ্রস্রবণ, ময়ূরাক্ষী অজয়, শাল, হিংলা, দ্বারিকা প্রভৃতি নদ নদী পাহাড়ের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বীরভূমের বেলফুল বড় মনোজ্ঞ। যশোহরের গোলাপও তাহাদের সৌন্দর্য্য অবয়ব ও সুরভির নিকট লজ্জা পাইবে। স্বভাবের সুরম্য নিকেতন বীরভূমি, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। তাঁহাদের হৃদয়ও সেই বেলফুলগুলির মত সুন্দর ছিল। তাঁহাদের কাব্যে সেই সুন্দর হৃদয়ের অমর প্রতিবিম্ব রহিয়া গিয়াছে।" আমাদের মনে হয় সেই সুন্দর হৃদয় বুঝি আজ মলিন হইয়াছে। আমরা বুঝি সহৃদয়তাটুকুও হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু একদিন ছিল। আমার আজ

সেই সব কথাই মনে পড়িতেছে, তবে—লিখিবার ক্ষমতা নাই, সভা সমিতিতে যাওয়া বা তদ্রূপস্থলে বক্তৃতাদি বিষয়েও আমি একেবারেই অনভ্যস্ত। সুতরাং বক্তব্যবিষয় শৃঙ্খলাসম্পন্ন না হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। আশা করি নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

বীরভূমি চিরকাল ব্রাহ্মণ অনুশাসনে শাসিত—সর্ব্বাদৌ সেই কথাই মনে পড়িতেছে। বীরভূমের সেই অতীতকালে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের দিনে বক্রেশ্বর, অট্টহাস প্রভৃতি স্থান হইতে সমুত্থিত হোমধূমে বীরভূমি যখন পবিত্র হইত। কুশীকাশ্রম প্রভৃতি হইতে সমুত্থিত সামঝঙ্কার যখন বীরভূমি মুখরিত করিত, কিন্তু কোন সুদূর অতীতের কাহিনী তাহা! তাই সেদিনের কথা ছাড়িয়া দিলাম। কিঞ্চিন্ন্যূন প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। বীরভূমের বিশ্রুতনামা ব্রাহ্মণ কবি জয়দেব তাঁহার মধুর কোমল কান্ত পদাবলীতে এক দিন সমগ্র ভারতবর্ষ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্বের কবিকুঞ্জ-কুটীরে বঙ্গ সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের শুভাগমন হইয়াছিল। শ্রীগীতগোবিন্দের সুধা সুমধুর সঙ্গীত কাকলী বৈষ্ণবধর্ম্মে এক নব ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। সে তরঙ্গের মধুর কম্পন আজিও ভারতহৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিতেছে। নানুরের নিরঞ্জন পাতের কুটীরে প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস তাঁহার অশেষ পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাসও ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পীযূষবর্ষী সঙ্গীতলহরীর মূর্ত্তিমানবিগ্রহ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি এই বীরভূম। হাড়াই পণ্ডিতের পুত্র-দান জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। কি অপূর্ব্ব ত্যাগশীলতা সেই ব্রাহ্মণের! শ্রীচৈতন্যপার্ষদ সুন্দরানন্দের ভাবানুপ্রাণিত ব্রজভূমের প্রেম মধুর মন্ত্রে উজ্জীবিত বীরভূম মঙ্গলডিহির শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুরও বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পর্ণিগোপালের উপযুক্ত বংশধর "শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরস-কদম্ব" রচয়িতা ঠাকুর 'নয়নানন্দ' ও সঙ্গীতে কবিতায় বৈষ্ণবধর্ম্মকে বীরভূমের পল্লীনিচয়ে বহুল প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন।

অবতারে শঙ্কর সদৃশ মহাপুরুষ বীরভূমি সিসুরের 'বিরূপাক্ষগোস্বামী' ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। "মৃণাল দীঘি" প্রভৃতি পণ্ডিত খনি প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বীরভূমেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৃণালদীঘির "তারাচরণ তর্করত্ন" 'রামচরণ ন্যায়চূড়ামণি' প্রভৃতি পণ্ডিতগণের খ্যাতি প্রতিপত্তি এক সময় সমগ্র বঙ্গে পরিব্যাপ্ত ছিল। এক দিন সবই ছিল—আজ কিছুই নাই। আজ আমাদের মত অধঃপতিত আর কাহারা? এত দুর্দ্দশা আর কাহাদের? ধর্ম্ম ভুলিয়া ত্যাগ সংযম সদাচার হারাইয়া আমরা এখন পথের ভিখারী হইয়াছি, কিন্তু তথাপি হতাশ হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। যখন আপনারা আসিয়াছেন—নিশ্চিতই একটা উপায় হইবে। আমার ভরসা জাগিয়াছে; নন্দেশ্বরীপীঠক্ষেত্র আজ নৈমিষারণ্যের স্থান অধিকার করিবে। জনহিত পরায়ণ মহর্ষিকল্প হে ভূদেবমণ্ডলী! সমাজরক্ষাকল্পে আপনারা বর্ত্তমান কালোপযোগী বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। সেরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান দেওয়া ও ধৃষ্টতা মনে করি। তবে আমার অন্তরের কথা দুই চারিটী আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি মাত্র। অবহিত হইলে অনুগৃহীত হইব। পিতৃ পিতামহগণের আচরিত সনাতন

হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান, আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়; ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইলেও চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ পুনঃ সংস্থাপন ভিন্ন দেশের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত; চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। 'আপাত অসম্ভব' বলিতেছি এই জন্য যে সমাজ বন্ধন বড় শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আশ্রম চতুষ্টয়ের একটীও আমাদের বর্ত্তমান নাই। সুতরাং এ কার্য্যে আমাদিগকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। সংযম ভিন্ন চরিত্রবান হওয়া যায় না, এবং ব্যক্তিগত সচ্চরিত্রতার অভাবে জাতিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তবেই দেখা যাইতেছে আশ্রম চতুষ্টয়ের যেটী প্রথম, সর্ব্বাগ্রে সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাই আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী "শ্রীগৌরাঙ্গমঠ" নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। প্রাচীন যুগের আদর্শ অনুযায়ী গুরুগৃহের মত ছাত্র প্রতিপালন করিয়া দ্বাদশবৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের সহিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মাচরণ এবং বর্ত্তমান কালোপযোগী অপরাপর বিষয় নিচয়ের শিক্ষাদানই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপে আদর্শ গড়িতে পারিলে কালে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন একরূপ সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। কিরূপে এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে—ইহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ আলোচনা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। "শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের" কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে আমরা আপনাদের মূল্যবান অভিমত আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু এই একটী কার্য্যের অনুষ্ঠানেই আমাদের সকল কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইবে না। ভীষণসমাজ ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলে আরও অনেক বিষয়েই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বরপণ, কন্যাপণ গ্রহণ প্রভৃতি যে সমস্ত পাপপ্রথা সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, সে গুলির সমূলে বিনাশ সাধন করিতে হইবে। আর একটী অবশ্যকরণীয় কার্য্য—পল্লী গ্রামগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে, সমাজ এখনও পল্লীগ্রামেই আছে। পল্লীগুলি লইয়াই দেশ। এই পল্লী শরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পল্লীগুলি না টিকিলে কুলধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না, সুতরাং জাতি বাঁচিবে না। এ সমস্ত কার্য্যেই অর্থ আবশ্যক। ভারতের জ্ঞানবল ও অর্থবলের সামঞ্জস্য সংসাধন ভিন্ন আমাদের জীবন সমস্যার সমাধান একরূপ অসম্ভব। কিন্তু সকলের মূলে আমাদের ধর্ম্ম। ধর্ম্মের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারতে কোনও কিছুই তিষ্ঠিতে পারিবে না। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ, আমাদের একমাত্র আশ্রয়। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় কামনা করিয়া আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

কতকগুলি "হইবে" ও "হইবে না"র সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আর আপনাদিকে বিরক্ত করিতে চাহি না। কিসে আমাদের দুর্দ্দশা দূর হয়, আমরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইতে পারি, আপনারাই তাহার উপায় বিধান করুন। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বঙ্গের এতগুলি মনিষী যখন একত্রিত হইয়াছেন, তখন আমাদের আশা অপূর্ণ থাকিবে না ইহা সুনিশ্চিত। অলমিতি।

নিবেদক—

শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

বীরভূম।

বীরভূম ও ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন।

এবারে "ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের" তৃতীয় অধিবেশন বীরভূমে সাড়ম্বরে সমাপিত হইয়াছে। মহাসম্মিলনের প্রস্তাবসমূহের আলোচনা বা তাহার পূর্ব্বাপর বিবরণ দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে বীরভূম মহাসম্মিলনে উপস্থিত থাকিয়া সেখানে যে কয়েকটী বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি—তাহাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

১। সাঁইথিয়া ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে শ্রীশ্রী৺নন্দেশ্বরী মাতার পীঠ সন্নিধানে সম্মিলনের স্থান হইয়াছিল। বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরে সভামণ্ডপ বড় সুন্দর মানাইয়াছিল। সম্মুখে ময়ূরাক্ষী নদী। রৌদ্রের প্রখরতাপে হউক বা বীরভূমের স্বভাবসুলভ মৃত্তিকার শোষণের গুণেই হউক ময়ূরাক্ষীর প্রবাহ ফল্গুনদীর মতই প্রায় অদৃশ্য। স্থানে স্থানে অল্প অল্প জল আছে বটে, কিন্তু তাহা আবার ঘোলা। যাহা হউক—স্থান মাহাত্ম্যে মহাসম্মিলন জমিয়াছিল ভাল। বীরভূমবাসীরা এইস্থানে মহাসম্মিলনের স্থান করিয়া বিশেষ বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছিলেন।

২। সম্মিলনের মণ্ডপও একটী সকলের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। আধুনিক সভা সমিতির ন্যায় ইংরাজীকায়দায়—ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। মণ্ডপ দেখিয়াই পুরাতনযুগের একটী উজ্জ্বল ছবি আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। সেই পুরাতনকালের চন্দ্রাতপ, সেই পুরাণ চিত্র বিচিত্র সামিয়ানা, সেই পুরাতন সাজসজ্জা আদপ কায়দা সবই বজায় ছিল। বীরভূমের জমীদারদিগের গৃহ হইতেই সম্ভবতঃ এসব আনয়ন করা হইয়াছিল, এখন আর এসব কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন শিল্পের এই বিরাট নিদর্শন ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের সঙ্গে বেশ মানাইয়া ছিল।

৩। বীরভূমের অভ্যর্থনা সমিতিতেও একটী বিশেষত্ব ছিল। বোধ হয় অভ্যর্থনা সমিতির কাহারও বাড়ী সাঁইথিয়াতে ছিল না। সেই হেতমপুর, কুণ্ডলা বা আরও বহু দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে সমস্ত জিনিষপত্র আনাইয়া আয়োজন উদ্যোগ—একটা মহাপ্রাণতার লক্ষণ। শুনিয়াছি বীরভূমের অনেকগ্রামের ব্রাহ্মণবর্গই এই অভ্যর্থনাসমিতিকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের উন্নতি যে সেখানকার সকলের বিশেষ অভীষ্ট, তাহা এই ব্যাপারেই বুঝা যায়। এই সমস্ত আয়োজন উদ্যোগে যদি কোথাও একটু ত্রুটি লক্ষিত হইয়াও থাকে, তাহা নূতন স্থানে সম্মিলনের স্থান নির্ব্বাচন জন্যই হইয়াছিল, বলিতে হইবে। যাহা হউক, আমরা বীরভূমের অভ্যর্থনা সমিতিকে তাঁহাদের এই বিরাট অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিই।

৪। বীরভূমের ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া বুঝা গেল যে, বীরভূমে এখনও একটী ব্রহ্মণ্যের ক্ষেত্র আছে। সমাজের চেতনাশক্তির অভাবে সেইক্ষেত্র অধুনা অনুর্ব্বর হইয়া পড়িলেও তাহার অবস্থা যে ভাল, তাহা বেশ বুঝা যায়। সেখানকার রাজা, মহারাজা, জমীদার, বিষয়ী, পণ্ডিত ও সাধারণ সকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-মধ্যেই একটী ব্রাহ্মণ্যের জন্য বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ বেশ লক্ষ্যের বস্তু। হেতমপুরের মহারাজা বাহা-

ছুর "গৌরাঙ্গ মঠ" প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণ-বালকগণের সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেখানে বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী হইয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে। "গৌরাঙ্গ মঠের" ব্রহ্মচারী কতিপয়ছাত্র সম্মিলনের প্রারম্ভে সুস্বরে মঙ্গলাচরণ পাঠ করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল।

৫। কেন্দুবিল্বের মহাপুরুষ জয়দেবের নাম অনেকে অবগত আছেন। যাঁহার গীত-গোবিন্দের মোহন সঙ্গীতে একদিন ভগবান-কেও বীরভূমে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল। সেই গীতগোবিন্দের প্রসূতি জয়দেবের কেন্দু-বিল্বে একটী মঠ আছে। সেই মঠের একজন সাত্ত্বিক মহাত্মা মোহান্ত আছেন। ইনি মোহান্ধ নহেন—বাস্তবিকই মোহান্ত। ইনি সম্মিলনে উপস্থিত থাকিয়া দ্বিতীয়দিবস আবেগময়ী বক্তৃতাছটায় সকলকে কাঁদাইয়াছিলেন। বাঙ্গলা ইহার মাতৃভাষা নহে। কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালায় এমনি মাধুরী ছিল যে সেই ভাষা অদ্যাপি আমার কর্ণে বাজিতেছে। ব্রজবুলির মত সেই ভাষা কেন্দুবিল্বের মোহান্তের উপযুক্তই হইয়াছিল। বাস্তবিক এইরূপ ধর্ম্মপ্রাণ মোহান্তের কথা অল্পই শুনা যায়। সাধারণতঃ মোহান্তেরা সভাসমিতিতে বড় মেশেন না। কিন্তু ইনি বিষয়ী হইয়া ও নির্ব্বিষয়ী, ধনী হইয়াও নির্ধন, উচ্চ হইয়াও তৃণাদপি সুনীচের মতই সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্বের মাটীর গুণেই বোধ হয় এইরূপ মহাত্মার আবাস স্থান হইয়াছে।

৬। মহাসম্মিলনের প্রথমদিবসের অধিবেশনের প্রাক্কালে অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একখানি পত্র পড়িয়া সভ্যবৃন্দকে শুনাইলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ,—"বরিশালের কোন গণ্ড গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন যে, তাঁহার সহস্রাধিক টাকার নিজস্ব সম্পত্তি আছে, সেই সমস্ত টাকার সম্পত্তি তিনি ব্রাহ্মণসম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করিতে চান। উদ্দেশ্য—যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সামাজিক বিপ্লবে উৎপীড়িত হইয়া অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, হয় ত বা সংসারের কষ্টে অসৎপথে গমনে উদ্যত, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের কথঞ্চিৎ রক্ষা"। এই পত্রের যখন কালিকা বাবু পাঠ শেষ করিলেন, তখন সভায় কেহই চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারে নাই। একজন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে প্রস্তুত, এইরূপ দান হিন্দুর ইতিহাসে বিরল নহে, কিন্তু অধুনাতনকালে অত্যন্ত বিরল সন্দেহ নাই। এইরূপ ব্রাহ্মণ এখনও আছেন বলিয়া হিন্দু সমাজ বিলুপ্ত হয় নাই।

৭। সায়ং সন্ধ্যা,—মহাসম্মিলনের দ্বিতীয় দিবস অধিবেশন শেষ করিতে অনেক রাত্রি হয়। এ জন্য সন্ধ্যার সময় সভ্যবৃন্দকে সন্ধ্যানুষ্ঠান জন্য এক ঘণ্টা অবসর দেওয়া হইয়াছিল। ঘণ্টা খানিকের জন্য সভাভঙ্গ হইলে স-সভাপতি বহুশত ব্রাহ্মণ, যখন ময়ূরাক্ষীতটে সন্ধ্যোপাসনায় বসিলেন; তখন একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। শত শত ব্রাহ্মণকে একস্থানে একভাবে উপাসনা করিতে কখনও দেখি নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিষয়ী, জমিদার প্রভৃতি সকলে এক ভাবের ভাবুক হইয়া সংসারের ক্ষুদ্র মানাপমান ছাড়িয়া যখন নদীতটে সন্ধ্যোপাসনায় নিরত হইলেন, তখন পুরাতন যুগের একটী দৃশ্যপট মনে সমুজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হইয়া গেল। বক্তৃতাদি দ্বারা যে কার্য্য হয় না, একমাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই কার্য্য সমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ মহা-

সম্মিলন এই ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন।

৮। ব্রাহ্মণের পদধূলি—মহাসম্মিলনে আর একটী বিষয় বড় চমৎকার দেখিলাম। তাহা—সভা ভঙ্গের পর ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহের চেষ্টা। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত সেই বিরাটসভা মণ্ডপস্থ অধিবেশন যখন ভঙ্গ হইয়া গেল তখন ব্রাহ্মণ শূদ্র অনেকেই সভাঙ্গনে বিস্তৃত জাজিম ঝাড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ সংগ্রহ করিলেন। যে জাতির মনে এখন পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণের প্রভাব জাগরূক আছে—সেই জাতি কখনও ধর্ম্মহীন হইতে পারে না। মানুষ একশ্রেণীর মানুষকে কেন এরূপ গৌরব দিল, কেন ব্রাহ্মণ এত উচ্চ হইলেন, তাহা কি চিন্তার বিষয় নহে! এখন ব্রাহ্মণ কাল দোষে হীন হইলেও এখন ব্রাহ্মণ অধিকাংশ স্থলে জাতিমাত্র সার হইলেও সে যে গুণে বড় হইয়াছিল—তাহা কি আবার লাভ করিতে পারে না? পদধূলি সংগ্রহ ব্যাপারে ব্রাহ্মণকে বুঝান হইল যে—তোমার অন্তর্নিহিত অস্ফুটশক্তি এখনও বর্ত্তমান আছে সেই শক্তিরই আদর করা হইতেছে। সেই ব্রাহ্মণ্যেরই পূজা করা হইতেছে। তুমি আবার সেইরূপ বড় হও, আবার সেইরূপ বরেণ্য হও। যে, যে বৃত্তিতে থাকে; সেই বৃত্তির আদর না করিলে সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় না। ব্রাহ্মণের যাহা কর্ম্ম, তাহার আদর সমাজ চিরকালই করিয়া আসিয়াছেন, এখন সেইরূপ ব্রাহ্মণের আদর নাই, তাই ব্রাহ্মণ স্ববৃত্তিতে সন্তুষ্ট নহে। তাই বৃত্ত্যন্তর গ্রহণে ব্রাহ্মণ ক্রমে বাধ্য হইতেছেন। এখন যদি পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের আদর করা যায়, তবে ব্রাহ্মণ "অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" হইয়াও স্ববৃত্তিতে তুষ্ট থাকিবেন। জাতীয় গৌরব হৃদয়ে প্রবেশ না করিলে, জাতীয়তার প্রতি সাধারণের সহানুভূতি না থাকিলে—একটা জাতিগঠিত হইতে পারে না। এখনও সামাজিকগণ ব্রাহ্মণের আদর করিতে সম্পূর্ণ ভুলে নাই, এখনও ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যজ্যোতিঃ খুঁজিয়া মিলে। বীরভূমও ব্রাহ্মণের আদর অদ্যাপি ভুলে নাই। আশা হয় বীরভূমের এই ব্যবহারে অনেক ব্রাহ্মণের জাতীয় গৌরব সন্ধুক্ষিত হইবে।

৯। বীরভূমের সঙ্কীর্ত্তন। বীরভূমের সঙ্কীর্ত্তন বড় মনোহর। গীত গোবিন্দের দেশে সঙ্কীর্ত্তন যে এইরূপ মনোহর হইবে। তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—সেই পুরাতন কাল হইতে সেই সঙ্কীর্ত্তনের ধারাটী ঠিক বজায় আছে। সেই পুরাতন খোল করতাল সিঙ্গা লইয়া একশ্রেণীর বৈষ্ণব সম্প্রদায় যখন সম্মিলন মণ্ডপে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিল; তখন বহুলোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে যে একটী প্রগাঢ় ভাবাবেশ আছে—একটী যে মোহকর উন্মাদক আকর্ষণ আছে তাহা পূর্ব্বে বড় অনুভবে আসে নাই। তালেতালে পা ফেলিয়া উন্মাদ নৃত্যের সঙ্গে যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল—তখন মনে হইল যে 'ভাবাবেশে সজ্ঞাশূন্য' হওয়ার কথা অলীক বা অবিশ্বাস্য নহে।

বীরভূমের ব্রাহ্মণসম্মিলনে অনেক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। অনেক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহুদূর দেশ হইতে কার্য্য ক্ষতি করিয়াও আসিয়াছিলেন। কেহ কিছু লাভের আশায় আসেন নাই। প্রাণের টান এমনি বস্তু। ব্রাহ্মণের মধ্যে এইরূপ মিলন বড় আবশ্যক, পূর্ব্বে অবশ্য বড় বড় কার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া এইরূপ

মিলনের সুযোগ পাইতেন—কিন্তু তাহা প্রায়ই বড় বড় অধ্যাপকের ভাগেই জুটিত, এইরূপ মিলনটি বড়র মধ্যেই হইত, উদ্দেশ্যও তাঁহাদের অনুরূপ ছিল। কিন্তু এখন আর সেরূপ প্রায় জুটে না। এখন আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধারণব্রাহ্মণের মিলন বড় হয় না ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন উপলক্ষে সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণের এইরূপ মিলনে সমাজের বল বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। সমাবস্থ বা হীনাবস্থ বহুলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘটিলে নিজের অবস্থায় শ্রদ্ধা হয়। বৃত্তির প্রতি অনুরাগ জন্মে। বিশেষতঃ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গেও মিলন ঘটে। তাঁহারাও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এইরূপ পরিচয় নাই বলিয়াই তাঁহারা দেশের বড় বড় কার্য্য উপেক্ষিত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিশিষ্ট চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর পরিচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; তাহাতে সমাজের কল্যাণ হইবে। ব্রাহ্মণসম্মিলন দ্বারা এই কল্যাণের সূত্রপাত হইয়াছে।

১১। সম্মিলনে আর একটী বড় ভালকার্য্য লক্ষ্য করিয়াছি। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের জমীদারবর্গ নিজের অন্তঃপুরে এখনও বেশ হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়াছেন। দ্বিতীয় দিবস সম্মিলনের প্রারম্ভে যখন উক্ত জমীদার বর্গের ভাগিনেয়গণ তান লয় সহকারে শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদ্গর' আবৃত্তি করিতে লাগিলেন তখন সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। জমীদার পরিবারের মধ্যে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে যে একটু একটু করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়—তাহা বড়ই আবশ্যক। ইংরাজি শিক্ষায় হৃদয়ে যে বিষ সঞ্চার হয় তাহার বিরেচকস্বরূপ কিছু কিছু সংস্কৃত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। শৈশব হইতে এইরূপ শিক্ষা হইলে পরে বালকগণ উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইতে পারে না। সমাজের সঙ্গে তাহার বেশ সৌহার্দ্দ্যও থাকে অধুনাতন শিক্ষিত শ্রেণী এ সব বিষয়ে বড় লক্ষ্য করেন না, তাই ইদানীন্তন বালক ও যুবকগণ এক একটী বাবুর দলে পরিণত হইতেছে, আহারে বিহারে শৃঙ্খলা নাই, আচারে বিচারে লক্ষ্য নাই—শাস্ত্রের প্রতি ও কাহার শ্রদ্ধা নাই। এইরূপ দলের যতই সৃষ্টি হইবে ততই দেশের অবনতি। আশাকরি অনেকে এই বিষয় ভাবিয়া দেখিবেন। ইতি—

শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ।

একুশ সাল।

যাচ্ছ অতীত, চলে যাও যদি—মুক্ত বাসনা ডোর,
ছিঁড়েছ তবে, রাখিব কেমনে—দিয়ে এ নয়ন-লোর।
গতানুগতিক ধরায় কেহ—ধরিতে পারে না কারে।
যাচ্ছ যদি, চলে যাও আর—ডাকিব না ক্ষীণ স্বরে।
পূর্ণ বাসনা দীন প্রার্থনা—বাজে না কাহারো কাণে ;—
তাইত তোমায় ডাকিবনা ওগো-বেদন ব্যথিত প্রাণে।
কেউত কখন কাহাকে অপেখি'—রহেনাক' চিরকাল—
(যাচি) অশ্রুসিক্ত কাতর কণ্ঠে—বিদায় একুশ সাল ॥
সুখ ও দুঃখ পূর্ণিত তুমি—বাঞ্ছিত স্মৃতি ঘেরা।
তৃষিত বক্ষঃ শিতলিতে কত ঢেলেছ মাধুরী ধারা।
সান্ত্বনা তব যন্ত্রণা মাঝে মন্ত্রনা মোহ দানে—
অমৃত তিক্ত গরল ঢালিয়া পাগল করেছে প্রাণে—
আশার পূর্ণ রক্তিম ছটা ভাবি সময়ের চেয়ে—
তুমিই অতীত রেখেছ আমার ক্ষুদ্র হৃদয় ছেয়ে।
ধন্য অতীত, তোমার মোহে আবরিত চিরকাল—
যাচ্ছ যাও চিরতরে আজ বিদায় একুশ সাল ॥
করিলেন বিধি ললাটে তব কলঙ্ক কষাঘাত।
সঙ্গে আনিয়া যুদ্ধ দুর্ম্মদ দানব ঝঞ্ঝাবাত।
অগ্ন্যুৎপাতে ইটালিদেশ করে দিলে ছারখার।
ভারত গগন বিপ্লব মেঘে করিলে অন্ধকার।
যুদ্ধের ছলে য়ুরোপ ভিতরে বহালে রক্ত নদী।
রোদন উৎসব প্রতি গৃহে তবু কাঁদেনা তোমার হৃদি।
বিশ্ব ইতিহাস রক্তে ভাসালে আপনিও হলে লাল ;—
আসিওনা আর রৌদ্রবেশে বিদায় একুশ সাল ॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

চণ্ডী রহস্য।

অবতরণিকা।

(১)

ব্রহ্মময়ী মহামায়ার যে লোকোত্তর চরিত্র পর্য্যালোচনার নিমিত্ত আজ এ ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যাকুল, মহামুনি মেধস জগদম্বার সেই চরিত্র সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন—সেই বর্ণনাময় গ্রন্থের নাম চণ্ডী। চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত; চতুর্দ্দশ মনু ও মন্বন্তর বর্ণনাই মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

সাবর্ণিনামক অষ্টম মনুর অধিকার বর্ণনার ভূমিকায়ই প্রসঙ্গক্রমে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্যের প্রথম ঘটনা এইরূপ—

অঙ্গদেশের চৈত্রবংশ সম্ভূত * সুরথরাজা, এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তিনি পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। কদাচ রাজকর্ত্তব্য রক্ষণে কোনরূপ ত্রুটি করিতেন না।

ভাগ্যবিপর্য্যয়ে কোলাবিধ্বংসি † রাজনাগণ তাঁহার শত্রু হইল, তাঁহাদের সহিত সুরথের যুদ্ধ বাধিল। শত্রুপক্ষ বলবিক্রমে সুরথ অপেক্ষা হীন হইলেও কূটযুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া প্রায় সমস্ত রাজ্য কাড়িয়া লইল। পরিশেষে সুরথ রাজা মাত্র নিজ দেশটাই শাসন করিতে লাগিলেন। বিপদ বিপদের অনুগামী, তখনও বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট অমাত্যগণ তাঁহার ধনাগার ও সৈন্যাদি হস্তগত করিল। রাজা হীনবল ও নিরুপায় হইয়া অশ্বারোহণে বনে চলিয়া গেলেন। দুঃখে ও ক্ষোভে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রবল বিজিগীষা প্রতিক্ষণে সুরথের মর্ম্মস্থল ভেদ করিতেছিল। তিনি ক্রমে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বনমধ্যে মেধস মুনির অপূর্ব্ব আশ্রম দেখিতে পাইলেন।

এই ধর্ম্মাশ্রমের হিংস্র শ্বাপদকুলও শান্ত স্বভাব ও হিংসাদ্বেষ পরিশূন্য। মুনি রাজাকে পরম সমাদরে আশ্রমে রাখিলেন। রাজা কিছু দিন ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্তে শান্তি আসিল না।

তিনি ইতস্তত ঘুরিতেছেন আর একাকী

---

* চন্দ্রের তনয় বুধ—ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে ও কুবেরের বীর্য্যে উৎপন্না চিত্রা নামক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপুত্র চৈত্র—সেই চৈত্ররাজের পুত্রই দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত মণ্ডলেশ্বর সুরথরাজা। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে—চৈত্র, স্বারোচিষ মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

† কোলাশব্দের অর্থ, সুরথের রাজধানী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

কোলা সুরথস্যৈব রাজধান্যন্তরং (নাগোজীভট্ট) কোলা-নাম-তদীয় রাজধানী, তৎপ্রমথনশীলাঃ কোলাবিধ্বংসিনঃ (তত্ত্বপ্রকাশ) পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলেন, কোল অর্থে শূকর, অবি অর্থে মেষ, শূকর ও মেষঘাতী কাশ্মীরের সীমান্তদেশাধিপতি ম্লেচ্ছগণই কোলাবিধ্বংসি শব্দের অর্থ। দ্বিতীয় অর্থই অধিকতর সঙ্গত, কেননা রাজধানী বিধ্বস্ত করার পূর্ব্বে তাহাদের নাম কোলাবিধ্বংসী হওয়া ঠিক নহে।

মনে মনে ভাবিতেছেন হায়! রাজরাজেশ্বর আমি, আজ অরণ্যে! আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের শাসিত রাজ্য আজ শত্রুহস্তে। আমার দুষ্ট স্বভাব কৃপণ ভৃত্যগণ কি এ রাজ্য ধর্ম্মানুশাসনে পালন করিতেছে? জানি না, আমার সেই প্রিয়তম মত্তহস্তী শত্রুহস্তে পতিত হইয়া, কিরূপ আহার্য্য পাইতেছে; নিয়ত পারিতোষিকাদি লাভে পরিতুষ্ট যে সকল ভৃত্য সর্ব্বদা আমার অনুগত থাকিত, তাহারা নিয়তই এক্ষণে অন্য নরপতির সেবায় নিরত আছে। বহুক্লেশে সঞ্চিত আমার সেই সুসমৃদ্ধ কোষাগার, সতত অসদ্ব্যয়িগণের হস্তে পড়িয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। এইরূপ চিন্তায় রাজার চিত্ত তখন অনুতাপানলে বিদগ্ধ এবং প্রবল প্রতিহিংসাধূমে সমাচ্ছন্ন হইল। এই তীব্র রজোগুণময় চিত্ত—কি সহসা শান্তির অধিকারী হইতে পারে? রাজা এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতেছেন, এমনি সময়ে দেখিতে পাইলেন—একটী দীনভাবাপন্ন লোক, ধীরে ধীরে আশ্রম অভিমুখে আসিতেছে, তাহার মুখ অপ্রসন্ন, হৃদয় চিন্তাকুল, অশ্রুজলে নয়নদ্বয় সুসিক্ত। রাজা তাহাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহাশয়! আপনি কে? কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন? আপনাকে শোকাকুলের ন্যায় দুর্ম্মনা দেখিতেছি, এই মনস্তাপের কারণ কি"?

আগন্তুক, রাজার প্রণয়বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিল, হয়ত ইনিও আমার সমাবস্থ। ঘোর বিপত্তিকালেও সমাবস্থ ব্যক্তি পাইলে হৃদয় খুলিয়া কথা কহিতে ইচ্ছা হয়, আগন্তুকেরও আজ তাহাই হইল, তিনি নিজ দুঃখকাহিনী বলিয়া রাজাকেও তাহার অংশভাগী করিতে লাগিলেন।

"আমি জাতিতে বৈশ্য, আমার নাম সমাধি, ধনিকুলেই আমার জন্ম ছিল, কিন্তু আজ আমি পথের ভিখারী। অসৎস্বভাব স্ত্রীপুত্রগণ, আমার দুঃখোপার্জ্জিত সমস্ত ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। এই বিশ্বস্ত আত্মীয়বর্গ দ্বারা নিরাকৃত হইয়া মহাদুঃখেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু বহুদিন হইল, সেই স্ত্রীপুত্রাদির কুশল সংবাদ জানিতেছি না, তাহারা কুশলে আছে কি কোনও অমঙ্গল ঘটিয়াছে, এক্ষণে এই ভাবনায়ই আমার হৃদয় ব্যাকুল।"

রাজা বলিলেন, "যে নিষ্ঠুর স্ত্রীপুত্র—পতিভক্তি ও পিতৃভক্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া ধন লোভে আপনাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাদের জন্যই আবার আপনি ব্যাকুল?"

বৈশ্য বলিলেন, "মহাশয়! ঠিক কথা, আপনি আমার মনের কথা কহিয়াছেন। তাহারা এইরূপ দুর্ব্যবহার করিলেও আমার মন যে, তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর হইতেছে না, এ যে কি অদ্ভুত প্রহেলিকা! জানিয়াও জানিতেছি না—বুঝিয়া বুঝিতেছি না" এইরূপে অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর দুইজনেই, মহামুনি মেধসের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন—"ভগবন্ আমাদের একটী সন্দেহ হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সমাধান করিয়া দিন।"

রাজা বলিলেন, আমার রাজ্য শত্রুগণ কাড়িয়া লইয়াছে এবং এই বৈশ্যবরও ধনলোলুপ স্ত্রীপুত্রাদি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছেন তথাপি আমাদের সেই রাজ্যও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মমত্ব রহিয়াছে। আমরা জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞানের ন্যায় এই সকলের

মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। মুনিবর একি অদ্ভুত রহস্য ?"

মেধস মুনি রাজার জ্ঞানাভিমান দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং ইঙ্গিতে বুঝাইতে লাগিলেন, "সুরথ তুমি যে জ্ঞানের অভিমান করিতেছ ; ইহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। এই জ্ঞান পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতি জীবেরই আছে, সকল জন্তুরই স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গোচরে জ্ঞান থাকে, এই সকল বিষয় আবার পৃথক্ পৃথক্ দেখ! কোনও প্রাণী দিবান্ধ (পেচকাদি) অপর প্রাণিগণ রাত্র্যন্ধ (মনুষ্যাদি) কোনও কোনও প্রাণী অহোরাত্রি উভয়কালেই সমদৃষ্টি সম্পন্ন (মার্জ্জারাদি) সুতরাং তাহাদেরও সামান্য জ্ঞান আছে।

মানুষ যে পুত্রাদির প্রতি অভিলাষযুক্ত হয়, তাহা কেবল লোভমূলক, অর্থাৎ পুত্রাদি হইতে প্রত্যুপকার পাইবে বলিয়া। কিন্তু ঐ দেখ! পক্ষিগণ নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও দুঃখে কষ্টে দুই একটী তণ্ডুলকণা সংগ্রহ পূর্ব্বক শাবকের মুখেই অর্পণ করিতেছে। তাহাদের কোনও প্রত্যুপকারের অভিলাষ নাই।

মনুষ্য ও পশুপক্ষিগণের জ্ঞানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও উভয়েরই জ্ঞান একপ্রকার তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ প্রত্যুপকারের অভিলাষ থাকুক আর নাই থাকুক, মহামায়ার প্রভাবে সংসার স্থিতিকারী প্রাণিগণ, মমতা-রূপ আবর্ত্তপূর্ণ মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া অনুক্ষণ ঘুরিতেছে, মহারাজ! এতে আর বিস্মিত হইবেন না।

এই মহামায়ার মায়ায়ই জগৎ সংমোহিত, এই অঘটন ঘটন পটীয়সী ভগবতী মহামায়া, জ্ঞানিগণেরও চিত্ত, বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিপাতিত করেন। ইনিই জগৎ সৃজন পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। মানুষ প্রাণভরে যাচ্ঞা করিলে ইনি, জ্ঞান প্রদান করেন এবং পরিতুষ্টা হইলে ঐশ্বর্য্যও দিয়া থাকেন"।

মুনির শেষ কথাটী শুনিয়া প্রতিহিংসা ক্রান্ত-চিত্ত সুরথরাজার, ঐশ্বর্য্য কামনা উদ্দীপ্ত হইল। আর ভগবতীর কৃপায় জ্ঞানপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া নির্ব্বেদপরায়ণ বৈশ্যবরের জ্ঞান-পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিল।

আজ মেধস মুনির আশ্রমে সমান অবস্থা সম্পন্ন দুইটীব্যক্তি উপস্থিত, অবস্থাটা সমান হইলেও উভয়ের লক্ষ্য কিন্তু অত্যন্ত বিভিন্ন, সুরথরাজা শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত, কোনও উপায়ে শত্রুবিজয় করিতে পারিলেই আবার সুরথ রাজ্যেশ্বর ; আবার পত্নী পুত্রাদি পরিজন পরিবেষ্টিত মহারাজ সুরথ, পরম আহ্লাদে ভাসিবেন ; সুরথের এই আশা অতীত হয় নাই, সুতরাং তখনও সুরথরাজার চিত্ত রাজ্য-লোভে অধীর।

আর সমাধি বৈশ্যের আর এক ভাব। সমাধি বৈশ্য, যাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ব্বাহার্থ প্রাণপণে ধনরত্নাদি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই স্ত্রীপুত্রদিই তাঁহার প্রতি বিমুখ ; সুতরাং বৈশ্যের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়! আজ বৈশ্যের পক্ষে সংসার প্রকৃতই দুঃখময় ভীষণ অরণ্যানী সেই অরণ্য মধ্যস্থ পত্নীপুত্ররূপ হিংস্র শ্বাপদ-কুল, আজ বৈশ্যের জীবন সংহারে উদ্যত। সেই চির লালিত বন্ধুগণ যাহার বিরূপ, সে যে বিষয় দোষ দর্শনে বৈরাগ্যবান্ হইবে, এ কথা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বৈশ্য আর সাংসারিক সুখ চাহে না। বৈশ্য চাহে শান্তি, বৈশ্য জ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞানতায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে আর ইচ্ছা করে না।

'দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয় বিতৃষ্ণ' বৈশ্যবর আত্মজ্ঞানের জন্য মেধস মুনির শরণাপন্ন। সুতরাং সুরথরাজা ঘোর প্রবৃত্তিমার্গী, আর বৈশ্য-নিবৃত্তি পথের পথিক।

মহামুনি মেধস এইরূপে অত্যন্ত বিরুদ্ধ-ভাবদ্বয়ের ভাবুক সুরথ ও বৈশ্যবরকে দেবী-মাহাত্ম্য উপদেশ করিতেছেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিলেন, সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্ন হইলেন, এবং ইহার কর্ম্মই বা কি?"

মেধসমুনি, রাজার ঘোর অজ্ঞানতাপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া, মনে মনে হাসিলেন, যাহা হইতে বিশ্বসৃষ্টি হইতেছে এবং যাহাতে প্রলীন হইবে সেই মহামায়ার আবার উৎপত্তি? প্রকাশ্যে বলিলেন; সেই জগন্ময়ী দেবী নিত্যা, তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, তাহা-দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রয়োজন বশে তাঁহার যে বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি, সেই অভিব্যক্তিরূপ উৎপত্তির কথা বলিতেছি।"

"দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিনি যখন যখন আবির্ভূতা হইয়াছেন, তখন তখন অজ্ঞান মনুষ্যগণ তাঁহাকে উৎপন্না বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, এইরূপ বহু প্রকার উৎপত্তির পবিত্র কথা শ্রবণ কর।"

দেবীমাহাত্ম্যে তিনটী চরিত্রের কথা উল্লিখিত, প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত ও উত্তর চরিত। প্রথম চরিতে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যোগ-নিদ্রার স্তুতি ও মধুকৈটভ বধ, মধ্যম চরিতে মহিষাসুর বধ ও উত্তর চরিত্রে শুম্ভনিশুম্ভ নিধন বর্ণিত হইয়াছে। মহামুনি মেধস, অগ্রে প্রথম চরিত বর্ণনা করিতেছেন।

প্রথম চরিত।

মধুকৈটভ বধ।

মহাপ্রলয়ে জগৎ একার্ণবীকৃত, ভগবান্ বিষ্ণু সেই একার্ণবে অনন্ত শয্যায় শায়িত হইয়া যোগনিদ্রা উপভোগ করিতেছেন। এমনিকালে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন মধু-কৈটভ নামক ঘোর অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইল, প্রজাপতি বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে অবস্থান করিয়া একাগ্র হৃদয়ে যোগ-নিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা বলিলেন্—

"হে দেবি! তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বষট্‌কাররূপিণী, তুমি সুধা, এবং অক্ষর সমুদায়ে তুমি ত্রিমাত্রারূপে (ওঙ্কাররূপে), অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বভাবতঃ অনুচ্চার্য্যা অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপিণী, হে দেবী তুমি সাবিত্রী এবং তুমিই জননী।" ব্রহ্মা, পরম যাজ্ঞিক, তিনি যে সর্ব্বব্যাপী যোগনিদ্রার স্তুতি করিতে গিয়া, সর্ব্বাগ্রেই তাঁহাকে নিত্য পরিচিত যজ্ঞীয় সাধন স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কার, ত্রিমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রারূপে স্তব করিবেন, তাহা অতিশয় স্বাভাবিক। ব্রহ্মা আদি কবি হইলেও এই ঘোর বিপত্তি সময়ে, বিষম আর্ত্তরূপে মহামায়ার স্তবে কবিত্বের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতে পারেন কি?

ব্রহ্মা, প্রথম পত্নীভাবে দেবীকে সম্বোধন করিলেন, "হে দেবী! তুমি সাবিত্রী," মাধুর্য্য-পূর্ণ পত্নীভাব, সম্পৎকালেই সম্ভবে, তাহাতেই মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাবান্তর করিয়া বলিলেন, "ত্বং দেবী জননী পরা" তখন ব্রহ্মা প্রকৃত পথ ধরিলেন, ব্রহ্ম, মা মা বলিয়া আকুল হইলেন;—

তিনি বলিলেন,—

"দেবি! এজগৎ তুমি ধারণ করিয়াছ,

তুমিই জগতের সৃজন ও পালন করিতেছ, এবং অন্তে তুমিই জগৎকে গ্রাস করিয়া থাক। অর্থাৎ জগৎ তোমাতে প্রলীন হইবে। তুমি সর্গকালে সৃষ্টিরূপা পালনে স্থিতিরূপা ও প্রলয়ে সংহৃতিরূপা, তুমি মহাবিদ্যা (জ্ঞান স্বরূপা) ও তুমি মহামায়া (আবরণী শক্তি) তুমি মহাস্মৃতি, মহামোহা এবং মহাসুরী ”

ব্রহ্মা আকুল ভাবে এইরূপ স্তুতি করিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন মা! তুমি সৃষ্টিরূপা, কিন্তু তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা সন্তান ব্রহ্মা কেন মা অকালে অসুর হস্তে নিহত হইবে? তুমি স্থিতিরূপা, কিন্তু অসুরদ্বয় বাঁচিয়া থাকিলে, জগতের স্থিতির সম্ভাবনা কোথায়? তবে কি মা তুমি আজ প্রকৃতই সংহৃতিরূপা! সৃষ্টির পর ত সংহার,এখনও যে সৃষ্টিই হয় নাই। মা মহাবিদ্যা! কেন মা! যোগনিদ্রারূপে বিষ্ণুর বিদ্যা (জ্ঞান) আবৃত করিয়াছ? মা তুমি মহামায়া, একি তোমার মায়া? আজ তুমি কি এই মায়ামন্ত্রে অসুরদ্বয় সৃজন করিয়া, মায়াসূত্র বদ্ধ ব্রহ্মার প্রাণহরণে উদ্যতা? মা মহাস্মৃতি। এখনও কি জগতের স্মৃতি জাগরিত হয় নাই? তাহা হইলে কি সৃষ্টি প্রারম্ভেই অসুরদ্বয় সৃষ্টিকর্ত্তার নাশে উদ্যত হইতে পারে? মা তুমি মহাদেবী, তোমার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী মহাক্রীড়ার মর্ম্ম কে বুঝিবে মা? আমরা অজ্ঞান সন্তান, তোমার লীলা বুঝিনা বলিয়াই, সূত্র বদ্ধ পুতুলের ন্যায় তোমার অঙ্গুলী সঙ্কেতে পরিচালিত হইতেছি। তবে বুঝিলাম-যথার্থই তুমি মহামোহা। এইরূপ মহামোহে ফেলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ঘুরাইতেছ। মহাসুরি এই কি তোমার আসুরী শক্তি প্রকটনের প্রকৃত সময়? ব্রহ্মা এইরূপে মহামায়ার জগৎ কর্ত্তৃত্বাদির উল্লেখে স্তব করিতেছেন, এদিকে অসুরদ্বয় ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী; অমনি অধিকতর ব্যাকুলতার সহিত—

“খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিনী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণ ভুশুণ্ডী পরিঘায়ুধা” ॥

হে দেবি তুমি খড়্গিনী, শূলিনী, গদিনী, চক্রিনী। বলিয়া অস্ত্রশস্ত্র বিভূষিতারূপে জগজ্জননীর স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এই স্তুতিতেও ফলোদয় হইল না; পরিশেষে ব্রহ্মা, নিরুপায় হইয়া, কম্পিত কলেবরে বলিয়া উঠিলেন, “যে কোনও স্থানে সৎ অসৎ যে কোনও বস্তু আছে,হে সর্ব্বাত্মিকে! তাহাদের যে শক্তি তাহা এক মাত্র তুমিই, অতএব তোমাকে আর কি স্তব করিব”? এই বার ব্রহ্মা আসল কথাটা বলিয়া ফেলিলেন; সমষ্টিভাবে স্তব করিলেন, এই বারের ডাকই তাঁহার সিংহাসন নড়াইল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিষ্ণুর চক্ষুঃ, মুখ, নাসিকা, হস্ত, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন, আজ ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বের সার্থক হইল। মধুকৈটভ! তোমরা ব্রহ্মার অপকার করিতে গিয়া কি উপকারই করিয়া ফেলিলে! আহা যাঁহারা মায়ের সুসন্তান—তাঁহাদের বিপদও সম্পৎ, এবং বিষও অমৃতরূপে পরিণত হয়। তাহার পর যোগনিদ্রাবিমুক্ত মহাবিষ্ণু, জাগরিত হইয়া মধুকৈটভের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন মহামায়ার মায়ামোহে বিমোহিত অসুরদ্বয় রণগর্ব্বে ভগবান্‌কে বলিয়া উঠিল; আমরা তোমার যুদ্ধে সন্তোষ লাভ করিয়াছি তুমি বর প্রার্থনা কর; তখন হরি বলিলেন আর কি বর চাহিব—তোমরা আমার বধ্য হও ধূর্ত্ত অসুরগণ দেখিল জগৎ জলে পরিপূর্ণ,তিল মাত্রও স্থল নাই, তখন বঞ্চনা করিয়া বলিল যেখানে জল নাই, তথায় আমাদিগকে বধ কর। মহাবিষ্ণু ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বকীয় জঙ্ঘদেশে রাখিয়া তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। বলাবাহুল্য এই মধুকৈটভের দেহ মেদ হইতেই জল মধ্যে মেদিনীর পূর্ব্ব সূচনা।

ক্রমশঃ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্য সাঙ্খ্যতীর্থ
অধ্যাপক শ্রীহট্ট সারস্বত আশ্রম

সামাজিক প্রসঙ্গ।

এই প্রসঙ্গে সামাজিকগণের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাস্য থাকিলে তাহার উত্তর দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান মাসে আমরা এইরূপ কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি, পত্রের সহিত উত্তর নিম্নে লিখিত হইল।

১। বহুবিনয় পুরঃসর নিবেদনমিদং—

আমাদের এখানে একটী গুরুতর বিষয় লইয়া নানারূপ আলোচনা হইতেছে। কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। নিম্নে বিষয়টী আনুপূর্ব্বিক বিবৃত হইতেছে; আশাকরি দয়া প্রকাশে যথাযথ উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

"দাসজাতীয় একটী লোক একটী মালী স্ত্রীলোককে নিয়া প্রথমতঃ পলাইয়া যায়। তৎপরে অনুসন্ধানে জানা গেল, উহারা প্রথমে শূদ্রজাতীয় এক বৈষ্ণবের নিকট হইতে ভেক্-গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু স্ত্রীলোকটী মালী বলিয়া তিনি ভেকদিতে সম্মত হন নাই। শেষে মালীজাতীয় এক বৈষ্ণবের নিকট হইতে তাহারা ভেক্ গ্রহণ করে। ভেক গ্রহণের আন্দাজ দেড়মাস কি দুইমাস পরে তাহারা দেশে ফিরিয়া আসে। উক্ত দেড় মাস কি দুইমাস কাল উহারা স্ত্রী স্বামী ভাবে একত্র বসবাস করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়; এবং স্ত্রীলোকটীও বলে। দাসজাতীয় লোকটী কিছুদিন পরে ভেক পরিত্যাগ করিয়া সমাজে উঠিতে যত্নবান হয়। শাস্ত্রানুসারে সে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারে কি না? উহাই আমরা জানিতে চাহিতেছি।

এদেশে দাসজাতীয় লোক শূদ্রবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মালীজাতীয় লোকের ব্যবসা পাল্কীবহন, মৎস্যধরা ও মৎস্যবিক্রয় ও কোদালী কাজকরা ইত্যাদি। এরূপ অবস্থায় মালীজাতী অন্ত্যজ কিনা তাহাও জানিতে বাসনা রহিল। ইতি—

উত্তর—

দাশজাতি (দাসজাতি) শূদ্রবৎ ব্যবহৃত হইলেও "দাশং নৌকর্ম্মজীবিনং কৈবর্ত্ত ইতি যংপ্রাহুঃ" এই মনুবচনে এবং "কৈবর্ত্ত—মেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতেচান্ত্যজাঃস্মৃতাঃ" এই বিবেকাদিধৃত স্মৃতিবচনের একবাক্যতা করিলে বুঝা যায়, দাশজাতি অন্ত্যজ, মালীও অন্ত্যজ। ব্যাসসংহিতাতে এই মালীই 'মালাকার কুটুম্বী' শব্দে উল্লিখিত। "মালাকারকুটুম্বিনঃ এতেহন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতাঃ"। এস্থলে উভয় অন্ত্যজজাতির সংসর্গ হওয়াতে অব্যবহার্য্যতা হইবে না। প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার্য্যতা হইবে। প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিকব্রত। পারদার্য্য উপপাতক হইলেও আপস্তম্ব বলিয়াছেন,—

"সবর্ণায়ামনন্যপূর্ব্বায়াং সকৃৎ সন্নিপাতে পাদঃ পততীত্যুপদিশতি এই বচনের অর্থে শূলপাণি লিখিয়াছেন,—সকৃদ্গমনে ত্রৈবার্ষিকংচতুর্থে সম্পূর্ণংদ্বাদশবার্ষিকং—ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে। অনিয়তবার অন্ত্যজা গমনে অন্ত্যজেরও ঐ ব্রত। "অভ্যাসেতুতয়ো ভূয়স্ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ" এই মনুবচনে উপপাতক বাহুল্যে প্রায়শ্চিত্তাধিক্য দেখিতেছি। এই আধিক্য দ্বাদশবার্ষিক ব্রতপর্য্যন্ত, তাহা আপস্তম্ববচনে পাইয়াছি, সুতরাং এরূপ স্থানে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতই কর্ত্তব্য—তৎপরে ব্যবহার্য্যতা হইবে, ইতি

স্বাক্ষর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

২। ব্রাহ্মণসভাগ্রে সানুনয়নিবেদন মেতৎ প্রত্যেক পঞ্জিকায় লিখিত আছে, সত্য

ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে মানবের আয়ু, একলক্ষ, দশহাজার, একহাজার ও একশত বিশ বৎসর দেখা যায়, ইহা কোন পুস্তকের প্রমাণ সিদ্ধ। সপ্রমাণ তাহার নাম পাইবার প্রয়োজন। মনুসংহিতায় লিখিত দেখা যায়; চারিশত বৎসর, ক্রমশঃ পাদ পাদ হানি। কুল্লুক ভট্টের ব্যাখ্যায় দেখাযায়, ষোড়শ শতবৎসর পরমায়ুঃ ছিল। সপ্রমাণ মীমাংসা পাইতে বাসনা।

নিঃ শ্রীকালীকুমার শর্ম্ম স্মৃতিরত্ন।

সত্যাদিযুগে লক্ষাদি বর্ষ পরমায়ুর কথা স্পষ্টভাবে কোন প্রামাণিক পুরাণে উল্লিখিত নাই। তবে মেরুতন্ত্রে নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি আছে, আমি মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুখে। শুনিয়া ছিলাম। মেরুতন্ত্র আমার নিকট নাই, শ্লোক কয়টী এইরূপ।

সুবর্ণ ভাজনাঃ সর্ব্বে পূর্ণ ধর্ম্ম তপোরতাঃ।
লক্ষবর্ষায়ুষো মর্ত্ত্যাঃ দ্বীন্দুহস্তায়তাঃকৃতে॥*
রৌপ্যপাত্রাশ্চ পাদোনধর্ম্মানো জ্ঞানতৎপরাঃ।
অযুতাব্দায়ুষশ্চাতুর্দ্দশহস্তা নরাস্তদা॥
তাম্রপাত্রার্দ্ধধর্ম্মাণো যাজ্ঞিকা রজসোহর্দ্দিতাঃ।
সহস্রাব্দায়ুষঃসাপ্তহস্তা দ্বাপর সম্ভবাঃ॥
দানৈকধর্ম্ম চরণাস্তামসা প্রায়শো নরাঃ।
শতবর্ষায়ুষঃ কেচিৎ সার্দ্ধত্রিহস্তকাঃ কলৌ॥

দশবর্ষ সহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ অথবা "দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ রামো রাজ্যং করিষ্যতি।"

রামায়ণ আদি১ম সর্গ।

কালিদাসের
"কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদামযুতং যযৌ॥

এই দুইটী প্রাচীন প্রসিদ্ধপ্রমাণে ত্রেতাযুগের দশসহস্র বৎসর আয়ুসমর্থিত হইতেছে। মনুর কথাত আপনার বিদিতই আছে।

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ১০ম অধ্যায়ে আছে।
চত্বারি ভারতেবর্ষে যুগানি ভরতর্ষভ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ তিষ্যঞ্চ কুরুবর্দ্ধন।
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কুরুসত্তম
আয়ুঃ সংখ্যা কৃতযুগে সংখ্যাতা রাজসত্তম।
তথাত্রীণি সহস্রাণি ত্রেতায়াং মনুজাধিপ।
দ্বেসহস্রে দ্বাপরে তু ভুবিতিষ্ঠন্তি সাম্প্রতং।
ন প্রমাণ স্থিতি র্হ্যস্তি তিষ্যেঽস্মিন্ ভরতর্ষভ!
গর্ভস্থাশ্চ ম্রিয়ন্তে চ তথা জাতা ম্রিয়ন্তি চ॥

এই সকল বিভিন্ন প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে কুল্লুকভট্টের মীমাংসাই সমীচীন মনে হয়—

"চতুর্বর্ষ শতায়ুষ্ট্বঞ্চ স্বাভাবিকং অধিকায়ুঃ—
প্রাপক ধর্ম্মবশাদধিকায়ুষোঽপি ভবন্তি॥"

৩। যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

মহাশয় এখানে একটী ব্যবস্থায় সংদ্বৈধ হওয়ায় সেবিষয়ে আপনাদের মতামতজানিতে এই পত্রখানি লিখিতেছি। বিষয়টী এই—

বৃষোৎসর্গের ন্যায় নিজে কিম্বা প্রতিনিধি দ্বারা স্ত্রী ও শূদ্রগণ শালগ্রাম শিলা দান করিতে পারে কিনা? এটী মহদান বলিয়া অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে অকালাদি হইলেও উহা দান করাযায় কিনা? অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কালাশুদ্ধি থাকিলে উহা দান করা যায় কিনা? ইহার যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা সংলগ্নকার্ডে লিখিয়া জানাইলেন, অনুগৃহীত হইব। নিবেদনমিতি

শ্রীতারকেশ্বর স্মৃতিরত্ন

উত্তর

স্ত্রী ও শূদ্রগণ প্রতিনিধিদ্বারা শালগ্রাম শিলা দান করিতে পারে। কিন্তু ইহার প্রতিগ্রহের নিষেধ আছে। অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কালাশুদ্ধি থাকিলে কাম্যকর্ম্ম বলিয়া করা যায় না।

* এখানে অঙ্কস্য বামাগতিঃ ইহার ব্যতিক্রম আছে বোধ হয়, ২১ হস্ত অর্থই বোধ হয়। কেননা তৎপরে চতুর্দ্দশ হস্ত ও সপ্তহস্ত আছে।

সংবাদ প্রসঙ্গ।

(১)

বাউগ্রাম শাখা ব্রাহ্মণসভা।

গত ১১ই বৈশাখ—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বাউগ্রামে একটী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার শাখা সভা স্থাপন করা হইয়াছে। বাউগ্রাম বিপ্রশেখর, কুলশেখর, আকুন্দী, সলকা যুগসরা, শ্রীহট্টি, সমতরী, লক্ষ্মীনারায়ণপুর, বেলগ্রাম, ছোটকাপশা, অমৃতমণি, বিচুর, গড্ড', গেজেড়া, কলেশ্বর, প্রভৃতি ১৬ খানি গ্রামের বিপ্রবর্গ উপস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহে শাখা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সভা বাউগ্রামে স্থাপিত হইয়াছে—কারণ উহা ঐ সকল গ্রামের কেন্দ্রস্থলে।

বাউগ্রাম শাখা সভার সহকারী সভাপতিগণ

১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
২। শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্য
৩। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়
৪। শ্রীযুক্ত কালীচরণ মুখোপাধ্যায়
৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নায়ক।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চক্রবর্ত্তী

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

দেশে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ ব্রাহ্মণ্য রক্ষার জন্য চেষ্টা দেখিয়া মনে হয় সুদূর ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আবার ভারতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

(২)

পাঁচথুপী ব্রাহ্মণসভা।

গত ১৯শে বৈশাখ রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন পাঁচথুপীগ্রামে একটী শাখা ব্রাহ্মণসভা স্থাপিত হইয়াছে। মালিয়াড়ী মামুদপুর, গড্ডা, সিংগারী, হরিশ্চন্দ্রপুর, মুনিয়াডিহি, বালুট, বল্লভপুর, নন্দীবানেশ্বর, সাবলপুর, সাটীতরা, আলুটা ও টগরা এই ১৩ খানি গ্রামের বহু ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ সভার স্থায়ী সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

সভাপতি ৺ব্রহ্মণ্যদেব।

সহ—সভাপতিগণ—

১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
৩। শ্রীযুক্ত রামস্মরণ মুখোপাধ্যায়।
৩। শ্রীযুক্ত রাধিকাচরণ ভট্টাচার্য্য।
৪। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৬। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম অধিকারী।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সহ—কর্ম্মাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী।

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহ—কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃত পণ্ডিতের তিরোধান।

স্বনামখ্যাত স্মার্ত্তপ্রবর বর্ত্তমানকালের ঋষিকল্প গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিগত ২৬শে চৈত্র ৺কাশীধামে স্বীয় তপঃসাধন পবিত্র পার্থিব শরীর লোকলোচনের অগো-

চরে রক্ষা করিয়া পরম পদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই তিরোধানে বর্ণাশ্রমি-সমাজে যে অভাব উপস্থিত হইল, বর্ত্তমান সময়ে সে অভাবের পূরণ সুদূরপরাহত। ইঁহার জন্ম হইতে এই তনুত্যাগের কাল পরিমাণ ৬৫ বৎসর, জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুরগ্রাম, এই পূত জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চরিত্র সমালোচনা করিলে অনেক সময়ে ঋষি চরিত্রের স্ফুরণই উপলব্ধি হয়, এজন্য বারান্তরে আমরা উক্ত মহাত্মার জীবন-চরিত্র পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিতে চেষ্টা পাইব।

বরপাত্র প্রসঙ্গ।

শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় বহুতর বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই দুই বৎসর যাবৎ প্রতি সমাজের সামাজিকগণের নিকট হইতে বংশপরিচয় সংগ্রহ করা হইতেছে। অথচ তাহার দ্বারা কি হইতেছে না হইতেছে—তাহা কেহই এযাবৎ জানিতে পারেন নাই—তাই সামাজিকগণের উৎকণ্ঠানিবৃত্তির জন্য সংগৃহীত কুল পরিচয় হইতে প্রকৃত কার্য্যারম্ভের সূচনা স্বরূপ রাঢ়ি বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীস্থ পাত্রের সংবাদ প্রতি মাসে এই ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকায় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য রূপে নির্দ্ধারিত হওয়ায় এই নূতন বৎসরের প্রথম মাস হইতে ক্রমশঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল, ২৮ শটী জেলাবাসী প্রায় তের চৌদ্দ লক্ষ ব্রাহ্মণের কুলপরিচয় সংগ্রহ করা বহু ব্যয় সাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ ৺ব্রাহ্মণ্যদেবের কৃপায় সংগ্রহ কার্য্য মন্দ চলিতেছেনা, কিন্তু অধিকাংশ সংগৃহীত না হইলে ইতিহাস বা কুলগ্রন্থ-প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করা যায় না অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, সুতরাং সে কার্য্যে আরও কিছু দিন বিলম্ব সম্ভাবনাবশতঃ সামাজিকবর্গের আশা বর্দ্ধনার্থ এই মাস হইতেই কার্য্যসূচনা আরম্ভ করা হইল। কোন পাত্রের সমগ্র বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইলে ব্রাহ্মণ সভায় পত্র লিখিতে হইবে। পত্রের সহিত টিকিট থাকা আবশ্যক, নচেৎ সে পত্রের উত্তর দেওয়া হইবে না।

রাঢ়ীয় শ্রেণী

ফুলে—নৈকষ্য। ১নং দুইটী ও৫১ও ৫৩ নং তিনটী ভালপাত্র আছে বয়ঃ প্রথম দুইটীর ২১ ও ১৯ বৎসর। শেষ তিনটীর ১৬, ১৭ পর্য্যন্ত। প্রথম নম্বরের শিক্ষা ভাল। শেষোক্তেরটী মধ্যম।

ফুলে ভঙ্গ।

১৯নং, ৩৯নং ও ৪১ নং দুইটী মোট চারিটি পাত্র আছে। শিক্ষা সকলের মধ্যম। বয়স সকলের ১৮ বৎসরের মধ্যে।

খড়দহ নৈকষ্য।

২৮ নং একটি ভালপাত্র আছে। শিক্ষা মধ্যম,উপস্থিত চাকুরী করে বয়স ২২ বৎসর।

খড়দহ ভঙ্গ।

৬ নং ৭ নং ১৬ নং ২৪ নং ২৬ নং তিনটি ৩০ নং ৪৭ নং ৪৮ নং ২টি ৫০ নং একটি মোট ১২ টী পাত্র আছে। সকলের শিক্ষা ভাল, কেহকেহ ইহার মধ্যে চাকুরী করেন। বয়স সকলের ২৭ বৎসর হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে।

খড়দহ বংশজ।

৪৬ নং দুইটি ভাল পাত্র আছে। প্রথমটির শিক্ষা খুবভাল, অপরটী মধ্যম, বয়স প্রথমটির ২২শ ও দ্বিতীয়টির ১৭ বৎসর।

সর্ব্বানন্দী নৈকষ্য।

১ নং দুইটি পাত্র, শিক্ষা খুবভাল, ১টি প্রেসিডেন্সীকলেজেপড়ে ও অপরটি বঙ্গবাসী-কলেজে পড়ে বয়স একটির ২১ ও অপরটীর ১৯ বৎসর।

সর্ব্বানন্দী ভঙ্গ।

৩নং ও ৪০ নং দুইটি পাত্র আছে। শিক্ষা মধ্যম, একটির বয়স ২০ অপরটির ১৯ বৎসর।

সর্ব্বানন্দী বংশজ।

৪৪ নং পাত্র, শিক্ষা মধ্যম, বয়স ১৯বৎসর।

সুরাই মেল।

৪২ নং দুইটি পাত্র, ডাক্তারী পড়ে ২৫ ও ২৩ বৎসর বয়স। আরও দুইটি নম্বর হীন পাত্র আছে বয়স ২০, ১৮ বৎসর, শিক্ষা এক রকম।

পোষাক বিক্রেতা।

৺প্যারিলাল দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

১১৯ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

সিমলা, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, কল্মে, মান্দ্রাজী তাঁতের ও নানা দেশীয় মিলের সকল রকম ধোয়া ও কোরা কাপড় এবং তসর, গরদ, বাপ্তা, চেলি, নানা দেশীয় ছিট কাপড় এবং শাল, আলোয়ান, পার্শি, বোম্বাই সাড়ি প্রভৃতি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

ছোট, বড়, কাটা ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসীগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠাইলে ভিঃ পিতে সমস্ত দ্রব্য পাঠান হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

একদর। সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী। এককথা।

নানা দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নূতন নূতন ছাঁট কাটের সার্ট, কোট, পেণ্টুলেন, চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সায়া সামিজ, সলুকা, ফ্রক্, করনেসন্ জ্যাকেট, সলমার কাজ করা জ্যাকেট, টুপি, কোট, পার্সী ও বোম্বাই সাড়ী, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, সার্জ্জের চাদর, কম্ফটার, আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, অর্ডার দিলে আবশ্যক মত সাপ্লাই করা হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়া থাকি

ছোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসীগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।

১১০।১১১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

একদর। সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী। এককথা।

নানা দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নূতন নূতন ছাঁট কাটের সার্ট, কোট, পেণ্টুলেন, চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সায়া সামিজ, সলুকা, ফ্রক্, করনেসন্ জ্যাকেট, সলমার কাজ করা জ্যাকেট, টুপি, কোট, পার্সী ও বোম্বাই সাড়ী, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, সার্জ্জের চাদর, কম্ফাটার, আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, অর্ডার দিলে আবশ্যক মত সাপ্লাই করা হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়া থাকি।

ছোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।

১৩।১৪ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীসত্যচরণ দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী।

নানা দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নূতন নূতন ছাঁট কাটের সার্ট, কোট, পেণ্ট-লেন, চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সামিজ, সায়া, সলুকা' ফ্রক, করনেসন্ জ্যাকেট, সলমার কাজ করা জ্যাকেট' টুপি, কোট, পার্শী সাড়ি এবং বোম্বাই সাড়ি, সিল্ক ও গরদ, চাদর, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল সার্জ্জের চাদর, আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, অর্ডার দিলে আবশ্যক মত সপ্লাই করা হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়া থাকি।

ছোট বড় ও পছন্দ না হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসীগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।

২০২।৫ নং হ্যারিসন রোড, মনোহর দাস ষ্ট্রীটের মোড়,

একদর। বড়বাজার, কলিকাতা। এককথা।

কলিকাতা ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে

ব্রাহ্মণসমাজ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৯নং রাজকৃষ্ণ বন্দুর লেনস্থ জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

বিতরণ।

মদীয় পিতৃদেব সুগৃহীতনামা কবিবর—

৺মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রণীত।

পুস্তকগুলি প্রচারার্থ কেবল প্রেরণাদিবায় আট আনা অথবা ঐ মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাইলেই বিতরণ করিব।

এই পুস্তকগুলি পূর্ব্বে ৩৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। পুস্তক—

১। ভগবচ্ছতকং (ভারতীয় নানাস্থানের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

২। কাব্যপেটিকা ১ম ও ২য় ভাগ।

৩। রসকাদম্বিনী। (অমরু শতকের পদ্য বঙ্গানুবাদ)।

৪। ধীরানন্দ তরঙ্গিণী।

(মদীয় ৺প্রপিতামহ দেব প্রণীত চম্পূকাব্য, ৺পিতৃদেব কৃত সমালোচনা ও টীকা সহ)।

শ্রীসারদাচন্দ্র কবিভূষণ। রাজারামপুর। (দিনাজপুর)

ব্রেইন BRAIN OIL অইল।

ফ্লোরা Flora Phosphorine ফস্‌ফরিন্।

ডাঃ চন্দ্রশেখরকালী আবিষ্কৃত।
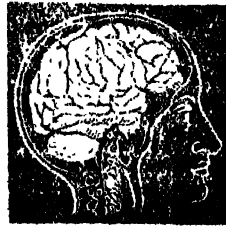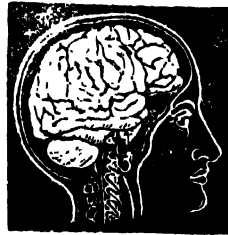
মস্তিষ্কজনিত পীড়াচয়, স্মৃতিহীনতা, অনিদ্রা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, ধাতুদৌর্ব্বল্য এবং কোষ্ঠবদ্ধাদির মহৌষধ; ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, ইঞ্জিনিয়ারাদির নবজীবনপ্রদ।

শিশি ১৲ এক টাকা। ডজন ৯৲ টাকা।

C. Kylye & Co. 150, Cornwallis Streetr Calcuttt

চতুর্থ বর্ষের বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী।

আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত—১৩২২-১৩২৩ সাল।

প্রবন্ধাবলী।

সমাজিক প্রসঙ্গ

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক

আখ্যায়িকাবলী

কবিতাবলী

REGISTERED No. C—675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non Political Hindu Religious & Social Magazine.

চতুর্থ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা।

বৈশাখ।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা

প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা।

সন ১৩১৩ সাল।

এই সংখ্যার লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায়।

রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি।

সম্পাদকদ্বয়—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্য-স্মৃতিতীর্থ।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non Political Hindu Religious & Social Magazine.

চতুর্থ বর্ষ—নবম সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ।

বার্ষিক মূল্য ২ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।০ আনা।

সন ১৩২৩ সাল।

এই সংখ্যার লেখকগণ।

সম্পাদকদ্বয়—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।

কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্য-স্মৃতিতীর্থ।

সূচীপত্র।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়

(মাসিক পত্র)

A Non Political Hindu Religious & Social Magazine.

চতুর্থ বর্ষ- স-

আ। ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ৲ কো।

প্রতি খণ্ড ।০ আনা।

সন ১৩২৩ সাল।

এই সংখ্যার লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায়।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কতীর্থ।
শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত রামতারণ মুখোপাধ্যায় বি এল।
শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ এম, আর, এস।
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ।
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যরত্ন বি,এ।
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ।
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম, এ।
সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি।

সম্পাদকদ্বয়—
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।
কুমার শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ।

সূচীপত্র।

(মাসিক পত্র)

A Non Political Hindu Religious & Social Magazine.

চতুর্থ বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা।

ভাদ্র।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।০ আনা।

সন ১৩২৩ সাল।

এই সংখ্যার লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ।
শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ।
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ শিরোমণি।
শ্রীযুক্ত হরকিশোর দেবশর্ম্মা।
শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন মজুমদার।
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্ন্যাল।
ব্রাহ্মণ-সভার সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাহিত্যভূষণ।
সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি।

সম্পাদকদ্বয়—
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।
[illegible] শ্রীযুক্ত পূর্ণ[illegible] মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—
[illegible]

সূচীপত্র।

ব্রাহ্মণসভার সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের দান।

গত ১৩২০ সালে কালীঘাটে শ্রীযুক্ত মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে যে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন হয়, উহাতে গৌরীপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় ব্রাহ্মণ সভার গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য ৫ বৎসরে একলক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, উক্ত অর্থ কি ভাবে ব্যয়িত হইবে তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সভার সহকারীসভাপতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে ব্রজেন্দ্রবাবু ১৩২২ সালের ১৩ই আষাঢ় তারিখে সভার সহকারী সভাপতির নামে এক পত্রদ্বারা তাঁহার প্রদত্ত অর্থের বিনিয়োগ নির্দ্দেশ করেন, এবং তদনুসারে একখানা ট্রাষ্টডিডের মুসাবিদা পাঠাইতে ব্রাহ্মণসভাকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ১৩ই আষাঢ় সোমবার শ্রীযুক্ত মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে ব্রাহ্মণসভার কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হয়। সেই সভাতেই শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের উক্ত পত্রের মর্ম্মমতে স্থিরীকৃত হয় যে ব্রাহ্মণসভাগৃহের জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বাবুর স্বীকৃত ত্রিশ হাজার টাকা নগদ লওয়া হউক এবং অবশিষ্ট ৭০,০০০ হাজার টাকা সভার স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্য সভার পক্ষে গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর নিকটই গচ্ছিত রাখা হউক। এবং উক্ত গচ্ছিত ৭০,০০০ হাজার টাকার উপরে বর্ত্তমান ১৩২২ সালের বৈশাখ মাস হইতে ব্রজেন্দ্রবাবুর স্বীকৃত বার্ষিক শতকরা পাঁচটাকা হারে সুদ বাবদে তিন হাজার পাঁচশত টাকা সভার পক্ষে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হউক।

সভার এই সিদ্ধান্তানুসারে বিগত ১৩২২ সালের বৈশাখ মাস হইতে ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করা হইতেছে, এবং ত্রিশহাজার টাকা গৃহের জন্য মজুত আছে। এবং হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ সম্বন্ধে ট্রাষ্টী দলিল মুসাবিদা করিয়া ব্রাহ্মণসভার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণসভার কর্ত্তৃপক্ষ আলোচনা করিয়া সত্বরই দলিল সম্পাদন করাইয়া লইবেন।

REGISTERED No. C—675.

৪র্থ বর্ষ। { ১৮৩৮ ১৩২৩ সাল, বৈশাখ। } ৮ম সংখ্যা।

নববর্ষে।

(১)

নববর্ষে, জাগো হর্ষে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী।
জীবনসিন্ধু-মথনামৃত দাতা, বিষপানকারী॥

(২)

সাম ঝঙ্কারে ওঙ্কার তুলি, ঋকে গাহিয়া বন্দনা।
যজুতে যোগ্য হইয়া আবার, মৃত্যুকে কর বঞ্চনা॥
মূত্র পুরীষ, ব্যাধির আগার, এ দেহ করিয়া সাধনা।
ব্রহ্ম মন্দির বলিয়া উচ্চে তুমিই করিলে ঘোষণা॥

(৩)

ভীত হইয়া ভীতি যাঁহার উপরত হয় চরণে।
নিত্য নিবাস, ছিল তব সেই, বরণীয় ব্রহ্ম সদনে॥
স্বরূপে তোমার, জাগহে ব্রাহ্মণ, আকুল আহ্বান এসেছে।
ধরণীর আঁখি, আশার তৃষায়, তোমার উপরে পড়েছে॥

(৪)

কর-গত কর, বেদান্ত-তত্ত্ব, আজীবন হও যোগী।
চিদানন্দ মাঝে, সে জন বিরাজে, যেই জন বিষয়-বিরাগী ॥
স্বরূপে তোমার, জাগহে ব্রাহ্মণ, আকুল আহ্বান এসেছে।
ধরণীর আঁখি, আশার তৃষায়, তোমার উপরে পড়েছে ॥

(৫)

ইন্দ্রিয় দাসের ভোগলব্ধ সুখ, তৃপ্তিবিহীন তৃষা।
যত করি ভোগ, বাড়ে ভব রোগ, আশার মেটে না আশা ॥
ত্যাগের আনন্দে, জাগহে ব্রাহ্মণ, আকুল আহ্বান এসেছে।
ধরণীর আঁখি, আশার তৃষায়, তোমার উপরে পড়েছে ॥

(৬)

দেবযানী-সম মত্ত লালসা, সাজিছে তোমায় বাঁধিতে।
কচের সন্তান, ব্রাহ্মণ তোমার, নারিবে নয়ন ধাঁধিতে ॥
একবার শুধু, মোহমদ ভুলি, দাঁড়াও কর্ম্ম ভূমিতে।
খণ্ডন করি, বন্ধন যত, জ্ঞানের নিশিত অসিতে ॥

(৭)

ত্যাগী, যোগী, বিষয় বিরাগী, বাণীবর পুত্র গো !
মোহ ঘুম ঘোর, ত্যজ হলো ভোর, জ্ঞানের আনন্দে জাগো ॥
(জাগ) আপন স্বরূপে, (জাগ) লব্ধ গৌরবে, দীপ্ত জ্ঞানের আলোকে।
ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব দৃপ্ত, তৃপ্ত আশার পুলকে ॥

(৮)

নন্দিত মনে বন্দিত কর অনাগত আর অতীতে।
সমাহিত হও, অবহিত হও, পুণ্যপ্রসাদ লভিতে ॥
ভগ্ন আশার, পুণ্য শ্মশানে, লভিব সাধন, সম্পদ।
অনাগতে আজ, অতিথি পাইয়া, হব নব প্রয়াসে উন্মত ॥

(৯)

নন্দিত মনে, বন্দিত কর, অনাগত আর অতীতে
সমাহিত হও, অবহিত হও, পুণ্য প্রসাদ লভিতে ॥
স্বরূপে তোমার, জাগহে ব্রাহ্মণ, আকুল আহ্বান এসেছে।
ধরণীর আঁখি, আশার তৃষায়, তোমার উপরে পড়েছে ॥

শ্রীশৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায়।

সামাজিক প্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন।

নব-বর্ষের প্রথম পবিত্র বৈশাখ মাসের গত ৯।১০ই তারিখে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে হিন্দুর পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বাঙ্গালার প্রায় জেলারই প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবৃন্দ, রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ ও ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই তো কয়েক বৎসর ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন হইল, বাঙ্গলার প্রায়স্থানের সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ সম্মিলিত হইতেছেন, কত রেজলিউসন্ পাশ হইল, বক্তৃতায় কত বিষয়ের কত আলোচন হইল, অথচ কার্য্যতঃ তাহার কিছুই দেখিতে পাই না কেন? এই সকল জল্পনা কল্পনাকারীদের নিকটই আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সাধক দাশরথী রায়ের পাঁচালীতে আছে—

"যে দিন ধাত্রী কাটে নাড়ী সেই দিন কি ওঠে দাড়ী
কাল পেয়ে যৌবনে দাড়ী উঠে।
যে দিনে কুপথ্য যোগ সেই দিনেই ঘটে রোগ,
কুপথ্য রোগের মূল বটে॥

সমাজ শরীরে তামসভাবপ্রবাহে ঘোর শ্লৈষ্মিক বিকার উপস্থিত। সমগ্র সমাজ শরীরই প্রায় হিমাঙ্গ, অচেতন। ইহাকে রীতিমত উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইয়া ও সেক্ তাপ দ্বারা আবার গরম করিয়া তুলিতে হইবে। বুকের ভিতর যে ভীষণ শ্লেষ্মা জমিয়া বাক্‌রোধ করিয়াছে, তাহা সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে, তবে তো চৈতন্য আসিবে। পূর্ব্বোক্ত জল্পনাকারীদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনার বাড়ীতে ডবল নিউমোনীয়ায় অচৈতন্য রোগী যখন ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তখন সে কথা বলিল না বা কিছু কার্য্য করিল না বলিয়া কি আপনি তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন? সেই অসাড় ঠাণ্ডা শরীরে আবার সাড়া ও গরম আনিতে যত্ন করেন না কি? আজকাল সমাজ শরীরও আপনার বাড়ীর রোগীর মত, এখন বিরক্ত হইবার বা রাগ করিবার সময় নয়, কেবল চিকিৎসা ও শুশ্রূষার আবশ্যক। যদি চিকিৎসা এবং শুশ্রূষায় আবার ঠাণ্ডা শরীর গরম করিতে পারেন, আবার যদি বুকের শ্লেষ্মা নাশ করিতে পারেন, আবার যদি অচেতনে চৈতন্য আনিতে পারেন, তবেই সমাজ আপনার কথা শুনিবে, তবেই সমাজ আপনার কথার উত্তর দিতে পারিবে। এখন এই বিকারপ্রাপ্ত সমাজের প্রতি আপনি বিরক্ত হইতেই পারেন না, বরং পীড়িত বিপন্নের প্রতি মানব-সুলভ অনুরাগই আপনার আসা উচিত; জানি না, আপনার এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন কেন হইতেছে?

ঘরে আগুন লাগিলে গৃহস্থের যেমন কর্ত্তব্য স্থির থাকে না, কেবল চিৎকার করিয়া লোক দেয়, এবং কোনটী আগে কোনটী পরে বাহির করা উচিত, এবং কাহার হাতে কি

দেওয়া উচিত, কি না দেওয়া উচিত, যেমন ঠিক থাকে না। হয় তো ইহার ফলে অনেক দ্রব্য অপাত্রে পড়িয়া যায়। ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনও অধর্ম্ম আগুনে দহ্যমান সমাজগৃহ দর্শন করিয়া কেবল লোক জাগাইয়া সমাজগৃহ রক্ষার জন্য আপাতত চেষ্টা করিতেছেন। এখন আর পাত্রাপাত্র বিবেচনা সেরূপভাবে করিবার সময় নাই। তাহারই ফলে অমূল্য দ্রব্য কিছু কিছু অপাত্রে ন্যস্ত হওয়ায় উদ্দেশ্য বহির্ভূত কার্য্য দর্শন হইলেও বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন তাহার সমর্থক নহেন, এবং যাহাতে পুনরায় সেরূপ না হইতে পারে, তাহার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন, অনুসন্ধান করিলে ইহা প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সামাজিকই জানিতে পারিবেন।

"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

আমাদের বিনীত প্রার্থনা সকলেই ভগবদ্ বাক্যটী স্মরণ রাখিতে ভুলিবেন না।

ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতি।

পূর্ব্বাপর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্য অপেক্ষা মুর্শিদাবাদে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

স্কুল, কলেজ ও টোলের ছাত্রগণ এবং জেলার গণ্ডগ্রামসকল হইতে প্রেরিত সেবকদল এই সমিতির পরিচার্য্যার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া যে ভাবে পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব।

রাত্রি নাই, দিন নাই, যখনই এই স্বেচ্ছাসেবকদলকে দেখা গিয়াছে, তখনই হাঁসিমুখ ছাড়া তাঁহাদের বিরক্তি কেহ লক্ষ্য করিতে পায় নাই। বিশেষতঃ কষ্টসাধ্য কার্য্যেও ইহারা সর্ব্ব সময়েই হাঁসিমুখে প্রস্তুত থাকিয়া সম্পাদন করিয়াছে। ১৪।১৫ বৎসরের বালক হইতে আরম্ভ করিয়া যুবক, প্রৌঢ় সকলেই যেন একভাবে ভাবুক। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ইহারা যেভাবে মর্য্যাদা রাখিয়াছে, তাহাও বিস্ময়াবহ। নিজেরা মাথায় মোট লইয়া, নিজেরা সকল সাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সুবিধা করিয়া দিয়াছে। মহাসম্মিলনে এই স্বেচ্ছাসেবক দলও একটা দেখিবার বস্তু হইয়াছিল। ইহারাই আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধার, আমরা আশীর্ব্বাদ করি ইহাদের মহৎ প্রাণটাও যেন ব্রাহ্মণ্য-গুণরাজি-মণ্ডিত হইয়া সমাজকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে।

সৈদাবাদের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত উমেশনাথ ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ উদারহৃদয় ব্রাহ্মণগণের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখ যোগ্য। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্মিলনে অর্থ সাহায্য করিয়াও কয়দিন বহুব্রাহ্মণকে নিজের বাটীতে রাখিয়া ভূরি ভোজ্যে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনা গিয়াছে, এরূপ আদর অভ্যর্থনা জীবনে ভুলিবার নহে। শ্রীযুক্ত উমেশনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ত সম্মিলনের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সব ভাবনা চিন্তা ভুলিয়া এই কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন—তাঁহাকে কিছু বলিবার

আমাদের ভাষা নাই। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদের কত ব্রাহ্মণই যে কত প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকমহাশয় সমস্ত বিরোধ, সমস্ত অবসাদ দূর করিয়া ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনকে যে ভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন—তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আশা করা যায় মুর্শিদাবাদবাসী ব্রাহ্মণগণ মনে প্রাণে এক হইয়া সমাজ-ক্ষেত্রে আপনার গৌরবোজ্জ্বল প্রভাব বিস্তার করিবে।

আদর্শ ব্রাহ্মণ-ভক্তি।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের ব্যবহার এই সম্মিলন ব্যাপারে একটী উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। মহারাজার সৎকার্য্য সকল বাঙ্গালার প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রায় অবগত আছেন, সুতরাং সে পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এবার বহরমপুরে তাঁহারই স্কুল হলে মহাসম্মিলনের অধিবেশন হয়। মহাসম্মিলন উপলক্ষে গাড়ী, ঘোড়া, আসন, শয্যা, পূজার সজ্জা, আলোকাদি মহারাজা বাহাদুর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। সম্মিলনের উভয় দিনই সভাগৃহের এক পার্শ্বে পৃথক্ আসনে সভাভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা অনেকে লোকের গরমে ও জনকোলাহলে যখনই বিরক্তি অনুভব করিয়াছি, তখনই তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিয়াছি যে, সেই ভক্তি-প্রবণ চিত্তের সমান ভক্তিভাব মুখকমলে বিরাজিত, একটুও বিরক্তি চিহ্ন নাই।

দ্বিতীয় দিন যখন সভাপতি মহাশয় মহারাজের নিজ গৃহে সম্মিলনে সমাগত ব্রাহ্মণবর্গের পদধূলি গ্রহণের প্রবলকামনার কথা প্রকাশ করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজ ভবনে গমনের অনুমতি সমস্ত ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থনা করেন, সেই সময় মহারাজা ব্যস্ত হইয়া যুক্ত করে দীন নয়নে অনুমতির অপেক্ষায় অতিকাতরভাবে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিলেন। মহারাজার সেই প্রবল ভক্তিভাব-ব্যঞ্জক কাতর মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সকল ব্রাহ্মণই স্নেহে বিগলিত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনার সে বিপুল আয়োজন বর্ণনাতীত। গাড়ী করিয়া প্রত্যেকের বাসা হইতে সকলকেই লওয়া হইয়াছিল। গাড়ী হইতে মহারাজ ভবনের সমীপে অবতরণ করিলেই সদর দরজা হইতে অভ্যর্থনাকারী ব্রাহ্মণগণের সাদর আহ্বানে প্রবেশ করিতেই মহারাজের একজন স্বজন পা হইতে জুতা খুলিয়া লইয়া বিনয়ের সহিত বলিতেছেন, আপনাদের জন্য ঐ নূতন বস্ত্র পাতা আছে, কৃপা করিয়া উহার উপরি পদরজ প্রদান করিয়া গমন করুন। ঐরূপভাবে গমনের পর বস্ত্রের শেষ প্রান্তে আবার তিনিই জুতা যোগাইতেছেন। জুতা পায়ে দিয়া একটু অগ্রসর হইলেই দেখি, গামছা কাঁধে মহারাজা, মহারাজকুমার, এবং তাহার দৌহিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করিতেছেন, এবং ঐ পাদোদক মস্তকেও কিছু গ্রহণ করিতেছেন। দেখিয়া পূর্ব্বপুরুষের ঋষিকুলের কাজ স্মরণ হইতে থাকিল। একদিন আমাদেরই পূর্ব্ব-

পুরুষ সমাজের ইহা অপেক্ষাও বুঝি শতগুণ ভক্তির পাত্র ছিলেন—আর তাঁহাদের শুক্র শোণিত আমাদের শরীরে আছে বলিয়া এহেন মহারাজারও আমরা এইরূপ ভক্তির পাত্র। সমাজ এই ভাবেই আমাদের সম্মান করিয়া আসিতেছিল, আমাদের নিজ দোষে সে সম্মান নষ্ট করিতে বসিয়াছি। এখনও শোধরাইলে বুঝি আবার পূর্ব্ব ভাব জাগরিত হয়। জ্ঞানীব্রাহ্মণ সম্মান কামনা করেন না, বরং বিষের ন্যায় ত্যাগ করেন; কিন্তু সমাজের এই সম্ভ্রম দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণবালক ও অশিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ এই সম্মানের লোভে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ হইতে বাসনা করেন। যেমন নাড়ু লোভে বালক তিক্ত ঔষধ সেবন করে, তাহার ফল নাড়ু নহে—রোগ আরোগ্য। সেইরূপএই সম্মান দর্শন করিয়া অজ্ঞানী ব্রাহ্মণ জ্ঞানী হইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার ফল সম্ভ্রম নহে, প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ। এই সম্ভ্রম হেতু হৃদয়ের গতির দ্বারা ইহাই অনুভব করিলাম। লোকে অর্থ হইতেও সম্মানকে বড় মনে করে। সমাজ যখন এইরূপে সম্মান করিত, ঐশ্বর্য্য যখন দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদতলে লোটাইয়া পড়িত, যখন ব্রাহ্মণ ঐ কার্য্যকে হেয় জ্ঞান করিতেন—তখন সমাজে রাজার কন্যাও বল্কলধারী দরিদ্র ব্রাহ্মণের পত্নীত্ব কামনা করিত। আবার যেদিন হইতে সমাজ জ্ঞান হইতে ধনের আদর আরম্ভ করিল, দরিদ্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ধনবানের সম্ভ্রম করিল, তখন হইতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যের আদর করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে ঐশ্বর্য্যের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। তাই এখন ব্রাহ্মণকুমারী রাজপত্নীত্ব কামনা করে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আজ ব্রাহ্মণ পদতলে নিজের রাজোচিত ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে বিসর্জ্জন দিলেন। মনে হয় মহাসম্মিলন অপেক্ষা মহারাজার এই কর্ম্মে ব্রাহ্মণ-সভার উদ্দেশ্য বেশী ফলবান্ হইবে। মহারাজার আদরে সমাজে এই জাতীয় সম্মান জাগিলে শীঘ্রই ব্রাহ্মণ-সমাজ আবার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইবে।

এইভাবে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অভ্যর্থনা শেষ হইলে মহারাজা বাহাদুরের গৃহপ্রাঙ্গণেই এক সভা করা হয়। সভার উদ্দেশ্য মহারাজাকে আশীর্ব্বাদ করা। মহারাজা সুসঙ্গাধিপ শ্রীযুক্ত কুমুদ-চন্দ্র সিংহবাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া মহারাজার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া—সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বাগ্মী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় মহারাজার বৈষ্ণবোচিত গুণরাজি উল্লেখ করিয়া বিস্তৃত বক্তৃতা করেন। পরে অন্যান্য অনেকের বক্তৃতার পর সুসঙ্গের মহারাজাকে অগ্রণী করিয়া সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলী ধানদূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। অতঃপর মুন্সীগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ঘটনা চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য প্রার্থনা করেন,—মহারাজা যেন একটী আদর্শ চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। মহারাজা বাহাদুর ও বিনয় নম্রভাবে তাহা স্বীকার করেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

সাহিত্যসম্মিলনে—নারী।

এবারে যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে বড় মজা হইয়াছে। সবজান্তা শ্রীযুত পাঁচকড়িবাবু বসুমতীতে নাকি নারীর অমর্য্যাদাকর কি লিখিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নিমন্ত্রণ পত্র

প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। ফলে সাহিত্য সম্মিলনে একটা বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। পাঁচকড়ি বাবুকে আমরা অনেক দিন হইতেই জানি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাবের কথাও অনেকে জানেন। কিন্তু এই প্রভাবের বশে তিনি যে জ্ঞানশূন্য হইয়া কতকটা অসদাচারী হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা অনেকের বিশ্বাস। বিগত কালীঘাটের ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনে তিনি এই অসদাচারের পরিচয় দিতে গিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন, এবার যশোহরেও হইলেন। সে যাহা হউক, পাঁচকড়ি বাবু ভাবের দিক দিয়া একটা মস্ত কাজ করিলেন—সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

আমাদের দেশে এক্ষণে নারীর অবাধ স্বাধীনতা লইয়া এক নব্যসম্প্রদায়ের সহিত প্রকৃত হিন্দুর বিরোধ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। নব্যসম্প্রদায় পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার দিয়া প্রাচীন কালের সমাজ ভাঙ্গিতে চান। আর প্রকৃত হিন্দু যাঁহারা, তাঁহারা প্রাচীনকালেরই মত নারীকে উচ্চ সম্মান ও উচ্চ মর্য্যাদায় ভূষিত করিয়া দেবী জ্ঞানে পূজা করিতে চান। অবাধস্বাধীনতায় নারীর মর্য্যাদা লোপ হয়, নারীর পবিত্রতার হানি হয়, এবং প্রকৃত হিন্দুত্ব যাহা অদ্যাবধি গার্হস্থ্যাশ্রমে বিরাজ করিতেছে, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, ইহাই প্রকৃত হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস। মনু বলিয়াছেন,—

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহাটনং।
স্বপ্নোঽন্য-গৃহবাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ষট্।

ইহা অবশ্যই আজকাল সাম্যবাদের কালে অনেকের নিকট উপেক্ষিত সন্দেহ নাই। কিন্তু যে জাতি মানস ব্যভিচারকেও ক্ষমার চক্ষে কোন দিন দেখে নাই, সেই জাতির স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলনে আত্মব্যভিচারও যে প্রকাণ্ড হইয়া দেখা দিবে না—কে বলিল? আজকালকার পুরুষ ত ইন্দ্রিয়দাস, ব্রহ্মচর্য্য-হীন, রূপের নেশায় ভরপুর। আজকাল পুরুষের এত বিলাস কেন? এত আড়ম্বর কেন? এমন রমণীমোহন সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি কেন? রাস্তায় রাস্তায় কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় দেখিলে এক একটা কন্দর্পের দোফলা সংস্করণ বলিয়া কি মনে হয় না? চক্ষে চটুল চাহনী, মুখে হাঁসি হাঁসি ভাব, মাথায় টেরির বাহার, বুকে অফুরন্ত পিপাসা লইয়া যে মানবদল সমাজক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়ায় তাঁহাদের যতটা ধর্ম্মজ্ঞান থাকুক না কেন—তাঁহারা যে অন্ততঃ মানসব্যভিচারী এ কথা স্পষ্টাক্ষরে আমরা বলিতে বাধ্য। এই মানবদলের সঙ্গে আমরা অন্তঃপুরবাসিনী গৃহলক্ষ্মীদের অবাধ মিলনে কোন রূপই প্রশ্রয় দিতে পারি না।

আজ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু হয়ত শ্লীলতার হানি করিয়াও এই অবাধ মিলনের গতিরোধ করিতে যেটুকু সৎসাহস দেখাইয়াছেন তাহা প্রকৃত হিন্দুর নিকট উপেক্ষিত হইবে না। এখানে ব্যক্তিগত বিরোধ নাই, বিরোধ ভাবের। নারীগণের অবাধ মিলনের ভাবে ভাবুক দল যতই প্রবল হউক না কেন, তাহার বিরোধী ভাবের ভাবুক দল এখনও প্রবলতর। এই প্রবলতর প্রকৃত হিন্দু সমাজের সঙ্গে আজ নব্যসমাজের বিরোধ। হিন্দুসমাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজের পবিত্রতা রাখিতে বদ্ধ পরিকর হউন। অনায়াসেই এই বিরোধী ভাব দূর হইবে, অনাচার দূর হইবে।

মুর্শিদাবাদ—ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীর সভাপতি—
শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের

অভিভাষণ।

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
বেদাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণা দেবতাঃ॥

জানি না কি কর্ম্মসূত্রে আমি আজ এখানে। আমার মত ব্যক্তিকে আপনারা এই ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর সভাপতিত্বে কেন বরণ করিয়াছেন বুঝিতে পারি না। যখন বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভা হইতে আমার চক্রধরপুরের আশ্রমে তারযোগে সংবাদ পাইলাম যে, তাঁহারা মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীতে আমাকে সভাপতি করিবার জন্য প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন আমি যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলাম। আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ আমার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা। দুঃখিত হইবার কারণ—গো ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য যে মহাসভা ভূদেবগণ কর্ত্তৃক আহূত হইবে, তাহাতে আমার মত শম-দম-তপো-বিহীন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিকে সভাপতি করিবার প্রয়োজন হওয়ায় মনে হইল যে বঙ্গ দেশের ব্রাহ্মণ-সমাজের দুর্গতি চরম সীমায় উপনীত প্রায়।

তারসংবাদ পাইবার সময় আমি অসুস্থ ছিলাম; সুতরাং ব্রাহ্মণ-সভার প্রস্তাবিত সম্মান গ্রহণে অক্ষম হইলাম বলিয়া তারযোগে উত্তর দিলাম। কিন্তু সভা আমাকে ছাড়িলেন না, দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন। তখন "ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ" এবং "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" ভাবিয়া অক্ষমতা সত্ত্বেও স্বীকার করিলাম।

মনে হইল সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভা ও মহাসম্মিলনীর আবির্ভাব ঠিক সময় মতেই হইয়াছে। ইঁহারা যেরূপভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহা আশাপ্রদ। সুতরাং আমার যতটুকু ক্ষমতা তদনুসারে উক্ত সভার কার্য্যে আমার যোগদান কর্ত্তব্য।

আরও মনে হইল যে এই উপলক্ষে শাস্ত্র-সন্দিহান, কর্ম্ম সন্দিহান ও ধর্ম্মসন্দিহান নব্য সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া করযোড়ে যদি কিছু নিবেদন করি, তাহা হইলে তাঁহারা আমার কথায় সম্ভবতঃ কর্ণপাত করিবেন। কারণ—

১। আমি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন উপাধিধারী বলিয়া পরিচিত।

২। আমি বৃদ্ধ।

৩। আমি রাজকার্য্যে একপ্রকার উচ্চপদেই অধিষ্ঠিত ছিলাম।

৪। আমি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নানা স্থানে রাজকার্য্য করিয়াছিলাম এবং অনেকের নিকট সুপরিচিত।

৫। আমি শাস্ত্র-বিশ্বাসী ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিয়া থাকি।

৬। আমি আজ ২৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল শাস্ত্রালোচনা করিতেছি।

এখানে আসিবার আর একটী কারণ :—

এই বহরমপুরে (ব্রহ্মপুরের অপভ্রংশ) প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে যখন রাজকার্য্য করিতাম, তখন এ স্থানের লোক আমাকে বিশেষ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতেন। স্থানীয় সংবাদ পত্র সমূহ আমার স্থানান্তর হইবার সময় আমাকে যেরূপে প্রশংসা করিয়াছিলেন—তাহা বেশ মনে আছে। বিদায় কালে জনসাধারণ কত আদর ও ভালবাসা ও সমারোহের সহিত আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—তাহা জীবনে ভুলিবার নহে। আমার নামে বিদায়ী গান ও সংস্কৃত স্তোত্র যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা কাণে এখনও বাজিতেছে। সেই অভিনন্দনের একটী বিশেষত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। তখনি বুঝিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণের আদর মা ভাগিরথীর অঙ্কস্থিত ব্রহ্মপুরেও সম্ভব। এবং অদ্যকার মহাসম্মিলনীও তাহা প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মপুর-বাসীর পূর্ব্বাচরিত সৌজন্যজনিত কৃতজ্ঞতা আমাকে অসুস্থতা সত্বেও তাঁহাদের আহ্বানে, এখানে উপস্থিত হইতে উৎযুক্ত করিয়াছে।

আমি বৃদ্ধ-বয়সে আত্মচিন্তা ও ভগবদুপাসনা মনের সাধে করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় না থাকিয়া কোলাহলশূন্য দুরদেশে বাস করিতেছি। মৃত্যু নিকটস্থ, পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতেছি। যে সময়টুকু ভগবদুপাসনা অথবা সৎশাস্ত্র পাঠে ব্যয় না করি, তাহাই অপব্যয় হইবে মনে হয় ; তাই নিভৃত স্থানে এক প্রকার লুকাইয়া থাকি। "বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জন-সংসদি" প্রভৃতি ভগবদুপদেশ পালন করিবার চেষ্টা করি। সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইতে মন চাহে না। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীর আহ্বান—ভগবানের আদেশ বলিয়া মনে হইল, তাই এ আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাদের সেবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি। আমি তাঁহাদের নেতা বা অগ্রণী হইবার উপযুক্ত নই, কারণ আমি বেদজ্ঞ মুখ্য ব্রাহ্মণ নহি, তবে ঐরূপ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

"বহুনাম্ জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে," "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" ইত্যাদি গীতোক্ত কথা কখনই নিষ্ফল হইবে না। কোনও না কোনও জন্মে আমি নিশ্চয়ই এই জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ হইব—আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আরও মনে হইল—হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রে সন্দেহ করেন, যাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা মানেন না, যাঁহারা দেবদেবীর পূজা বৃথা পরিশ্রম মনে করেন, যাঁহারা প্রতিমাপূজা পুঁতুলপূজা মনে করেন, যাঁহারা কোনরূপ যোগের প্রয়োজনীয়তা মানেন না, যাঁহারা গুরুবেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগকে দুই চারিটী কথা বলিবার সুযোগ ভগবান দিতেছেন। এ সুযোগ ছাড়িব না।

আজ কতিপয় বৎসর কাল শারীর, বাঙ্ময় ও মানস তপঃ, যাহা গীতায় ভগবান্ বুঝাইয়াছেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অভ্যাসে যে প্রত্যক্ষ ফল স্বকীয় জীবনে পাইয়াছি, তাহাই শাস্ত্রসন্দিহান হিন্দুকে বলিবার জন্য আসিয়াছি।

হে ভূদেবগণ! আপনাদের সাদর আহ্বানে কৃতার্থ হইয়াছি। আপনাদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক এখন একবার সম্রাটের এবং বৃটিশরাজ্যের কল্যাণকামনায় ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা করি, আসুন! সম্রাট্ ভিন্ন জাতীয় হইলেও তিনি ভগবানের দিব্যবিভূতি। "নরাণঞ্চ নরাধিপঃ" ভগবানের কথা। বিশেষতঃ আমাদের রাজা কাহারও ধর্ম্মকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না। প্রত্যুত ধর্ম্মালোচনায় আমাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। বৃটিশরাজ আমাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য ভগবৎপ্রেরিত।

বৃটিশরাজ আমাদের রাজা না হইলে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত তাহা বর্ণনা করা যায় না। হে ভগবন্! আমাদের ধর্ম্মপরায়ণ রাজার মঙ্গল করুন। দারুণ যুদ্ধে তাঁহাকে এবং তাঁহার সাহায্যকারী রাজগণকে জয় প্রদান করিয়া পৃথিবীর শান্তি পুনঃস্থাপিত করুন। এ ভীষণ লোকসংহারক যুদ্ধ দেখিয়া আমরা বড়ই ভীত হইয়াছি। ঠাকুর! সংহারমূর্ত্তি সংবরণ কর।

আপনারা হয় ত ভাবিবেন, অভিভাষণের ভূমিকা কিছু ছোট করিলে ভাল হইত। আমারও সেই অভিমত। কিন্তু আমি নিজেকে সভাপতির আসনের অযোগ্য জানিয়াও কেন উহা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ কিছু বলা আবশ্যক বোধে এত কথা বলিলাম।

অভিভাষণ।

কেহ কেহ বলেন—"সভা সমিতি করিয়া কি হইবে? সভা সমিতিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত হইবে না; সভায় ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না। উহা অভ্যাসের জিনিষ—উহা আচরণের বস্তু। ঘরে বসিয়া নিজে নিজে ভাল হইলেই সমাজ উন্নত হইবে, যেহেতু সমাজ ব্যক্তিরই সমষ্টি।" এ কথাগুলি সবই সত্য। প্রকৃত ধর্ম্মকর্ম্ম সভা সমিতিতে কখনও হয় না। সভায় হৈ চৈ অধিকাংশ হয়। কিন্তু যে স্থলে প্রায় সকলেই নিদ্রিত, তথায় তাহাদিগকে জাগ্রৎ হইতে হইলে কয়েক জনের হৈ চৈ আবশ্যক নয় কি? ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন যদি প্রায় সকলেই নিদ্রায় অভিভূত থাকে, তবে যাঁহারা জাগ্রত, তাঁহারা যদি এই ভাবে বসিয়া থাকেন যে, নিদ্রিতগণ অগ্নির তাপ পাইলে আপনা আপনি জাগিয়া উঠিবেন; তাহা হইলে নিদ্রিতগণের অধিকাংশেরই মরিবার আশঙ্কা হয় না কি? আমাদের সমাজেও আগুন লাগিয়াছে জানিবেন, সে কথা জানাইবার জন্যই এই মহাসভার আহ্বান। যাঁহারা নিদ্রিত নন, তাঁহারাও এত তমোগুণাচ্ছন্ন যে, তাঁহারাও মনে করেন যে আমাদের আর কিছু হইবার নয়, আর ধর্ম্ম রক্ষা করা যায় না—এ কালে আর প্রাচীন ধর্ম্ম থাকে না, এবং দেশ কাল পাত্রের মতে চলিতে হইবে, আমরা অতি দুর্ব্বল, এখন আর কালস্রোত বারণ করা যাইবে না। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এবং চাকুরিয়াগণের মধ্যেও যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসী, তাঁহারা এই শ্রেণীতে। তাঁহাদের বল সঞ্চারের জন্য, তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্যও এই সভার আহ্বান।

যাঁহারা নূতন শিক্ষার ফলে বা অন্য-ধর্ম্মী বলিয়া ঋষি প্রকাশিত ধর্ম্মের নিন্দা করেন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে বর্ত্তমান কালের অনুপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন, আর্য্য সভ্যতার উপযুক্ত সম্মান করিতে জানেন না, তাঁহাদিগকে সেই আর্য্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য এং সভ্যতার অসারত্ব বুঝাইবার জন্যও এই সভার আহ্বান।

লোকে পুস্তক পড়িতে চায় না, কিন্তু অনেকে কথা শুনিতে পারে, তাহাদিগকে কতকগুলি প্রকৃত সত্য শুনাইবার জন্যও এই সভার আহ্বান।

বর্ত্তমান সমাজ, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র রক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে, গুরু পুরোহিতকে, কুলের বিশুদ্ধিরক্ষক, জাতীয় পবিত্রতারক্ষক, কুলাচার্য্যদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন না। পণ্ডিত ও পুরোহিতগণও উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত হইয়া বিষয়ী সমাজের কুদৃষ্টান্তে ক্রমে ধর্ম্ম ও আচার ভ্রষ্ট হইতেছেন, শাস্ত্র চর্চ্চায় উদাসীন হইতেছেন, পাণ্ডিত্য উচিত রূপে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তন্নিবন্ধন পাশ্চাত্য :সভ্যতার আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, পাশ্চাত্য প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাস্ত হইতেছেন। পাণ্ডিত পুরোহিতদিগকে বুঝান আবশ্যক যে এখনও চেষ্টা করিলে; এখনও রীতিমত শাস্ত্রাভ্যাস এবং ধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষা করিলে এখনও তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করিতে পারেন এবং তাহাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। সামাজিক বিষয়ীকেও বুঝাইতে হইবে যে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের পরেই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য—গুরু, পুরোহিত ও পণ্ডিত রক্ষা, যেহেতু তাঁহারাই ধর্ম্মরক্ষার ও শাস্ত্র-রক্ষার হেতু। পণ্ডিত ও পুরোহিতদিগকে এবং বিষয়ী সামাজিকদিগকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্যও এ সভার আহ্বান।

বর্ত্তমানে বিষয়িগণ কেবল অর্থোপার্জ্জনেই ব্যস্ত। কিন্তু কেবল অর্থের দ্বারাই সুখ শান্তি হয় না। ধর্ম্মহীন হইয়া অর্থ লাভে বরং সমাজ হইতে সুখ, শান্তি, সন্তোষাদি সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। যে সুখের জন্য অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ততা, সেই মূল উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমানে ভুল। ধর্ম্মরক্ষা শাস্ত্ররক্ষা, দেবতার প্রীতিবিধান ও দেবালয় রক্ষা, পণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত রক্ষা, গোচারণ ভূমি রক্ষা, বিশুদ্ধ জলাশয় রক্ষা ইত্যাদির উপযুক্ত বিধান সমাজে হইলেই সমাজে প্রকৃত সুখ শান্তি রক্ষা হইতে পারে এবং সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভাবিত হইতে পারে। এই সমস্ত কথা বুঝাইবার জন্য এই সভার আহ্বান।

সকলেই অর্থচিন্তায় ব্যস্ত হইয়া সমাজকে উপেক্ষা করিতেছেন, তাহার ফলে নানা সামাজিক উপদ্রব ও কুক্রিয়া প্রভৃতি প্রশ্রয় পাইতেছে। বিবাহাদিতে নানা কুপ্রথা উপস্থিত হইয়াছে, প্রকৃত কৌলিন্যের অর্থাৎ নবধা গুণবিশিষ্ট কৌলিন্যের অবনতি হইতেছে, বালকগণ কুশিক্ষা পাইতেছে এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া অনুচিত ভোগের আকাঙ্ক্ষায় স্বয়ংও অসুখী হইতেছে এবং সমাজকেও অসুখী করিতেছে। এ সমস্ত গুরুতর বিষয় বুঝাইবার জন্য এবং এখনও সমাজকে ঐ সমস্ত উপদ্রবের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য সকলকে উৎসুক্ত করিবার জন্যও এই মহাসভার আহ্বান।

এখনও প্রকাণ্ড ব্রাহ্মণ-সমাজ আমাজ আমাদের পিছনে রহিয়াছেন, তেরলক্ষ ব্রাহ্মণ এখনও বঙ্গদেশে বর্ত্তমান আছেন, তাহার অধিকাংশই এখনও ধর্ম্মে .বিশ্বাসী। এই সমাজশক্তি উন্মেষিত হইলে ধর্ম্মরক্ষা সহজসাধ্য, তবে উপযুক্ত বিশুদ্ধমতি পণ্ডিত ব্যবস্থাপক, বিশুদ্ধাচার ধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের হস্তেই সমাজকে অর্পণ করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে সমাজে উচ্চপদ দিতে হইবে, বিরুদ্ধাচারীকে সুপথে ফিরাইতে হইলে, অর্থমাত্রের সম্মান না করিয়া সৎকার্য্যেরই সম্মান করিতে হইবে। এই সকল গুরুতর বিষয় বুঝাইবার জন্যও এরূপ মহাসভার প্রয়োজন।

এরূপ মহাসভাতে সমস্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সম্মিলিত হইলে বহু সহস্র ব্রাহ্মণের সমবেত ও সমুচ্চারিত বাণী লোকের হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, নিদ্রিত শক্তির উন্মেষণ করিবে এবং কার্য্যোৎসাহ জন্মাইবে, এই আশাতেই এই মহাসম্মিলনীর আহ্বান।

তাই বলিতেছিলাম—সভা সমিতিতে ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না, এই মহাসভাও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য আহূত হয় নাই। ব্রাহ্মণের তমোভাব দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে উপরোক্ত উদ্দেশ্য সমূহের সিদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাবের উন্মেষণ জন্যই এই মহাসম্মিলনীর আহ্বান হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয়মধ্যে আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে। বিবাহব্যাপারে যে পণপ্রথার উল্লেখ আছে, তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ঘোর অধর্ম্মজনক। বিবাহে এই পণপ্রথা সমাজ-শরীরের একটী সংক্রামক ক্ষতস্বরূপ, অচিরেই ইহার উচ্ছেদ না করিলে সমাজকে ধ্বংস করিবে। হিন্দুমাত্রই যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পণ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলেই এ পাপ দূর হইবে।

রাঢ়ীয় কুলীনগণ মধ্যে মেল বন্ধনের কঠোরতা আজকাল অনেক শিথিল হইয়াছে। আমি নিজে বালকগণকে প্রতিযোগী মেলে বিবাহ দিয়াছি। এবং আশা করি—যখন মেলবন্ধনের সহিত ধর্ম্ম অথবা শাস্ত্র বা আচার-সঙ্গত কোন সম্বন্ধ নাই, প্রত্যুত উহা রক্ষা করিতে যাইয়া অনেক সময় অবিবাহ্য বিবাহ-রূপ পাপ-সমাজে প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং উহার কঠোরতা হ্রাস করিয়া কালীঘাটের সম্মিলনীর সিদ্ধান্তানুসারে কার্য্য করিলে মনে হয় সমাজের উপকার হইবে।

অন্যান্য আলোচ্য বিষয়গুলি সমস্তই প্রয়োজনীয়। তৎসম্বন্ধে আমার পৃথক্ বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে সমস্ত বিষয়ই মীমাংসিত হইবে আশা করি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাসম্মিলনীর সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা গ্রাহ্য।

নিমন্ত্রণপত্রের ফুটনোটে দেখিলাম—"বিদেশপ্রত্যাগতকে সমাজে গ্রহণ করা হইবে কি না; এ বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান অধিবেশনে স্থগিত রহিল।" আমার এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে—বলাবাহুল্য এ বক্তব্য আমার ব্যক্তিগত। কেহ না .ভাবেন যে ইহা দ্বারা বর্ত্তমান মহাসম্মিলনীর কোনরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি। বিদেশ-প্রত্যাগতের গ্রহণ সম্বন্ধে

কালীঘাটের মহাসম্মিলনীতেই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। *আমার মনে হয়—পাপের তারতম্য হেতু উপস্থিত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে নূতন বিচার আবশ্যক, সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ অবস্থা পর্য্যালোচনার প্রয়োজন। এ সম্মিলনীতে সে বিষয় স্থগিত রাখা সঙ্গতই হইয়াছে। এ কথাটা একটু পরিষ্কার ভাবে বলিতেছি, পূর্ব্বে লোক স্বেচ্ছায় বিলাত প্রভৃতি দেশে যাইত। বর্ত্তমানে ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় কেহ কেহ রাজার আদেশে, কেহ বা রাজপক্ষের সাহায্যার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইউরোপে গিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ব্যবহার্য্য হইবেন কি না এ বিষয়ে বিচার হয় নাই, মহাসম্মিলনীতে এই বিচার করা উচিত হইলেও তাহা নানাকারণে এ ক্ষেত্রে হইয়া উঠিল না। তবে যাঁহারা রাজার আদেশে বা রাজার সাহায্যার্থে গিয়াছেন, তাঁহারা এ দেশে আসিয়া সদাচার-পরায়ণ হইলে তাঁহাদিগের ব্যবহার্য্যতা বিষয়ে অনুকূল মত শাস্ত্রে আছে, একথা স্বধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি।

সভা ও সম্মিলনীর প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া এক্ষণে শাস্ত্র সাহায্যে যাহা বুঝিয়াছি, এবং যাহা নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ হিন্দু নামে পরিচিত অথচ শাস্ত্র সন্দিহান, শ্রোতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। হিন্দু শব্দটা ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষা নহে। উহা অন্যদেশীয় শব্দ। আমাদের ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম। অর্থাৎ নিত্যধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম চিরকাল ছিল, আছে ও থাকিবে। যে সকল গুণ থাকিলে জীবকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারা যায়, সেই সকল গুণসমষ্টির নাম মানবের সনাতন ধর্ম্ম।• ইহা সার্ব্বভৌমিক সনাতন ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই, খৃষ্টান্ বল, মুসলমান বল, বৌদ্ধ বল, জোরো আষ্ট্রীয়ান বল, সকল ধর্ম্মই এই সার্ব্বভৌমিক সনাতন ধর্ম্মরূপ মহৎ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা মাত্র। সমস্ত ধর্ম্মেরই নীতি শাস্ত্র এক, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রই পবিত্র, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। তবে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মই জগতে সনাতন-ধর্ম্ম নামে পরিচিত। ইহার অনেকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রধানতঃ তাহা বলিতেছি।

১। এখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিহিত এবং তাহা পালন করিতে হয়।

"অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোহন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তমঃ।
কদাচিৎ লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্য সঞ্চয়াৎ॥"

জগতে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ ভূমি; কারণ ইহা কর্ম্মভূমি এবং অন্যান্য ভূমি ভোগভূমি। এখানে অসংখ্য লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ জন্মান্তরীণ পুণ্য সঞ্চয় হেতু মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ লইয়া ভারতের সমাজ। "চাতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"—গীতা। এই চাতুর্ব্বর্ণের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্। বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম জগতে ভারত ছাড়া আর কোথাও নাই।

২। ভারতের ধর্ম্ম বিশ্বাস এই যে, সর্ব্বত্র ভগবান্ বিদ্যমান। উপাসক যে মূর্ত্তিতে ইচ্ছা ভগবানকে উপাসনা করিতে পারেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল, পৃথিবী, দিক, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, শিলা, প্রতিমা, ঘট, পট প্রভৃতি সর্ব্বত্র এবং সমস্ত দেহে ভগবানের সত্বা ভারতের আর্য্য-সন্তান অনুভব করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"
"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥"
"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি,
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥"

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন এবং আমাতে সর্ব্বভূত দেখেন আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, অর্থাৎ আমি প্রত্যক্ষ থাকিয়া কৃপাদৃষ্টিপাতে তাঁহাকে অনুগ্রহ করি। আমা ছাড়া জগতে কিছুই নাই, মালায় মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই সমস্ত বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। যে যে ভক্ত আমার যে যে তনুকে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি সেই সেই ভক্তের সেই সেই তনুতে অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। এবং সেই সেই তনু হইতে ভক্তগণ যে সকল অভিলষিত কাম পাইয়া থাকেন, তাহা আমিই প্রদান করিয়া থাকি।

৩। ভারতীয় ধর্ম্মের তৃতীয় বিশেষত্ব এই যে, জগতের মধ্যে কেবল এইখানেই জ্ঞানযোগিগণ—"সোঽহং," "অহং ব্রহ্মাস্মি," "শিবোঽহং," "সচ্চিদানন্দরূপোঽহং," "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অদ্বৈতজ্ঞানের মহাবাক্য উচ্চারণ ও উপলব্ধি করিবার অধিকারী, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞান ভারতে ব্রাহ্মণ-হৃদয়েই সম্ভবে। অন্যত্র নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই তত্ত্ব দার্শনিকতত্ত্ব-রূপে বুঝিয়াছেন; কিন্তু ইহার উপলব্ধি যে সম্ভবপর তাহাও এ পর্য্যন্ত বুঝিতে সক্ষম হন নাই।

৪। আর্য্যধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি জন্মান্তর বিশ্বাস। আজ যিনি শূদ্র, কর্ম্মপ্রভাবে তিনি জন্মান্তরে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, এবং আজ যিনি ব্রাহ্মণ তাঁহার কর্ম্মদোষে জন্মান্তরে অধম যোনিতে যাইবার কথা।

৫। ভারতীয় ধর্ম্মের অপর একটী বিশেষত্ব আচার—"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" আচারহীন ব্যক্তিকে বেদও পবিত্র করেন না। আচার মানিয়া কার্য্য করিলে দেহটী সত্য সত্যই শিব মন্দির হয়। এবং তখন পৃথক্ আর দেবালয়ে উপাসনার জন্য যাইবার প্রয়োজন হয় না। হিন্দুর শাস্ত্র বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। বেদই মূলশাস্ত্র। ইহা অপৌরুষেয়, ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা) নাই; ইহা অনাদি ও অনন্ত। স্মৃতি, পুরাণ সমস্তই

বেদমূলক ও ঋষিপ্রকাশিত; সুতরাং অভ্রান্ত। মন্ত্রও স্বয়ং ভগবানেরই উক্তি। এই সকল শাস্ত্র যাহা শিক্ষা দেন—তাহাই আর্য্যজাতির শিক্ষণীয় ও পালনীয়। এই সকল শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মধ্যে যাহার যেমন অধিকার সে সেই মত কর্ম্ম করিলে আর্য্যজাতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কীর্ত্তিমালিনী।

(২য় স্তবক)

পদ্মপুর ভারতখ্যাত মহারাজ নলের রাজত্বকাল হইতে নিষধ রাজ্যের করদ-রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। মহারাজ নলের পরলোকান্তে, তদীয় পুত্র ইন্দ্রসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময় রত্নাকরনামা বৈশ্যপ্রবর পদ্মপুরের রাজা ছিলেন। রত্নাকর রাজা ইন্দ্রসেনের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। তিনি বৈশ্য হইয়াও বিশেষ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। রাজকীয় জটিল কার্য্যাদিতে রাজা ইন্দ্রসেন অনেক সময় তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিতেন। এজন্য অনেক সময় তাঁহার নিষধ রাজধানীতে বাস করিতে হইত। রত্নাকরের পুত্র পদ্মাকরও ঐ সময় কখন কখন পিতার সহিত তথায় বাস করিতেন। এজন্য পদ্মাকর নিষধ-রাজনন্দন চন্দ্রাঙ্গদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কুমার চন্দ্রাঙ্গদ কালিন্দীতীরবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্তীয় রাজা চিত্রবর্ম্মার শিবপরায়ণা দুহিতা সীমন্তিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহের কিয়দ্দিন পরে শ্বশুরের ঐকান্তিক অনুরোধে পিতার আদেশে কুমার চন্দ্রাঙ্গদ শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছিলেন। একদা চন্দ্রাঙ্গদ বন্ধুজনসহ তরণিযোগে যমুনায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। দৈবযোগে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হওয়ায় তরণি জলমগ্ন হইল। অচিরে রাজপুরে সংবাদ পৌছিলে রাজা চিত্রবর্ম্মা সপারিষদ কালিন্দীতটে আগমন করিয়া নানা প্রকারে জামাতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাঙ্গদের সহচরগণের মৃতদেহ পাওয়া গেল, কিন্তু চন্দ্রাঙ্গদের কোন অনুসন্ধানই পাওয়া গেল না। জামাতার কোন প্রকার অনুসন্ধান না পাওয়ায়, রাজা চিত্রবর্ম্মা নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। রাজনন্দিনী সীমন্তিনী পতিশোকে ম্রিয়মাণ হইয়াও পতির জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি অতি কঠোর ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক পতির মঙ্গল ও পুনরাগমন নিমিত্ত মহেশ্বরের আরাধনায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন, রাজা ইন্দ্রসেন। বৃদ্ধবয়সে একমাত্র পুত্র চন্দ্রাঙ্গদ জলমগ্ন হওয়ায় শোকে জড়ভাবাপন্ন হইয়া গেলেন। তাঁহার ধূর্ত্ত খুল্লতাত পুত্র এই সময় সুযোগ পাইয়া শোকাতুর রাজাকে কারাবদ্ধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। এদিকে কুমার চন্দ্রাঙ্গদ জলমগ্ন হইয়া নিতান্ত অবসন্ন

হইয়া দৈব যত্নে পাতালপুরে নাগরাজ পুরদ্বারে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি সংজ্ঞাহীন ও অবসন্ন হইয়া তদবস্থায় পতিত ছিলেন, এমত সময় কতিপয় নাগকন্যা তথায় উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে তদবস্থ দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া, নাগরাজ ভবনে লইয়া গেলেন। . তাঁহাদের শুশ্রূষায় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, তিনি নাগরাজ তক্ষক সন্নিধানে নীত হইলেন। নাগরাজ তাঁহার তদবস্থার কারণ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিনীতভাবে তাবৎ বিবরণ ও আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। পন্নগরাজ প্রীত হইয়া তাঁহাকে তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রামের আদেশ করিলেন। নাগরাজের আদেশে কুমার নাগলোকে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ পন্নগরাজ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। বৎসরাধিক কাল নাগলোকে বাস করিয়া নাগরাজ প্রসাদাৎ চন্দ্রাঙ্গদ অমানুষিক বলবিক্রম ও শৌর্য্যশালী হইলেন। চন্দ্রাঙ্গদ পিতা মাতা ও:পত্নীর নিমিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অবকাশানুসারে নাগরাজ সমীপে গৃহগমন প্রার্থনা করিলেন।

উরগরাজ তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণে দুঃখিত হইয়াও তাঁহাকে গৃহগমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। নাগরাজ তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে সুরপাদপলব্ধ দিব্য স্রক্, গন্ধ, রত্ন ও আভরণ প্রভৃতি বিবিধ অনর্ঘ্যসম্ভব ভোগ্যবস্তু প্রদানে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন—যখন তুমি কোন প্রকার বিপদাপন্ন হইয়া আমাকে স্মরণ করিবে তখন আমি তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। তদনন্তর পন্নগরাজ স্বপ্রদত্ত রত্নাদি বহন জন্য মানবরূপধারী একজন রাক্ষসকে ও কুমার চন্দ্রাঙ্গদের সর্ব্বদা সহায়তা জন্য এক পন্নগরাজ কুমারকে প্রদান করিয়া একটী কামগামী অশ্ব প্রদান করিলেন।

কুমার চন্দ্রাঙ্গদ ভুজগরাজ প্রদত্ত উপহার ও অনুচরসহ কামগতি যানারোহণে মুহূর্ত্তমধ্যে স্বরাজ্যে উপনীত হইলেন। তিনি স্বরাজ্যে উপনীত হইয়া রাজ্যের সমস্ত বিবরণ পরিজ্ঞাত হইলেন। তিনি অনুচরসহ রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া, নাগরাজনন্দনকে রাজ্যাপহারী দায়াদ সমীপে প্রেরণ করিলেন। ভুজগরাজ-কুমারের মায়াবলে ও বাক্‌কৌশলে তাঁহার পিতৃ-রাজ্যাপহারী দায়াদ ভীত হইয়া রাজা ইন্দ্রসেনকে কারামুক্ত ও সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার পুত্রের পুনরাগমন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া নগরোপকণ্ঠে চন্দ্রাঙ্গদসমীপে গমন করিয়া স্বকৃত দুষ্কৃতি নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কুমার চন্দ্রাঙ্গদ স্বীয় দায়াদকে অভয়প্রদান করিয়া তৎসহাগত অনুচরামাত্যগণ পুরঃসর মহোৎসব সহ পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া, পিতৃচরণ বন্দনা করিলেন। বৃদ্ধ রাজা ইন্দ্রসেন মৃতপুত্রকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। কুমার চন্দ্রাঙ্গদ পিতৃসকাশে তক্ষকপুর গমন ও তদীয় অনুগ্রহ বিবরণ বিবৃত করিয়া, জনকজননীর আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। বৃদ্ধ রাজা পরদিনই বৈবাহিক সমীপে সুসংবাদ প্রেরণ করিয়া পুত্রবধূকে আনয়ন করিলেন। চিত্রবর্ম্মানন্দিনী সীমন্তিনী শিবসেবাফলে মৃতপতিকে পুনঃপ্রাপ্ত ও তৎসহ মিলিত হইয়া আনন্দসাগরে মগ্না হইলেন।

বৃদ্ধ রাজা বৈশ্যপতি রত্নাকরকেও পুত্রের উদ্বাহ সম্পাদনের আদেশ করায়, রত্নাকরও স্বীয় পুত্র পদ্মাকরের বিবাহ সম্পাদন করিলেন। কিয়দ্দিন পুত্র পুত্রবধূসহ সংসারসুখ সম্ভোগ ও

রাজ্যশাসন করিয়া রাজা ইন্দ্রসেন পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শিবারাধনায় মনোনিবেশ করতঃ অল্পদিন পরেই সংযমীদিগের গতি প্রাপ্ত হইলেন। বৈশ্যপতি রত্নাকরও অচিরকালমধ্যে বৃদ্ধরাজা ইন্দ্রসেনের অনুকরণ করিলেন।

চন্দ্রাঙ্গদ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া যথাকালে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সমাধা করিলেন এবং পতিপরায়ণা পত্নী সীমন্তিনী সহ পরমানন্দে রাজ্যপালনও করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী সীমন্তিনী মহেশ্বরের উপাসনায় রত থাকিয়া, পতিসেবা পুরঃসর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। যথাকালে তাঁহার কয়েকটী পুত্র ও একটী কন্যা হইল। কন্যার নাম কীর্ত্তিমালিনী রাখিলেন।

বৈশ্যরাজকুমার পদ্মাকর পিতার পরলোকান্তে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা মনোরমার সহিত মহাসুখে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। পদ্মাকর স্বীয় রাজধানীর প্রান্তভাগে একটী মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গুরুদেব মহাযোগী ঋষভদেবের দ্বারা "চন্দ্রশেখর"নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করাইলেন। তদীয় পত্নী মনোরমা প্রতিদিন শিবালয়ে গমন করিয়া স্বহস্তে মন্দির ও তৎপ্রাঙ্গণ মার্জ্জনা পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিতেন। শিবপ্রসাদাৎ যথাকালে তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রের জন্মোপলক্ষে পদ্মাকর ব্রাহ্মণ ও দীন-দুঃখীদিগকে প্রভূত ধনদান করিয়া মহোৎসব করিলেন। যথানিয়মে পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়া যথাকালে নামকরণ করিলেন। পুত্রের নাম সুনয় রক্ষা করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত সুনয় পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

একদা বৈশ্যরাজপত্নী মনোরমা শিবালয়ে গমন করিয়া, মন্দির ও তৎপ্রাঙ্গণাদি মার্জ্জনা করিয়া, যথা নিয়মে "চন্দ্রশেখরের" অর্চ্চনা করিলেন। শিবার্চ্চনা সমাধা করিয়া, মনোরমা মন্দির হইতে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমত সময়ে পূর্ব্বস্তবক বর্ণিত অবস্থায় দশার্ণ রাজমহিষী সুনীতিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(তৃতীয় স্তবক)

বৈশ্যপতি পদ্মাকর গুরুদেবের আদেশে দশার্ণ-রাজমহিষী সুনীতিকে ও তদীয় সুকুমার শিশুকে উপযুক্ত সম্মান সহকারে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহাযোগী ঋষভদেবের আশীর্ব্বাদে ভদ্রায়ু ভুবনমোহন রূপ প্রাপ্ত হইয়া বৈশ্যভবনে দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া, শোকাতুরা জননীর শোকাপনোদন পূর্ব্বক আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমান হইয়া, বৈশ্যকুমার সুনয়সহ বাল্যক্রীড়ায় শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়া, সকলের নয়নাভিরাম হইয়া উঠিলেন। বৈশ্যপতি পদ্মাকর স্বীয় পুত্র সুনয় ও সুমতীপুত্র ভদ্রায়ুর শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করিলেন। উভয় বালক সুশিক্ষালাভে দিন দিন সকলের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। একত্র শিক্ষা, একত্র ভ্রমণ ও একত্র ভোজ-নাদি জন্য উভয়ের পরস্পর বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিতে লাগিল। উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৈশ্যপতি স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ নিয়োগ করিয়া উভয় বালকের স্বস্ব বর্ণোচিত সংস্কার সম্পাদন করাইলেন।

উভয়ে যথাবিধি সংস্কৃত হইয়া স্বাধ্যায় নিরত ও গুরুশুশ্রূষা পরায়ণ হইলেন। পদ্মাকরের বর্ণোচিত বৃত্তি বাণিজ্যাদি হইলেও তিনি কার্য্যতঃ ক্ষাত্রধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। বৈশ্যরাজের রাজ্যপালন ও শাসন নিমিত্ত রাজকীয় ধর্ম্মানুসারে স্বরাজ্যমধ্যে দুর্গ, সেনানিবাস ও সর্ব্বপ্রকার সৈন্যসামন্ত ছিল। তিনি কুমারদ্বয়কে উপযুক্ত আচার্য্যের অধীনে রাজনীতি, যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার ভদ্রায়ু ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলে, একদা মহাযোগী ঋষভদেব বৈশ্যরাজপুরে সমাগত হইলেন। তাঁহার আগমন মাত্র পদ্মাকর পাদ্যার্ঘ্যদ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঋষভদেব অন্তঃপুরে গমন করিলে তদীয় আগমনবার্ত্তা শ্রবণে অগ্রসর হইয়া রাজ্ঞী সুনীতি পুত্রসহ তদন্তিকে আগমন করিয়া তাঁহার চরণোপান্তে পতিত হইয়া ভক্তিসহকারে চরণবন্দনা করিলেন।

যোগিবর হৃষ্টান্তঃকরণে মাতাপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, সস্নেহে ভদ্রায়ুমস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—বৎস! তোমার কুশল তো? তুমি তোমার মাতার প্রতি ভক্তিমান থাকিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন কর তো? তুমি যত্নসহকারে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গুরুসেবাপরায়ণ আছ তো? কুমার ভদ্রায়ু ভক্তি ও বিনয় সহকারে যোগিবরের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে, বিনয়ান্বিতা রাজ্ঞী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া, স্বীয়তনয়কে তাঁহার পাদমূলে স্থাপিত করিয়া, সভক্তিবিনয়বচনে বলিতে লাগিলেন—হে গুরো! ভদ্রায়ু আপনারই, যেহেতু আপনিই ইহার প্রাণ দাতা, আপনি এই অনাথ বালককে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। আপনি এই বন্ধুস্বজন পরিত্যক্ত বালককে প্রতিপালন করুন। আপনি সন্মার্গ উপদেশ প্রদান করিয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করুন। আপনি ভিন্ন এই অনাথিনী নন্দনের আর কেহ নাই।

মহামতি ঋষভদেব রাজ্ঞী কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে প্রসাদিত হইয়া, ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে উপবেশন করিয়া, যেন কিছু চিন্তা করিলেন; পরমুহূর্ত্তে আনন্দোৎফুল্ল স্বরে বলিলেন, "মা চিন্তা করিও না আমি ইহাকে সাধ্যানুসারে উপদেশ প্রদান করিতেছি। এইরূপ স্বীকার করিয়া, তিনি ভদ্রায়ুকে স্নান পূর্ব্বক শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। ভদ্রায়ু ক্ষণকাল মধ্যে স্নানান্তে শুচি হইয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া ঋষভদেবের পাদবন্দনা পূর্ব্বক তদন্তিকে উপবেশন করিলেন। ঋষভদেব ভদ্রায়ুকে আশীর্ব্বাদপুরঃসর বলিতে লাগিলেন "বৎস, শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বিশদরূপে বিস্তীর্ণভাবেই সনাতন ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ধর্ম্ম বর্ণাশ্রমানুক্রমে জনগণের সর্ব্বথা নিয়ত পালনীয়। বৎস! তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে সন্মার্গ ভজনা করিবে, সাধু চরিত অনুকরণ করিবে। দেবাজ্ঞা লঙ্ঘন ও দেবতার প্রতি কদাচ অবহেলা করিবে না। গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও গুরুর প্রতি সর্ব্বদা ভক্তিমান থাকিবে। সমাগত অতিথি চণ্ডাল হইলেও সযত্নে সর্ব্বথা তাঁহার সৎকার করিবে। প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইলেও, সত্য লঙ্ঘন করিবে না; কিন্তু গো ও ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার নিমিত্ত কদাচিৎ মিথ্যা বলায় দোষ হইবে না। পরধন, পরদ্রব্য ও পরস্ত্রী অতীব লোভনীয় হইলেও তৎপ্রতি কদাচ লোভ করিবে না। তুমি সর্ব্বদা সৎকথা, সদাচার, সদ্‌ব্রত, সদাগম ও ধর্ম্মসংগ্রহ সম্বন্ধে সর্ব্বথা যত্নবান

থাকিবে। হে অনব! তুমি স্নান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, গো দেব ও অতিথি পূজা সম্বন্ধে সর্ব্বদা নিরালস্য থাকিবে। ক্রোধ, দ্বেষ, ভয়, শাঠ্য, পৈশুন্য, অসৎসেবা, কৌটিল্য, দম্ভ ও উদ্বেগ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবে। তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসেবী হইলেও কদাচ বৃথা হিংসা করিবে না। শুষ্কবৈর, বৃথালাপ ও পরনিন্দা বর্জ্জনীয়। মৃগয়া, দ্যূত, পান, স্ত্রী, ব্যসন ও স্ত্রীবিজিত জনে আসক্ত হইবে না। অতিভোজন, অতি ক্রোধ, অতিনিদ্রা, অতিশ্রম, অত্যালাপ ও অতিক্রীড়া প্রভৃতি পরিহার পূর্ব্বক অতিবিদ্যা, অতিশ্রদ্ধা, অতিপুণ্য, অতি স্মৃতি, অত্যুৎসাহ, অতিখ্যাতি ও অতিধৈর্য্যসাধনে যত্নবান হইবে। তুমি স্বপত্নীতে সকাম, শত্রুর প্রতি সক্রোধ, পুণ্যার্জ্জনে লুব্ধ, ধার্ম্মিকে সদয়, অধার্ম্মিকে অসূয়া পরবশ, সজ্জনানুরাগী পাষণ্ড বিদ্বেষী, সুমন্ত্রণানুরাগী ও কুমন্ত্রণা পরিত্যাগী হইবে। খল, ধূর্ত্ত, চণ্ড, শঠ, ক্রূর, কিতব, চপল, কুটীল, পতিত ও নাস্তিক ব্যক্তিকে দূর হইতেই পরিহার করিবে। কদাচ আত্মপ্রশংসা শ্রবণে পুলকিত হইবে না। সর্ব্বদা সর্ব্বথা ইঙ্গিতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, আত্মরক্ষা-পরায়ণ ও অধ্যবসায়-শালী হইবে। সত্যবাদী চোরকে ও বিশ্বস্তকে বধ করিবে না। অপাপ কর্ত্তব্য সাধনে পশ্চাৎপদ বা ভীত হইবে না। অনাথ, বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, পঙ্গু ও নিরপরাধ শরণাপন্ন ব্যক্তিকে ধন, প্রাণ, বুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা রক্ষা করিবে। বধার্হ শত্রু শরণাগত হইলে অবধ্য। যাচকের উচ্চনীচত্ব ও কুলধর্ম্ম বিচার না করিয়াই প্রার্থনা পূরণে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম, পুণ্য, যশঃ ও কীর্ত্তি উপার্জ্জনে সর্ব্বথা যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। দৈবকে অবহেলা না করিয়াই পুরুষকার দ্বারা কার্য্যসাধনে তৎপর হইবে। পুরুষকার বিহীন দৈবকার্য্য, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ফলোপধায়ক নহে। দৈব ও পুরুষকার প্রায়শঃ তুল্য হইলেও পৌরুষ প্রত্যক্ষ ফলোৎপাদক এবং দৈব ফলসিদ্ধি দ্বারা নির্ণীতব্য বলিয়া, পুরুষকার দৈব অপেক্ষা উচ্চতর। কার্য্যারম্ভে কোন বিঘ্ন জন্মিলে সন্তপ্ত বা পশ্চাৎপদ না হইয়া, অধ্যবসায় অবলম্বনে কার্য্য সম্পাদনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। সত্যপরায়ণ, গুণবান, চরিত্রবান, বদান্য, শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বজন কল্যাণকারী, দেশহিতৈষী, নিরলস ও অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হয়েন না। কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানেই কর্ম্ম কর্ত্তব্য। নাতি মৃদু ও নাতি উগ্রভাবেই কার্য্য সম্পাদন কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা নমস্য ও সর্ব্বথা রক্ষণীয় হইলেও স্বধর্ম্মচ্যুত অত্যাচার পরায়ণ পাপীষ্ঠ ব্রাহ্মণ দণ্ডার্হ। বেদবেদান্ত পারগ ব্রাহ্মণকেও রণস্থলে শস্ত্র উদ্যত করিয়া, আগমন করিতে দেখিলে, তাঁহাকে প্রশমন কর্ত্তব্য। বিনাশোন্মুখ ধর্ম্ম সর্ব্বথা রক্ষণীয়। সর্ব্বদা উদ্যোগ ও ধৈর্য্যশীল হওয়া কর্ত্তব্য। ভৃত্যগণ সহ হাস্য পরিহাস কর্ত্তব্য নহে। যে সমস্ত কার্য্যে আয়ু, যশঃ, বল, সৌখ্য, ধন, পুণ্য ও প্রজাবৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। দেশ, কাল, শক্তি ও কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই, কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ভোজন ও নিদ্রায় দীর্ঘকাল ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নহে। দাক্ষিণ্যযুক্ত, সরল, সত্য, জনমনোহর ও অল্পাক্ষর অথচ অনন্তার্থ বাচক, সারগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিবে। সাধুজনের হিতোপদেশে, পুণ্যকথায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বিদ্যাগোষ্ঠীতে, কদাচ বীতস্পৃহ হইবে না। শুচি, পুণ্যতোয়, হ্রদ-নদাদি

সন্নিহিত, প্রখ্যাত, মঙ্গলময় ও ব্রাহ্মণ বহুল দেশেই বাস করা কর্ত্তব্য। একমাত্র ত্রিভুবনেশ্বর মহেশ্বরের উপাসনারত হইলেও অন্য দেবে দ্বেষ বা অভক্তি করিবে না। নির্দ্দিষ্ট দিনে সকল দেবতাকেই তুল্য ভক্তিতে পূজা করিবে। হে অনঘ! সর্ব্বদা শুচি, দক্ষ, শান্ত, স্থির, বিজিত-ষড়্‌বর্গ ও ঐকান্তিক হইবে। বেদবিৎ, শান্তমতি, নিয়তোজ্জ্বল বিপ্র, পুণ্যবৃক্ষ, পুণ্যনদী, পুণ্যতীর্থ, মহোৎসব, ধেনু, বৃষভ, রত্ন, কুমারী, যুবতী, ধর্ম্মপরায়ণা রমণী, পতিব্রতা ও আপনার গৃহদেবতাদিগকে নমস্কার করিবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিমলাশয় হইয়া আচমন পূর্ব্বক গুরুকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিবে।

পরে প্রাণায়াম পূর্ব্বক উমাপতির ধ্যান করিয়া নারায়ণ, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিনায়ক, স্কন্দ, কাত্যায়নী, মহালক্ষ্মী, ইন্দ্রাদিলোকপাল, ঋষিগণ ও উদিত আদিত্যকে চিন্তা করিয়া প্রণাম করিবে। সমস্ত ভক্ষ্যভোজ্য ও ভোগ্য উমাপতিকে দান করিয়া উপভোগ করিবে। স্নান, দান, জপ, হোম ও ধ্যান প্রভৃতি কর্ম্মনিচয় শিবচরণে অর্পণ করিবে। সর্ব্বাবস্থায় শিব-স্মরণ করিবে। শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বিনায়ক প্রভৃতি দেবগণকে ও উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণকে অভেদ চিন্তা করিবে। হে বৎস, তুমি মৎপ্রদত্ত এই ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-বর্ণিত শাশ্বত ধর্ম্মোপদেশানুসারেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। কদাচ ধর্ম্মশাস্ত্র নিষিদ্ধকার্য্যে অভিলাষ পর্য্যন্ত করিবে না। তাহা হইলেই তুমি সংসারে পরম সুখে জীবন যাপন করিয়া অন্তে পরম পদ লাভ করিবে। আমি তোমাকে যে সমস্ত ধর্ম্মোপদেশ বলিলাম এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে বহু শিক্ষণীয় উপদেশ আছে, সময়ানুসারে ঐসমস্তও বিশিষ্ট জ্ঞানীর নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিবে। ধর্ম্মযুক্ত জীবনই জীবন, আর ধর্ম্মশূন্য জীবন পশু জীবন অপেক্ষা ও হেয়। এই সমস্ত বিবেচনা পূর্ব্বক, সর্ব্বদা সর্ব্বথা ধর্ম্মপথে বিচরণ করিবে। অধুনা আমি তোমাকে এক পরম গুহ্য, সর্ব্বপাপনাশক ও সর্ব্ববিপন্নাশক, পবিত্র ও জয়প্রদ শিবকবচ প্রদান করিতেছি। তুমি শুচি হইয়া এই অমোঘ কবচ ধারণ করিবে ও প্রতিদিন এই কবচ পাঠ করিবে। যে ব্যক্তি এই অমোঘ কবচ ধারণ করে, তাহাকে কোন প্রকারের বিপদ ব্যাধি ও শত্রু আক্রমণ করিতে পারে না। সে সর্ব্বত্র বিজয়ী ও দীর্ঘায়ু হইয়া, দেহান্তে শিবলোক প্রাপ্ত হয়।"

এই সমস্ত উপদেশ ও যথাবিধানে শিবকবচ প্রদান করিয়া, মহাযোগী ভদ্রায়ুকে এক অপূর্ব্ব মহারাব শঙ্খ ও একখানি শিবাভিমন্ত্রিত অরিনিসূদন অমোঘ তীক্ষ্ণধার খড়্গ প্রদান করিয়া বলিলেন। "হে বৎস! আমি তোমাকে যে, সুলক্ষণাক্রান্ত শৈব শঙ্খ প্রদান করিলাম, ইহা দেবদুর্ল্লভ, ইহার ঘোর গভীর আরাব শ্রবণে, শত্রুগণ মূর্চ্ছিত ও ভীত হইয়া, পলায়ণ করে এবং স্বসৈন্য ও স্বপক্ষীয়গণ উৎসাহিত হইয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়। এই খড়্গও সামান্য নহে, এই খড়্গ তপোমন্ত্র-প্রভাবসমুৎপন্ন। এই শত্রু-মৃত্যুস্বরূপ খড়্গ দর্শনমাত্র বিপক্ষ ভীত ত্রস্ত হইয়া পলায়ণপর হয়। ইহা সকল প্রকার অস্ত্রেরই অচ্ছেদ্য; এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা ইহার আঘাতে অচ্ছিন্ন থাকে। ইহার প্রহারে ইহার দৈর্ঘ্যানুযায়ী

আয়তন বিশিষ্ট কঠিনতম লৌহস্তম্ভ পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়। হে মহাবাহো! তুমি এই দেবদুর্ল্লভ শঙ্খ ও খড়্গ প্রভাবে তোমার জীবনে পরাভব ক্লেশ পাইবে না। ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিজয়প্রদ। তুমি মহারুদ্র মহেশ্বর প্রসাদাৎ মন্নিয়োগবশতঃ অদ্যই ছয়সহস্র রণনাতঙ্গ, ছয়সহস্র সুলক্ষণাক্রান্ত রণবাজি ও এতদ্দ্বিগুণিত সুশিক্ষিত রণদুর্ম্মদ সর্ব্ববিধ সৈন্য পাইবে। হে শিবকিঙ্কর! তুমি মহারুদ্রের প্রসাদাৎ আমার আশীর্ব্বাদ বলে অচিরকালমধ্যে জনককর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া, সসম্মানে পিতৃসিংহাসন লাভ করিবে এবং সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে। তুমি অচিরকালমধ্যে শিবপ্রসাদে মন্নিয়োগ বলে ত্রিভুবনললনামভূতা পরমরমণীয়া শিবপরায়ণা পত্নী লাভ করিবে।

তুমি সর্ব্বদা তোমার বিপদবন্ধু আশ্রয়দাতা বৈশ্যরাজকে পিতৃবৎ ভক্তি ও সম্মান করিবে। তদীয় তনয় তোমার বাল্যসখা ও সুহৃদ, তাহাকে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ পরিগণিত করিয়া তোমার প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করিবে। তাহাকে সর্ব্বদা অভিন্নহৃদয় ও বিশ্বস্তবন্ধু জ্ঞান করিবে। আমার আশীর্ব্বাদ বলে, কুমার সুনয় কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায়, তোমার আজ্ঞাপালন পূর্ব্বক, পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, আজীবন বিশ্বস্ত সখারূপে তোমার সেবা করিবেন। তোমার বিবাহকালও সন্নিকট, যেখানেই যেদিন তোমার পরিণয় হইবে আমি স্বেচ্ছাবশতঃ সেখানেই সে দিন উপস্থিত থাকিব।" এইরূপ বলিয়া মহাযোগী ঋষভদেব সপুত্রা রাজ্ঞী সুনীতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সপুত্রারাজ্ঞী সুনীতি ও সদারাপত্য বৈশ্যপতি ভক্তিসহকারে তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তিনি ও তদনন্তর যথেচ্ছা গমন করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা।*

একটা কথা আছে যে, যে সত্য আবহমানকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহারও সত্যতা আবার মধ্যে মধ্যে লোকের নিকট প্রতিপন্ন করিতে হয়। যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বাস্তবিক, তাহা যে বাস্তবিক একথাও মাঝে মাঝে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হয়। নচেৎ কালবশে সত্যের সত্যতা সম্বন্ধে, বাস্তবিকের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে, লোকে সন্দিহান হইয়া পড়ে। যতদিন লোকে আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, সেইবাক্য নিঃসন্দিহান হইয়া নিঃসঙ্কোচে প্রতিপালন করিয়া

---

* মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে পঠিত।
—লেখক

আসিতে থাকে, ততদিন কোন কথাই উঠে না। কিন্তু চিরাগত আপ্তবাক্যের সহিত যখন নূতন অন্য এক প্রণালীর আপ্তবাক্যের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন সেই ঘাতপ্রতিঘাতের সময় লোকের মনে পুরাতনের প্রতি সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। পুরাতনের যাচিয়া ঘসিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। তখনই বিচারের সময় উপস্থিত হয়। আমরা হিন্দুগণ এখন এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি।

জাতিগত বিশুদ্ধি রক্ষা করা উচিত কি না, একথা বহুকাল যাবৎ এদেশে কেহও উত্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। যদিও এদেশে এখনও এমন অনেক জাতি আছে যাহাদিগের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই; যদিচ অদ্যাপি এদেশে মালাবার প্রদেশীয় নায়েরগণের মধ্যে, অযোধ্যা প্রদেশের তিপুরগণের মধ্যে, মাদুরা প্রদেশের কল্লন ও কম্বুবনগণের মধ্যে, নীলগিরি প্রদেশীয় টোডাগণের মধ্যে, আসামের কোন কোন প্রদেশে, দম্পাতিযুগলের যৌন সম্বন্ধ স্বল্পকালস্থায়ী ও ইচ্ছাধীন মাত্র; যদিও তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা এককালে বহুপতি সেবা করিলে নিন্দনীয় হয় না; যদিও এরূপ আচার-ব্যবহার লইয়া তাহারা সমাজ-বন্ধন রক্ষাপূর্ব্বক অদ্যাপি ইহলোকে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বাহির হইতে দেখিলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে, এমন কি বিদ্যা ও সুশিক্ষা লাভকরতঃ ইচ্ছামত অনেকটা স্বাধীনতা আশ্রয় করিয়া কালযাপন করিতেছে; কিন্তু তাহা হইলেও আর্য্যগণ তাহাদের সমাজ-প্রথা এতই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন যে, তাহাদের বিবাহ-পদ্ধতির সহিত আর্য্য-জাতির বিবাহ-পদ্ধতির সহিত তুলনা করাও পুরাতন আর্য্যগণ উচিত বিবেচনা করেন নাই। এমন কি বহুল নিয়মাদির পেষণে প্রপীড়িত আর্য্যজাতি এ পর্য্যন্ত ঐ সকল জাতির সামাজিক-প্রথা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সেগুলি ভাল কি মন্দ প্রশ্নও উত্থাপন করেন নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঐ সকল জাতি অনার্য্য-জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরন্তু অনার্য্য-জাতি হইলেও তাহারা ভারত-বর্ষের আর্য্য-জাতির সহিত পাশাপাশি ভাবে বহুকাল ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতদিনের সাহচর্য্য সত্ত্বেও তাহাদিগের দাম্পত্য আচার-ব্যবহার আর্য্য-জাতির বিবাহ-পদ্ধতি ও যৌন সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণেও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ইহা হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি? যদ্যপি অনার্য্য জাতি সমূহের মধ্যে প্রচলিত যৌন সম্বন্ধ সম্পর্কীয় আচার ব্যবহারে ব্যক্তিগত বা সমাজগত উৎকর্ষ সাধনোপযোগী এমন কিছু বিশেষত্ব থাকিত, যাহাতে পারিপার্শ্বিকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিত, বা যাহা অপরের অনু-করণীয় বলিয়া মনে হইত, তাহা হইলে এতদিনের সংঘাত ও সংস্পর্শে তাহার কিছুমাত্রও কি আর্য্যসমাজে সংক্রামিত হইত না? পরন্তু আমরা দেখিতে পাইতে পাই যে বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যসমাজের যৌন প্রথা সম্বন্ধে যে কিছু শৈথিল্য মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়াছে, তাহাও কালক্রমে অপসারিত হইয়া প্রচলিত বিবাহ সম্বন্ধ ক্রমশঃ দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্বেতকেতুর উপাখ্যান আপনারা সকলেই জানেন। শ্বেতকেতুর কিম্বদন্তীতে যেরূপ স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে শাস্ত্রকারেরা তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য বলিয়াই উপদেশ দিয়াছেন। ঐরূপ

আচার সমাজের মঙ্গলকর হইতে পারে না, ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্ম বিবাহপ্রথা আর্য্যসমাজে দৃঢ়তরভাবে পরিচালিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই যে অনার্য্য সমাজের সমাজিক রীতি নীতি ও ব্যবহারের মধ্যে এমন কিছু অভাব আছে, যাহার জন্য আর্য্যজাতির নিকট অনার্য্যদিগকে প্রতিপদে পরাজিত হইয়া আসিতে হইয়াছে। এমন কি অনেক অনার্য্য-জাতিকে ক্রমে ক্রমে আর্য্য-জাতির ব্যবহার ও আচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আসিতে হইয়াছে। মালাবার দেশের যে বিবাহ-আইন তদ্দেশস্থ শিক্ষিত লোকের অনুরোধে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৯৬ সালে লিপিবদ্ধ করা হয়, তদ্দারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আর্য্য-জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-প্রথা অনার্য্য-জাতিগণের বিবাহ বা যৌন সম্বন্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং অনার্য্যদিগের মতানুসারে তাহাদিগের পক্ষে অনুকরণীয়। এই আইন প্রচার হইবার ফল এই হইয়াছে যে, মালাবার ও কানারা প্রদেশীয় লোকগণ যাঁহাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না তাহারা ইচ্ছা করিলে এক্ষণে বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে ঐতিহাসিক প্রণালীতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্য-জাতির মধ্যে এমন একটা সমাজ ব্যবহার ও চরিত্রগত উৎকর্ষ ছিল ও আছে যদ্দারা তাঁহারা স্বয়ং প্রতিষ্ঠা লাভ ও চতুঃপার্শ্বস্থিত অনার্য্যগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তবে আধুনিকগণের মধ্যে হয় ত অনেকে একথা স্বীকার করেন না যে আর্য্যদিগের উৎকর্ষ তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল-স্বরূপ। তাঁহারা বলিবেন যে, আর্য্যদিগের বাহুতে হয় ত অধিক বল ছিল, হয় ত সেজন্য তাঁহারা অনার্য্য-দিগকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। তবে বহুকাল এদেশে বাস করিয়া এবং সমানভাবে অনার্য্য-দিগের সহিত এদেশের জল বায়ুর অত্যাচার সহ্য করিয়া ও ক্রমশঃ হীনবল হইয়াও আর্য্যগণ তাঁহাদিগের আধিপত্য ও প্রভাব অনার্য্যদিগের উপর এতদিন যাবৎ চালাইয়া আসিয়াছিল কেন, তাহার সদুত্তর প্রদান করিতে হইলে আর্য্যদিগের নৈতিক ও ব্যবহারিক উৎকর্ষের দোহাই না দিলে চলে না।

আমি অদ্য যে কথা বলিবার জন্য সভ্যমহোদয়গণের নিকট দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহা আলোচনা করিবার প্রয়াসের সহিত আমার মনে নানা বিভীষিকার উদয় হইতেছে। অনেকের মতে আজকালের দিনে ইংরাজি শিক্ষিতগণের পক্ষে পুরাতনের রক্ষণ চেষ্টা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। বাস্তবিকই সেদিন আমি বাঙ্গালার কোনও মাসিক পত্রিকায় পড়িলাম যে প্রবন্ধ লেখকের মতে—"যাহাতে সামাজিক প্রসার না বাড়ে, অভিজ্ঞতা না বাড়ে, নিজে নিজে পথ চলিবার ক্ষমতা না বাড়ে, অর্থাৎ যাহাতে যথার্থ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়, প্রচলিত রকমের প্রাচীনের ধুয়ায় তাহাই ঘটিতেছে। এত ক্ষুদ্র অসার উপহাসাস্পদ ও সমাজক্ষয়কর বিষয় লইয়া যাঁহারা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ) পাণ্ডিত্য করেন, তাঁহাদের শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা হওয়াই স্বাভাবিক। সামাজিক প্রসারের পথ রোধ করিয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থকে পরার্থপরতায় বাড়াইবার উপায় নষ্ট করিয়া অর্থাৎ যথার্থ ধর্ম্মকে পায়ে দলিয়া যাঁহারা আধ্যাত্মিকতা খুঁজিতে-

ছেন, তাঁহারা প্রতারিত। শুদ্ধ আচারের নামে পৃথিবী শুদ্ধ লোককে না ছুঁইয়া, যাঁহারা জাত শরীরটাকে ব্রহ্ম-সান্নিধ্যের উপযোগী করিতেছেন, তাঁহাদের মুক্তি নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি"।

উপরোক্ত তাড়নার মধ্যে যে সকল কথা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে বাস্তবিকই কতকটা সত্য। কিন্তু কিয়দংশ সত্য হইলেও তাহার সহিত অনেক অসত্য ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে, এবং অনেক সত্যকথা লেখকের জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ উহ্য রহিয়া গিয়াছে। লেখক তাঁহার প্রবন্ধে স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, অখাদ্য ভোজন করা হিন্দুমতে শারীরিক পীড়াদায়ক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, শারীরিক পীড়াদায়ক হইলে অখাদ্য খাইয়া কোন হিন্দু জাতি হারাইবে কেন? তাঁহার পেটের পীড়া বা অন্য কোনও রোগ হওয়া সম্ভাবনা। ঐরূপ লেখকগণের মতে সামাজিক প্রসারের গূঢ় অর্থ টেবিলের উপর শুভ্র বস্ত্রাবরণ ও তদুপরি সুসজ্জিত ইংরাজি ধরণের নানাবিধ পান ভোজনাধার ও আহার্য্য এবং চতুর্দ্দিকে উদরপূরণ কর্ম্মকুশল নানা বেশ ও ভেকধারী সংস্কারকবৃন্দ। তাঁহাদিগের মতে কেবল ঐরূপ উদার মতাবলম্বিগণের দ্বারা অতি সহজ উপায়ে নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থকে পরার্থপরতায় পরিণত করা যাইতে পারে। ঐ জাতীয় লেখক ও বক্তাগণ ঐরূপ কতশত প্রকারের যথার্থ ধর্ম্ম সংস্থাপনের সদুপায় প্রদর্শন করাইবার জন্য স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত। আধুনিক কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে কত সত্বর, কতদূর সহজ উপায়ে ও কিরূপ সহাস্য বদনে কোমল মতি শিশুগণ বাহ্য বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে পারে। অতএব মুমুক্ষগণ আধ্যাত্মিকতা লাভের এমন সহজ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বাতুলের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাচীন প্রথানুসারে যোগাভ্যাসের দুর্গম পন্থা কেন গ্রহণ করিবে? তাঁহাদিগের এরূপ করিতে যাওয়া যথার্থ ধর্ম্মকে পদদলিত করা। ধ্যান ধারণার চেষ্টা করা, আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া। কর্ম্মবীরই প্রকৃত ধর্ম্মবীর। অতএব নিশ্চেষ্ট হইয়া ধ্যান করা জড়প্রকৃতির লক্ষণ। তাহাতে জগতের কোনও উপকার হয় না। অতএব ঐরূপ দূষিত মার্গানুসরণ করিয়া সময় নষ্ট করা একেবারেই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য। ইত্যাদি ইত্যাদি—

ঐ জাতীয় লেখকগণের মধ্যেই আবার কেহ কেহ সময় বুঝিয়া জাতীয়তার আস্ফালন করিবেন। বলিবেন যে আর্য্য-জাতি এবং তাহার অন্তর্গত হিন্দুজাতি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। কেন যে শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল বা আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত মস্তক কণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইবেন। তবে তাঁহাদের মনের অন্তঃস্থলে হয় ত এইরূপ একটা কুজ্ঝটিকাময় অথচ নিতান্ত সহজ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, হিন্দুজাতি পূর্ব্বে বড় ছিল এবং এখনও কতকটা আছে, কারণ অহং সেই জাতির অন্তর্ভূত। কিন্তু সমাজের লাভালাভ বা হিতাহিত বিবেচনা করিতে যাইলে কেবল নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষানুরূপ সুবিধা বা অসুবিধার উপর দৃষ্টি রাখিয়া মতামত প্রকাশ করিলে চলিবে না। আমাদের বিচার শক্তি এতদূর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, আমরা বহুদর্শিতাকে—বিজ্ঞতাকে এতদূর অসম্মান করিতে শিখিয়াছি যে, আমরা অনেক সময়ে আপনাকেই সমাজ বলিয়া মনে করি। অল্প সংখ্যক ইংরাজিশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিতগণের

গণ্ডীর বাহিরে যে লক্ষ লক্ষ লোক পুরাতন প্রথার অনুসরণে জীবনযাপন করিতেছে তাহা আমাদের অনেক সময় স্মৃতিগোচর হয় না। ইংরাজি শিক্ষিতগণ বিশ্বজগৎকে যেরূপভাবে দেখেন, তাঁহারা যে আদর্শানুসরণ করিয়া নিজ নিজ সুখ দুঃখের পরিমাণ উপলব্ধি করেন, যে পন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিরূপণ করেন, সেই সমস্ত ঠিক যে সেই ভাবেই ইংরাজিতে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বুঝিবেন না ও বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন না, ইহা তাঁহারা অনেক সময়ে ভুলিয়া যান। এবং মনে পড়িলেও তাঁহাদিগকেও অজ্ঞ ও অশিক্ষিতের গাদায় ফেলিয়া আবর্জ্জনার ন্যায় নগণ্য মনে করিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েন। আমরা মুখে বলি যে আমরা খুব উদার কিন্তু কার্য্যস্থলে এবং হৃদয়ের নিভৃত কোণে আমরা অনেক সময় বড়ই সঙ্কীর্ণমনা। ইংরাজিতে যাহাকে Civic consciousness অর্থাৎ সামাজিক হৃদয় বলা হয় আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। আমরা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিলেও আমাদের হৃদয় বাস্তবিকই প্রসারিত হয় নাই। সমাজ বলিতে আমরা অনেক সময়ে কেবল স্বয়ং ও নিজ নিজ পরিবারবর্গ, পার্শ্বানুচর ও বন্ধুবর্গের গণ্ডীকেই ধারণার মধ্যে আনিয়া ফেলি। সমাজের হিতাহিত চিন্তা করিতে যাইয়া যাঁহারা এরূপ নিতান্ত খণ্ডভাবে চিন্তা করেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে সমাজ-সমস্যা সম্বন্ধে সদুত্তর পাওয়া একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা সমাজ-সমস্যা পূরণ করিবেন তাঁহাদের হৃদয় এত উদার হওয়া আবশ্যক যে, তাঁহারা যেন যে কোন শিক্ষিত, উচ্চনীচ আপামর সাধারণ সকলেরই আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, ভাব ও চিন্তা স্রোত অনেকটা নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়া সেইরূপ ভাবে আর কতকটা অনুপ্রাণিত হইতে পারেন।

সমাজ চিন্তা কিন্তু কেবল মাত্র সহানুভূতির উপর নির্ভর করে না। সমস্ত সমাজের ভাবী মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, এবং কোন্ বস্তুটিকে ব্যক্তিগত ও সমাজ-গত মঙ্গলের কারণ বলিয়া স্বীকার করিব একথারও নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু এই সকল কথা লইয়াই মূল বিবাদ। এই সকল কথা লইয়াই তর্ক। কিন্তু একথা তর্ক সমাকুল হইলেও, আমরা অনেক সময় নিজ নিজ প্রবৃত্তি বা taste কে প্রাধান্য দান করিয়া এবং অপরের উপর তাহা তর্ক সমন্বিত করিয়া এইভাবে চালাইতে চাই যে, আমাদের যাহা করিতে ভাল লাগে তাহা নিশ্চয়ই অপরের গ্রাহ্য এবং সমাজের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর। তাঁহাদের মতে প্রবীণ শাস্ত্রকারেরা "সেকেলে-লোক," তাঁহাদের কথা 'সেকেলে' অজ্ঞলোকেরা মানিয়া চলিয়াছিল, তাই বলিয়া আমাদের মানিবার প্রয়োজন নাই। এখন আমরা একটা world force এর অর্থাৎ বাহিরের একটা প্রবল বিশ্বব্যাপী সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। সেই প্রভাবস্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া চলা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু তদবস্থাপন্ন হইয়াও মধ্যে মধ্যে আমরা আবশ্যক মত আস্ফালন করিয়া বলিব যে, আমরা আর্য্যজাতি, অতি বড় ছিলাম, এখনও কতকটা আছি। এই কথা বলিলেই আমাদের national self realization হইবে অর্থাৎ আমাদিগের জাতিগত আত্মানুভূতি প্রসার লাভ করিবে এবং

আমরাও তদুপায়ে জীবন সার্থক করিয়া লইব। অন্য বিশেষ কিছু চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা এইরূপ চিন্তা সাহায্যে সমাজ সমস্যা পূরণ করিবার প্রয়াস পান, বলা বাহুল্য যে তাঁহাদিগের কার্য্য বা চিন্তা প্রণালীর সহিত ব্রাহ্মণ-সমাজের কার্য্য ও চিন্তাপ্রণালীর কোনও সৌসাদৃশ্য নাই।

সমাজের নিয়তি সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছাধীন। কিন্তু যেরূপ কোনও ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির ফলাফল সেই ব্যক্তি এবং তাঁহার সন্ততিবর্গকে ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ কোনও সমাজের সামাজিকগণের সামাজিক প্রবৃত্তির ফলাফলও সমস্ত সমাজের উপর আসিয়া পড়ে। যেমন পিতার হস্তে পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গল অমঙ্গল অনেকাংশে নির্ভর করে, যেমন পিতা পুত্রকে শাস্ত্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না করিয়া কাঠের বা পাটের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিতে পারেন, তদ্রূপ সামাজিকগণও সমাজকে অল্পেঅল্পে ধর্ম্মের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কেবল মাত্র লাভের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে লইয়া যাইতে পারেন। তাহাতে ধর্ম্ম থাকুক বা না থাকুক।

পুরাতন হিন্দু সভ্যতা ও আধুনিক ইয়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে এই খানেই মৌলিক প্রভেদ। যেমন রাম রাজ্যে ও রাবণের রাজ্যে প্রভেদ। এক রাজ্যে সাত্ত্বিক ভাবের স্ফুরণ। অপর রাজ্যে রাজসিক ও তামসিক ভাবের স্ফুরণ। বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় বিরাট যুদ্ধ দ্বারা ইহা অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণির দর্শন-শাস্ত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে—জার্ম্মাণি সভ্যতায় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যাহা লুক্কায়িত ছিল তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আত্মহারা হইয়া ইয়ুরোপীয় সভ্যতা-স্রোতে "গা ভাসান" দিলে আমরাও অল্পকাল মধ্যে ঐ নৈতিক হীন-দশা প্রাপ্ত হইব। বরঞ্চ আমাদিগের যৎকিঞ্চিৎ নৈতিক-বল যাহা এখনও আছে তাহাও হারাইয়া ফেলিব এবং তৎপরে সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া আমাদিগকে পশুবৎ জীবনযাপন করিতে হইবে। সমাজ সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয়গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জার্ম্মাণির ন্যায় ঐশ্বর্য্য ও প্রাধান্য লাভ করা আমাদের কস্মিন্‌কালেও হইবে না। আমাদের প্যাজ পয়জার উভয়ই হইবে।

জাতিগত পবিত্রতা রক্ষার ঔচিত্য সম্বন্ধে বিচার কতকটা প্রবৃত্তি সাপেক্ষ এবং কতকটা হিতাহিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এই হিতাহিত জ্ঞানের কথা উত্থাপিত হইলেই আমাদিগকে—অনুকরণীয় আদর্শ কি সে কথা উঠাইতে হয়। জাতীয় ভাবে ধরিতে গেলে আমরা শীতপ্রধান দেশীয় লোকগণের মত দেহবল আপাততঃ বোধ করি বহুকাল যাবৎ পাইব না। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে অনুশীলন বলে উহা কতক পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিবে, কিন্তু তত্রাপি এদেশের জল বায়ুর ফলে আমাদের তত্তুল্য বা ততোধিক না হওয়াই সম্ভব। সুতরাং আমাদিগের প্রধান সম্বল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল। এই দুই বল আমাদিগকে অধিক পরিমাণে এবং দৃঢ়তর ভাবে রক্ষা করিতেই হইবে বরং তাহা সমধিক বর্দ্ধিত করিবার প্রয়াসেও যত্নবান্ হইতে হইবে। এরূপ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রবল ধর্ম্মানুষ্ঠান অটুট রাখিতে হইবে। পরকাল সম্বন্ধে

আস্থাহীন হইলে চলিবে না। আত্মার অমরত্ব ও জন্মান্তর বাদে আমাদিগের বিশ্বাস অটুট রাখিতে হইবে। সামাজিক প্রথা সকল এরূপ ভাবে বজায় রাখিতে হইবে, যাহাতে সেই গুলি আমাদিগের ধর্ম্মাচরণের ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রকৃত সহায়ক হইয়া থাকে, যেন সেগুলি আমাদিগকে নাস্তিক ও অধার্ম্মিক করিয়া না তুলে। আমাদিগের সামাজিক প্রথা ও আচার ব্যবহারাদি ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় কেবলমাত্র ঐহিক সুখ সমৃদ্ধির পরিপোষক করিয়া রাখিলে চলিবে না। অগ্রে সুখ, সমৃদ্ধি, প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য এবং তৎপর ধর্ম্ম বা অন্য কিছু এরূপ ধারণা মনে স্থান দিয়া সংসার ও সমাজযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে আমাদিগের জাতীয় বিশেষত্বের শীঘ্রই লোপ পাইবে।

চিত্তশুদ্ধির প্রধান সহায়ক সংযম ও আচারকে প্রাধান্য প্রদান করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি জাতিগত সংস্কার ও প্রবৃত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। এই কালে যতদূর সম্ভব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আমরা অন্যান্য বর্ণের কথা রাখিয়া আপাততঃ ব্রাহ্মণের আশ্রমধর্ম্ম জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, ও অধ্যাপনাই ব্রাহ্মণের প্রকৃত ব্যবসা। কিন্তু এই সমস্তই ধর্ম্মমূলক। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সমগ্র সমাজকে ধর্ম্মপ্রাণ করিবার জন্যই আমাদিগের সামাজিক ব্যবস্থা। সুতরাং ব্রাহ্মণকে বিশেষ ভাবে ধর্ম্মপ্রাণ হইবার জন্য কত অধিক চেষ্টা করা আবশ্যক? ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি ত জন্মলাভ করিবার পর। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই আমরা যে সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করি তাহার কি হইল? সে সংস্কার ত অনুশীলনের দ্বারা পাওয়া যাইবে না। বীজ ভাল না হইলে শস্য ভাল হইবে কেন? ইয়ুরোপে ও অন্যান্য দেশে অশ্ব, গো ইত্যাদি গৃহপালিত পশুগণের উন্নতিসাধন জন্য ভাল পিতা, ভাল মাতা একত্র সংগ্রহ করা হয়। মানুষের পক্ষে কি সে নিয়মও খাটিবে না? আজকাল ইয়ুরোপে Eugenics এর অর্থাৎ সুসন্ততি উৎপাদনের উপায় বলিয়া অনুসন্ধিৎসা আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় গ্রন্থে পড়িয়াছি যে ইয়ুরোপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, যদি কোনও উচ্চবংশীয়া গাভীতে নিকৃষ্ট বংশীয় বৃষকর্ত্তৃক সন্তান উৎপন্ন করা হয়—তাহা হইলে উৎপন্ন বৎস ত অতি নিকৃষ্ট হয়ই, কিন্তু তদ্দ্বারা গাভীর জরায়ুতে এরূপ দোষ জন্মায় যে তৎপরে সেই গাভীতে উৎকৃষ্ট বৃষের দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করাইলেও এমন কি পর পর দুই তিনবার পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট জাতীয় বৎস প্রসূত হয়। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াও কি আমরা আমাদের শাস্ত্রোল্লিখিত অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধাদিতে সন্দিহান হইব? জাতিগত বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব না?

হিন্দুজাতি heredity অর্থাৎ বংশ পরম্পরাগত দোষগুণের অস্তিত্বে একান্ত বিশ্বাস করেন। এ বিশ্বাস যে ইয়ুরোপে নাই তাহা নহে। কিন্তু ইয়ুরোপীয়গণ অনেকস্থলে এই বিশ্বাস তাঁহাদের গৃহপালিত পশুর উপর কার্য্যে পরিণত করেন। মানুষের উপর যৎসামান্য মাত্র। হিন্দুগণ এই তথ্য পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ পিতার বংশে যাহাতে ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান জন্মলাভ করিতে পারে, বীরক্ষত্রিয়ের যাহাতে বীরসন্তান লাভ হয় ও অন্যান্য বর্ণেও যাহাতে

বংশোচিত সংস্কার লইয়া সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই জাতি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা-প্রসূত মনে করিয়া আমরা তাহাতে আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছি ত বটেই, বরং আমরা স্বয়ং এইরূপ মনে করিতেছি ও ইয়ুরোপীয়গণ আমাদিগকে বারম্বার মনে করাইয়া দিতেছেন যে, এই জাতিবিভাগ আমাদিগের অধঃপতনের মূল কারণ।" লোকে অভ্যাসের দোষে যে কয়দিন পারে এই বর্ণবিভাগের গণ্ডীর মধ্যে আদানপ্রদান করুক। কিন্তু যত শীঘ্র এই বর্ণবিভাগ উঠিয়া যায় ততই ভাল।

ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে তাহা কে বলিবে? আধুনিক শিক্ষাপ্রভাবে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পরিণাম কি হইবে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই তাহা জানেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের কর্তব্য সম্বন্ধে কাহারও কোন দ্বিধা হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের প্রকৃত মার্গ নিবৃত্তির মার্গ। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, স্বয়ং দারিদ্র্য আশ্রয় করিয়া অপরের প্রাণের ধর্ম্মাচরণাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করা, কায়মনোবাক্যে পরোপকার করা ও পরহিত চিন্তা করা। অন্যান্য বর্ণের লোকগণ কালবশে ব্রাহ্মণের প্রতি আস্থাহীন হইলেও ব্রাহ্মণের কখনও স্বধর্ম্মচ্যুত হওয়া উচিত নহে। যে সকল বিষয়ী-ব্রাহ্মণ অর্থোপার্জ্জনে রত থাকিবেন, আপৎকালে অন্য কেহ প্রতিপালন না করিলে তাঁহারাই শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের প্রতিপালক হইবেন। ব্রহ্মাগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া থাকিলেও কোন না কোনও দিন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। যদি ব্রহ্মাগ্নিকে রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণজাতির পবিত্রতা রক্ষা না করিলে এই মহান উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হইবে না। আজকাল ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, সমগ্র ব্রাহ্মণজাতির সকলেই আশানুরূপ 'আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিয়া কেবল মাত্র ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দিন যাপন করিবে। যে সময় ভারতবর্ষে হিন্দুগণ একাধিপত্য করিয়াছেন, সে সময়েও সেরূপ হয় নাই বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য মতাদি—বিশেষতঃ ইয়ুরোপীয় মত ও শিক্ষা ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং এ সময়ে ত সমগ্র ব্রাহ্মণ-জাতির সকলেই যে কেবল যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বৃত্তি অবলম্বন করিবে, কোনও মতে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। তবে জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিলে এই হইবে যে, সমগ্র ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে অন্ততঃ এক অংশ, বংশ পরম্পরা ক্রমে নীতি, ধর্ম্ম, ত্যাগ, ও সংযমের অভ্যাসে যত্নশীল হইবে। এবং তাঁহাদের এরূপ অভ্যাস দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ অনেক পরিমাণে পরিরক্ষিত হইবে; যে উদ্ভাসিত জ্ঞানালোকে হিন্দুগণ সমাজের সকল স্তরেই আধ্যাত্মিকতা প্রবেশ করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞানালোক নির্ব্বাপিত হইতে পারিবে না। আধুনিক জড়বাদের অন্ধকারের মধ্যেও তাহার বিমল কিরণ আকুল পথিককে পথ প্রদর্শন করাইবে। আবার যখন কালের গতি ফিরিবে সেই আলোক প্রজ্জ্বলিত হুতাশন আকারে জগতের পাপ তাপ ভস্মীভূত করিবে।

ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের বীজ যত্ন সহকারে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া মুসলমান আধিপত্যের সময়েও হিন্দুর হিন্দুত্ব লুপ্ত হয় নাই। সহস্র সহস্র হিন্দু ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ

করিয়া অন্যধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও হিন্দুর অত্যদ্ভুত ধর্ম্ম ও সমাজনীতি সামাজিকগণের মধ্যে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া নিজ অন্তর্নিহিত বলে আত্মরক্ষা করিতে এমন কি সমাজের পুষ্টিসাধন করিতেও সক্ষম হইয়াছে। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম ইয়ুরোপের পূর্ব্বতন ধর্ম্মের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে দুই তিন শত বৎসরের নিয়ত চেষ্টাতেও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এখনও হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সক্ষম হয় নাই। মহম্মদীয় ধর্ম্মও তাহা পারে নাই। আমার মনে হয় যে জাতিগত পবিত্রতা রক্ষাই ইহার একটী প্রধান কারণ।

কিন্তু জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিতে গেলে সমাজে সুশৃঙ্খলা হওয়া চাই। পূর্ব্বকালে বংশরক্ষা, কুলধর্ম্মরক্ষা, এবং শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ার ব্যবস্থাদি দ্বারা প্রধানতঃ পবিত্রতা রক্ষা করা হইত। এই সকল ক্রিয়াদি দ্বারা প্রেতলোক এবং পিতৃলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্মকার্য্যের সহিত, ইহলোকাবস্থিত হিন্দুগণের জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে যে কতদূর সাহায্য লাভ হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই সকল সুব্যবস্থার সহিত কুলাচার্য্যগণের রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির উপায় না করিতে পারিলে জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

আমি স্বয়ং কলিকাতা অঞ্চলে বাস করি। সেখানে প্রায়ই কেহ কাহারও খবর রাখে না। নানা জাতীয় লোক সেখানে একত্রীভূত হয়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে—এমন লোক যাঁহাদিগের জাতি নির্ণয় করা সুকঠিন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ বা অপর জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া এক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অর্থশালী হইলে কালক্রমে ব্রাহ্মণ বা অপর কোনও জাতীয় দূরস্থ লোকের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে জাতিতে উঠিয়া গেলেন। এই সমস্ত ব্যভিচার হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় কুলপরিচয় সংগ্রহ। যদি আমরা পুনরায় সমাজকে এবিষয়ে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে প্রথমতঃ কুলাচার্য্যগণকে পোষণ ও তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে হইবে। যদি তাঁহারা অনশনে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমাদের কুলপরিচয় Marriage League অর্থাৎ বিবাহ সমিতি বা ঐরূপ অপর কোনও সমিতির হস্তে পড়িবে। কলিকাতায় বা অপরাপর বড় বড় সহরে চাকর যোগাইবার, জিনিষপত্র যোগাইবার, ও অন্যান্য কার্য্যের সুবিধার জন্য অনেক সমিতি ও কোম্পানি আছে। তাহাদের হস্তে আমাদের কুল ও বংশের অস্তিত্ব নির্ভর করিলে, পরিণাম যে কি হইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে বৃদ্ধা বেশ্যা ঘটকীদিগের অনুকম্পার উপর আমাদের কুলমান নির্ভর করিবে। সহর অঞ্চলে এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লীগ্রাম অঞ্চলেও যে কুলাচার্য্যগণের অভাবে লোকে কষ্ট সহ্য করিতেছেন না, তাহাও বোধ হয় না। কলিকাতার ব্রাহ্মণ-সভা এই কুলপরিচয় সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া পদে পদে দেখিতে পাইতেছেন যে, কি সহর অঞ্চলে কি পল্লীগ্রামে সদ্‌ব্রাহ্মণগণ কিরূপ উৎকণ্ঠা সহকারে কণ্ঠাগতপ্রাণে কুলমর্য্যাদাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ও তাঁহারা বিশুদ্ধমতি কুলাচার্য্য-

গণের অভাব উপলব্ধি করিতেছেন। অল্পবয়সে আমরা বিবাহাদি কার্য্য সময়ে ঘটক চূড়ামণিগণের যে কুলুচিগান ইত্যাদি শুনিয়াছি, তাহা এখন আর কর্ণগোচর হয় না। এমন কি বিবাহ সভায় আজকাল অনেক সময় ঘটকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। হয় ত বর কন্যার সেই শুভ মুহূর্ত্তে কোনও অজ্ঞাত কুলশীলা দালালস্বভাবসম্পন্না প্রৌঢ়া কি বৃদ্ধা, অন্তঃপুরচারিণীগণের মধ্যস্থলে আসীন হইয়া এবং কুলচূড়ামণির স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় ঘটকালি কার্য্যকুশলতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আমরা সামাজিকতা হারাইয়া ধর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে নিরুদ্যম হইয়া, অলসতাকে প্রশ্রয় দিয়া এইরূপ ভাবি অথবা এইরূপ শূন্যমনা হইয়া বসিয়া থাকি, যেন আমাদিগের সামাজিকতা আপনাআপনি জাগিয়া উঠিবে, আমাদিগের সামাজিক অভাব আপনাআপনি পূরণ হইয়া যাইবে, কাহাকেও অধিক কিছু পরিশ্রম বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে না। এইরূপ হয় বলিয়াই আমরা অনেক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি না। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে যেরূপ উদ্যম, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের আবশ্যক—তাহা আমাদের নাই। যাহাতে সেগুলি আমরা লাভ করিতে পারি, সেই মহদুদ্দেশ্যেই এই ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনী সমবেত হইয়াছেন। "কলৌ সঙ্ঘশক্তিঃ।" যাহাতে ব্রাহ্মণগণ পুনরায় তাঁহাদের নির্ব্বাণোন্মুখ জ্ঞানশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া সমাজে নিজ পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন—তজ্জন্য বদ্ধ পরিকর হউন।

আহ্লাদের বিষয় এই যে আমরা আমাদের জাতীয় অভাব ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অভাবের উপলব্ধি হইতে অভাব পূরণের আকাঙ্ক্ষা ও তৎপরে অভাব-পূরণ। ব্রাহ্মণ-সভা কর্তৃক অল্পে অল্পে কুলপরিচয় সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের কুলপরিচয় সংগ্রহ কিরূপ বিরাট ব্যাপার—তাহা আপনারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। ব্রাহ্মণ-সভার আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। এই কুলপরিচয় সংগ্রহ কার্য্যে বিস্তর অর্থব্যয়। সুতরাং একার্য্যে আমরা আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারি নাই। আমরা একটী মাত্র লোককে মফস্বলে পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছি এবং তাঁহার দ্বারা স্থানে স্থানে স্থানীয় লোকের সাহায্যে কুলপরিচয় সংগ্রহ করিতেছি। কিন্তু অনেক স্থলে সহানুভূতি পাওয়া যাইতেছে না। সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা যেন স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাইলে তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সভার এই কার্য্যে উৎসাহ সহকারে যোগদান পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম রক্ষার সহায়তা করেন। যাহা হউক, এখানে আসিয়া শুনিলাম যে এই মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার প্রায় সমগ্র ব্রাহ্মণ অধিবাসীর কুলপরিচয় সংগ্রহ করা হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্যের সহায়তার জন্য আমরা শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন মহোদয়গণের নিকট নিতান্ত কৃতজ্ঞ। ব্রাহ্মণ-সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু তরঙ্গবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্রমাগত ৪ মাস কাল কান্দি মহকুমায় কার্য্য করিয়াছেন। কান্দি মহকুমায় যে প্রণালীতে কার্য্য হইয়াছে, তাহা সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি পাইলে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক বিবৃত হইবে।

কুলগ্রন্থ সমূহও শীঘ্র লুপ্ত হইবার আশঙ্কা, সে জন্য আমার একান্ত অনুরোধ যে এই মহাসম্মিলনী প্রধান প্রধান কুলগ্রন্থ সমূহ সত্বর ক্রয় করিয়া যত্নসহকারে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করুন। এরূপও শুনিয়াছি যে, বিক্রমপুর অঞ্চলে পূর্ব্বে যে সমস্ত কুলাচার্য্য ছিলেন, তন্মধ্যে অধুনা কেবল ৫।৭ জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। আমার ইহাও একান্ত অনুরোধ যে এই মহাসম্মিলনী তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জনকে বেতন প্রদান পূর্ব্বক এই কুলপরিচয় সংগ্রহ কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য নিয়োজিত করিবার ব্যবস্থা করুন। এই কুলপরিচয় সংগ্রহ কার্য্য অতিশয় সতর্কতার সহিত বিশ্বস্ত লোকের সাহায্যে সম্পন্ন হওয়া উচিত। যদ্যপি ব্রাহ্মণ-সমাজ এই সুকঠিন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন,—তাহা হইলে সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধিত হইবে। সুতরাং অন্যান্য কার্য্যের সহিত এই মহাসম্মিলনীকে এই মহৎ কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ প্রকাশ করিতে হইবে। যে উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কার্য্য সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে পারিব তাহা আর অধিক কিছু বলিয়া আপনাদের সময় ক্ষেপণ করিব না। সম্মিলনীর মন্তব্যে তাহা বিবৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সমাজ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে—ইহা কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীর বোধগম্য শুষ্ক দার্শনিক তত্ত্ব নহে। এই ধর্ম্মতত্ত্ব আমাদের সমাজতন্ত্রের প্রত্যেক অংশে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। আমার এই কথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া জাতিগত বিশুদ্ধিরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে দুইচারি কথা।*

জগতের সকল সভ্যজাতি মাত্রেই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করেন। কিন্তু চাতুর্ব্বর্ণসমাজ কর্ম্ম-ভূমি ভারতবর্ষেরই একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি। কোন্ স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতবর্ষে এই সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, স্মরণ করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীভগবান কর্ত্তৃক গুণ কর্ম্মানুসারে প্রেরিত হইয়া, আপন গণ্ডীর মধ্যে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই হিন্দুসমাজ এক সময় উন্নতির কি গরিমাময় মন্দির অধিকার করিয়াছিল, সভ্যতার কি মহিমান্বিত শিখরি-শিরে অধিরোহণ করিয়াছিল, কাব্য সাহিত্যেতিহাস দর্শন বিজ্ঞানে, স্থাপত্য ভাস্কর্য্যে, কৃষি বাণিজ্যে, শৌর্য্যে বীর্য্যে ও সর্ব্বপ্রকার নীতিশাস্ত্রের শাশ্বতীজ্ঞানে জগতে কি বরেণ্য-পদবী লাভ করিয়াছিল; হায়! যাহার কাহিনী শুনিলেও আত্মহারা হইতে হয়। এই দুর্দ্দিনেও অতীত গৌরব গর্ব্বে

* মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনে পঠিত।

আমাদের মত দুর্ব্বলের বক্ষও স্ফীত হইয়া উঠে। কিন্তু বর্ত্তমানের এই অধঃপতন? আজি-কার এই দুর্দ্দশা? কি ভীষণ এবং কত শোচনীয়! অমৃতের পুত্র, আনন্দময়ের সন্তান আমরা, কেন আমাদের এই অধঃপতন? কেন আমরা আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত? কেন? সমাজবন্ধন শিথিল হইয়াছে বলিয়া! আত্মকৃত কর্ম্মপ্রবাহে ক্ষয়িতমূল হিন্দুসমাজসৌধ আজ পতনোন্মুখ বলিয়া! আত্মকলহে, অন্তর্ব্যভিচারে, শৌচ সদাচার হীনতায়, অধর্ম্মের অত্যাচারে হিন্দুসমাজ আজ জর জর, অন্তিম শয্যায় শায়িত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এমন কেন হইল? দোষ আমাদেরই, সমাজ যন্ত্রের যাহারা যন্ত্রী, সমাজ শরীরের যাহারা শীর্ষস্থানীয় সেই ব্রাহ্মণেরপ্রভাব আমরা মানিতে চাই নাই। নীবার মুষ্টিতে সন্তুষ্ট, ইঙ্গুদীর স্নেহ তৃপ্ত, চীর বল্কল পরিহিত, সমাজ হিতকারী, বিশ্ব হিতানুধ্যানরত ব্রাহ্মণসমাজ উদরান্নের জ্বালায় স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিয়া আজ শ্ববৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যুৎপত্তিবাদকে পুত্ররূপে ও লীলাবতীকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়া চির-কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বনেও যিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না, তিন্তিড়ী পত্র ভোজ্যে পরিতৃপ্ত, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, জ্ঞানে গরীয়ান যে তাঁহার নির্দ্দেশিত জীর্ণ কম্বলাসনে উপবেশন করিতে রাজন্যবর্গ ও গৌরব বোধ করিতেন—সেই রঘুনাথ, রামনাথের বংশধর—আজ অর্থের জন্য লাঞ্ছিত! এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে? সকলের কথা বলিতেছি না, তবে আধুনিক কালের ব্রাহ্মণ সন্তান যে অনেকেই নির্দ্দোষ নহেন, এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু গতানুশোচনায় আর লাভ কি? যে জন্যেই হউক—আর যাহার জন্যই হউক—আমরা যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত এ কথাতো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জল নিমজ্জিত ব্যক্তিকে তিরস্কার না করিয়া আপাততঃ তাহার উদ্ধার সাধনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এখন প্রতীকারের উপায় দেখিতে হইবে। আমাদের মত অনভিজ্ঞের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতীকারের একমাত্র উপায় সমাজের আপাদ-মস্তকের সংস্কার। অবশ্য আমি আধুনিক নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তথা কথিত সংস্কারের কথা বলিতেছি না, আমার বলিবার উদ্দেশ্য সমাজে যাহার যতটুকু ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন। এই যে যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতেছেন—এই যে, কোন কোন জাতি প্রকাশ্যভাবে "ব্রাহ্মণের" উপাধি গ্রহণ করিয়া বসিতেছে,—ইহার পরিণাম শুভ বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মণ কখন কাহাকে ঘৃণা করেন না,—করিতে জানেন না, করিতে পারেন না। বুঝিয়া রাখা উচিত যে ব্রাহ্মণ কাহারও উন্নতির পরিপন্থী নহেন। আর বিশ্বাস করা উচিত যে, হিন্দুর পুরুষার্থ এক জন্মেই পর্য্যবসিত নহে। জন্মগত অধিকার অনুসারে স্বজাত্যুক্ত কুলধর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে পরজন্মে তাহার শুভ ফললাভ—স্থায়ী উন্নতিলাভ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দেশের শিক্ষা দীক্ষা এই ধারণার প্রতিকূল,—কালধর্ম্মে দেশের মতিগতি এখন অন্য রকমের,—সুতরাং পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বলিতে হইতেছে যে আমাদিগকেই এই ব্রাহ্মণগণকেই প্রস্তুত হইতে হইবে। দেশে আদর্শের সৃষ্টি করিতে হইবে। আমি আদর্শ ব্রাহ্মণের কথাই বলিতেছি। দেশে ত্যাগী, সংযমী, উদার, ন্যায়-নিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ গড়িয়া উঠিলে তাঁহারাই এই কালস্রোত উজানে প্রবাহিত করিতে পারিবেন। শুভ সুযোগ বর্ত্তমান। সদাশয় ইংরাজ

গভর্ণমেণ্টের কৃপায় প্রজার জাতিধর্ম্ম, ধনমান—এখন নিরাপদ। এই শুভসুযোগে সাধনা আরম্ভ করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ ধ্রুবনিশ্চিত। তাই বলিতেছিলাম—বাক্‌চাতুর্য্যের হট্টগোল ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সাধনার নিরালা নিকেতনে আদর্শ ব্রাহ্মণ গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া সদাচারপূত বিদ্বান্ অধ্যাপকের অধীনে ব্রাহ্মণ কুমারগণকে সনাতন শাশ্বতী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে। চতুষ্পাঠীর দুইটী বিভাগ প্রতিষ্ঠা উচিত বলিয়া মনে করি। একটী বিভাগে কেবলই সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইবে, অপরটীতে সংস্কৃতের সহিত ইংরাজী, দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয়স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিবে। বর্ত্তমান কালে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট—ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ইংরাজী শিক্ষা দিতে বলার আর একটী তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষিতগণ যে বিদ্যাপ্রভাবে যে তর্কযুক্তির পন্থা আবিষ্কার করিয়া, একটা অস্বাভাবিক ভাবুকতায় পরিচালিত হইতেছেন, ইংরাজীর সহ সংস্কৃত শিক্ষা দিলে, চতুষ্পাঠীর হিন্দুত্বের মধ্যে লালিত পালিত হইলে, তাহা 'বিষস্য বিষমৌষধিঃ' হইবে বলিয়া মনে হয়। স্কুল, কলেজ ও চতুষ্পাঠীর আবেষ্টনের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা যথাযথ রক্ষিত হইলে ছাত্রজীবনে চতুষ্পাঠীর প্রভাব যে সুফল প্রদান করিবে, তাহা বোধ হয় নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। প্রসঙ্গতঃ একটী কথার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। হেতমপুর শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের দুইজন ব্রহ্মচারী এবার ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষা দিতে বর্দ্ধমান কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন চতুষ্পাঠী হইতে তথায় বহুছাত্র সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গমঠের ব্রহ্মচারিদ্বয়ের ত্রিসন্ধ্যা, শিবপূজা ও নিত্য হোমাদি অনুষ্ঠান, স্বপাক হবিষ্যান্ন ভোজন, পাদুকাহীন নগ্নপদ, এবং বাজার প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি ভক্ষণে নিস্পৃহতা প্রভৃতি দেখিয়া, শুনিয়াছি বহু ছাত্রই নাকি বলিয়াছিলেন—"বাপ্ রে! ইহারা থাকে কি করিয়া?" আমাদের এই শ্রীগৌরাঙ্গমঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দ ইংরাজীও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অবশ্য কিরূপভাবে কি কি বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে অভিজ্ঞগণই তাহার বিচার করিবেন। তবে আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গমঠে যে পন্থা অনুসরণ করিয়াছি তাহাই আমার পূর্ব্বকথিত দ্বিতীয় বিভাগের চতুষ্পাঠী শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহা হউক চতুষ্পাঠীতে কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপনের উপর লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না, অবশ্যপালনীয় ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহারের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চতুষ্পাঠীস্থ অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, দেশের সম্ভ্রান্ত সজ্জনগণকেই সে ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ-সমাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটী স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপন এবং সেই ধনভাণ্ডারে দেশের সকলেই যাহাতে সাহায্য করিতে আগ্রহান্বিত হন, এইরূপ চেষ্টা করাও বিশেষ কর্ত্তব্য। ধনভাণ্ডারের ভার ব্রাহ্মণসমাজের নিজ নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতম সমিতির হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া তদ্দ্বারাও উপযুক্ত অধ্যাপক এবং প্রচারক প্রতিনিধিগণকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। সমাজ অন্তঃপুরের শিক্ষার ভার চিরকালই গুরুপুরোহিতগণের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। গুরুপুরোহিত তুল্যরূপেই আমাদের পরম

পূজনীয়। তাঁহাদের উপকারের ঋণ পরিশোধিত হইবার নহে; গুরুপুরোহিতগণই সমাজের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের ভাগ্যবিধাতা। তাঁহাদের মত বিশ্বস্ত শিক্ষক আর দ্বিতীয় পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। যাঁহাদের উপর অসঙ্কোচে অন্তঃপুরের ভার দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় সেই গুরুপুরোহিতের সম্ভ্রম প্রতিপত্তি সমাজে এক্ষণ সূপকারগণের সমপর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে সমাজ বা গুরু পুরোহিত, কাহার বেশী দোষ? সে বিষয়ে আলোচনা করিতে চাহি না। তবে আদর্শ গুরু পুরোহিতের যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপ বৃত্তি প্রদানে, সম্মান সম্ভ্রম-দানে পূর্ব্ব পদমর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া—অন্তঃপুরের শিক্ষার ভার তাহাদের হস্তেই প্রদান করিতে হইবে। নতুবা অধিকাংশ স্থলেই শুদ্ধান্তঃপুরচারিণীগণ যেরূপভাবে পরিচালিত হইতেছেন, তাহার অদূর ভবিষ্যৎ বিশেষ ভয়াবহ ও সঙ্কট-সঙ্কুল বলিয়াই মনে হয়। এই সমস্ত কার্য্যের জন্যই ধনভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা। কার্য্য আরম্ভ হইলে এই ভাণ্ডারে আমি ১০০০৲ এক হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি। সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এই সমস্ত বিষয়ে আর উদাসীন থাকিলে চলিবে না। সমস্যা তো একটী দুইটী নহে। আমরা এক্ষণে অসংখ্য সমস্যার জালে জড়িত হইয়া খেই হারাইয়া বসিয়াছি। কোনও সমস্যাটীই উপেক্ষণীয় নহে। মানুষ যদি ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নিদারুণ আধি ব্যাধি-নিপীড়নে নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবে আর অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে কে? চমৎকার অন্নচিন্তায় যদি তাহার স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিনাশ হইয়া যায়, তবে আর সদসৎ নির্দ্ধারণ করিবে কে? কিন্তু এই সমস্ত উপসর্গের মূল রোগের চিকিৎসাই আশু প্রয়োজনীয়, এবং তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। মূলরোগের প্রতীকারের একমাত্র ঔষধ আমাদের স্বধর্ম্মপ্রতিপালন। ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের কৌশল ভারতে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিজড়িত। কর্ম্মহীন ধর্ম্ম ভারতবর্ষে আছে বলিয়া মনে হয় না। নিজ ধর্ম্মকর্ম্মে আমাদের আস্থা হইলে সেই পুণ্যময় ইষ্টাপূর্ত্তের অনুষ্ঠান আবার দেশে প্রচলিত হইবে। মানব সংযমী হইবে, সদাচারী হইবে, তাহার বিলাসব্যসন কমিলে অভাব অভিযোগের তাড়নাও অনেকাংশে অপসারিত হইবে, আধিব্যাধি দূরে পলায়ন করিবে। স্বধর্ম্ম প্রতিপালন ভিন্ন ভারতীয় সমাজের বিপদ নিবারণে—"নানা পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"॥ তাই আদর্শ অধ্যাপক এবং ছাত্র ও গুরুপুরোহিত,—এক কথায় আদর্শ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণই ভারতের ধর্ম্মভাব পুনর্জ্জাগ্রত করিবেন।

দেশের এই ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আর একটী অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য—কুলাচার্য্য-গণকে পুনরুজ্জীবিত করা। মহাভারত পুরাণাদি ইতিহাস নামে বিখ্যাত। ভারতের ইতিহাসের সংজ্ঞা—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং উপদেশ-সমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

কেবল রাষ্ট্রীয় ঘটনার সন তারিখ লইয়াই ইতিহাস নহে। সমাজ-ধর্ম্মের ইতিহাসই ভারতের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভারতে ইতিহাসের গৌরব যথেষ্টই ছিল। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ইতিহাসকে পঞ্চম বেদ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রাদ্ধ কার্য্যাদিতে ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থা রহিয়াছে—ইতিহাস আমাদের আত্মবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া দেয়,—পিতৃ পিতামহের পূতপদাঙ্ক অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে,—জাতির উত্থান পতনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়,—আমরা কি ছিলাম, তাহা বুঝাইয়া দেয়। মহাভারত পুরাণাদির পর এ হেন ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন—আমাদের কুলাচার্য্যগণ। মানুষ দেবতা নহে; দোষ গুণ তাহার থাকিবেই। হইতে পারে কুলাচার্য্যগণেরও দোষ ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও গুরুপুরোহিতগণের ন্যায় তাঁহাদেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের উপেক্ষায় তাঁহাদের সংখ্যাও ক্রমে নির্ম্মূল হইয়া আসিতেছে। এখনও যাহা আছে তাহা রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, দুই দিন পরেই সব হারাইতে হইবে। সুতরাং উপযুক্ত বৃত্তি আদি দানে, প্রত্যেক ক্রিয়াকাণ্ডে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সম সম্মানে বিদায় দক্ষিণাদি প্রদানে, তাহাদিগের রক্ষার ব্যবস্থাও বিশেষ কর্ত্তব্য। আমা অপেক্ষা বহুতর বিজ্ঞব্যক্তি এই সম্মিলনে মিলিত হইয়াছেন, ভরসা করি এই অযোগ্যের নিবেদনে তাঁহারা কর্ণপাত করিবেন। এই সমস্ত বিষয়ের পুনরুক্তি দোষাবহ নহে বলিয়া আবার বলিতেছি—ধর্ম্মই আমাদের শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়,—ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ,—ধর্ম্মই ভারতের বল। সহায়, সম্বল, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ যাহা কিছু ধর্ম্মই তাহার মূল। যেথনে. ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই স্থলেই ধর্ম্মগ্লানি নিবারণকারী ভূতভাবন ভগবান বর্ত্তমান। ধর্ম্মের আধার সত্ত্বগুণাত্মক ব্রহ্মণ্য-বিগ্রহ তাঁহার দ্যোতনা মাত্র। আসুন!—ব্রাহ্মণের মঙ্গল প্রার্থনায় সেই পরমপুরুষের উদ্দেশে ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া ভক্তি গদ্গদ স্বরে উচ্চারণ করি—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।
(মহারাজকুমার—হেতমপুর।)

মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির

সভাপতির অভিভাষণ।

সভাস্থ মহোদয়গণ,—

মুর্শিদাবাদবাসী ব্রাহ্মণগণের প্রতিনিধি স্বরূপে অদ্য আমি আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। বহুকাল পরে মুর্শিদাবাদে এই নূতন দৃশ্য। শুনা যায়—সার্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমার বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে লক্ষ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগের পদধূলি দ্বারা তদীয় ভদ্রপুর বাসভবন পবিত্র করিয়াছিলেন। ভদ্রপুর তৎকালে মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিল, এক্ষণে বীরভূমের অন্তর্গত। আজ পুনরায় মুর্শিদাবাদ বঙ্গদেশের আর্য্যকুলতিলকগণের পদধূলি সংযোগে পবিত্র হইল।

এই মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ নগর এককালে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। মুর্শিদাবাদের সেই গৌরব সূর্য্য, এক্ষণে অস্তমিত। যেমন বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ তাঁহাদের পূর্ব্ব মহত্ত্বের কঙ্কালমাত্র, তদ্রূপ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদও সে কালের মুর্শিদাবাদের ভগ্নাবশেষ মাত্র। যে মুর্শিদাবাদ এককালে সমগ্র বঙ্গদেশবাসিগণের তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত ছিল, সেই মুর্শিদাবাদ আজ বিস্মৃতি সলিলে নিমগ্ন—আজ তাহা বঙ্গদেশের একটী সামান্য জেলা ও নগর মাত্র। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে আজ মুর্শিদাবাদ আপনাদিগের পদধূলি পাইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে পরিচিত হইল।

আমাদিগের আহ্বানে আপনারা যে এস্থানে শুভাগমন করিয়াছেন, সেজন্য আমরা আমাদিগকে নিতান্ত অনুগৃহীত মনে করিতেছি। দূর হইতে—বহু দূর হইতে,—অনেক ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক বিস্তর ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করতঃ আপনারা আমাদিগকে যে কৃতার্থ করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাদিগকে মুর্শিদাবাদবাসী ব্রাহ্মণগণ শত শত ধন্যবাদ দিতেছেন।

আপনাদিগের যথোচিত সেবা করিবার শক্তি আমাদিগের নাই। আমাদিগের অর্থবল নাই, লোকবল নাই, অধিকন্তু মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপর ভবাদৃশ মহাত্মগণের অভ্যর্থনা কার্য্যের নেতৃত্ব ভার অর্পিত হইয়াছে। অনুক্ষণ আমাদিগের শত শত ত্রুটী লক্ষিত হইবে। ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃই দরিদ্র। মহাশয়গণ আমাদিগকে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

এক্ষণে অন্য বিষয় অবতারণার পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথমে আমরা আমাদিগের পালনকর্ত্তা ব্রিটিশ রাজাধিরাজকে আশীর্ব্বাদ করি। আমাদিগের রাজরাজেশ্বর আজ প্রায় বিংশতি মাস কাল সসৈন্যে মহাসমরে লিপ্ত আছেন। আপনারা সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী আশীর্ব্বাদ করুন যে সত্বরেই ব্রিটিশবাহিনী অক্ষত শরীরে শত্রু পরাজয় করিয়া এই জগদ্ব্যাপী সৃষ্টিনাশক মহাযুদ্ধের করাল গ্রাস হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করতঃ শান্তি রাজ্য পুনঃস্থাপিত করুক। এবং ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা যে—"অমোঘা ব্রাহ্মণাশিষঃ" এই মহাবাক্য সার্থক হউক।

ভূদেবগণ! মুর্শিদাবাদ যে কেবল আপনাদিগের আগমনেই পবিত্র হইল তাহা নহে। আপনারা এই অধিবেশনে যে সকল বিষয় আলোচনা করিবেন, তদ্দ্বারাও মুর্শিদাবাদের প্রত্যেক রজঃকণা পর্য্যন্ত পবিত্র হইবে। যেমন পুরাকালে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন, সেইরূপ আপনারাও এই মুর্শিদাবাদ বক্ষে অধিবেশন করিয়া লুপ্তপ্রায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনর্জীবনের উপায় অনুশীলন করিবেন। আজ মুর্শিদাবাদ নৈমিষারণ্যের পবিত্রতা লাভ করিবে।

আপনারা যে উদ্দেশ্য লইয়া আজ আমাদিগের নগরে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা অতি মহৎ। আপনাদিগের উদ্দেশ্য এক কথায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা। এবং এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষারই অর্থ সমগ্র লোক রক্ষা। পুরাকালে রাজশক্তিও ব্রাহ্মণের নিকট নতশির হইত। রাজার মুকুট ও ব্রাহ্মণের পদলুণ্ঠিত হইত। তাহার কারণ কি? ব্রাহ্মণ স্বার্থকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। লোক হিতৈষিতা তাঁহার জীবনের এক মাত্র ব্রত ছিল। তাঁহার পান ভোজনের বাহুল্য ছিল না, পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছিল না, বাসভবনের সমারোহ ছিল না, বিলাসিতার লেশ মাত্র ছিল না। আত্মসংযম জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। পর্ণ কুটীরে বাস, বল্কল পরিধান, দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন এবং তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ মহাসুখসন্তোষে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহারা এইরূপ অতি সামান্যভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য ছিল কি? পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, তপস্যা, দান, সৎপ্রতিগ্রহ ইত্যাদি। তাঁহারা রাজাকে রাজনীতি শিক্ষা দিতেন, প্রজাকে ধর্ম্মশাস্ত্র উপদেশ করিতেন, সৃষ্টিস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিতেন, ইহলোক ও পরলোকের সম্বন্ধ আলোচনা করিতেন, পাপপুণ্যের বিচার করিতেন, চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুশীলন করিতেন, বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেন, ব্যবহার শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন ও প্রয়োগ করিতেন, পশুপালনের ব্যবস্থা করিতেন, আর কত বলিব। সংক্ষেপে বলিতে হইলে—জীবসঙ্ঘ যাহাতে আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে, তাহারই উপায় চিন্তা ও উদ্ভাবন ব্রাহ্মণ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। স্বীয় জীবনকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একভাগ মাত্র নিজের পরিবার প্রতিপালনের জন্য নিয়োজিত করিতেন এবং অবশিষ্ট তিন ভাগ নিজের শিক্ষা দীক্ষা ও পরহিত ব্রত পালন জন্য উৎসর্গ করিতেন। বিদেশীয়গণও ব্রাহ্মণকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা জানাইবার জন্য আমি সুবিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবের নিম্নোক্ত বাক্যগুলি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"The Brahmans, therefore, were a body of men who in an early stage of this world's history bound themselves by a rule of life the essential precepts of which were selfculture and selfrestraint. The Brahman is an example of a class becoming the ruling power in a country not by force of arms, but by the vigour of hereditary culture and temperance. One race has swept across India after another, dynasties

have risen and fallen religions have spread themselves over the land and disappeared. But since the dawn of history the Brahman has calmly ruled swaying the minds and receiving the homage of the people and accepted by foreign nations as the highest type of Indian mankind."

অর্থাৎ জগতের ইতিহাসের প্রারম্ভেই ব্রাহ্মণেরা এমন এক শ্রেণীর লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান চর্চ্চা এবং আত্মসংযমই জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। ব্রাহ্মণগণ দেখাইয়াছিলেন যে বিনা অস্ত্রে কেবল পুরুষানুক্রমে জ্ঞান চর্চ্চা ও আত্মসংযম প্রভাবে দেশের শাসন কর্ত্তা হওয়া যাইতে পারে। এই ভারতবর্ষে কত জাতি আসিয়াছে ও গিয়াছে, কত রাজবংশের অভ্যুদয় ও ধ্বংস হইয়াছে, কত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও বিলোপ হইতেছে কিন্তু চিরকালই ব্রাহ্মণগণ অবিচলিত ভাবে দেশ শাসন করিয়া আসিতেছেন। দেশস্থ লোকগণ ব্রাহ্মণকে গুরু ও আদর্শ বলিয়া পূজা করিয়াছেন এবং বিদেশীয়েরা তাঁহাদিগকে ভারতবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন।

এখন আমরা কি হইয়াছি! সেই সকল ব্রাহ্মণগণের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয়। এখন আমরা কেহ কেহ শাস্ত্র অনুশীলন করি বটে, কিন্তু সে আত্মসংযম কোথায়? সে বিলাসহীনতা কোথায়? সে স্বার্থত্যাগ কোথায়? সে লোক হিতৈষিতা কোথায়? আমাদের সংযম নাই—আমরা বিলাসিতায় ব্যস্ত, আমরা স্বার্থের কীট, নিজের হিত ব্যতীত অন্যের হিত আমাদের মনে স্থান পায় না। আমাদের প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব চলিয়া গিয়াছে, কেবল বাহাড়ম্বর পড়িয়া আছে। আমরা অর্থ উপার্জ্জন করি—নিজের উদর পরিপূরণ জন্য ও নিজের বিলাসিতার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য। পূজা করি নিয়ম রক্ষার জন্য অথবা নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন জন্য, কিম্বা আত্মগৌরব বৃদ্ধির জন্য। দান করি যশ ও খ্যাতি লাভের জন্য। আমরা সংসার লইয়া এতই ব্যস্ত যে ধর্ম্ম চিন্তা ও পরমার্থ চিন্তার সময় পাই না।

অনেকেই বলেন যে এক্ষণে আর পুরাকালের স্মৃতিশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত মার্গ অনুসরণ করিলে আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে তাহা মানিলে আর চলিবে না। আমাদিগের রাজা আমাদিগের শাস্ত্রের বশবর্ত্তী নহেন। রাজপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থা সকল আমাদিগের শাস্ত্রের বিধান গ্রাহ্য করে না। রাজপুরুষগণের মনোরঞ্জন করিতে হইলে আমাদিগের শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য না করিলে চলিবে না। যেরূপ কাল উপস্থিত তাহাতে শাস্ত্র অনুমোদিত উপায়ে আর ব্রাহ্মণের অভাব মোচন হয় না। তবে আমাদিগকে কি করিতে হইবে? আমাদিগকে কি একবারে ধর্ম্মশাস্ত্রে জলাঞ্জলি দিয়া সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যথেচ্ছার বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে? আমার বোধ হয় বর্ত্তমান তথাকথিত হিন্দু ব্যতীত জগতে এমন উচ্ছৃঙ্খল জাতি আছে কিনা সন্দেহ। আমার আরও বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণগণ উচ্ছৃঙ্খল না হইলে অন্যান্য জাতি উচ্ছৃঙ্খল হইত না। জগতের অন্য সমস্ত

জাতিরই স্বধর্ম্মনিষ্ঠা আছে, সহজে কখনই তাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। ইংরাজ আজ কাল আমাদের আদর্শ স্থল। ইংরাজ পৃথিবীর যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তিনি কখনই স্বীয় আচার হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। কিন্তু আমাদের কোনও বন্ধনই নাই, আমরা একবারে মুক্তপুরুষ। আমরা 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ'। আমরা আমাদের নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে যাই। কিন্তু ইংরাজ তাহাতে আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষুতে ভিন্ন দেখেন না। আমরা স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার ইংরাজও আমাদিগকে গ্রহণ করেন না ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে? যদি আমাদের কখনও উন্নতি হয়, তাহা পরধর্ম্ম আশ্রয়ের দ্বারা হইবে না। পরধর্ম্ম পরধর্ম্মই থাকিবে, তাহা আমরা কখনই নিজের করিতে পারিব না। পরধর্ম্মে কখনই আমাদের অবস্থার স্ফূর্ত্তি হইবে না। কাক কখনও ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করিয়া শোভা পায় না, কলমের-গাছ বীজের গাছের মত অধিক ফল দেয় না, কিম্বা বেশীদিন ফল ধরে না। যে জলাশয়ে নির্ঝর নাই, কেবল বর্ষার জলে পরিপুষ্ট—তাহাতে কয়দিন জল থাকে? তাই বলি আমাদের স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম আশ্রয় ব্যতীত উন্নতির অন্য উপায় নাই।

তবে সেই মন্বত্রি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকগণের প্রবর্ত্তিত সমস্ত রীতিনীতিই এক্ষণে প্রয়োগ হইতে পারে কি না, তাহা হইতে আমাদের রেখা মাত্র বিচলিত না হওয়াই শ্রেয়ঃ কি না, তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন। সেই সময় হইতে শত শত অথবা সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, জগতের ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জীবের হিতই যদি ব্রাহ্মণ-জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে যে সময়ে যাহা হিতকর তাহাই করিতে হইবে। দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থাও বিভিন্ন হইবে। ভগবান্ মনুই বলিয়াছেন—যদি ব্রাহ্মণ অধ্যাপনাদি নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হন তাহা হইলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন।

"অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ স হ্যস্য প্রত্যানন্তরঃ॥
উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্ বৈশ্যস্য জীবিকাম্॥"

যদি পুনরায় প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, যদি আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় যথাসম্ভব প্রকৃত ব্রাহ্মণ হই, এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণের শিক্ষা ও উপদেশ অনুসরণ করেন, যদি চাতুর্ব্বর্ণ্য-ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হয়, তাহা হইলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বিবেচনা হয় যে আমাদের যে নিরন্তর হাহাকার রব উঠিয়াছে, তাহা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে এবং পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে। যদি বলেন এক্ষণে ব্রাহ্মণ কই? ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পালন করাইবে কে? ব্রাহ্মণের উপদেশ শুনিবে কে? সে শাসনশক্তি কোথায়? আমার উত্তর—সে শাসনশক্তি আমরা নিজে ইচ্ছা করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারি। যদি আমাদের প্রত্যেক ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র শক্তি একত্র মিলিত করি—তাহা হইলে সেই সমবেত মহাশক্তির প্রভাবে সমস্ত বাধা-বিপত্তি

পরাহত হইবে। যদি আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প হই, যদি আমাদের কার্য্য এই দুই দিনের মুখ-ভারতীতেই শেষ না হয়, তাহা হইলে সমবেত ব্রাহ্মণ্যশক্তির তেজ উপেক্ষা করে, এমন ক্ষমতা কাহার? আবার সেই ব্রাহ্মণের মুখ হইতে অগ্নি উদ্গীর্ণ হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মার্গিতাকে ভস্মীভূত করিবেই। সেই সমবেত ব্রহ্মশক্তি উদ্ভাসিত করিবার জন্যই আজ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন উপস্থিত। এক্ষণে আপনারা এইস্থানে সুখাসীন হইয়া সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় অনুশীলন করিয়া আমাদের দেশ ও অন্তরাত্মা পবিত্র করুন।

শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লিঙ্গ দেহ রহস্য।*

মুক্তপুরুষ ও শিশুগণ ব্যতীত যাবতীয় ব্যক্তি মৃত্যুর পর প্রথম আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হয়। এই আতিবাহিক দেহ মানব ব্যতীত অপর প্রাণী লাভ করেনা। দশপিণ্ড দ্বারা এই আতিবাহিক দেহের নাশ হইয়া থাকে। আতিবাহিক দেহ লাভের অনন্তর প্রেত দেহ লাভ ঘটে। শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণাদি দ্বারা এই প্রেত দেহের অবসান হইয়া থাকে। এই প্রেত দেহের অবসান হইলে কাহাদিগকে আবার ভোগ দেহ পাইতে হয়, কাহাদিগকে বা একেবারেই কর্ম্মার্জ্জিত স্থূলদেহ লাভ করিতে হয়।

আতিবাহিক দেহ প্রেতদেহ, ভোগদেহ লিঙ্গদেহেরই পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা মাত্র। গর্ভাবস্থায় মানব শিশু যে সূক্ষ্ম অবরণে আবৃত থাকে, ঐ সূক্ষ্ম আবরণের সহিত আতিবাহিক দেহের তুলনা। এই সূক্ষ্ম আবরণ ছিন্ন হইলেই শিশু ভূমিষ্ট হয়, তাহার দেহ স্বাভাবিক ভাবে দৃশ্যমান হয়। আতিবাহিক দেহ নাশ না হইলেও লিঙ্গশরীর স্বাভাবিক শক্তিগুণ আকার লাভ করে না। হস্ত বস্তু গ্রহণে, পদ বিচরণে, মুখ চর্ব্বনে, জিহ্বা উচ্চারণে সমর্থ হয় না। প্রেতদেহের ভোগ সামর্থ্য নাই, মানস সুখ দুঃখানুভব শক্তি জন্মে না। এই সামার্থ্য যখন সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, তখনই ভোগ দেহ আখ্যা, এই ভোগ দেহেই স্বর্গ নরক ভোগ। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকং।
আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব॥
কেবলং তন্মনুষ্যাণাম্ নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ।
প্রেত পিণ্ডৈ স্ততোদত্তৈ দেহমাপ্নোতি ভার্গব॥"

---

* যশোহর সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

বড়জোর একবৎসর পর্য্যন্ত প্রেতদেহের বিদ্যমানতা। তাহার পরই ভোগ দেহ, কিম্বা জন্মান্তর গ্রহণ। কেহ কেহ আতিবাহিক দেহের স্বাতন্ত্র্য, কেহ কেহ ভোগদেহের ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আতিবাহিক, প্রেত, ভোগ দেহ লিঙ্গদেহেরই প্রকারভেদ মাত্র। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যের মত একই দেহের অবস্থান্তর মাত্র।

"পূর্ণে সংবৎসরে প্রাপ্তে দেহমন্যং প্রপদ্যতে
ততঃ স নরকং যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মনা ॥"

যাহারা বর্ত্তমান জন্মের কোন প্রকার পাপ পুন্য লইয়া যায় না, তাহাদিগের নূতন জন্মের জন্য কিয়দ্দিন অপেক্ষা করিবারও প্রয়োজন পড়ে না। কারণ লক্ষবিধ পাপ পুন্যের বৈচিত্র্য ও পার্থক্য বশতই লক্ষবিধ জন্মলাভও ঘটিয়া থাকে। একের পাপ পুন্যের পরিমাণ অপরের পাপ পুণ্যের পরিমাণ—একরূপ বা একজাতীয় নহে, কাজেই অসংখ্য প্রকার পাপপুণ্য হেতু তদনুরূপ জন্ম গ্রহণ ও সর্ব্বত্রসুলভ হয় না। এই বৈচিত্র্যময় কর্ম্মবশতই মানবদের জন্মের এত বৈশিষ্ট্য; কর্ম্মনানাত্ব বশতই জন্মের নানাত্ব। তজ্জন্যই অপেক্ষা করিতে হয়। এই অপেক্ষা ৩।৪ বৎসরের শিশুদের সম্ভব নহে। ইহাদের পাপপুণ্য জনিত কর্ম্মফল জন্মিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহারা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নূতন দেহলাভ করে; কর্ম্মের কারণীভূত বাসনার উচ্ছেদ করিয়া যায় নাই বলিয়া ইহাদের মুক্তিলাভ ঘটে না। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য সমূলে উচ্ছিন্ন না হইলে সংসার বন্ধনের চিরদিনের জন্য মোচন হইতে পারে না, কাজেই জন্মলাভ অপরিহার্য্য। আর অফলোন্মুখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মফল শিশুজীবনে নিঃশেষে ভুক্ত হইয়া যায় না, তজ্জন্য এই কর্ম্মফলাবশেষের জন্য জন্মলাভের সমাপ্তি হয় না। আরও, একই জীবনের কর্ম্মফল ২।৩ জন্মেও নিঃশেষে ভোগ হইয়া যায় না। শিশুদের লিঙ্গদেহে অবস্থিতি সম্ভব পর নহে বলিয়াই আমাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি মহামনীষী শাস্ত্রকারগণ ইহাদের শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। উৎকট পাপ কিম্বা পারলৌকিকার্থ পুণ্যকর্ম্ম শিশুদের করা সম্ভব নহে বলিয়া ভোগদেহ প্রাপ্তির অর্থাৎ লিঙ্গদেহে মানস সুখ দুঃখ ভোগের কোন সম্ভাবনাই নাই।

যাহারা বিচিত্র নব নব কর্ম্ম করিয়া যায়, উৎকট পাপ কিম্বা পারলৌকিকার্থ পুণ্য করিয়া যায় না, তাহাদের স্বর্গ নরক ভোগ করিতে হয় না। সাধারণ পাপপুণ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর উৎকট পাপজন্য নরকভোগ, পারলৌকিকার্থ পুণ্য জন্য স্বর্গভোগে অধিকারী হয় না, সাধারণ পাপপুণ্যের ফল বৈচিত্র্যময় জন্ম। উৎকট পাপের ফলস্বরূপ জীবকে নরকভোগোচিত ভোগশরীর লাভ করিতে হয়, তত্তৎ পাপময় সংস্কার জালে আবদ্ধ থাকিয়া নিজকর্ম্মানুরূপ ফলভোগে বাধ্য হইতে হয়। ধনু হইতে উৎক্ষিপ্ত বাণ লক্ষ্যস্থানে পড়িয়া থাকে, বাণের এমত শক্তি নাই যে স্বীয় গতি রোধ করে। পাপী জীবও নিজ পাপবেগবশতই নরক গমনে বাধ্য হয়। তাহার এমত শক্তি থাকে না যে, সে বেগ রুদ্ধ করে। বাণ অচেতন। লিঙ্গদেহস্থ জীব পর-চালিতযন্ত্রবৎ অবস্থিতি করে বলিয়া সচেতন হইয়াও অচেতন ধর্ম্মাক্রান্ত। এই মানস অপরিসীম দুঃখ

হইতে অব্যাহতি পাইবার সামর্থ্য পরবশ জীবের থাকিতে পারে না। পারলৌকিকার্থ পুণ্যের ফল স্বর্গসুখভোগ। সংকল্পমাত্রাগত ইচ্ছাপ্রাপ্তব্য সুখ জীবদ্দশায় সৎকর্ম্মেরই পরিপাক-মাত্র। স্বর্গভোগও জীবকে ভোগ্যা স্ত্রীর মত পরবশ হইয়াই করিতে হয়। স্বর্গভোগ সময়ে দাম্ভিকতাদ্বারা কখন কখন স্বর্গচ্যুতির কথা শুনা গিয়াছে, আবার তথায় সুসংস্কৃত উপাসনা, সুপরিশুদ্ধ মনোবৃত্তির দ্বারা আরও উদ্ধগতির অধিকার প্রাপ্তির কথাও শুনা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা জীবদ্দশারই মহত্তর অথচ অস্ফুট সৎকর্ম্মেরই যে ফল নহে, তাহাও বলা যায় না। অস্ফুট বলিবার হেতু তাহা স্বর্গভোগে ভুক্ত হইতে পারে নাই। পরিমিতকালে স্বর্গভোগ হওয়ার পর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তিবশেই হউক বা অপর কোন শক্তি বশেই হউক সে স্বর্গভ্রষ্ট জীবকে পৃথিবীতে আসিয়া স্থূল শরীর পরিগ্রহ করিতে হয়। সাধারণ পাপপুণ্য কারীদের জন্য স্বর্গনরক ব্যবস্থিত নহে, ইহা শাস্ত্র প্রমাণেই আমরা জানিতে পারিয়াছি।

উৎকট পাপ কি কি—ইহা বোধ হয় উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে না। উৎকট পাপের পরিণাম যে ইহকালেই কত ভীষণ, তাহার উদাহরণও যে পাওয়া যায় না তাহা নহে। তবে কোন কোনটির জাতি ও সম্প্রদায় ভেদেই ঐক্যমত্য দৃষ্ট হয় না; সে বিচার এস্থলে করা অবান্তর। কর্ম্ম পারলৌকিকার্থ ও ঐহিকার্থ ভেদে দ্বিবিধ। পরলোকে সুখ হইবে, এই বিশ্বাসে অনুষ্ঠিত পুণ্য কর্ম্মই পারলৌকিকার্থ। আমাদের শাস্ত্রে পারলৌকিকার্থ কর্ম্মের ফলে স্বর্গ সুখ হয়, ইহা বহুস্থানেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। পারলৌকিকার্থ ব্যতীত সৎকর্ম্ম ঐহিকার্থ। এস্থলে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, নিষ্কামকর্ম্ম কখন পারলৌকিকার্থ বা ঐহিকার্থ নহে। কৃষ্যাদি কর্ম্ম ঐহিকার্থ; আর সকাম শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই পারলৌকিকার্থ। ঐহিকার্থ কর্ম্মের ফল ইহলোকে ভোগ করিতে হয়। পরলোকে ইহার ফল ভোগ হয় না। তবে ঐহিকার্থ কর্ম্ম মৃত্যুর পরও জীবকে অনুবর্ত্তন করে, জন্মান্তর লাভের কারণও হইয়া থাকে। আবার কখন জন্মান্তরে দত্ত ফলও হইতে দেখা যায়। স্বর্গে পারলৌকিকার্থ পুণ্যের ফল অবশ্য নিঃশেষেই ভোগ হয়, তাহার আর অবশেষ থাকে না। তবে ঐহিকার্থ কর্ম্মের ফল তথায় উপভুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এই ঐহিকার্থ কর্ম্মের বলেই ভ্রষ্টস্বর্গ ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট জন্মলাভ করেন। নচেৎ পুণ্যকর্ম্ম স্বর্গে নিঃশেষে ভোগ হইলে উৎকৃষ্ট জন্মলাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এজন্য ঐহিকার্থ কর্ম্ম স্বীকার করা হইয়াছে। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত-লোকং বিশন্তি" এই যে পুণ্যক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পারলৌকিকার্থ কর্ম্মই বুঝিতে হইবে। ঐহিকার্থ কর্ম্মকে পুণ্য কর্ম্মের মধ্যে ধরা হয় নাই। তবে ইহা সৎকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইলেও শাস্ত্রোক্ত পুণ্যকর্ম্ম নহে। আবার নরকেও উৎকট পাপ কর্ম্মফল সম্পূর্ণরূপে ভোগ হইলে পর সাধারণ (উৎকট নহে) পাপকর্ম্মের ফলে ঐ নারকী জীবকে অপকৃষ্ট জন্মলাভ করিতে বাধ্য হইতে হয়। সাধারণ পাপের ফলভোগ বর্ত্তমান জন্মেই শেষ হইয়া যায় না, মৃত্যুর পর জীবে অনুবর্ত্তিত হইয়া অপকৃষ্ট জন্মের হেতু হয়। এই সাধারণ পাপ ঐহিকার্থ সৎকর্ম্মেরই বিপরীত ভাগ। সাধারণ পাপের ফলে

কেহ প্রস্তরাদি, কেহ বৃক্ষাদি, কেহ পশ্বাদি কেহ বা চাণ্ডালাদি জন্মলাভ করে। আবার কাহাকে বা জঘন্য ভূতযোনিও লাভ করিতে দেখা যায়। কুষ্ঠাদি রোগও জন্মান্তরীণ পাপাবশেষের ফল বলিয়াও শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। প্রস্তরাদি জন্ম বহুদিন স্থায়ী, এইজন্য ইহা অতীব কষ্টতম, বৃক্ষাদি কষ্টতম, পশ্বাদি কষ্টতর, চাণ্ডালাদি কষ্টকর। পুণ্যাবশেষ যখন থাকিতে পারে না, পাপকর্ম্মাবশেষও তখন নরক ভোগান্তে থাকিবে, ইহা সম্ভব নহে। এইজন্য অপকৃষ্ট জন্মপ্রাপক পাপকে সাধারণ পাপশ্রেণীতে পরিগণিত করিতে হইল।

"তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি। অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি তইহ ব্রীহি যবা.........ইতি জায়ন্তে"॥

স্বর্গ ভোগান্তে জীব প্রথম আকাশ সাম্য প্রাপ্ত হয়, ক্রমে বায়ুভূত, ধূম, অভ্র ও মেঘরূপতা লাভ করে। পরে বৃষ্টির মধ্য দিয়া শস্যাদি সংশ্লেষ প্রাপ্ত হয়। শস্যের পর রস, রক্ত, পশ্চাৎ শুক্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। শস্যাদির মধ্য দিয়া না আসিলে মানবাদি জীবরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। এই সংশ্লেষের নাম স্থাবর সংশ্লেষ। সংশ্লেষ লাগিয়া থাকা। শস্যে সংশ্লিষ্ট জীব অচেতন বং অবস্থিতি করে; শস্যের ছেদনে-ভেদনে তৎস্থ জীবের কোন কষ্ট জন্মে না, এই শস্যাদি স্থাবর তৎস্থজীবের দেহ নহে। নরক ভোগের পর নারকী জীবেরা কখনও কখনও স্থাবর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জীবের স্থাবরজন্ম আর স্থাবর সংশ্লেষ একবস্তু নহে। স্থাবর-যোনিতে স্থাবরই ঐ জীবের দেহ, স্থাবরের আত্মা ঐ জীবেরই আত্মা।

"অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশোহযত্তেকপূযাং যোনিমাপদ্যেরন্"

জীবাত্মা যেমন পার্থিব দেহে থাকে, এই শস্যরূপ দেহে তদ্রূপই অবস্থিতি করে, ইহাই স্থাবর যোনি প্রাপ্তি। স্থাবরজন্মে স্থাবর দেহের ছেদন পেষণে জীবেরই যাতনা। স্থাবরের যতদিন অবস্থিতি, তৎস্থ জীবের ততদিনই ঐ স্থাবরদেহে থাকিতে হয়। নারকী জীবগণের সকলেই যে স্থাবর জন্মলাভ করে তাহা নহে। কেহ ভূতযোনিতে কিছুদিন অবস্থিতি করে, কেহ বা পশুপক্ষী চাণ্ডালাদি যোনিতেও কিছুদিন অবস্থিতি করে। নারকী জীবগণের যদি একেবারে প্রাণিজন্ম লাভ ঘটে, তবে তাহাদিগেরও স্থাবর সংশ্লেষরূপ সুবিধা ভোগ অদৃষ্টে জুটে। কারণ স্থাবর সংশ্লেষ জন্মার্থ, ভোগার্থ নহে।

এই ভোগদেহাদি যাবতীয় সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ পার্থিব দেহেরই ছায়ামাত্র। তবে ইহা অনাতপরূপ সাধারণ ছায়ার সমজাতীয় নহে। সাধারণ ছায়ার গুরুত্ব নাই, ইহার সামান্য গুরুত্বাংশ বিদ্যমান। সাধারণ ছায়া একমতে আলোকাভাবজনিত একটি ভ্রান্তি মাত্র, আর ইহা সূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনঃ সমন্বিত একটি দেহ। সাধারণ ছায়া ব্যাপক বায়ুর সহিত উপমিত হইলে ইহা প্রাণবায়ুর সহিত উপমিত হইতে পারে। স্থূলদেহে ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ বর্ত্তমান থাকে, লিঙ্গদেহে একমাত্র মনই রাজত্ব করে। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সাহায্যে একা মনই তাবৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া স্থূলদেহে মন যে যে ভোগে অভ্যস্ত, যে যে সংস্কারে আবদ্ধ,

লিঙ্গদেহে তাদৃশই থাকে। স্থূলদেহে যাহা ভাল লাগে সূক্ষ্মদেহেও তাহাই। স্থূলদেহে যাহার অভাবে কষ্ট হয়, লিঙ্গদেহেও তাহাই। জীবদ্দশায় চিত্তরূপ বাক্‌যন্ত্রে (ফনোগ্রাফযন্ত্রে) যেমন যেমন স্বর প্রবেশ করিয়াছিল, লিঙ্গদেহে চিত্তযন্ত্রে সেই সেই স্বরই বাজিতে থাকিবে। জীবৎকালে স্থূল ইন্দ্রিয় সংযোগের ফলে মন যাহা দেখে শুনে, অনুভব করে, লিঙ্গদেহে সেই অভ্যস্ত সংস্কারগুণে মনই সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সাহায্যে তাহাই দেখিয়া শুনিয়া অনুভব করিয়া থাকে। জীবদ্দশার তাবৎ প্রতিচ্ছবি লিঙ্গদেহে স্পষ্টই প্রকাশমান হয়। যৌবনের অত্যাচার বার্দ্ধক্যে দেখা দেয়, পূর্ব্বপুরুষের রোগাদি দোষ, সদ্বৃত্তাদি গুণ ও পরপুরুষে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। তবে স্থূলদেহের কর্ম্মের ফল লিঙ্গদেহেই বা ফলিবার বাধা কি ? স্বপ্নকালে বাহ্য বিষয় থাকে না। তথাপি মনই জাগরণাবস্থায় পরিচিত বলিয়া সেই দৃষ্ট বাহ্য বিষয়েরই দর্শন করিতে সমর্থ হয় ; তবে মন লিঙ্গদেহে দর্শনাদি করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ? স্থূলদেহে বাহ্য জগতের ক্রীড়া। লিঙ্গদেহে অন্তর্জ্জগতের ক্রীড়া। অন্তর্জ্জগৎ বাহ্যজগতেরই প্রতিবিম্ব। আর দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার নিরন্তর ভাবনাদ্বারা অনুভবের আকার যে ধারণ করে, তাহা কোন কোন দার্শনিক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

লিঙ্গশরীরের সুখ দুঃখানুভূতি অবশ্য খাঁটী মানস। তবে বাহ্যভাবের সহিত একদিন না একদিন সংযোগ আবশ্যক, নতুবা অনুভূতি জন্মে কি না সন্দেহ। বাহ্যভাবের সহিত এক দিনও সংযোগ না ঘটিলে, মনের বিষয়গ্রাহী সামর্থ্য হওয়া অবশ্য যুক্তিবিরুদ্ধ। মানস সুখ দুঃখ আর বাহ্য সুখদুঃখে অনুভবাংশে কোনও পার্থক্য নাই,আকারগত পার্থক্য থাকিলেও মূলে ঐক্য বিদ্যমান।

সৌন্দর্য্য যেমন বস্তুতে থাকে না, মানবের চিত্তে ও নয়নেই থাকে, ইহা যেমন রসজ্ঞ বুঝেন, সুখ দুঃখও তদ্রূপ বস্তুগত নহে, মনোগত ; ইহাও সূক্ষ্মচিন্তাশীল বুঝিতে পারেন।

সুখ দুঃখ বস্তুর অধীন হইলে একই বস্তু কখন সুখকর কখন দুঃখকর দেখা যাইত না। মানসিক অবস্থাভেদে বস্তুর দর্শন স্পর্শন অনুভবের এরূপ বিষম প্রভেদ লক্ষ্যীভূত হইত না। মানস সুখদুঃখ আমাদের নিকট কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট বোধ হয় মাত্র। স্বপ্নকালে স্বপ্নজ সুখদুঃখ অস্পষ্টরূপে প্রতীত হয় না। সাধারণতঃ বোঝা যায় যে, চিত্তে দৃঢ় সংস্কার বাস্তব ঘটনার মত। পুত্রের মৃত্যু হইলে যে শোক, চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে সেই শোক। দৃঢ় সংস্কারজ সুখদুঃখের আর বাস্তব সুখদুঃখের কোন প্রভেদ নাই। তবে সাধারণতঃ সেরূপ দৃঢ় সংস্কারও জন্মে না, জন্মিলেও স্থায়ী হয় না। আর স্বপ্নও ক্ষণিক, স্বপ্ন জাগরণবৎ স্থায়ী হইলে স্বপ্ন জাগরণের সুখ দুঃখের প্রভেদেও কি আসিয়া যাইত।

দৈহিক ঐন্দ্রিয়িক বাহ্য সুখ দুঃখ কখন নিরবচ্ছিন্ন বহুকালস্থায়ী অসীম হইতে পারে না। বাহ্যবস্তুসাপেক্ষতাই বাহ্য সুখদুঃখের নিরবচ্ছিন্নতা, অসীমতা ও বহুদিন স্থায়িত্বের প্রতিবন্ধক। লিঙ্গদেহের বাহ্যবস্তু সাপেক্ষতা সে সময়ে থাকে না বলিয়া আন্তর সুখদুঃখ অসীম অপরিচ্ছিন্ন ও বহুকাল স্থায়ী।

ইচ্ছামত পার্থিব বস্তুর ভোগ করিতে হইলে প্রকৃতির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে হয়। তাহাতে

নানারূপ ক্ষতি। উৎকট রোগ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার পরিণাম হইতে পারে। তদ্ভিন্ন অতৃপ্তি ও অবসাদ আছেই। আন্তর সুখ সংস্কারজ সঙ্কল্পোপনীত বাহ্য ভাববিরহিত বলিয়া তাহাতে উপরোক্ত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, অতৃপ্তি ও অবসাদ সহজে জন্মে না। তবে বহুকাল ক্ষতি, অতৃপ্তি ও অবসাদ আসিয়া থাকে বলিয়া মুক্তির তুলনায় স্বর্গসুখ অকিঞ্চিৎকর। বহুকাল প্রবৃত্তির সেবার ফলে কামনার সম্ভব, সেই কামনার পরিচালনের শেষ ফল দুস্ত্যজ্য আসক্তি। শেষে সেই আসক্তি বা নেশার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ হিতকর, নচেৎ চিরদিনের মত অতৃপ্তি ও অবসাদ জীবকে চির দুঃখী করিতে পারে, তজ্জন্য স্বর্গ চ্যুতিও ভগবানের অনুগ্রহ। স্বর্গ অনন্ত হইলেই সুখের চিরস্থায়িত্ব হইবে, এ আশা আকাশ কুসুম, পুণ্যক্ষয়ান্তে স্বর্গ হইতে পতনে সেই স্বর্গ ভ্রষ্ট জীবের উপকার ব্যতীত অপকার নাই, পার্থিব সুখের তুলনায়ই অবশ্য স্বর্গসুখ অনির্ব্বচনীয়, অক্ষয় ও অনন্ত বলা হইয়া থাকে।

নরকে দুঃখ ভোগের বেলায়ও এইরূপ। জীবদ্দশায় কাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে, কিয়ৎক্ষণ পরেই দেহ ভস্মীভূত; ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়, চিত্ত নিশ্চল, প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে ; তখনই দাহ জনিত জ্বালার উপশম ঘটিবে। কিন্তু মানসদাহের জ্বালায় দেহ ইন্দ্রিয়ের ভস্ম বা নিষ্ক্রিয়তার সম্ভাবনা নাই বলিয়া যাতনার উপশম হয় না, অথচ অনুভবাংশে দাহজ্বালা সমানই। তবেই মানসদুঃখ নিরবিচ্ছিন্ন অসীম ও বহুকাল স্থায়ী হইয়া পড়িল।

স্বর্গ নরক অবশ্য স্বপ্নবৎ মানস সৃষ্ট একটি অপার্থিব সাম্রাজ্য। তাহা হইলে যে ইহা আকাশ কুসুমবৎ মিথ্যা হইবে, তাহা নহে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেমন অনিত্য, ক্ষণে ক্ষণে পরিণামশীল, বস্তুরূপে প্রতিভাসিত, স্বর্গনরক ও তদ্রূপ। মানসসৃষ্ট লোকসংকল্পজ ভোগ কিছুই নহে বলা যায় না। আমরা যখন জাগিয়া থাকি, তখন স্বপ্ন সুখদুঃখকে মিথ্যা বলিয়া থাকি, কিন্তু স্বপ্নকালে কেহ কি মিথ্যা বলিয়া জানে? সত্যরূপে প্রতীতি—স্পষ্ট ভাবে অনুভূতি করে না কি? আর জাগরণ অবস্থায়ও স্বপ্নের অবগতি সত্য বলিয়াই বুঝিতে পারি, তবে (স্বর্গনরকে) মানস সুখ-দুঃখানুভূতি সত্য বলিয়া বুঝিব না কেন? জাগরণাবস্থায় থাকিয়া স্বপ্নকালীন অবস্থাকে মিথ্যা-বলা আর পার্থিব সুখ দুঃখকে মিথ্যাবলা একই কথা নহে কি?

আমরা যদি বাস্তব জগতে থাকিয়া অপর্থিব লোককে উড়াইয়া দিতে পারি, তবে তত্ত্বজ্ঞানীর পারমার্থিক দশায় অবস্থিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে উড়াইয়া দিতে পারেন। তত্ত্বজ্ঞনীর নিকট জগৎ মায়াময়, শূন্যময় ও সংস্কারজ ভ্রান্তিমাত্র, কিন্তু আমরা যখন বাস্তব বলিয়াই জানি তখন ইহা মিথ্যা বলিতে পারি না, সত্ত্বা উড়াইয়া দিতেও পারি না। আমরা স্বর্গনরক মিথ্যাই বলি, কিন্তু তাহা যখন লিঙ্গদেহীর নিকট সত্যরূপেই প্রতীত, স্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে, তখন তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান বলিতে হইবে। মোট কথা ব্যবহারিক দশায় অবস্থিত আমরা পার-মার্থিক অবস্থা কিম্বা অপার্থিব সুখদুঃখ ভোগের প্রকৃত বিচারক হইতে পারিনা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পারলৌকিকার্থ কর্ম্ম সকাম কর্ম্ম, আর এই সকাম কর্ম্মই স্বর্গ ফলের জনক। নিষ্কাম কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জনক। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তের শুদ্ধি হইলে

পর তাহাতে জ্ঞানজ্যোতি প্রতিফলনের সম্ভাবনা থাকে। জ্ঞানজ্যোতি প্রতিফলিত হইলেই অপবর্গ সিদ্ধি বা মোক্ষ লাভ। তবে লোকে নিষ্কামকর্ম্ম না করিয়া যে সকাম কর্ম্ম করিতে থাকে, তাহার হেতু ঐ স্বর্গসুখ লোভ। মানবমাত্রেই সকাম—অতএব ভোগপরায়ণ। কামনা না থাকিলে ভোগের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না জানিলে কেহ কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইবে না কোনও পুণ্যকার্য্যে কাহারও আনুরক্তি জন্মিবে না। সকাম ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্ম কখনও করিতে পারে না, কারণ কামনা পরিত্যাগ তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য যে হেতু তাহারা সকাম। চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল জন্মিবে জ্ঞানলাভ যোগ্যতা আনিয়া দিবে, এই বোধে কৃতনিষ্কাম কর্ম্মও ঠিক নিষ্কাম নহে। পুণ্যকর্ম্ম করিতে হইলেই সংযম আবশ্যক, ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন। সকাম ভোগী ব্যক্তি যে ঐহিক কোন কোন কামনা দূরীকরণে সমর্থ হয়, কোন কোন ত্যাগ স্বীকারে সক্ষম হয়, তাহা ঐ পারলৌকিক অসীম সুখের কামনাই তাহার কারণ। সকাম ব্যক্তি বড় কামনার দ্বারা ছোট কামনার নাশ করে। সাধারণ ব্যক্তি বড় পারলৌকিক বহুকালস্থায়ী অপরিসীম সুখের আকাঙ্ক্ষায়ই তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী ঐহিক সুখত্যাগ করিতে পারে। তবে ঐহিক কামনা যে দূর করিতে পারে, এতাদৃশ ত্যাগস্বীকার শক্তি যে পাইয়াছে, সে ব্যক্তি মনে করিলে একদিন পারলৌকিক সুখ কামনাও ত্যাগ করিতে পারিবে। আর যদি তাহা নাই পারে, তাহা হইলে মুক্তির তুলনায় সামান্য হইলেও তাহার লাভ ত কম হইল না।

সকাম ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী নহে। ঐহিক কামনা যে ত্যাগ করিতে না পারে পারলৌকিক বড় কামনা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। প্রথম সকাম কর্ম্মদ্বারা ঐহিক কামনার রোধ, পশ্চাৎ নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা পারলৌকিক কামনার রোধ। আমাদের সমস্ত সকাম কর্ম্মের শেষে "সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণমস্তু" বলিয়া নিষ্কামের উপদেশ করা হইয়াছে। কর্ত্তার মনোবৃত্তির অনুসারেই কর্ম্ম সকাম ও নিষ্কাম। মনোবৃত্তি নিষ্কাম না করিলে নিষ্কাম সকামে পরিণত হইবে।

অনেকে স্বর্গনরকের পৌরাণিক বর্ণনা পড়িয়া অলৌকিক, অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক ভাবেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বুঝিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাহা অতিরঞ্জিত বা কাল্পনিক নহে। পুরাণকারই বলিয়াছেন—"মনোময়ানি হি স্বর্গলোকে শরীরাণি," "সঙ্কল্পমূলা হি লোকাঃ" মানবের নিকট যে যে ভোগ স্পৃহণীয়, যাহা হইলে বাসনার সম্পূর্ণ (সম্যক) সম্পূর্ণতা, তাহারই একত্র সমাবেশ মাত্র স্বর্গে দেখিতে পাওয়া যায়। চিরযৌবনা অপ্সরা, অবসাদহীন ভোগ, চিরবসন্ত, চিরজ্যোৎস্না, কাঞ্চন পদ্মনির্ম্মিত শয্যা স্বর্গে বিদ্যমান। মানস-সৃষ্ট, সঙ্কল্প মাত্রোপনীত সুখই যখন স্বর্গসুখ, তখন তাহা অলৌকিক হইবেই। আর উৎকট পাপপরায়ণ ব্যক্তি মৃত্যুকালে "ঐ কে মারিতেছে, কে যেন কাঁটাবনের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, লৌহদণ্ড দ্বারা কে যেন প্রহার করিতেছে, ঐ শতশত তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পদংশন করিতেছে"—এইরূপ এবং অন্যান্য বহুবিধ বিভীষিকা দেখিতে পায়, তাহাও শুনা গিয়াছে। উহাই মানসী যন্ত্রণার সূত্রপাত মাত্র।

একস্থানে সকল প্রকার যাতনার সমবায় সম্ভব নহে বলিয়া রৌরব কুম্ভীপাক প্রভৃতি অনেকগুলি নরকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। স্বর্গসুখ যেমন অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব, নরক-যন্ত্রণাও তদ্রূপ অবক্তব্য অনন্ত সাধারণ।

যতদিন লিঙ্গদেহস্থ জীবের পারলৌকিকার্থ পুণ্যের ও উৎকট পাপের ক্ষয় শেষ না হইবে, ততদিন এই মানস সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে।

সাধারণ পাপপুণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত থাকিয়া নিজ কর্ম্মানুরূপ জন্ম লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। আর মহাপাপী কোন্ উৎকট দোষে যে ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। সে দোষ অজ্ঞেয় বলিয়াই বুঝিয়া রাখিয়াছি। তাহা হইলে আতিবাহিক দেহ, প্রেতদেহ, ভোগদেহ আর ভূতযোনির দেহ সমস্তই লিঙ্গদেহেরই প্রকারভেদমাত্র॥

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

অভ্যর্থনা সঙ্গীত।*

বঙ্গমাঝারে ভাগীরথীতীরে অতীতগৌরববিজড়িত দেশে।
আজি এস গো বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ এ মধুমিলনে নব বরষে।
প্রথম জ্ঞানের আলোক ব্রাহ্মণ ধরিল সবার সম্মুখে,
পঞ্চনদতীরে মধুসামগান শুনিল সকলে হরষে ;—
প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ণাশ্রম, ভিক্ষা বিনিময়ে বিতরিল জ্ঞান,
স্থাপন করিল পরা শান্তি হিন্দুস্থান ভারতবর্ষে।
ধীরে কালবশে প্রতিকূল বায়ু স্পর্শ করিল হোমের শিখা,
ক্ষীণ হইল কণ্ঠ, মন্ত্র, হেরিল ব্রাহ্মণ ঘোর বিভীষিকা ;—
সমাজ হইল লক্ষ্যভ্রষ্ট, নষ্টপ্রায় আশ্রম চয়,
কলুষিত হ'ল সোণার ভারত পূর্ণ হইল হিংসা দ্বেষে।
আর না গমন করি অধোদিকে যদি ব্রাহ্মণ ফিরিয়া চায়,
ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার ভার এখনও যদি নিজ শিরে লয় ;—
তত্ত্বজ্ঞানের, ত্যাগের আদর্শ ব্রাহ্মণ যদি এখনও হয়,
কোনও বর্ণে রবেনা বেদনা (সবে) হাসিবে আবার শান্তি পরশে।

---

* মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে গীত।

ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচার।*

জলের জন্য পদ্মার তীরে বাস করিয়া মানব যেমন শেষে কুলভঙ্গের (ভাঙ্গনের,) ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, এমন কি ভিটামাটী পর্য্যন্ত ছাড়িয়াও পলাইতে হয়, আজকালকায় শিক্ষাও সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিতে না পারিলে পিতামাতার যেমন অসহ্য ক্লেশ উপস্থিত হয়, আবার শিক্ষা দিতে যাইয়াও তাঁহারা বিশেষ বিপদে পতিত হন।

এ বিপদের জন্য অনেকেই এখন চিন্তিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন এ বিপদের কএকটী কারণ স্থির করিয়া তাহার প্রতীকারে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। ভগবানের দয়ায় সম্মিলনের উদ্যম সফল হউক। শিক্ষা পদ্মার ভয়প্রদ স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর চিরোজ্জ্বল চিরশান্তিময় মূর্ত্তি ধারণ করুক। দেশের আতঙ্ক ঘুচিয়া যাউক।

আমরা মনুষ্যপ্রকৃতিতে দুইটী ভাব দেখিতে পাই। একটী দিব্যভাব অপরটী আসুর ভাব। জন্ম হইতে নিখিল-মানব ন্যূনাধিকরূপে এই দুইটী ভাবে গঠিত। ক্রমে তাহা বয়সের সহিত শিক্ষার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা আনয়ন করে। যে শিক্ষা সেই দেবভাবের অনুকূল হইয়া মনুষ্যকে পৃথিবীতেও অমরতা দান করে, তাহাই সুশিক্ষা। আবার যে শিক্ষা দ্বারা মানব আসুর-বৃত্তির প্রবল স্রোতে অধোনীত হয়, সেই শিক্ষাই বিকৃত শিক্ষা। সুশিক্ষা অপেক্ষা কুশিক্ষার কর্ম্মস্থান অধিকতর প্রশস্ত। যেখানে কোনরূপ শিক্ষা নাই, সেখানেও পতিত ভূমিতে স্বয়ং উৎপন্ন কণ্টকগুল্মের মত কুশিক্ষা আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। আবার এক স্থানে সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা উভয়ই স্থান পাইলে কু সুকে পরাজিত করিবেই। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। ধান্যের অঙ্কুরগুলির সহিত নিষ্প্রয়োজন তৃণাঙ্কুরগুলি জন্মাইতে দিলে তাহা ধান্যাঙ্কুর বিনষ্ট করিবেই। এজন্য কুশিক্ষার তৃণগুলি সমূলে উৎপাটিত করা আবশ্যক।

দেশে এখন এই শিক্ষা বিকার ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ফল— বিনয়, গুরুজনে ভক্তি, শাস্ত্রে বিশ্বাস, ঈশ্বরে প্রেম সবই দুর্লভ হইতেছে।

ইহার প্রতি হেতু—

(১) সদাচার সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠানে শিথিলতা। (২) সদ্গ্রন্থপাঠের অভাব ও অসদ্ গ্রন্থ পাঠের সুযোগ।

আমাদের সনাতন শাস্ত্র কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সদাচার পালন করিলে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক, উভয়-প্রকার শৌচ সাধিত হয়। আভ্যন্তরিক শৌচের নামান্তর নৈতিক শিক্ষা। শিক্ষার আনুষ্ঠানিক দিক্‌টী সদাচারের উপর নির্ভর করে। আর অন্য অংশটী—সদ্গ্রন্থপাঠ ও অসদ্গ্রন্থের পরিহারের দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই জন্য পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত না

* মুর্শিদাবাদ-ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে পঠিত।

হইলেও সদাচার পালন করিয়া অনেকে শিক্ষিতরূপে পরিগণিত। আবার গ্রন্থশিক্ষায় পূর্ণরূপে শিক্ষিত হইলেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা সদাচারে বর্জ্জিত ব্যক্তি সুশিক্ষিত বলিয়া গণ্য হন না।

ব্রাহ্মণ-সম্মিলন—সদাচার সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা করিতেছেন, সুতরাং শিক্ষার দ্বিতীয় অংশ যাহার উপর নির্ভর করে, সেই সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও অসদ্ গ্রন্থ পরিহার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সদ্‌গ্রন্থ ও অসদ্‌গ্রন্থ অর্থে ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মগ্লানিকর গ্রন্থ। আজকাল স্কুল কালেজের ছাত্রদিগের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মপুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি সদ্‌গ্রন্থ নহে। বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি বালকগণ যে ভাবে শিক্ষিত হইবে, যে ভাবে তাহাদের মুদ্রিত মনোবৃত্তিগুলিকে প্রকাশিত করা যাইবে, তাহাদের চরিত্র, তাহাদের হৃদয়ের বিশ্বাসও তেমনি সেইভাবে গঠিত হইবে।

বাল্যকাল হইতে যে সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। এখন যে সকল বাঙ্গলা ও ইংরাজী ইতিহাস পঠিত হয়, তাহাতে বহুস্থানে ধর্ম্ম গ্লানিকর বাক্য বিন্যস্ত আছে। এই সকল গ্রন্থের কএকখানি এই দেশের শিক্ষিতগণের প্রণীত, কএকখানি বা বিদেশীয় রচিত।

প্রজাবৎসল সম্রাটের সুশাসনে আমরা আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড়ই স্বাধীন। যেহেতু, এ সম্বন্ধে স্বয়ং সম্রাট্ আমাদের সহায়, ধর্ম্মপালন করিতে কোন নিষেধ আমাদের নাই। অবিশ্রান্তভাবে, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কোনপ্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই। তবে কেন আমরা নিজেরাই নিজেদের ধর্ম্মগ্লানির পথ করিতেছি? এই সব ইতিহাস কি চেষ্টা করিলে আমরা সংশোধন করিতে পারি না? সামান্য অনবধানতা পরিত্যাগ করিলে, একটু জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিতে চাহিলে আমরা কি আমাদের ইতিহাসের প্রকৃত তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি না? আজ ব্রাহ্মণ-সম্মিলনে উপস্থিত ধর্ম্মানুরাগী বিপ্রবৃন্দকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া, দেশের একটা প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশের চেষ্টা করুন। শাস্ত্রমর্য্যাদা, ধর্ম্মের স্বরূপ, ব্রাহ্মণ্যের উদ্দেশ্য, এইগুলি বেশ প্রকাশ করিয়া আমাদেরই পুরাণাদি হইতে ইতিহাস সঙ্কলিত হউক। এখনও যাঁহারা পরকীয় কল্পনা রাজ্য হইতে একটু দূরে আছেন, তাঁহাদের দ্বারা এই কার্য্য করাইলেই ভাল হয়। পাঠ্য ইতিহাস দু'একখানির পরিচয় দিতেছি। একস্থানে লিখিত আছে—

"অতি প্রাচীনকালে এই দেশে ভরতনামে এক রাজা ছিলেন। "লোকে বলে" যে তাঁহারই নামে ভারতবর্ষ হইয়াছে।" (ঈশান ঘোষের ইতিহাস)

এইখানে "লোকে বলে" এই কথাটী প্রয়োগ করা কি যুক্তিযুক্ত?

শাস্ত্রেই আছে যে,—

"ভারতাদ্ ভারতী কীর্ত্তির্যেনেদং ভারতং কুলম্"

মহাভারত। আদি।

সুতরাং "লোকে বলে" এই বাক্যদ্বারা শাস্ত্রের প্রতি আস্থাহীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। যদিও ইহা সামান্য ত্রুটি, তাহা হইলেও এই ইতিহাস যে বালকদিগের জন্য। তাহাদের মনে এই সকল সামান্য সামান্য কারণ হইতে যে তিল তিল করিয়া শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার পর্ব্বত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আবার আর একস্থলে আছে—"হিন্দুরা সকল দিকেই তাঁহাদের উন্নতিসাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সুন্দর শ্লোক রচনা করিয়া যে দেবতা জল দেন, যিনি শস্য দেন, সেই সমস্ত দেবতার স্তুতিগান করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শ্লোকগুলি পরে একত্রিত হইয়াছিল, ইহারই নাম ঋগ্বেদ!" (১২পৃঃ ১৮ পং খগেন্দ্র মিত্রের ইতিহাস) এইরূপ অনেকেই নিজেদের ইতিহাসে বেদ যে মনুষ্য রচিত তাহা নিঃসঙ্কোচে লিখিয়া গিয়াছেন। বেদ যে স্বয়ং কমলাসনের মুখ পদ্মবিনিঃসৃত ঐশ-শক্তি সম্পন্ন এ সত্য বিশ্বাস বালক হৃদয়ে না জাগাইলে তাহারা ক্রমেই অবিশ্বাসী হইবে। শাস্ত্রে, মন্ত্রে অবিশ্বাস হইলে তাহার ফল ভয়ানক। সেই অবিশ্বাস হইতে ক্রমে গুরুজন, পিতামাতা সকলের উপর ভক্তি কমিয়া যায়। নিজের বিবেক প্রধান বলিয়া মনে হয় এবং হেতুবাদী হইয়া সকলের অবাধ্য হইয়া উঠে। সে ফল এখন কালেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রায়ই ঘটিতেছে।

তারপর ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কারণ লইয়া অনেকেই অনেকরূপ লিখিয়াছেন।

তন্মধ্যে প্রধান মত—

"আগে লোকে যাগযজ্ঞ করিয়া অসংখ্য পশু বলিদান করিয়া ধর্ম্ম করিতেছি মনে করিত। প্রকৃতধর্ম্ম তাহাতে হয় না, নিজে ভাল না হইলে কি ধর্ম্ম হয়?" (খগেন্দ্র মিত্র,এম্ এ, ৩১ পৃঃ ১৫ পং)

আর একজন লিখিতেছেন ;—

"বেদের মতে চলিয়া লোকে আরও কত যজ্ঞ করিত এবং তাহাতে শত শত পশু বলি দিত।

·········এই সকল নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া অনেক মহাপুরুষের প্রাণে আঘাত লাগিল।"

গৌণমত ;—

"ক্রমে পুরোহিতের একাধিপত্য হইল। তাহার দমনের জন্য বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন" (৺কৈলাস মান্নার ইতিহাস) এই গুলি পড়িলে প্রকৃতই কি বালকদের মনে বিধি-বোধিত বলিদান ও পুরোহিত গণের উপর একটা কুধারণা আসে না? যাগযজ্ঞের আধিক্য, বলি-দান, পুরোহিতের আধিপত্য, এই সকল কি একটী অবতার আবির্ভাবের কারণ! ইহাও কি সম্ভবপর? বুদ্ধদেব ভগবানের নবম অবতার। তিনি যে জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ আমাদের পুরাণাদি পাঠে যাহা জানা যায়, তাহা কি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিলে দোষজনক কার্য্য হইত? বিদেশীয়দের কল্পনা এতই কি মনোহর, যে সেগুলি পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই? শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত

·········তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"

ধর্ম্মগ্লানি না হইলে ত ভগবানের অবতার আবির্ভূত হ'ন না। বলিদান, যাগযজ্ঞ ধর্ম্মগ্লানি নহে, উহা ধর্ম্মের অঙ্গ। সুতরাং এরূপ কারণকল্পনাদ্বারা ভ্রান্ত মতের প্রচার করিয়া কোমল বুদ্ধি বালকগণকে ভ্রমে ফেলিবার প্রয়োজন বুঝি না।

ইতিহাসের কাল সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্র হইতে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা এখনকার সিদ্ধান্তের সহিত মিলে না। যখন এখনকার সিদ্ধান্তবাগীশগণের পরস্পরই কালনির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তখন দেশবাসী নিশ্চয়ই উঁহাদের কোন একটী সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী হইবে না। তাহা না হইলেই ভ্রান্তিতে পড়িবেন না।

আজকালকার বি,এ, শ্রেণীর পাঠ্য একখানি পুস্তক আছে, তাহার নাম (History of Sanskrit Literature) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।

ম্যাকডোনেল সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই ম্যাকডোনেল সাহেবই এই গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থ তাঁহার অসীম পরিশ্রম ও অশেষ বুদ্ধিমত্তার ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েক স্থলে তিনি ধর্ম্মগ্লানিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া হিন্দুমাত্রেরই প্রাণে ব্যথা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"When thoroughly subjected, the original inhabitants, ceasing to be called 'Dasyus' became the fourth caste under the later name of Sudras. The 'Dasyus' are described in the Rigveda as non-sacrificing, unbeliev ing and impious. They are also doubtless meant by the phallus-worshippers mentioned in two pssaages. The Aryans in course of time came to adopt this form of cult."

ভারতের আদিমনিবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে, তাহাদের দস্যু নাম দূর হইল এবং তাহাদের লইয়া শূদ্র নামে চতুর্থ জাতির সৃষ্টি হইল। ঋগ্বেদে দস্যুদের ধর্ম্মকর্ম্মবিহীন নাস্তিক এবং অপবিত্র বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের দুটী বাক্যে "লিঙ্গপূজক" নাম উল্লিখিত আছে এবং ঐ শব্দদ্বারা নিশ্চয়ই দস্যুদের বুঝাইয়াছে। আর্য্যগণ কালক্রমে, এই লিঙ্গপূজা-পদ্ধতি গ্রহণ করিলেন।

সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গিয়া—হিন্দুর প্রধান আরাধ্য দেবতাদিগকে লইয়া এইরূপ খেলা করা তাঁহার মত বিজ্ঞের উচিত কার্য্য হয় নাই।

আবার জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন :—

৩৮৭ পৃঃ ও ৩৮৮ পৃঃ (Doctrine of Trasmigration).

জন্মান্তরবাদ আর্য্যগণ আদিম অসভ্যদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা, অর্দ্ধ অসভ্য জাতির ভিতর এ বিশ্বাস আছে যে, মৃত্যুর পর আত্মা গাছের গুঁড়ি বা পশুর দেহে প্রবেশ করে। এখনও ভারতের সাঁওতালরা বলে যে, সৎকর্ম্মকারীর আত্মা ফলশালী বৃক্ষের মধ্যে গমন করে। ইহা অসভ্যদের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেও আর্য্যগণ অবশ্যই প্রশংসার্হ,

যে হেতু পুনর্জন্মবাদ দ্বারা সংসারের অবিচ্ছিন্ন স্থিতির সমাধান করিয়াছেন। আবার একস্থানে হিন্দুর ষড়্ দর্শনকে এক প্রকার নাস্তিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সকল মন্তব্য পড়িলে মনে মনে হাসিও পায় আবার একটু ব্যথাও লাগে। হাসি পায় ভারতের অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্তগুলিকে অসভ্যদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত এইরূপ কথাদ্বারা অসারত্ব প্রতিপাদনের বৃথা চেষ্টা দেখিয়া। আর দুঃখ হয়—আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এইসব ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধী গ্রন্থগুলি কেন এখনও পাঠ্যরূপে রাখিয়াছেন, কেন এখনও এইসব স্থান গুলি পরিত্যাগ করিতে উদাসীন আছেন। আর দুঃখ হয় যে বালককাল হইতে পূর্ব্বোক্ত-রূপ বাঙ্গালা ইংরাজী ইতিহাস পড়িয়া বালকদের মনে যে অবিশ্বাস বীজ রোপিত হয়, তাহাই আবার পরিণত বয়সে এইসব পুস্তক পাঠের জলসেক দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া বৃহৎ অবিশ্বাস বৃক্ষে পরিণত হয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই, আমাদের প্রকৃত শাস্ত্র অনুযায়ী একখানি ইতিহাস সঙ্কলন বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ কার্য্য ব্রাহ্মণ সম্মিলন না করিলে কে করিবে। ইতিহাসের অতিশয় প্রচার বলিয়া তাহার আলোচনা এত বিস্তৃত ভাবে করিলাম।

ধর্ম্মগ্লানিকর আরও অনেক পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত আছে, সে সমস্তের আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে। তাহার নিবারণের জন্য ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী দেশীয় রাজগণের সাহায্যে প্রজানুরক্ত সম্রাট্ প্রতিনিধি লাট মহোদয়কে জ্ঞাপন করিতে হইবে। আর একদিক্ হইতে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ধর্ম্মগ্রন্থের বহুল প্রচার হইলে আপনা হইতেই ধর্ম্মগ্লানিকর পুস্তকের প্রভাব কমিয়া আসে। তাহার জন্য আমাদের বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

একপক্ষের কথা শুনিয়া দেশবাসীর কর্ণ ভরিয়া উঠিয়াছে, এখনও হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ভরে নাই, এখনও আর্য্যবংশধরগণ ভারতের সত্য পূত কর্ম্মগাথা ভারতবাসীর কর্ণে অল্পে অল্পে ঢালিয়া দাও! অল্পে অল্পে তাহাদের ভ্রান্তি দূর করিয়া চেতনা সঞ্চার করিয়া দাও। এখনও আধসুপ্ত আধজাগ্রত ভাব, আধ আসুর আধ দেবভাব বর্ত্তমান। এখনও ব্রহ্মণ্যদেবের করুণাজলধির বিন্দু বিন্দু কণিকা দেশবাসীর মস্তকে বর্ষিত হয়। এখনও সময় আছে—উঠ, জাগো।

শ্রী শ্রীজীব দেবশর্ম্মা।

সংবাদ।

মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন।

বিগত ৯ই ও ১০ই বৈশাখ দুই দিন মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর সদরে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অবসর প্রাপ্ত জেলা-জজ রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭ই বৈশাখ শেষ রাত্রিতে সভাপতি মহাশয় বহরমপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কতিপয় সভ্য, বহু স্বেচ্ছাসেবক, নগরবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন।

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ-স্কুলের সুপ্রশস্ত বৃহৎ "হলে" সভার স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। সুদূর ৺কাশীধাম, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, গৌহাটী, আসাম, ভট্টপল্লী, বীরভূম, বর্দ্ধমান, রাজসাহী ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থান হইতে শতাধিক ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বহরমপুরে শুভাগমন করতঃ সভাস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, (৺কাশীধাম) শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ (ত্রিপুরা), শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (পাবনা), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস স্মৃতিভূষণ ও সারদাচন্দ্র কবিভূষণ (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (বগুড়া), শ্রীযুক্ত বামনদাস বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও শ্রীযুক্ত অভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম (রাজসাহী), শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম ন্যায়তীর্থ ও শ্রীযুক্ত ছকড়ি ন্যায়রত্ন (বীরভূম), শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ (মেদিনীপুর), শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত স্মৃতিতীর্থ (যশোহর), শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন (কার্ত্তিকপুর গৌরীপুর), শ্রীযুক্ত উমেশানন্দ ন্যায়রত্ন (মিতরা), শ্রীযুক্ত কালীকান্ত তর্কশিরোরত্ন (কালিকচ্ছ), শ্রীযুক্ত শশিভূষণ শিরোমণি (গঙ্গাটিকুরী), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তর্করত্ন (বিল্বপুষ্করিণী), শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র স্মৃতিপঞ্চানন, শ্রীযুক্ত রামতারণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ (বহরমপুর জুবিলী টোল), শ্রীযুক্ত শশিমোহন তর্কশাস্ত্রী (নোয়াখালী), শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (ভবানীপুর), শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন (শান্তিপুর), শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (নবদ্বীপ), শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ঝা ও শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ (পাকুড়), প্রভৃতি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিখ্যাত লালাবাবুর বংশধর বংশধর কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তাঁহার নিজব্যয়ে তাঁহার ইষ্টদেবতা-বংশীয় শ্রীযুক্ত ষোড়শীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সভায় প্রেরণ করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

সুসঙ্গের মহারাজা বাহাদুর, তাহেরপুরের রাজাবাহাদুর, হেতমপুরের মহারাজ কুমার বাহাদুর, তাহেরপুরের কুমার বাহাদুর, চৌগ্রামের রাজাবাহাদুর, কাশীমবাজারের কুমার শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন

রায় বাহাদুর, কুণ্ডবাটীর কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ, কুণ্ডলা, দাঁইহাট, গঙ্গাটিকুরী, রতনপুর, স্থল, সীতাহাটী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জমীদারগণ ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল প্রমুখ কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলগণ, ভিন্ন ভিন্ন জেলা-কোর্টের উকীল, মোক্তার রাজকর্ম্মচারী ইত্যাদি ন্যূনাধিক ৪০০ শত গণ্যমান্য ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া সভাস্থলের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বহরমপুর সহরের যে অংশ অতি রমণীয় স্বাস্থ্যকর সেই অংশে কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাহাদুরের অজস্র অর্থব্যয়ে নূতন কলেজ-স্কুল নির্ম্মিত হইয়াছে। এত বড় অট্টালিকা মুর্শিদাবাদে আর নাই। ইহার দ্বিতল "হলে" সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থল যথা-সম্ভব লতাপুষ্পে সজ্জিত করা হইয়াছিল। দারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপ নিবারণের জন্য অনেকগুলি টানাপাখার ব্যবস্থা ছিল। সুপ্রশস্ত ও অত্যুচ্চ সভাস্থল বলিয়া গ্রীষ্মের উত্তাপ আদৌ অনুভূত হয় নাই। সমাগত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্য বিরাট সভাস্থলে দুইটী পৃথক্ উপ-বেশনের আসন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত ন্যূনাধিক ৪০০০ চারি সহস্র দর্শকের সমাগম হইয়াছিল।

মাননীয় কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুর, মহারাজ কুমার শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বনবিহারী সেন প্রমুখ স্থানীয় উকীল জমীদার ও রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতি নিমন্ত্রিত হইয়া সভাস্থলে সমাগত হইয়া মহাসম্মিলনের কার্য্যপ্রণালী বিশেষ আনন্দের সহিত পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি প্রতিনিধিবর্গ ও মফঃস্বলস্থ দর্শকমণ্ডলীর বাসস্থান জন্য তাঁহার বহরমপুর কলেজের ছাত্রাবাসগুলি, তৈজসপত্র ও শয্যার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রতিনিধিগণের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। সভার আরম্ভ হইতে শেষপর্য্যন্ত প্রতিদিনই সভাগৃহের একপ্রান্তে উপবিষ্ট থাকিয়া ব্রাহ্মণসেবা যে ব্রাহ্মণেতর জাতির স্পৃহণীয় তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্যের পরিচয় পাইয়া সমবেত ব্রাহ্মণগণ মুগ্ধ ও আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

পাকুড়ের বেদবিদ্যালয়ের বেদাধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ঝাঁ বেদরত্ন মহাশয় ও কলিকাতা বেদবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্বর-সংযোগে বেদগান করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। সভাপতি মহা-শয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ও দৌহিত্র সুর লয় সহযোগে গীতার বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সভাস্থ সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ লাহিড়ী কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় রচিত একটী সম্ভাষণ সঙ্গীত শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তানপুরা সহযোগে গান করিয়া সকলকে মোহিত করিলেন।

অনুষ্ঠান সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, মহোদয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে তিনি মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের প্রতি যে আনুকূল্য করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া সকলকে

তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলেন। অনন্তর কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক ৺গয়ারাম স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সকলকে শোকাচ্ছন্ন করেন।

অনন্তর রাণী আন্নাকালী দেবী প্রতিষ্ঠিত জুবিলী টোলের অন্যতম ছাত্র ও অনুষ্ঠান সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ মহাশয় সুললিত সরল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ করেন।

অনন্তর প্রসিদ্ধ বক্তা, ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিকে এই মহাসম্মিলনের সভাপতিত্বে বরণ করার প্রয়োজনীয়তা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

সভাপতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বকীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার অভিভাষণ বিস্তৃত ও সুচিন্তিত, তাহাতে সরলভাব এত অধিক ছিল যে তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন।

অভিভাষণ পাঠকালে তাহার সমুচ্চারিত বাণী সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীয় হৃদয়ের নিদ্রিত শক্তির উন্মেষণের চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহার অভিভাষণ শেষ হইলে যে সমস্ত প্রতিনিধি নানা কারণে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের সহানুভূতি পূর্ণ টেলিগ্রাম ও পত্র সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ বর্দ্ধমান রাজ কলেজ,) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় সদাচার শীর্ষক একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর সায়ংকাল উপস্থিত হওয়ায় সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য এক ঘণ্টাকাল সভার অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। সন্ধ্যার পর পুনরায় সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সন্ধ্যাহ্নিকের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অনন্তর বাগ্মী শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ভাগবৎভূষণ মহাশয় সন্ধ্যাহ্নিক ও সদাচার সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তাহার বক্তৃতা এমনই আবেগময়ী ও মনোহর হইয়াছিল যে সভাস্থ জনবৃন্দ মুগ্ধ, উল্লসিত ও অশ্রুপূর্ণনয়ন হইয়া বক্তার গুণের শতমুখী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই বক্তৃতার পর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় প্রথম দিনের সভার কার্য্য শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিন বেলা দুই ঘটিকার সময় অধিবেশনের কার্য্য আরব্ধ হয়। প্রথমে বেদগান দ্বারা সভার উদ্বোধন হয়। এইদিন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নির্দ্ধারণ ঘোষণা হয়।

১ম। প্রত্যেক ব্রাহ্মণপরিবারস্থ প্রত্যেক উপনীত ব্যক্তি যাহাতে ত্রিসন্ধ্যোপাসনা যথাশাস্ত্র করেন এবং ব্রাহ্মণোচিত সদাচারের যথাসম্ভব রক্ষা করেন, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন ও বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে যাহাতে সদাচার রক্ষা হয় এবং

ব্রাহ্মণসভার তত্ত্বাবধানে যাহাতে ছাত্রাবাস স্থাপন করা যায়, তাঁহার বিহিত ব্যবস্থা ব্রাহ্মণসভা সমূহ করিবেন।

বক্তা—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ।

শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সাংখ্যস্মৃতিতীর্থ।

২য়। জাতিগত বিশুদ্ধিরক্ষার ও ব্রাহ্মণের কুলপরিচয় রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এবং বংশাবলী সুপ্রণালীতে নিয়মবদ্ধরূপে পাঠ করিবার জন্য নামাশ্লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

বক্তা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। (উকীল হাইকোর্ট)

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩য়। ব্রাহ্মণবিদ্যার্থীদিগের শাস্ত্র বিধিমত অধ্যয়ন জন্য ব্রাহ্মণবিদ্যালয় সংস্থাপন ও চতুষ্পাঠী সমূহের আবশ্যকমত সংস্কার পূর্ব্বক রক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য এবং অন্যান্য বর্ণভুক্ত ব্যক্তি দিগের প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য বিভিন্ন বর্ণভুক্ত সমাজকে সাহায্য ও উপদেশ করা হউক।

ব্রাহ্মণবিদ্যালয় বা চতুষ্পাঠী সমূহের সংস্কার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাউক।

ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে আদর্শ চতুষ্পাঠী প্রত্যেক জিলাতে অন্যূন একটী সংস্থাপনের চেষ্টা করা হউক।

বর্ত্তমান চতুষ্পাঠী সমূহের সংস্কার জন্য এই ব্যবস্থা করা হউক যে, যে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক স্বয়ং সদাচার পূত এবং ছাত্রদিগের মধ্যেও সদাচার রক্ষণে বিশেষ যত্নবান্, ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদের প্রতিই কার্য্যতঃ অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

অধ্যাপকগণের মধ্যে কে কোন শ্রেণীর অধ্যাপক, তাহা সভাস্থিত পণ্ডিতগণের বিচারে স্থিরীকৃত হইয়া যোগ্যতানুসারে সম্মান পাইবার অধিকারী হইবেন এবং ক্রিয়াবান্ গৃহিগণ এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিবেন।

বাঙ্গালা ও ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে সদাচার ও বর্ণভাব প্রবর্ত্তন জন্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ দ্বারা চেষ্টা করান উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য হইবে।

বক্তা—শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম্, এ, বি, এল,
এম, আর, এ, এস।
(উকীল হাইকোর্ট)

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ।

৪র্থ। বরপণ গ্রহণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ সুতরাং সমাজে ঘৃণার্হ হইবে। পাত্রপক্ষের প্রস্তাব মতে বিবাহকালে যাহা কিছু দেওয়া হইবে, তাহাই পণশব্দবাচ্য। কন্যাপক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহা কিছু বরপক্ষকে দিবেন তাহা পণ বলিয়া গৃহীত হইবে না।

বক্তা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

৫ম। হিন্দুসমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার্থে ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সুবিধার জন্য হিন্দুগ্রামে সাধারণ দেবালয় ও জলাশয়ের রক্ষা ও সংস্থাপন করা হউক এবং গোরক্ষা ও গোচারণ ভূমি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণও যাহাতে স্বয়ং গোপালন করেন তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হউক।

বক্তা—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ।
শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী।
শ্রীযুক্ত মাতাদীন শুকুল।

৬ষ্ঠ। আচারবান্ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত ও কুলাচার্য্য মহোদয়গণকে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ হইতে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে বৃত্তিদানে সমাজে রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

বক্তা—মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মৈত্র।
শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন সান্যাল।

৭ম। বিদ্যালয়ে হিন্দুধর্ম্মের গ্লানিকর পুস্তক অধ্যয়ন নিবারণের এবং ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্মগ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষাতে প্রণয়নের বিহিত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা তদ্‌বিষয়ের চেষ্টা করিবেন।

বক্তা—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি,এ। (মুর্শিদাবাদ)
শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

৮ম। সুযোগ্য ধার্ম্মিকপণ্ডিতগণের সাহায্যে বিশুদ্ধভাবে ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর অনুমোদিত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ ও সঙ্কলনের ব্যবস্থা করা হউক।

বক্তা—শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়।
উকীল (বর্দ্ধমান)

৯ম। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ মধ্যে মেলবন্ধন সম্বন্ধে বিগত কালীঘাট ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে স্থিরীকৃত নিম্নলিখিত সংস্কারসমূহ কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হউক।

(ক) কুলীন সম্প্রদায়ের আদান প্রদান কার্য্যে নৈকুষ্য কুলীন মধ্যে বহু অনিষ্টকর পর্য্যায় প্রথা, এবং ভঙ্গকুলীন মধ্যে অনিষ্টকর পুরুষগণনা প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(খ) কুলীনগণের স্বমেল মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট বংশের সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট বংশের কন্যার বিবাহ, যাহা ঘরবন্ধন নামে অভিহিত আছে, তাহার ত্যাগে কৌলিন্যের কোন হানি হইবে না।

(গ) কুলীনগণ প্রতিযোগী মেলে কন্যা আদান প্রদান করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রতিযোগী মেল ভিন্ন মেলে আদান প্রদান করিলেও কৌলিন্যের কোনও হানি হইবে না।

বক্তা—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়। (কাশীধাম)

১০ ম। প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার অত্যাবশ্যক। এ বিষয় উপায় নির্দ্ধারণের ভার বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার উপর অর্পণ করা হউক এবং তাঁহারা যোগ্য ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন, তাহা আগামী মহাসম্মিলনে উপস্থিত করার জন্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভাকে অনুরোধ করা হউক।

বক্তা—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১১ শ। ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের সিদ্ধান্তসমূহ কার্য্যে পরিণত করার জন্য গঠিত স্থায়ী ব্যবস্থাপকমণ্ডলী—উপদেশকমণ্ডলী, প্রবর্ত্তকমণ্ডলীর সাহায্যে কলিকাতা নগরীতে তাহাদের কেন্দ্রস্থল নির্দ্ধারণ করিয়া বিভিন্ন জেলাতে এবং বিভিন্ন ব্রাহ্মণসমাজে ব্রাহ্মণসভা সংস্থাপন করা হউক। এবং প্রবর্ত্তকমণ্ডলীর একটী কার্য্যকরী সমিতি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা কলিকাতাতে সুসঙ্গের মহারাজের সভাপতিত্বে—অদ্যাবধি একমাস মধ্যে গঠিত করিবেন। তাহার অর্থ সংগ্রহকার্য্য পরিচালনের সুব্যবস্থা করা হউক এবং উক্ত উদ্দেশ্য সমূহ সাধনজন্য এবং সমাজশক্তির উন্মেষণ জন্য আবশ্যকমতে বিভিন্নস্থানে মহাসম্মিলন আহ্বান করা হউক।

বক্তা—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উকীল (ঢাকা মুন্সীগঞ্জ)

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার আচার্য্য।

(ফরিদপুর)

১২ শ। মহামান্য ভারত-সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ জয়শ্রী ও সাম্রাজ্যের সর্ব্ববিধ মঙ্গলদ্বারা বিভূষিত হউন, এতদর্থে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বক্তা—মহারাজ শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি,এ।

১৩ শ। কাশীমবাজারের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি আই ই মহোদয়কে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের পক্ষ হইতে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন।

আশীর্ব্বাক—মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি,এ।

অনন্তর ফরিদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার আচার্য্য মহাশয় স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। এবং আগামী বর্ষে—ফরিদপুর জেলায় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনকে আহ্বান করিলেন। সভাস্থ সকলে তাঁহার এই আহ্বানে সম্মত হইলেন এবং আহ্বানকারীকে শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহরমপুরে একটী ব্রাহ্মণসভা পুনঃ স্থাপনের কথা বলেন। পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণসভা বহরমপুরে ছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণকে লইয়া ঐ ব্রাহ্মণ-সভা পুনঃ গঠিত হউক এই প্রস্তাব করেন।

অনন্তর প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম,এ, মহাশয় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল

সন্ধ্যাহ্নিকের তত্ত্ব সম্বন্ধ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় সকলেই পুলকিত হইয়াছিলেন। রাত্রি তখন ১১ ঘটিকা হইলেও সকলেই স্থিরভাবে তাঁহার অমৃত নিস্যন্দিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয় নিজের ত্রুটি ও বিচ্যুতি প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণ মহোদয়গণের নিকট নিজের অযোগ্যতা প্রকাশ করেন। অনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া কার্য্য শেষ হয়। তখন রাত্রি ১২ টা।

এ বৎসর বহরমপুরে ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন যেরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার জন্য সমগ্র মুর্শিদাবাদবাসী ব্রাহ্মণগণ সকলের নিকট বিশেষ ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য।

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ যেরূপ প্রখর রৌদ্রের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, যেরূপ ব্রাহ্মণসেবা দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। তজ্জন্য আমরা স্বেচ্ছাসেবকগণের পরিচালক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল, মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অবশেষে কার্য্যকরী সমিতির নিম্নলিখিত সভ্যগণ ও আমাদের বিশের ধন্যবাদের পাত্র। প্রায় ৪ মাস যাবৎ কঠিন পরিশ্রম ও কর্ম্ম করিয়া তাঁহারা এই ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অধিবেশন বহরমপুরে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। কত বাধা কত বিঘ্ন যে ইহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য—ব্রহ্মণ্যদেব ইহাদের মঙ্গল করুন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কার্য্যকরী-সমিতির সভাপতি।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।
সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামতারণ স্মৃতিতীর্থ।
শ্রীযুক্ত উমেশনাথ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার মৈত্র।
শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর বাগচী।
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ।
} সহকারী সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত ষোড়শীমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।
} সভ্যগণ—

সভাস্থানে বহু ব্রাহ্মণের সমাগম হইবে জানিতে পারিয়া তাঁহাদের পদরজ গ্রহণ জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

সভাস্থান সিমেণ্ট করা হেতু তাহাতে পদরজ পতিত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই, এজন্য প্রথম দিন সকলে সতরঞ্চ জাজিম হইতে অতি কষ্টে পদধূলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনে সোপানাবলীর উপর কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর ধূলিরাশি সংগৃহীত করিয়া রাখা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ পাদুকা ত্যাগপূর্ব্বক উক্ত সংগৃহীত ধূলিরাশির উপর দিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শে পবিত্র রজঃকণা মুহূর্ত্তমধ্যে দর্শকগণ সংগ্রহ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে বান্ধিয়া স্ব স্ব গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

অনুভূতি।

(১)

আমি একলা বসে সাঁঝের বেলা—
পল্লী নদীর ধারে,
তখন ঢেউপরে ঢেউ রঙ্গকরে—
পড়ছে বেলার পরে,
অস্তরবির রক্তরেখা
পশ্চিমেতে যাচ্ছে দেখা
আকুল করে শাখীর শাখা
ফিরছে পাখী নীড়ে;
আমি একলা বসে সাঁঝের বেলা—
পল্লী নদীর ধারে,

(২)

দূরে তখন গ্রামের মাঝে
তুলসী বেদীর মূলে
ভক্তি ভরে পল্লী বধূ
দিচ্ছে প্রদীপ জেলে,
গোষ্ঠ ফেরা রাখাল গানে
উদাস করা করুণ তানে
কি রাগিণী বাজলো প্রাণে
সুপ্ত মরম তলে,
লাগলো কাহার চরণ পরশ
চিত্ত শত দলে,

(৩)

বন্দনার শঙ্খ নাদে
বার্ত্তা কাহার ঘরে ঘরে
প্রচার হ'ল নিমেষ মাঝে
সন্ধ্যা অন্ধকারে,
আকুল করা এমনি সাঝে
কার নুপুর উঠলো বেজে—
ঝিল্লি তানে কুঞ্জমাঝে
কাহার অভিসারে;
সন্ধ্যা উদার আকাশ তলে
বিশ্ব সাগর তীরে,

(৪)

ওগো এমনি করে দিবস রাতি
পাচ্ছি আভাস হৃদয় স্বামি,
তবু হাত বাড়ালে ধর্‌তে তোমায়
পাইনে খুঁজে আমি,
রহস্যের ওই ভবনছেড়ে
ব্যর্থ হৃদয় আসন পরে
কবে তুমি আসবে ফিরে
ওগো অন্তর্য্যামী
(হায়) কবে আমার হবে প্রভাত
মোহ আঁধার যামী॥

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। চতুর্থবর্ষের ব্রাহ্মণ-সমাজের বর্ষারম্ভ ১৩১২ সালের আশ্বিন মাস হইতে হইয়াছে। এবৎসর হইতে আমরা ইহার উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নবান হইয়াছি। দারুণ যুদ্ধ উপলক্ষে কাগজ ভীষণ দুর্ম্মূল্য হইলেও সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি। এ সময়ে যে সমস্ত গ্রাহকবর্গ এ বৎসরের পত্রিকাগ্রহণে অনিচ্ছুক তাঁহারা যেন অবিলম্বে সংবাদ জ্ঞাপন করেন। কারণ অসময়ে ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজের অনর্থক ক্ষতি করিয়া কাহারও লাভ নাই। বলা বাহুল্য আমরা প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু করিয়া ভিঃ-পিঃ করিয়া থাকি যাঁহাদের টাকা দিতে যেরূপ সুবিধা তাহা জানাইলে আমরা সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

২। এবার হইতে ভিঃ পিঃ প্রেরণের বিশেষ সুবিধা করা হইয়াছে। গ্রাহকবর্গের নিকট অন্ততঃ ভিঃ পিঃ করিবার দশদিন পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইবে। এবং তাঁহাদের যদি কোনরূপ আপত্তি থাকে বা বক্তব্য থাকে। তাহা হইলে তদনুরূপ ব্যবস্থা হইবে। টাকা পাইলে প্রত্যেককেই রসিদ দেওয়াও হইবে।

৩। এই সমস্ত বন্দোবস্তের জন্য এবার হইতে ভিঃ পিঃ খরচা সাধারণতঃ ৶০ আনা করিয়া ধার্য্য করা হইল। এবার হইতে ভিঃ পিতে পত্রিকা লইতে হইলে ২৶০ দিতে হইবে। মণি অর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইলে অনর্থক /০ আনা কাহাকেও দিতে হইবে না। আমরাও অনর্থক ঝঞ্ঝাট হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২২ সালের আশ্বিন হইতে ইহার চতুর্থ বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউননা কেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা একটু কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিতে অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—মূল্যাদি ব্রাহ্মণ সভার কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ১০৩নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

শ্রীপঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ।
৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা হইতে
ব্রাহ্মণসমাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১নং রামতনু বসুর লেনস্থ জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No. C—675.

৪র্থ বর্ষ। { ১৮৩৮ ১৩২৩ শক, সাল, জ্যৈষ্ঠ। } ৯ম সংখ্যা।

গায়ত্রী-বোধন।

জাগ মা সাবিত্রী! জাগ ঘুমিও না আর,
তব জাগরণ বিনা ভারতে আবার।
কক্ষে কক্ষে বক্ষে বক্ষে জ্বলে তুষানল,
ধর্ম্ম চির নির্ব্বাসনে অধর্ম্ম প্রবল॥
নাচিছে তাণ্ডবে কত প্রেতিনী পিশাচ,
রতন লুটায়ে দিয়ে শিরে পরি কাচ।
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে তোমা, সন্তান তোমার,
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে জাগ পুনর্ব্বার॥
মহারৌদ্রীরূপে কর অধর্ম্ম সংহার,
আত্মতেজঃ পূর্ণ কর ব্রাহ্মণে আবার—
আবার জ্বলিবে মাগো পূত হোমানল,
ভারতের তপোবনে পুনঃ যোগবল॥
ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান হইবে ব্রাহ্মণ—
প্রণবে স্বরূপ তব করিবে দর্শন।
ছুটাবে শান্তির ধারা অমৃত সংবাদে—
লুটাবে দানবশিরঃ ব্রাহ্মণের পদে॥

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সামাজিক প্রসঙ্গ।

সভা, সমিতি, সম্মিলন প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত। প্রাচীনকালের সভা সমিতিগুলির সহিত বর্ত্তমানকালের সভাসমিতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে কি না তাহা লইয়া বিচার বিতণ্ডার আবশ্যক নাই। তবে প্রাচীনকালেও সভাসমিতির প্রয়োজনীয়তা ছিল এখনও আছে। সে হিসাবে সভাসমিতিগুলি যে দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্যই উদ্ভূত তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই।

এই মঙ্গল কথাটী লইয়া অনেক গণ্ডগোল আছে। কারণ মানুষের জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারে মঙ্গল জিনিষটাও বিভিন্নরূপে আত্ম প্রকাশ করে। বিশেষতঃ পারিপার্শ্বিক আচার অনুষ্ঠান ও সঙ্গগুলির সহিত যে শ্রেণীর মানবগণের যেরূপ সম্বন্ধ থাকে সেই সম্বন্ধানুসারেই মতবাদ গঠিত হয়, এই বিভিন্নমতবাদের চাপে পড়িয়া মঙ্গল জিনিষটাও নানারূপ ধারণ করে।

কোন সম্প্রদায় হয় ত সমাজের মঙ্গলের জন্য বিধবা বিবাহ চালাইতে বলেন, কোন সম্প্রদায় বা বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিতে বলেন, কোন সম্প্রদায় হিন্দুসমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাই মঙ্গলের নিদান বলেন, এইরূপ অনেক মতবাদ দেশের মঙ্গলের জন্য উদ্ভূত, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত হইয়া সভাসমিতির ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে আসিবেও। উক্তরূপ মতবাদ লইয়া যে সমস্ত সভা সমিতি গঠিত, তাহা ছাড়াও নানা রকমের সভাসমিতিও আছে। সেই সমস্তের মধ্যেও দেশের মঙ্গল কথাটাও আছে। সাহিত্য-সম্মিলন, সঙ্গীত-সমাজ, সাহিত্য-পারিষদ, প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দেশের মঙ্গলের অভিপ্রায়কে বাদ দিয়া যে সমস্ত সভাসমিতি কেবল আত্মবিনোদন মাত্র ফলকে লক্ষ্য করিয়া গজাইয়া উঠিয়াছে তাহাদের কথা আলোচ্য নহে।

হিন্দুসমাজের কিসে মঙ্গল হইবে, কিসে মঙ্গল হইবে না ইহা লইয়া হাজার নূতন তর্ক থাকুক, কিন্তু এটা আমরা বুঝি যে কিসে আমাদের মঙ্গল হইবে এই বিষয়টা আমাদের শাস্ত্রে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বিস্তার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, শুধু বুঝানও নহে, দৃষ্টান্ত রাখিয়া আদর্শ রখিয়া জগৎসমক্ষে প্রচারও করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে সেই দৃষ্টান্ত ও আদর্শকে মানিয়া চলিতেই হয়, নচেৎ হিন্দুত্ব নষ্ট হয়, সমাজের অমঙ্গল হয়। প্রাচীনকালের আদর্শ এ যুগের বাহ্যক্রমোন্নতিশীল লোকের অযোগ্য কিনা তাহা লইয়া এ প্রবন্ধ নহে। আমাদের সিদ্ধান্ত—আদর্শ চিরকালই আদর্শ, কালক্রমে যদি ইহাতে আবিলতা ধরে তাহাই মাত্র পরিহার্য্য। এই জন্য হিন্দুর দৃষ্টিতে শাস্ত্রের সমঞ্জসীভূত দেশগ্রাহ্য নিবন্ধকারদিগের মতবাদই অনুসরণীয় এবং এই মতবাদের অনুকূল—অনুকূল না হইলেও অন্ততঃ প্রতিকূলও নয়—এমন সভাসমিতিই গ্রাহ্য—অপর পরিত্যাজ্য। কারণ প্রতিকূল সভাসমিতিগুলি হিন্দুর নিকট অমঙ্গলের আস্পদ। এইজন্য কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স বা ঐ রকম সভাসমিতিতে যদি

হিন্দুর পক্ষে প্রতিকূল কোন সিদ্ধান্ত প্রকটিত হয়, তবে তাহাতে হিন্দুর যোগদান করিতে নাই। কারণ—নীরবে অধর্ম্মের অনুমোদন করিলেও তাহাতে হিন্দুর পাপ হয়।

মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"প্রযোজয়িতা, অনুমন্তা, কর্ত্তা চেতি সর্ব্বে স্বর্গনরক-ফলস্থ ভোক্তারঃ।" অর্থাৎ প্রয়োগ কর্ত্তা, কর্ত্তা এবং অনুমোদক সকলেই স্বর্গ নরক ফলের উপভোগ কারী হইয়া থাকে। অনুমোদন অনেক রকমে হয়, অনুমতি দাতাও যেমন অনুমোদক, তেমনি সামর্থ্য থাকিতে চুপ করিয়া থাকাও অনুমোদন। এই জন্য উক্তরূপে বিরুদ্ধ সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া যদি প্রতিবাদের সামর্থ্য না থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসা উচিৎ, নচেৎ না যাওয়াই উচিত। পাপ অনেক রকমে হয়, স্বয়ং সাক্ষাৎ পাপ অনুষ্ঠান করিলে গুরুতর দণ্ড পাইতে হয়। কিন্তু বাচিক পাপ বা মানসিক পাপের ও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

বৈজ্ঞানিকেরা পাপের কোন রকম জীবাণু আবিষ্কার করিতে পারুন আর নাই পারুন—কিন্তু পাপ সংক্রামক। সঙ্গগুণে ধীরে ধীরে পাপ সাচ্চা মানুষকেও আক্রমণ করিয়া তাহাকে ঝুটা করিয়া তুলিতে পারে। এই জন্য পাপের সংস্রব পর্য্যন্ত বর্জ্জনীয়। হিন্দুসমাজ পাপের চতুর্থ সঙ্গকারীকে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এই জন্য যেখানে পাপের কথাবার্ত্তা হয়, যেখানে পাপের সংস্রব দোষ থাকে, যেখানে আচার ব্যবহারেও পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেখানে যাইতে নাই। আমি ভাল থাকিলেই হইল, এ কথাটা বলা যত সহজ, থাকা ততটা সহজ নহে। ধীরে ধীরে কেমন করিয়া যে পাপ তোমার দেহে ঢুকিয়া তোমাকে আয়ত্ত করিয়া তুলিবে, তাহা তুমি বুঝিতেও পারিবে না, তখন তুমি হয় ত নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়া শাস্ত্রের দোষ দেখাইয়া সমাজের অন্যায় দেখাইয়া দশকে ভ্রূকুটী করিবে। কিন্তু একদিন ঘুম ভাঙ্গিলেই দেখিবে—তুমি আর গোড়ার তুমি নও। অনেক পরিবর্ত্তন তোমাতে প্রবেশ করিয়াছে। এইজন্য প্রকৃত হিন্দুকে আমরা পুনঃ পুনঃ সাবধান হইতে বলি যে, এইরূপ হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ-আচারী, বিরুদ্ধমতবাদী সভাসমিতির সঙ্গে যেন বংশের কাহার সম্বন্ধ না থাকে। এইরূপ সম্বন্ধ থাকে বলিয়াই আজকালকার স্কুল কলেজের ছেলেদের মধ্যে অনেক স্থলেই হিন্দুত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সভাসমিতি ও অনাচার।

সাহিত্য সম্মিলন, সঙ্গীত-সমাজ বা এই রকমের সভাসমিতিগুলি নানা শ্রেণীর লোক লইয়াই গঠিত। হিন্দু, মুসলমান্, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান কাহারও সাহিত্য-সম্মিলন প্রভৃতিতে অনধিকার নাই। নানা জাতি লইয়া এই সমস্ত সঙ্ঘ গঠিত হইলেও প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্যকে ভুলিয়া গিয়া সকলকে সকল ব্যবহারে এক হইয়া সে সম্মিলিত হইতে হইবে—এখন আইন বোধ হয় তৈয়ারী হয় নাই। যে জাতি বা সম্প্রদায় যে ব্যবহারটাকে কোনরূপ দূষ্য বিবেচনা করে না বা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও দূষ্য বিবেচনা করিতে বলে নাই, সেই জাতি

বা সম্প্রদায়ের সহিত যাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সেই ব্যবহারগুলিই দূষ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাঁহারা নিজের সেই সেই দূষ্য ব্যবহার বর্জ্জন করিয়া চলিবেন—ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। ইহার জন্য যদি বন্ধুবিচ্ছেদ সহিতে হয়, তাহাও স্বীকার্য্য। কারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে যে বলে—তাহার বন্ধুত্বের মূলে নিশ্চয়ই কোন খাদ আছে।

এবার সাহিত্য-সম্মিলনে, অনেক গুলি ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ, অথচ হয় ত ভিন্নজাতির নিকট তাহা বিরুদ্ধ নহে। সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় সভাপ্রারম্ভে উচ্চস্বরে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন, যদ্যপি তিনি দ্বিজাতির অন্তর্গত নহেন। দেশের এমনি দুর্ভাগ্য যে আবার তিনিই বেদান্ত-বাচস্পতি উপাধিধারী হইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে দৃশ্যতঃ এক পৈঠায় বসিবার যোগ্য নাম পাইয়াছেন। আবার ২৩শে বৈশাখ তারিখের বসুমতীতে "যশোহর সাহিত্যসম্মিলন" প্রবন্ধের একস্থলে বিশেষ সংবাদদাতা মহাশয় সাক্ষ্য দিয়াছেন যে,—"আমরা দেখিয়াছি ব্রাহ্মণ-সন্তান সানন্দে সকলের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতেছে—বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে অতিথির সাচ্ছন্দ্য বিধান করিতেছে। কোন কাজেই তাহাদের অপমান অভিমান বোধ নাই।" বসুমতীতে এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি। ভাবিতেছি সাহিত্য-সম্মিলন প্রভৃতিতে সমাজের একি সর্ব্বনাশ হইতেছে। অথচ বসুমতীর মত ব্রাহ্মণপরিচালিত সংবাদপত্রে ইহা আদরের সহিত গৌরবের সহিত প্রকাশিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ-সন্তান সকলের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়াছে? আমরা আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে সমাজের উপর বসিয়া যাহারা এই কর্ম্ম করিতে একটুমাত্রও অপমান বোধ করে নাই, অকর্ত্তব্য জ্ঞান করে নাই, তাহাদের কি প্রতিরোধ করিবার কেহ ছিল না? শুনিয়াছি অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত পর্য্যন্ত সে সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন—তাহারাও কি গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া শাস্ত্রজ্ঞান সমাজজ্ঞান হারাইয়া ছিলেন? ছি! ছি! আমরা লজ্জায় অধোবদন হইতেছি।

সভার মাঝখানে আবার সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বৃদ্ধা মাতাকে আনিয়া সকলের অভ্যর্থনা করান হইয়াছিল। পুরুষের অভ্যর্থনায় ত কুলাইল না, স্ত্রীলোক চাই। যশোহর নূতন জিনিষ দেখাইলেন। সাহিত্য সম্মিলনের মত সাধারণ কাজে অন্তঃপুরচারিণীদের যে প্রবেশ অধিকার নাই তাহা আমরা গতবারে বলিয়াছি। সুতরাং সে কথা লইয়া অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের মত থাকিবে—সে কখনও পুরুষ হইবে না। তাহাকে পুরুষের অধিকার দিলে হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিবে। আজ এই বৃদ্ধার দৃষ্টান্তে হিন্দুর শুদ্ধান্তচারিণীদের মনে নিশ্চয় একটা বাহির হওয়ার সংক্ষোভ উপস্থিত হইবে। হিন্দুশাস্ত্রও মাতৃরূপিণীদিগকে ঐইরূপ ভাবে যোগদানের নিষেধ আজ্ঞা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তারপর আরও হাস্যকর কথা বৃদ্ধ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যবহার। তিনি কিনা পণ্ডিত হইয়া বৃদ্ধ হইয়া অক্লেশে বৃদ্ধার গলায় মাল্য দান করিলেন। ইংরাজি ফ্যাসান এটা যতই কেন সম্মানিতের পুরস্কার হউক না, হিন্দুর নিকট ইহা সমাজবিরুদ্ধ ও ব্যবহার বিরুদ্ধ।

সাহিত্যসম্মিলনে ত এই অনাচার। দেশের অন্যান্য সভা সমিতিতে কি হয়, তাহা যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা অবশ্যই জানেন। সকলের চেয়ে বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই অনাচারীর দলরাই আবার অনেক সময়ে নিজেরা প্রকৃত হিন্দু বলিয়া ডঙ্কা বাজাইতে কুণ্ঠিত হন না।

মুর্শিদাবাদ—ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের সভাপতির—

অভিভাষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

সুতরাং বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যে বেদের অবিরোধে যে কোনও শাস্ত্র মানিয়া যিনি চলেন, তিনিই হিন্দু বলিয়া পরিগণিত। নবীন হিন্দুসম্প্রদায়কে আমার করযোড়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞাস্য, আপনারা কি কোনও শাস্ত্র মানিয়া থাকেন? যদি বলেন হাঁ, তাহা হইলে সেটী কোন্ শাস্ত্র? বলা বাহুল্য হিন্দুশাস্ত্রের মত বাইবল্, কোরাণও শাস্ত্র। হিন্দুশাস্ত্র আর্য্যের জন্য। অন্যান্য শাস্ত্র অন্যান্য ধর্ম্মীর। কলিকলুষদূষিত জীবের কল্যাণার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে মায়া মানুষ সাজিয়া যাহার যেমন অধিকার তাহার তদনুরূপ কর্ম্ম ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি ভ্রান্ত জীবের প্রতি দয়া করিয়া কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গণে গীতায় সকল কথাই সহজ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। গীতাতে প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ উভয়ই আছে। ইহাতে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের বিস্তৃত উপদেশ আছে। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও উপনিষদ্শাস্ত্র একাধারে সমস্তই। বেদাদি শাস্ত্র বুঝিতে না পার, গীতা পাঠ কর, গীতা বুঝিতে চেষ্টা কর, গীতার ধ্যান কর, তোমার সকল সংশয় দূর হইবে। ইহাতে সার্ব্ব-ভৌমিক সনাতন ধর্ম্মের বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে এবং ভারতীয় বিশেষ সনাতন ধর্ম্মেরও মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। অধ্যাত্মরাজ্যের এমন কোনও প্রশ্ন নাই, যাহার এই গীতায় মীমাংসা হয় নাই।

এই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"

যিনি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম করেন, তাঁহার সিদ্ধিও হয় না, সুখও হয় না, পরাগতিও হয় না—অতএব শাস্ত্রবিধানোক্ত কার্য্য জানিয়া তাহা করিতে থাকুন।

এই শাস্ত্র কোন্ শাস্ত্র? তাহার উত্তর জানিবার জন্য গুরু ও আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হউন। দ্বিজপদবাচ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নকালে আচার্য্য যাহা উপদেশ দেন, তাহাই তত্তৎ বর্ণের শাস্ত্রবিহিত প্রধান কর্ম্ম।

"শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাম্ নয়নে দ্বে বিনির্ম্মিতে।
কাণঃ স্যাদেকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ বিপ্রদিগের তুইটী নয়ন; একটী শ্রুতি, অপরটী স্মৃতি; একটী হীন হইলে কাণা হয়, আর তুইটী হীন হইলে অন্ধ হয়।

শূদ্রের জন্যও স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম ও ধর্ম্ম বিধিবদ্ধ আছে। এবং তাঁহাদিগেরও গুরূপদিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে তাহাদের স্বভাবজ সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

আজকাল আমাদের ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে এক নূতন ধরণের বৈদান্তিক সম্প্রদায় হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে শৌচাচারের প্রয়োজন নাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের প্রয়োজন নাই, খাদ্যাখাদ্যের বিধিনিষেধের প্রয়োজন নাই, দেবদেবী পূজার প্রয়োজন নাই, শ্রাদ্ধ তর্পণের প্রয়োজন নাই, কেবল ভাবিলেই হইল যে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এ সমস্তই ব্রহ্ম, এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। তাঁহাদিগের জন্য আমার বড়ই তুঃখ হয়। তাঁহারা যখন আমাদেরই মত অসংযমী, আমাদেরই মত যখন রিপুগণের দাস, আমাদেরই মত সুখতুঃখ অনুভব করেন, তখন ভগবানের আদিষ্ট কর্ম্মযোগ না করিয়া জ্ঞানযোগ করিতে গিয়া তাঁহারা বৃথা শ্রম করিতেছেন। তাঁহারা জানেন না যে, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ ভিন্ন কেহ জ্ঞানযোগে অধিকারী হয় না।

কেহ কেহ বলেন—উদরান্নের চেষ্টা করিব, না তোমার শাস্ত্র খুঁজিয়া বেড়াইব? তাহার উত্তর—শাস্ত্রবিধি গুরুর নিকট জানিয়া তদনুরূপ কর্ম্ম করিলে তোমার উদরান্নের সংস্থান অতি সহজেই হইবে। শাস্ত্র মান না বলিয়াই তুমি ভগবানের অপ্রিয় এবং তোমার উদরান্নের সংস্থানও হয় না। শাস্ত্র মানিয়া কর্ম্ম করিলে তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে, তোমার শরীর সুস্থ থাকিবে, শারীরিক যন্ত্রসমূহ স্ব স্ব কার্য্য ঠিক ঠিক করিবে, মনের প্রসন্নতা আসিবে, বাক্যের সংযম আসিবে, পাপ করিতে ভয় হইবে, হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইবে এবং সাংসারিক অভাব থাকিবে না। এগুলি আমার নিজের জীবনে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিয়া লাভ করিয়াছি। তুমি শাস্ত্র মানিয়া চল, তুমিও লাভ করিবে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন:—

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥"

ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং সেই যজ্ঞ যথাবিধি করিলেই দেবতারা সন্তুষ্ট হইবেন এবং প্রজাগণের কল্যাণ হইবে। ভগবানের কথা বিশ্বাস [illegible], যজ্ঞ

কর, সুখ পাইবে, দুঃখ দূর হইবে, অন্ধকার ঘুচিবে, আলো পাইবে, নিজের গন্তব্য পথ দেখিতে পাইবে। সংসার সুখময় হইবে; যে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার লইয়া জ্বালাতন হইতেছ, সেই স্ত্রী পুত্র পরিবার তোমার চক্ষে স্বর্গের অপূর্ব্ব পদার্থরূপে প্রকাশিত হইবে। সংসার সুখের স্থান হইবে। শাস্ত্র মানিয়া দেখ কি হয়।

জিজ্ঞাসা করিবে, যজ্ঞ কি? দিন রাত্রি ঘৃত, কুশ, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, যজ্ঞডুমুর ও অগ্নি লইয়া হোম করিতে হইবে না কি? তাহা হইলেই গিয়াছি। ভয় নাই! যজ্ঞের অর্থ—সমস্ত বিহিত কর্ম্ম। আহার, বিহার, নিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি দেহের সমস্ত কার্য্য যজ্ঞ, এবং মন্ত্রোচ্চারণকরতঃ অগ্নিতে ঘৃতাহুতিও যজ্ঞ। জপ ও যজ্ঞ। তোমার নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তও যজ্ঞ এবং কাম্য কর্ম্মও যজ্ঞ। পূজা পাঠ প্রভৃতি সমস্তই যজ্ঞ। যাহা কিছু সৎকার্য্য কর, তাহা সমস্তই যজ্ঞ। এই যজ্ঞ গুণত্রয় ভেদে ত্রিবিধ, অর্থাৎ সাত্বিক যজ্ঞ, রাজসিক যজ্ঞ, তামসিক যজ্ঞ। গীতায় ইহার বিস্তৃত ব্যখ্যা ভগবান করিয়া গিয়াছেন। শারীরিক যজ্ঞের মধ্যে প্রধান যজ্ঞ আহার। শুদ্ধ যদি আহার যজ্ঞটী শাস্ত্রমতে করিতে পার, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে কত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য। আমি যখন শাস্ত্র জানিতাম না, তখন আমার আহারের যথাবিধি নিয়ম ছিল না। কিন্তু গীতা পাঠ করিয়া আহার যজ্ঞ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য যখন বুঝিলাম,

"আয়ুঃসত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ॥

প্রভৃতি সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের কথা শুনিলাম, তখন চক্ষু ফুটিল। তখন রাজসিক ও তামসিক আহার পরিত্যাগ করিয়া সাত্বিক আহার আরম্ভ করিলাম। যে শরীর এক সময়ে ব্যাধির মন্দির বলিয়া মনে হইত, তাহা সাত্বিক আহারের ফলে ক্রমে সুখের মন্দির হইয়া উঠিল। এক সময়ে বহুমূত্র প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলাম, তাহা ক্রমে অদৃশ্য হইল। যাহা খাই তাহাই এখন অমৃত বলিয়া মনে হয়। রসনা, এটা, সেটার জন্য আর ব্যস্ত নাই। ক্ষুধানিবৃত্তিকর যৎসামান্য আহারেই এখন পরিতৃপ্ত। আহার সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা বলিব। আমরা যাহা আহার করি তাহার পরিণাম রক্ত, মাংস, বসা, অস্থি, মজ্জা, ইত্যাদি; আহার্য্য দ্রব্যের গুণ সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া আমাদের মনের প্রবৃত্তিগুলি গঠন করে। সুতরাং সাত্বিক আহার করিলে মনের ভাব সাত্বিক হইবে, রাজসিক আহারে রাজসিক ভাব; এবং তামসিকে তামসিক ভাব হইবে। সাত্বিক আহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান গো দুগ্ধ ও গব্য ঘৃত। সুতরাং যদি শরীর ভাল রাখিতে চাহ, তাহা হইলে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও বিশুদ্ধ ঘৃতের সংগ্রহ কর এবং গোমাতার সেবা কর। আহার সম্বন্ধে কোন্ মাসে কি তিথিতে কি আহার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য ইহার বিধি নিষেধ শাস্ত্রে আছে। এমন কি কোন্ মুখে বসিয়া আহার করিতে হয়, তাহারও নিয়ম আছে, মৌনী হইয়া আহার করিতে হয় ইত্যাদি অনেক নিয়ম শাস্ত্রে আছে। এই সকল প্রত্যেক বিধিরই একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। একটা নিয়মের তাৎপর্য্য বুঝাইব। মৌনী হইয়া কেন খাইতে হয়? উত্তর এই, যে যখন তুমি আহার যজ্ঞ সম্পাদন করিতে থাক,

তখন তোমার অন্নকে (অদ্‌ধাতু অর্থে যাহা খাওয়া যায় তাহাই অন্ন) হবিঃ ভাবিবে। জঠরস্থ অগ্নিকে বৈশ্বানর অগ্নি ভাবিবে। অগ্নিতে হবিঃ যে প্রণালীতে হোম করিতে হয়, সেই নিয়মানুসারে অন্নদ্বারা বৈশ্বানর অগ্নিতে হোম করিতে হয়। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ব্রহ্মরূপ অন্ন তোমার উদরস্থ ব্রহ্মরূপ অগ্নিকে নিবেদন করিতেছ ভাবিতে হয়।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং॥
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥"

চিন্তা কর—এটী কি মহান্ যজ্ঞ করিতেছ। এমন সময় কি কথা বলা সম্ভব? এইরূপে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধে মৈথুনক্রিয়াও একটী মহাযজ্ঞ। ইহারও বিধিনিষেধ শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেই অথবা স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিলেই অনায়াসে জানিতে পার।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ ভগবৎ প্রেরণায় আমাদের নিত্য কর্ম্ম ও উপাসনা প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ঋষি শব্দের বুৎপত্তি "ঋষতি জ্ঞানস্য পারং গচ্ছতি।" যাঁহারা জ্ঞানের পারে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তোমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ও উপাসনার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কথা যদি না শুনিবে, তবে কাহার কথা শুনিবে? ঋষিগণও সন্ধ্যা আহ্নিক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতেন। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও লোক শিক্ষা দিবার জন্য ঐ সকল কর্ম্ম করিতেন। তোমরা না করিবে কেন?

মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ। চতুরশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণান্তে জীব মনুষ্যজন্ম লাভ করে। আবার ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ দুর্লভাদপি দুর্লভ। ইহা বহু তপস্যার ফল। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীমহাভারতে বলিতেছেন,—

"সুদুর্লভতরং প্রাপ্য মানুষ্যমপি যো নরঃ।
ধর্ম্মাবমন্তা কামাত্মা ভবেৎ স খলু বঞ্চিতঃ॥
ইহৈব নরকব্যাধিচিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং স্থানং স রুজঃ কিং করিষ্যতি॥"

সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে কামাত্মা লইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম না করে, সে নিজে নিজেকে বঞ্চনা করে। মনুষ্য দেহ পাইয়া যে নরকব্যাধির চিকিৎসা না করে, সে পরত্র ঔষধশূন্য স্থানে যাইয়া রোগের চিকিৎসা কিরূপে করিবে?

শ্রীমহাভারতে আবার বলিতেছেন,—

" * * * কদাচিদিহ মানুষে!
ব্রাহ্মণ্যং লভতে জন্তুস্তৎ পুত্র পরিপালয়॥
ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন কামার্থায় জায়তে।
ইহ ক্লেশায়-তপসে প্রেত্য ত্বনুপমং সুখম্॥"

"ব্রাহ্মণ্যং বহুভিরবাপ্যতে তপোভিস্তল্লব্ধা ন রতিপরেণ হেলিতব্যং।
স্বাধ্যায়ে তপসি দমেন নিত্যযুক্তো ক্ষেমার্থী কুশলপরঃ সদা যতস্ব।"

বহু তপস্যার বলে জীব ব্রাহ্মণদেহ লাভ করে। ইহা প্রাপ্ত হইয়া হেলায় হারাইতে নাই। স্বাধ্যায় (শাস্ত্রপাঠ), তপস্যা, দম প্রভৃতি অভ্যাস করিতে হয়। ব্রাহ্মণের দেহ কাম চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। ইহাতে ইহকালে ক্লেশ করিতে হয় এবং তদ্দ্বারা পরকালে অনুপম সুখলাভ হয়।

আরও দেখুন বৃহদারণ্যক কি বলিতেছেন,—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স-কৃপণোঽথ। য এতদক্ষরং গার্গি! বিদিত্বাঽস্মালোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥"

হে গার্গি! যিনি এই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) না জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি কৃপণ। এবং যিনি এই অক্ষরকে জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। বেদের কথা ছাড়িয়া দিন। "ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ" এ কথাটা সকলেরই মুখে শুনা যায়। এখন বুঝুন কাণ্ডটা কি! বাক্য ও মনের অগোচর ব্রহ্মকে জানা কি দুরূহ ব্যাপার! কিন্তু ভারতের ব্রাহ্মণ অবাঙ্মানসগোচর এই ব্রহ্ম বস্তুকেও জানিতে পারেন। এ ক্ষমতা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও সম্ভবে না।

মনু বলিয়াছেন,—

"ঊর্দ্ধং নাভের্মেধ্যতরং পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অস্মান্মেধ্যতমং তস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা॥
উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য স্বর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥
তং হি স্বয়ম্ভুঃ স্বাদাস্যাত্তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহায় সর্ব্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে॥
যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ॥
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥
উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

পুরুষের নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর, তাহা অপেক্ষা মুখ পবিত্রতম, ইহা ব্রহ্মা স্বয়ং কহিয়াছেন। ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় এবং ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়

এবং ব্রহ্মের (বেদের) ধারণা করিবার ক্ষমতা থাকায় ব্রাহ্মণই সমুদায় জগৎ মধ্যে ধর্ম্মানুসারে প্রভু। ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া স্বকীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য দেবলোক ও পিতৃলোকের হব্য কব্য বহন এবং জগৎ রক্ষা। স্থাবর জঙ্গমাদি মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ। প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণী শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের মধ্যে শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি আছে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। এবং এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধির মধ্যে যাঁহারা কর্ত্তা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। এবং এইরূপ কর্ত্তাদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। বিপ্র জন্ম গ্রহণ করিবা মাত্র অপর সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। কারণ তাঁহার উৎপত্তির উদ্দেশ্যই ধর্ম্মরক্ষা। ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণই কেবল আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভের উপযুক্ত। তবেই হইল ব্রাহ্মণ মনুষ্যপ্রধান। কিন্তু ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া অধুনা কর্ম্মদোষে আমরা পশুবৎ হইয়াছি। তবে কি নিরাশ হইয়া কেবল ক্রন্দনই সার করিব, কখনই নহে।

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে—

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥"

আবার বলিয়াছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"
"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপী হও, তথাপি সমুদায় পাপসমুদ্র জ্ঞানপোত দ্বারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে। অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন, তবে তিনিও সাধু বলিয়া গণ্য হন এবং শীঘ্রই ধার্ম্মিক হইয়া নিত্য শান্তি লাভ করেন। আমার ভক্ত কখনই প্রণষ্ট হন না।

শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণীতে উৎসাহিত হইয়া আইস ভাই! শাস্ত্রবিহিতকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। এত দিন অলস হইয়া কর্ম্ম করি নাই বলিয়া হতাশ হইব না। কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করি আইস। করিতে করিতে আশা ফলবতী হইবে। আবার যেন ব্রাহ্মণ হইয়া ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতে পারি, তাহার জন্য এই বেলা কর্ম্ম করা আবশ্যক। যতটুকু অগ্রসর হইতে পারি, তাহা করি আইস। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি কল্যাণকৃৎ, তাঁহার দুর্গতি কখনই হয় না, তিনি শুচি ও শ্রীমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন অথবা যোগীর কুলে জন্মলাভ করিয়া থাকেন। তাদৃশ জন্মগ্রহণের পর তিনি পূর্ব্বদেহজাত বুদ্ধির সংযোগলাভ করেন এবং ব্রহ্মলাভের জন্য অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন॥"

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥" (গীতা)

এখন ব্রাহ্মণরক্ষার উপায় কি? উপায়ের অভাব নাই। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ যদি নিজ নিজ পরিবার মধ্যে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, প্রত্যেক উপনীত ব্রাহ্মণ যদি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ, অতিথি সেবা, বলিবৈশ্বদেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদাদি শাস্ত্র) পাঠ করেন, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়। শরীরযাত্রা এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য আমরা যে কর্ম্ম করি, তাহা উপরোক্ত নিত্য ক্রিয়া করিয়াও অনায়াসেই করিতে পারি। ভাই! উদরান্নের জন্য যে কর্ম্ম করিতেছ, তাহা ত্যাগ করিতে বলি না। চাকুরী বাকুরী কর, ওকালতী, মোক্তারী, হাকিমি কর, ব্যবসা বাণিজ্য কর, কিন্তু বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম যতটকু পার, সঙ্গে সঙ্গে কর। আমি রাজকার্য্য করিয়াও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি। ২২ বৎসর পূর্ব্বে এই ব্রহ্মপুরে থাকিবার সময়ে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতে প্রাতঃস্নান করতঃ প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা তর্পণ করিয়া পুনরায় বেলা ৯টার সময় মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও দেবার্চ্চনা করিয়া কাছারী যাইতাম ও সায়ংকালে সায়ং সন্ধ্যা করিতাম। কৈ কখন ত আমার সময়াভাব হয় নাই, তোমারই বা সময়াভাব হইবে কেন? বৃথা কেবল গল্প, তাস খেলা, বড়ে খেলা, পাশা খেলা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ অথবা পর নিন্দা ও পরচর্চ্চা করিয়া সময় ক্ষেপণ না করিলেই নিত্য কর্ম্ম করিবার সময়াভাব হয় না। তবে বিশেষ কার্য্যবশতঃ নিতান্ত সময়াভাব হইলেও সন্ধ্যা, গায়ত্রীজপ ও ইষ্টদেবতার নাম জপের সময় সকলেই করিতে পারেন। ইচ্ছা থাকিলেই কার্য্য করিতে পারা যায়। আইস ভাই! আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই। মরণকালে যেন ভগবানকে স্মরণ করিতে পারি, তাহার চেষ্টা সময় থাকিতে করি আইস। মৃত্যুর পর ভাবী দেহ গঠনের মাল মসলার জোগাড় এই বেলা না করিলে কখন করিবে?

ভগবান বলিয়াছেন—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥" [গীতা]

যে যে ভাব ধারণ করিয়া জীব কলেবর ত্যাগ করে, মরণান্তে সে সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। ভাই! কেবল অর্থ, স্ত্রী, পরিবার যদি ভাব, তাহা হইলে মরণ সময়ে প্রাণের প্রাণ ভগবান্‌কে ডাকিতে পারিবে না এবং তাহার ফলে কোন্ যোনিতে যাইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ভাই! কত কথা মনে উঠিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে আরও বলি;—

"খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কবাট।"

কিন্তু সময় নাই। প্রাণের কথা বলিতে যাইলে ছয় মাস ধরিয়া প্রতিদিন বলিলেও

ফুরাইবে না। এক্ষণে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সম্প্রদায়ের চরণে কিছু নিবেদন করিব। হে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি আপনারা লোক শিক্ষার জন্য আবির্ভূত। আপনারা অন্যান্ত সকল বর্ণের গুরু। অনধীত-শাস্ত্র জীবের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসন্তানেরও গুরু। আপনাদের জীবন অতি পবিত্র রাখা আবশ্যক। আপনারাই পুরাকালের ঋষির স্থানীয় বলা অসঙ্গত নহে। আপনারাই একমাত্র ব্রাহ্মণ্য রক্ষার উপায়। আপনারা ভ্রষ্টাচার হইলে আপনারা অর্থের লোভে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দান করিলে, আজি একরূপ ব্যবস্থা দিয়া কল্য ধনলোভে, অথবা আর কিছুর লোভে, অথবা কাহারও ভয়ে, সম্পূর্ণরূপ বিপরীত ব্যবস্থা দিলে সমাজ সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবিয়া যাইবে। সমাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবে। অতএব পূর্ব্বপুরুষগণের কর্ম্ম স্মরণ করিয়া বিষয় ভোগের জন্য লালায়িত না হইয়া স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন। আপনারা উদরান্নের জন্য এবং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কখন চিন্তাকুল হইবেন না।

ভগবানই স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।"
"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং।"

যাহারা আমাকে অনন্যচিন্তা করে, তাহাদের আমি সমস্ত অভাব পূরণ করি, তাহাদের বোঝা আমি বহিয়া থাকি। আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই। যাহারা ভক্তির সহিত আমাকে ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমিও সে সকল ব্যক্তিতে অবস্থান করি। ভগবানের যিনি অনুগ্রহ পান তাঁহার কি কখন অভাব থাকিতে পারে? আপনারা স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে থাকুন, তাহা হইলেই ভগবানে অনন্যচিত্ত হইবেন। তাহা হইলেই তিনি আপনাদের যোগক্ষেম বহন করিবেন। আমি আমার একজন পরম বন্ধু ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। তিনি আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সান্যাল। এখন তিনি ৺কাশীবাস করিতেছেন। তাঁহার যৌবন কালে তিনি অযাচিত ভিক্ষা পরিগ্রহ দ্বারা স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের ভরণ পোষণ করিতেন। একদিন বৈকাল পর্য্যন্ত সপরিবারে অনশনে ছিলেন। ক্ষুধায় স্ত্রী, পুত্র কাতর হইলেও ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। শেষে কোন স্থান হইতে এক বৃহৎ বৈকালী নৈবেদ্য আসিল। তাহাতে তাঁহার পরিবারের দুই দিনের আহারের সংস্থান হইল। ভগবান্ সর্ব্বদ্রষ্টা। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে এবং তাঁহার কার্য্য করিলে তিনি নিশ্চয়ই জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেন।

আর একটী কথা বলিব। মনে রাখিবেন—আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আচারভ্রষ্ট, তাঁহারা বাহিরে ব্রাহ্মণ সাজিয়া ভিতরে যথেচ্ছাচারী হইয়া সকল দলেরই মন রাখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের সরলতা নাই—ধর্ম্মবিশ্বাসও নাই। এরূপ ব্যবহার করিলে কি তাঁহারা ভগবানের অনুগ্রহপাত্র হইতে পারেন? অথবা বর্ণাশ্রম-সমাজের নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন?

যাঁহারা সদাচারভ্রষ্ট হইতেছেন, তাঁহাদের গৌরব ও সম্মান অন্তর্হিত হইতেছে। যাত্রায়, থিয়েটারে সং দিবার আবশ্যক হইলে এখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সং দেওয়া হয়। অহো! ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পর্ণকুটীরে বাস করিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাইতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অধঃপতন হওয়াতেই আমাদের হিন্দুমাত্রেরই অধঃপতন। তাই বলি হে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ, আপনারা চক্ষু দিয়া না চাহিলে আপনাদের নিজেদের ধ্বংশ ও আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমগ্র হিন্দু-সম্প্রদায়ের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। আমরা দারিদ্র্যের কঠোরতা ভোগ করিয়াও যদি স্বধর্ম্মে থাকি তাহা হইলে সমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা কখনই থাকিবে না। সুখের বিষয় এই যে, আজকাল অধিকাংশ ব্রাহ্মণের চৈতন্য উদয় হইয়াছে। বহু দেশে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভার জন্ম ও কর্ম্ম দেখিয়া হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। বৎসর বৎসর এই ব্রাহ্মণ-সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মহাসম্মিলনীও বিশেষ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভা ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া যে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। ব্রাহ্মণ্য রক্ষার চেষ্টা ইঁহারা সাধ্যমত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং ফলও কিছু কিছু ফলিতেছে। যে দেশে ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিত এখনও শত সহস্র বিদ্যমান আছেন, যেখানে মহারাজা রাজা জমিদার এবং পদস্থ বিষয়ীর মধ্যে ধর্ম্মনিরত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ এখনও জীবিত আছেন, সেখানে ব্রাহ্মণের নৈরাশ্যের কারণ নাই।

সত্য বটে ধর্ম্ম বিপ্লব হেতু আজ আর্য্যজাতি দীপ্তিহীন, বীর্য্যহীন, তেজোহীন। আমাদের দেহ সকল নানা ব্যাধির আবাসভূমি। আমাদের দেহে রোগ, মনে অশান্তি। কিন্তু গো ব্রাহ্মণ রক্ষা হইলেই আমাদের সকল দুঃখ দুর হইবে। আহ্লাদের বিষয় শুভ লক্ষণ দেখা গিয়াছে। চারিদিক হইতে ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল, সমাজ গেল, এই ধ্বনি উঠিয়াছে। এখন ইহা বড়ই আশাপ্রদ ও মঙ্গলের চিহ্ন। বিষাদযোগ না হইলে ভগবানের কৃপা হয় না। অর্জ্জুনের বিষাদযোগ হওয়াতেই গীতার উৎপত্তি। মহারাজা সুরথ এবং সমাধি নামক বৈশ্য প্রধানের বিষাদযোগের ফলে শ্রীচণ্ডীর আখ্যান প্রকাশিত হয়। আমাদের অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া যে বিষাদযোগ হইয়াছে ইহা মঙ্গলের চিহ্ন। শেষ নিশার ঘোর অন্ধকারের পরেই উষার সুবিমল জ্যোতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ উষার আভা দেখা গিয়াছে, এই বেলা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করি আসুন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকলে যেন ত্রিসন্ধ্যা করেন। মন্ত্রের অর্থ ও তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করি আসুন। যাহাতে তাহাদের বাল্যকাল হইতে মন্ত্রে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হয় এবং মন্ত্রগুলি সাপের মন্ত্রের ন্যায় অর্থশূন্য বলিয়া তাহাদের যাহাতে মনে না হয়, তাহার চেষ্টা করি আসুন। আচারের উপকারিতা, নিষিদ্ধ আহারের অপকারিতা, ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি আসুন। বাল্যকালে ধর্ম্মশিক্ষা না পাইলে

যে বিষময় ফল হয়, তাহা আমার নিজের জীবনেই বুঝিয়াছি। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ছিল বলিয়াই ৩২ বৎসর বয়সে মনে হইল আমার স্বধর্ম্ম কি বুঝিতে হইবে। হঠাৎ বিষাদযোগ আসিল, মন অবসন্ন হইল এবং ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন,—"কুল-গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ কর।" মন্ত্রগ্রহণ করিলাম। সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি নাই, শাস্ত্রে কি আছে কিছুই জানি না। একদিন অতিবৃদ্ধ সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন দেবমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ আমার গৃহে অতিথি-স্বরূপ আগমন করিলেন এবং ধর্ম্মকর্ম্ম কিছু নাই বলিয়া আমার বিষাদের কথা শুনিয়া আমাকে গ্রহযাগ করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং নানা উপদেশ দিলেন। আহা সে প্রসন্নমূর্ত্তি ভুলিতে পারিব না, স্বয়ং অল্প স্বল্প ব্যয়ে গ্রহযাগ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তা'র পরেই যাজী-পুরেই বৈতরণীক্ষেত্রে রাজকার্য্যে যাইতে হইল। তথায় আমার এক সুহৃদের পরামর্শে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্মব্যাখ্যা ও ভবৌষধ পড়িলাম। প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। একজন অধ্যাপকের নিকট গীতাপাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। গীতাপাঠের পর তাঁহারই চরণপ্রান্তে শ্রীমদ্ভাগবত এবং দর্শনশাস্ত্রের একটু আধটু পড়িতে আরম্ভ করি-লাম। ক্রমে দেখিতে পারিলাম—হায়! হায়! অমূল্য সময় হেলায় হারাইয়াছি। উন্মাদের ন্যায়—

"দেবদ্বিজগুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচমার্জ্জবং।"
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে"

ভগবদ্বাক্যানুসারে শারীর তপ আরম্ভ করিলাম। তপস্যা একপ্রকার কঠোরই হইতে লাগিল। হবিষ্যাশী হইলাম গেরুয়া বসন লইলাম। কেবল কাছারীতে পোষাক পরিয়া যাইতাম।

লোকে কথা তুলিল,—"আমি পাগল হইয়াছি। আমার এক প্রিয়তম ইংরাজবন্ধু Davidson সাহেব আমাকে বুঝাইবার জন্য এক ইংরেজ missionary পাদ্রীকে আনি-লেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া শেষে তর্কে না পারিয়া বলিলেন'—'আমি আপনার জন্য বড়ই দুঃখিত হইলাম। দেখিতেছি আপনি শীঘ্রই "ভাগবতিয়া" হইয়া স্ত্রীপুত্রকে ছাড়িয়া পাপের সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবেন।" আমি বলিলাম—"আমার সে অদৃষ্ট নাই। সন্ন্যাসী হওয়া বড়ই কঠিন। উহা জ্ঞানযোগ ভিন্ন হয় না।" বন্ধুবান্ধবের কথা না শুনিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম বলিয়া যাহা বিশ্বাস—তাহা করা বন্ধ করিলাম না। গুরূপদেশ না লইয়াই প্রাণায়াম করত শেষে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইলাম। চিকিৎসা হইতে লাগিল। প্রাণায়াম কমাইয়া দিলাম।

প্রায় দুই বৎসর ভুগিয়া সারিলাম। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং পূজা পাঠ নিয়মিত চলিতে থাকায় দেখিতে দেখিতে আশাতীত ফল হইল। শরীর সুস্থ হইতে লাগিল। নানারূপ পারিবারিক কল্যাণ হইতে লাগিল। আমার হিন্দু আচার ব্যবহার দেখিয়া বঙ্গেশ্বর লাটসাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া জেলার জজ পর্য্যন্ত সকলেই শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। যেখানে যাই, সেই খানেই সম্মান পাই। সকল দিকে মঙ্গল হইতে লাগিল। শৌচ ও

আচার ক্রমে বাড়িতে লাগিল। লোকে উপহাস করিতে লাগিল—"লোকটার লেখাপড়া কি শোচনীয় অবস্থা হইল! কি আশ্চর্য্য, তুলসীতলায় গড়াগড়ি দেয়। কি অধঃপতন!" আমি মনে মনে হাসিতাম। আমার ব্রত নিয়মিত চলিল। মনে কতই আনন্দ ভোগ করি। পত্নীও আমার প্রকৃতই সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরিবার মধ্যে সকলেই আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া ধর্ম্মপিপাসু হইতে লাগিল।

শাস্ত্রপাঠে যাহা বুঝিয়াছি, ঠিক সেইরূপই সুফল পাইতে লাগিলাম। ক্রমে মন্ত্রে ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। সমস্ত সংশয় দূর হইয়াছে। যখন শ্রাদ্ধ তর্পণ করি, তখন পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদে পারিবারিক মঙ্গল যেন হাতে হাতে পাই। বিপদে পড়িলে অথবা কোনরূপ দুঃখ হইলে বারকতক"ওঁ তৎসৎ" নাম উচ্চারণ করিয়া ভগবানকে ডাকিলে তাঁহার যেন সাড়া পাই—সকল দুঃখ দূর হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে তীর্থ যাইয়া স্থানে স্থানে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া যে কি আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা বর্ণনা করা যায় না। 'আইস ভাই! সকলে শাস্ত্রমত কার্য্য করি। বড় সুখ পাইবে, প্রথম প্রথম ভাল লাগিবে না বটে, কিন্তু কিছুদিন করিলেই রসভোগ করিতে আরম্ভ করিবে।

আইস ভাই ব্রাহ্মণসন্তান! কায়দণ্ড, বাক্‌দণ্ড ও মনোদণ্ড অভ্যাস করিয়া ত্রিদণ্ডী হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ সার্থক করিবার চেষ্টা করি। আইস, নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এজন্মে যতটুকু ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইব, পরজন্মে তাহার পর হইতে আরও অগ্রসর হইব। মনুর কথা শুনি আইস।

"ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোক-সহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্‌॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতামাতা চ তিষ্ঠতি।
ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতি র্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং এক এব চ দুষ্কৃতং॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠ-লোষ্ট্র সমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥

পুত্তিকারা (উই) যেমন আপনাদের বল্মীক ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া প্রস্তুত করে, তেমনি পরলোকের সহায়জন্ত কাহাকেও পীড়া না দিয়া আস্তে আস্তে ধর্ম্ম সঞ্চয় কর। পরলোকে পিতামাতা স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি কেহই তোমার সাহায্য করিবে না। জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী লয়প্রাপ্ত হয় এবং একাকীই নিজের সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ করে। যখন বান্ধবগণ মৃতশরীরকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া যায় তখন ধর্ম্মই কেবল অনু-গমন করে।

এখন দেবদেবীর পূজা ও বৃহৎ যজ্ঞ সকল উপযুক্ত পুরোহিত অভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতেছে। উহা তামসযজ্ঞ হইয়া থাকে।

"বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥"

যে যজ্ঞ বিধিহীন, মন্ত্রহীন, উপযুক্ত দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধা বিবহিত এবং যাহাতে ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করা না হয় সে যজ্ঞ তামসিক যজ্ঞ বলে। শাস্ত্রে বিশ্বাস না করিয়া হোম, দান, তপস্যা আর যাহা কিছুই কর তাহা সমস্তই অসৎ। তাহা পরকালে বা ইহকালে কোনরূপই ফলদায়ক হয় না।

তাই বলি, তোমার প্রতিনিধি হইয়া যিনি পুরোহিত স্বরূপে তোমার কল্যাণার্থ যজ্ঞ করিবেন, তোমাব হইয়া ভগবানকে ডাকিবেন, তিনি পবিত্রচিত্ত না হইলে, তিনি জ্ঞানবান্ না হইলে তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন কর্ম্মে কোনই ফল নাই। অতএব ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীর প্রধান কার্য্য সদ্ব্রাহ্মণ প্রস্তুতেব উপায় কবা, এবং ব্রাহ্মণ দেহ গঠিত করাব জন্য ও হোম করিবার জন্য গো রক্ষা করা। গো রক্ষা না হইলে দুগ্ধ কোথায় পাইবে? এবং দুগ্ধ না পাইলে যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ঘৃত কোথায় পাইবে? দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা শাস্ত্রোক্ত যে কোন যজ্ঞ করিবার বিধি আছে, তাহা নিবর্থক হইতেছে বলিয়াই আজ হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বাণ প্রায়। ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহারাই জানিতেন অগ্নিতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সংযোগে ঘৃতাহুতি দিলে কিরূপ অদৃষ্টের উৎপত্তি হয়। তবে স্থূল দৃষ্টিতে ঐটুকু বেশ বুঝা যায় যে গোমাতা হইতে দুগ্ধ ঘৃতাদি যাহা আমবাস আহারের জন্য পাই, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সাত্ত্বিক ও বলকাবক অন্ন।

যদি তাহাই হইল তবে কি গো-কুল রক্ষার জন্য আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে?

শাস্ত্রে গো সকলের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি।

"অমৃতং হ্যবায়ং দিব্যং ক্ষরন্তি চ বহন্তি চ।
অমৃতায়তনং চৈতাঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতাঃ॥" (মহাভারত)

অমৃতেব আয়তন গো সকল অমৃত বহন ও ক্ষরণ করেন এইজন্য তাঁহারা সর্ব্বলোক নমস্কৃত।

"ইমা গাবো মহাভাগাঃ পবিত্রং পরমং স্মৃতং
ত্রীন্ লোকান্ ধারয়ন্তি স্ম স-দেবাসুর মানুষান্॥"
(মহাভারত)

এই সকল মহাভাগ গোগণ পবিত্র বলিয়া পরিচিত। ইহারা সদেবাসুর মানুষ লোকত্রয় ধারণ করিয়া থাকেন।

"দাহেন চ ভুবঃ শুদ্ধির্বাসেনাপ্যথবা গবাম।
গাবঃ পবিত্রং মঙ্গল্যং গোষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

গাবো বিতন্বতে যজ্ঞং গাবঃ সর্ব্বাঘসূদনাঃ।
গোমূত্রং গোময়ং সর্পিঃ ক্ষীরং দধি চ রোচনা॥
ষড়ঙ্গমেতৎ পরমং মঙ্গলং সর্ব্বদা গবাম্।
শৃঙ্গোদকং গবাং পুণ্যং সর্ব্বাঘবিনিসূদনম্॥
গবাং কণ্ডূয়নঞ্চৈব সর্ব্বকল্মষনাশনং।
গবাং গ্রাসপ্রদানেন স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

গবাং হিতার্থে বসতীহ গঙ্গা
পুষ্টিস্তথাসাং রজসি প্রবৃত্তা।
লক্ষ্মীঃ করীষে প্রণতৌ চ ধর্ম্ম—
স্তাসাং প্রণামং সততঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

(বিষ্ণু-সংহিতা)

গো সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "গো-গঙ্গা-গায়ত্রী" নামক গ্রন্থে সঙ্কলন করিয়াছেন। এইখানি সমস্ত হিন্দুর পাঠ করা উচিত।

উপসংহারে আমার জীবনের একটী ঘটনা বলিতে চাহি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আজ কাল আমাদের প্রায় সমস্ত যজ্ঞই তামসিক অথবা অসৎ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব। কলিকাতায় বেদবিদ্যালয় দেখিয়া বড় ইচ্ছা হইল, তাহার অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাই। অধ্যাপকগণের আদেশ মত বিশেষ বিশেষ খাদ্যের আয়োজন যত্ন সহকারে করিলাম। খাইতে বসিবার অগ্রে তাঁহারা পা ধুইতে যাইলেন। একজন প্রবীণ ছাত্র বলিলেন যদি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল চাহেন তাহা হইলে আপনি স্বয়ং পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিন। আপনার স্ত্রী জল ঢালিয়া দিন এবং আপনি পা ধুইয়া দিন। তখন গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্র। আমি সেই রৌদ্রে বসিলাম। অধ্যাপকগণ এক ভৃত্যকে আমার মাথায় ছাতি ধরিতে বলিলেন। আমার স্ত্রী জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন এবং আমি ব্রাহ্মণগণের অর্থাৎ ক্ষুদ্র বালকটীর পর্য্যন্ত ভক্তি সহকারে পা ধুইয়া গামছা দিয়া মুছিয়া দিলাম। এ কার্য্যে অনেকক্ষণ সময় লাগিল। কিন্তু আমার কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক মনে আনন্দ হইল। শেষে তাঁহাদের প্রত্যেকের ললাটদেশে চন্দন দিয়া শোভিত করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলাম। শেষে তাঁহারা যখন আহার করিতে লাগিলেন, আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী আহার পরিবেশন করিতে লাগিলাম। আহার শেষ হইবার পর তাঁহাদের দক্ষিণা দিয়া প্রণাম করিলাম।

অধ্যাপকগণ ও প্রবীণ ছাত্রটী খুব আশীর্ব্বাদ করিলেন। পা ধুইয়া দিবার সময় তাঁহারা কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সে মন্ত্রে আমার শরীর কণ্টকিত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ব দিবস আমার পেটের অসুখ হওয়ায় উপবাসী ছিলাম। সেই দিন অপরাহ্ণ কাল পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলাম, কিন্তু কোনই কষ্ট বোধ হইল না। রাত্রিতে

রক্ত-আমাশয় দেখা দিল। আত্মীয়বর্গ উপহাস করিয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণ ভোজনের কেমন ফল পাইতেছেন?" আমি বলিলাম ভাগ্যে উহা করিয়াছিলাম—তাই আমি এ আমাশয়ে প্রাণ হরাইব না। আমার মনে হইতেছে ঐ যজ্ঞের ফলে এবং সৎব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আমি সারিয়া যাইব।" তাহাই ঘটিল, পীড়াটী একটু কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু সহজেই সারিয়া উঠিলাম। এই ঘটনার পর হইতে আমি যখনই ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছি, ব্রাহ্মণগণের পা স্বয়ং ধুইয়া দিয়া থাকি। নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা আমার অনুগ্রহপ্রার্থী তাঁহারা আমার কার্য্যে বড়ই সঙ্কুচিত হন, কিন্তু আমি ছাড়ি না, এবং তাহার ফলে আমি যে কত আনন্দ পাই তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। এখন বুঝিয়াছি—ব্রাহ্মণ ভোজনের বিধি আমি ইতিপূর্ব্বে ভালরূপ না জানায় ফলও আমি তেমন পাইতাম না। তাই বলি শাস্ত্রবিধি জানিয়া কর্ম্ম করিলেই শাস্ত্রোক্ত ফল হইবার কথা—নচেৎ নহে।

আমার অভিভাষণ শেষ হইল। আমার পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তি না থাকায়, আমার কথাগুলি আপনাদের ভাল লাগিল কি না জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি সরল ভাবে সকল কথা বলিয়াছি।

পরিশেষে যে সকল ব্যক্তির মত আমাদের মতের সহিত ঐক্য নহে, তাঁহাদের নিকট এই ভিক্ষা যেন তাঁহারা আমাদের উপর বিরক্ত না হন। আমরা কাহারও উপর বিদ্বেষ বুদ্ধিতে চালিত হইয়া কোন কার্য্য করিতেছি না। ব্রাহ্মণ সভার উদ্দেশ্য প্রথমেই বলিয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য—সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করা, ব্রাহ্মণদিগকে ধার্ম্মিক ও সদাচার সম্পন্ন করা, হিন্দুর নাম যাহাতে ডুবিয়া না যায় তাহার চেষ্টা করা। সুতরাং কৃতবিদ্য শিক্ষিত মাত্রেই আমাদিগের সহিত সহানুভূতি করিবেন এই প্রত্যাশা করি। আমরা সকলেরই নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। অবশেষে হে ভূদেবগণ! আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। আমার ত্রুটি হইয়া থাকিলে ক্ষমা করিবেন। ক্ষান্তি আপনাদের স্বধর্ম্ম ইহা বিস্মৃত হইবেন না।

বানপ্রস্থাশ্রম ও কাশীধাম।

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" ইহা শাস্ত্রের আদেশ। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে বনগমন দ্বিজাতির পক্ষে বিহিত। সে পরিণত বয়সে সংসার আর ভাল লাগে না; সংসারবাসই তখন বনবাসের তুল্য হইয়া থাকে। এই বন গমন জঙ্গলে কিম্বা হিংস্র পশু প্রভৃতি সেবিত ভীষণ অরণ্যে গমন নহে। বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশের নামই বনবাস। পরিণত বয়সে রাজা মহারাজ হইতে সাধারণ সংসারী পর্য্যন্ত সকলের পক্ষে এই বানপ্রস্থ অবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বানপ্রস্থাশ্রম তৃতীয় আশ্রম। প্রথম গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন করার নামই

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। তারপর যথাবিধি বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক সংসার কর্ত্তব্য বা সংসার ধর্ম্ম পালন করাই সংসারাশ্রম। এই সংসারাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম, কারণ ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সকল আশ্রমের স্থিতি। তবে সংসারের প্রলোভন পদে পদে, আপনার ও পরিবারবর্গের জীবিকাদির জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয়; কাজেই ধর্ম্মালোচনা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না। সংসারাশ্রম পালন করার পরই বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ।

পুত্রকে সংসারে স্থিতি করাইয়া পরিণত বয়সে সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক এই পবিত্র শান্তিসুখকর আশ্রমে আসিতে হয়। ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া কিম্বা পুত্রের উপর ভার দিয়া এই ঋষিব্রাহ্মণাধ্যুষিত আশ্রমে ভগবদারাধনায় দিন কাটাইতে হয়। "পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা।" শুক্লপক্ষের পূর্ব্বাহ্নে উত্তরায়ণে বানপ্রস্থ যাত্রা বিধি। বৃদ্ধবয়সে সংসারে নানারূপ ঝঞ্ঝাট সহ্য করিয়া অক্ষমজীবন যাপন অপেক্ষা এই অরণ্যগমন অনেক সুখের ও শান্তির ছিল। ঋষিগণ, তপঃপূত ব্রাহ্মণগণ যেখানে পর্ণশালা বাঁধিয়া বাস করেন, বেদ সঙ্গীত যেস্থানে নিরন্তরই ধ্বনিত হইতে থাকে, ব্রহ্মচারী বালকগণ যেথায় দলে দলে বেদপাঠ করে, রাজা মহারাজ যেস্থলে মুনিজীবন যাপন করতঃ ত্যাগমাহাত্ম্য খ্যাপন করেন, সে স্থানে বাস কাহার না স্পৃহণীয়?

এইরূপ আশ্রম পুরাকালে অনেকগুলি ছিল। রাজা এই স্থানের কর লইতেন না, এ স্থানের সকল স্বত্বই বানপ্রস্থাশ্রমীদের জন্য দিয়া রাখিয়াছিলেন, এখানকার সকল সুবিধার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। দস্যুরা যাহাতে আক্রমণ না করে, হিংস্র জন্তুগণ অত্যাচার উপদ্রব করিতে না পারে, দুষ্টগণ আসিয়া পবিত্রস্থান কলুষিত না করিতে পারে, তাহার উপর রাজার ও রাজপুরুষের দৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ ছিল। ক্ষেত্রে অকৃষ্টপচ্য তৃণধান্য জন্মিত, আম্র, কাঁটাল, তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর, পেয়ারা, গুবাকু, হরীতকী, বিল্ব, তিন্তিড়ী প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষ সে স্থান আলো করিত; শাল, সেগুণ, বট, অশ্বত্থ, শিরীষ, দেবদারু প্রভৃতি তরুগণ ছায়া দিত, চারিদিকে হরিণের দল নির্ভীক চিত্তে দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইত, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে খাদ্যদ্রব্যের আশায় চাহিয়া দেখিত, গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া বালকোচিত আবদারের পরিচয় দিত। বিরোধিস্বভাব প্রাণিগণ ভ্রাতা ভগিনীর মত পরস্পর সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিত। কাহারও উপর কাহার হিংসা দেখা যাইত না। স্বচ্ছ সত্ত্বগুণই তথায় বিরাজমান ছিল।

তথায় স্বহস্ত-নির্ম্মিত পর্ণশালায় বাস, অকৃষ্টপচ্য নীবারও অযত্নলভ্য ফলমূলাদিই ভোজ্য, পর্ণময়ী শয্যায় শয়নই ব্যবস্থিত ছিল। কোনরূপ আড়ম্বর, জাঁকজমক, বিলাসিতা, বিবাদ-বিসম্বাদের স্থান ছিল না। কোথাও ঋষিবালক উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরে বেদপাঠ শিক্ষা করিত, কোথাও সামশ্রমীরা সামগান গাহিয়া মৃগ পক্ষীদিগকেও মাতাইয়া তুলিত, কোথাও বা ঋষিপত্নীগণ-সহ বানপ্রস্থাশ্রমীর পত্নীগণ সুললিত স্তব পাঠদ্বারা আশ্রম মুখরিত করিতেন। হোমাগ্নি দিকে দিকে লেলিহান শিখাবিস্তার করতঃ শাখাগ্রসংসক্ত আর্দ্র বল্কলগুলিকে ধূসর, আশ্রমতরুগুলিকে চিক্কণ, জমাট মেঘগুলির জলভরাপৃষ্ঠে উষ্ণ উত্তাপ সঞ্চারিত করিত। ধূমগন্ধি বাতাস আশ্রমের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া অটুট স্বাস্থ্য ও নির্ম্মল শান্তি প্রদান করিত।

যে সকল বানপ্রস্থাশ্রমী এই পুণ্য আশ্রমে শান্তজীবন নিশ্চিন্তে অতিবাহিত করিতে আসিতেন, তাঁহারা যে সকলেই সংসারমায়া সম্পূর্ণ কাটাইতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে, সমাজ নিয়মানুসারেও অনেককে এই বানপ্রস্থাশ্রম পালনার্থ আসিতে হইত। পরে ইঁহার আকর্ষণী শক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উপাসনা শক্তির গুণে, বেদপাঠ শ্রবণাদি শাস্ত্র উপদেশ ও সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যে সংসারমায়া সূর্য্যকরস্পর্শে কুজ্ঝটিকার মত অল্পে অল্পে মিলাইয়া যাইত। সংসারমায়া সম্পূর্ণরূপে কাটাইতে পারিলে তবেই বানপ্রস্থাশ্রমে গমন বিধি—ইহা ভাবিয়া অপেক্ষা করিলে কোন দিনই ঐ মায়া কাটিবে না। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া "কল্লোলের উপশান্তি ঘটিলে জলপান করিব" বলিয়া বসিয়া থাকিলে কোন দিনই তাহা হইলে জলপান করা হইবে না। যদি সংসারমায়াই কাটিয়া থাকে, তবে ত সে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াই নিঃসঙ্গ জীবন যাপনদ্বারা উপাসনাশুদ্ধচিত্ত হইয়াই মায়াতীত হইতে পারেন। তাঁহার বানপ্রস্থাশ্রমে যাওয়ারও তাদৃশ আবশ্যক করে না। সম্পূর্ণ মায়া কাটান কি সহজ কথা? স্থান মাহাত্ম্যে, সাধুসঙ্গগুণে, বেদাদিপাঠে, শাস্ত্রকথা শ্রবণে ক্রমে ক্রমেই সংসারমায়া কাটিয়া যায়। অনুশীলনের ফলে চিত্ত অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রবণ ঐশ্বরিক রসরসিক হইয়া থাকে। পুত্রাদি দর্শনের ইচ্ছা জন্মিলে সংসারে ফিরিয়া যাইবার নিয়ম ছিল না বটে, তবে পুত্রাদির মধ্যে মধ্যে আসার অধিকার ছিল। আত্মীয় স্বজন বৎসরান্তে একবার করিয়া দেখা দিয়া যাইতে পারিতেন।

বানপ্রস্থাশ্রমে কতকগুলি নিয়ম ছিল। প্রথম সকলকেই জটা রচনা করিতে হয়, বল্কল পরিতে হয়, নখ রোমাদি অচ্ছিন্ন রাখিতে হয়। দানগ্রহণ, পত্নী উপগমন, মধুমাংস ভোজন, রাত্রিভোজন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। বেশভূষা, সুগন্ধ দ্রব্যানুলেপন, কেশপারিপাট্য, বৃথামোদ প্রমোদ, ব্যসনাদিতে কাহারও অধিকার ছিল না। প্রত্যহ বেদপাঠ, ত্রিসন্ধ্যাস্নান অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞ, জপ, তপাদি সকলকেই করিতে হইত। পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাশ্রমী সকলকারই কর্ত্তব্য। পঞ্চযজ্ঞ যথা—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥"

বানপ্রস্থাশ্রম সম্বন্ধে কয়েকটি শাস্ত্রবচন দেখিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন,—

তত্রারণ্যোপভোগেন তপোভিশ্চাত্মদর্শনং।
ভূমৌ শয্যা ব্রহ্মচর্য্যং পিতৃদেবাতিথিক্রিয়া॥
হোমস্ত্রিসন্ধ্যস্নানং জটাবল্কলধারণং।
বন্য-স্নেহ-নিষেবিত্বং বানপ্রস্থ-বিধিস্ত্বয়ং॥
জটাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং নখরোমাণি ন ত্যজেৎ।
স্বাধ্যায়ং সর্ব্বদা কুর্য্যাদ্ নিযচ্ছেদ্বাচমন্যতঃ॥
অগ্নিহোত্রন্তু জুহুয়াৎ পঞ্চযজ্ঞং সমাচরেৎ।

বর্জ্জয়েন্মধু মাংসানি ভৌমানি কবকানি চ।

*　　*　　*　　*

ন নক্তং কিঞ্চিদশ্নীয়াৎ রাত্রৌ ধ্যান-পরোভবেৎ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধস্তত্ত্বজ্ঞানবিচিন্তকঃ॥
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং ন পত্নীমপি সংশ্রয়েৎ।
যস্তু পত্ন্যা বনং গত্বা মৈথুনং কামতশ্চরেৎ।
তদ্ব্রতং তস্য লুপ্যেত প্রায়শ্চিত্তী ভবেদ্দ্বিজঃ॥"

পূর্ব্বে সূর্য্য-বংশীয় রাজগণ যে বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, তাহা অনেকেই "বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং" রঘুবংশ শ্লোকেই জানিয়াছেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকেও শকুন্তলা যখন "কবে আবার আশ্রমে আসিব" বলিয়া পিতা কণ্বঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—উত্তরে মহর্ষি বলেন—"পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পতিসহ আবার এই আশ্রমে আসিবে॥" মহর্ষি এখানে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনের কথাই বলিলেন; উহা এমনই কর্ত্তব্য বিধিমধ্যে পরিগণিত ছিল।

এ তো গেল অতীতের কথা। এক্ষণে বানপ্রস্থাশ্রমের স্থান কোথায়? সে শান্ত পুণ্য আশ্রম নাই, সে বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বনের ব্যবস্থা নাই। জরাজর্জ্জরিত দেহে যখন কেহ তত্ত্ব লইবে না, বুড়া বলিয়া কেহ গ্রাহ্য করিবে না, অকর্ম্মণ্য বোধে সকলেই লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিবে, তখন মনে হয় বটে বনগমনই বিধেয়। এক্ষণে আমাদের কাশীবাসই একমাত্র বার্দ্ধক্যের আশ্রয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কাশীবাসই বর্ত্তমান সময়ের বানপ্রস্থাশ্রম। বানপ্রস্থাশ্রম নাই, কাজেই কাশীবাস দ্বারাই সেই ফলভোগ করিবার উদ্দেশ্যে অনেকে কাশীবাস করেন। পরিণত বয়সে সংসার হইতে ছুটি লইয়া শেষ কয়টা দিন নিশ্চিন্তে ভগবানের নাম লইয়া দিন কাটাইবার জন্য কাশীবাস বার্দ্ধক্যে এত প্রিয়। অবশ্য সেই সঙ্গে ৺বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার পুরী, কাশীধামে মৃত্যু হইলেই মুক্তিলাভ—এই বিশ্বাসও কাশীবাসের প্রযোজক। কিন্তু এক্ষেত্রে কাশীধাম যে তীর্থের সেরা, মৃত্যু হইলেই মোক্ষলাভ—ইহার প্রতিপাদন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ", কাশীধামেও অনেকে "পঞ্চাশোর্দ্ধে কাশীং ব্রজেৎ" করিয়া থাকেন। কেহ পত্নীকে সঙ্গে লন, কেহ পত্নীকে পুত্রের সংসারে রাখিয়া আসেন। উপরন্তু বিধবা প্রৌঢ়া রমণীরা পুত্রবধূর উপর সংসারভার অর্পণ করিয়া বার্দ্ধক্যে কাশীবাসিনী হন। যদিও কাশীধামে পর্ণশালা নাই, হরিণদের বিচরণ করিবার সম্ভাবনা নাই, অযত্নলভ্য ফল মূলে নিশ্চিন্তে জীবিকা নির্ব্বাহও চলে না, তথাপি ভাবগত হিসাবে বানপ্রস্থাশ্রম সাদৃশ্য কাশীধামে বর্ত্তমান। আমাদের বোধ হয়, কিছুদিন পূর্ব্বেকার এই বাঙ্গালী ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ কাশীবাস দ্বারা প্রকৃতই বানপ্রস্থাশ্রম বাসের উদ্দেশ্য সাধিত করিয়া লইতেন। বর্ত্তমানে অবনতির কথা যাউক; এই কাশীতেই ত একদিন ঋষিকল্প ত্রৈলঙ্গস্বামীর মত জীবন্মুক্ত জ্ঞানী, বিশুদ্ধানন্দ-

স্বামীর মত ত্যাগী মহাপণ্ডিত, ভাস্করানন্দের মত কঠোর যোগী মহাত্মা বাস করিতেন। এই কাশীধামেই বিষয়েচ্ছাত্যাগী দণ্ডিগণ ত ব্রহ্মচারী ছাত্রের মত বেদপাঠ করতঃ চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া বেড়ান। বানপ্রস্থাশ্রমিসদৃশ ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারপ্রমুখ পণ্ডিত গৃহস্থগণ সমস্ত যশঃ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইখানেই ত শেষজীবন কাটাইয়া গেলেন। ৺বিশ্বেশ্বর-আরতিকালে এখনও সামবেদ ঝঙ্কার ত শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণে পুণ্যামৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বেই দশাশ্বমেধ ঘাটের একধারে বেদপাঠ করিতে শুনিয়াছি, বৃদ্ধগণ পরস্পর শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন দেখিয়াছি, চাতালের উপর সন্ন্যাসী হোমাগ্নি জ্বালিয়া আহুতি দিতেছেন—তাহাও দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি। পুঁটিয়ার রাণীপ্রমুখ দয়াবতী দেবীগণের অন্নসত্রে প্রত্যহ শতশত দীনদরিদ্র এখনও আহার করিতে পাইতেছে, মুষ্টিভিক্ষার গুণে হাজার হাজার অনাথ নরনারী জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া লইতেছে। গৃহস্থের মধ্যেও এমন দুই একটি নিষ্কাম ভগবদ্গতপ্রাণ কাশীবাসী দেখিয়াছি, যাঁহাদিগকে দেখিলে বাস্তবিকই অন্তরে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়; অশান্ত জীবনে আশার সঞ্চার হয়। কত দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, গৃহী প্রত্যহ একমনে বেদবেদান্ত অধ্যয়নে রত, কত বালক স্বর করিয়া বেদের উচ্চারণ-প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাপৃত। ভাবগত হিসাবে সত্যই কাশীধাম বানপ্রস্থাশ্রম। কিন্তু বাস্তবভাবে সে আশ্রমদৃশ্য অবশ্য নাই। প্রকৃত কাশীবাসে বানপ্রস্থাশ্রমবাসের ফল হইতে পারে, তাহাতে বাধা নাই। তবে ইহাও সত্য যে, আগন্তুক নানা দোষ, নানা পাপ এমন ভাবে পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামকে ঘিরিয়া আছে, যে জন্য কাশীধামকে লোকে আর সেরূপ স্পৃহনীয় দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। যেমন মেঘে সূর্য্যদেব আবৃত মত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্য্যদেবকে আবৃত করার শক্তি মেঘের থাকে না। তদ্রূপই যত আবর্জ্জনা, যত দোষ, যত ব্যভিচার, যত জুয়াচুরী কাশীধামকে ঘিরিয়া থাকুক, তাহাতে পুণ্যক্ষেত্র-মাহাত্ম্য লুপ্ত বা খর্ব্ব হয় না। বাহ্যমালিন্য যতই ৺বিশ্বেশ্বররাজ্য প্লাবিত করুক, তাহাতে আন্তর বিশুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায় না। তবে ঐ বাহ্যমালিন্য থাকার জন্য শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ক্ষতি হয়, ইহা সত্য; কিন্তু তাহার ত কোন উপায়ও নাই। পাপীদের পাপপ্রবাহ পথ রুদ্ধ করা সম্ভবও নহে। কাশী পুণ্যবান্ ও পাপিগণেরও আশ্রয়; কিন্তু কাশীধামে কৃত পাপের কোন স্থানেই খণ্ডন নাই।

কাশীধাম মাহাত্ম্য শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে; এবং তন্মাহাত্ম্য খ্যাপনের গল্পও মধ্যে মধ্যে শুনিয়াছি। আজি আমরা আমাদেরই এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করিব, যাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যকর।

আমাদের কাশীধামে একখানি বাড়ী আছে। তাহারই কল্যাণে মধ্যে মধ্যে আমাদের কাশীবাস ঘটে। একবার আমি বুড়োদিদিকে লইয়া কিছুদিন কাশীবাস করি। সেই সময়ে আমাদেরই গ্রামের "সাতু" বলিয়া একটি ছেলে গিয়া আমার বাটীতে উঠে। বুড়োদিদি একদিন রাগ করিয়া কাঁটালপাড়ায় চলিয়া গেলেন। আমরা দুইজনে রহিলাম। একদিন

আমি রাঁধিতাম, একদিন সাতু রাঁধিত। যে দিন সাতু রাঁধিবে, সেদিন আমি বাজার করিয়া দিতাম। আবার যেদিন আমি রাঁধিব, সেদিন সাতু বাজার করিয়া দিবে—ইহাই আমাদের নিয়ম ছিল।

একদিন আমার বাজারের পালা। আমি বাজার করিয়া আনিলাম, কিন্তু ঘুঁটে পাইলাম না। কয়লার উনানে রন্ধন হইত, ঘুঁটে ব্যতীত উনান ধরিবে না; কাজেই ঘুঁটে চাইই। আমাদের ভাগ্যে সেদিন ঘুঁটের দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। আমি সাতুকে বলিলাম "ভাই ঘুঁটে ত পাইলাম না, চল দুইজনে ঘুরিয়া দেখি। একা আমি আর ঘুরিতে পারি না।" সাতু তাহার বাজারের পালা নহে বলিয়া যাইতে চাহিল না। আমারও রাগ হইল; আমিও ঘুঁটে আনিতে না গিয়া বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। আমাদের দুইজনেই তখন বলাবলি করিতে লাগিলাম—"শুনিয়াছি ৺অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেহ উপবাস করে না। আচ্ছা দেখাই যাক। ৺অন্নপূর্ণা দেবী যদি সত্যই কাশীর ঈশ্বরী হন, তবে এইখানে অবশ্যই ঘুঁটে আনিয়া দিবেন।"

আমরা দ্বাররুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। অকস্মাৎ কিয়ৎক্ষণ পরেই "ঠাকুর দোর খোল, ঘুঁঠে আনিয়াছি"—শুনিলাম। আমার হৃদয়ে অকস্মাৎ একটি ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা আসিল। শয্যা ছাড়িয়া আমরা লাফাইয়া উঠিলাম। আমরা যখন বলাবলি করি, তখন আমাদেরই উপরতলার একটী ভাড়াটের চাবী বন্ধ করা ঘরটি খুলিবার জন্য একজন তাহাদেরই আত্মীয়া আসিয়া ছিল। সেই আমাদের ধনুকভাঙ্গা পণ শুনিয়া "ব্রাহ্মণ উপবাস করিবে, ইহা ত ভাল নহে" ইহা ভাবিয়া ঘুঁটে আনিয়া উপস্থিত হইল। আমরা ৺অন্নপূর্ণাদেবীরই প্রেরিত ঘুঁটে—ইহা মনে করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে একজন ঘুঁটেওয়ালী বাড়ীর মধ্যে আসিয়া নীচে হইতে ডাকিল "বাবু, ঘুঁটে লবে?"

আমরা একাধারে বিস্ময় ও আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। সেই ঘুঁটেওয়ালী মাগী বলিল "বাবু আজ আমার এই ঘুঁটে বিক্রয় হয় নাই; তাই আপনাদের কাছে লইয়া আসিলাম।"

অবশ্য ঘুঁটেওয়ালী হিন্দীতেই কথা কহিয়াছিল। ঘুঁটে সে একদিনও আমাদের বিক্রয় করে নাই। আর আমাদের বাড়ীর ভিতরে কাহাকেও একদিনও ঘুঁটে বিক্রয় করিবার জন্য প্রবেশ করিতে দেখি নাই। এই ঘটনাটি বস্তুতই দৈবপ্রেরিত বলিয়াই বোধ হয় নাকি?

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

কীর্ত্তিমালিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪ স্তবক।

নিষধ-রাজনন্দিনী কীর্ত্তিমালিনী ক্রমশঃ বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া, কন্দর্পদেবের পুষ্প ব্যতিরিক্ত অস্ত্র-স্বরূপ যৌবনে পদার্পণ করিলেন। এই সময় তাঁহার অসাধারণ রূপমাধুরী দর্শনে বোধ হইত যেন বিধাতা সমগ্র সৌন্দর্য্য একত্র তাহার দেহে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রমণী কুলললামভূত রমণীয়রূপ দর্শনে, সংযমী শ্রেষ্ঠ বায়ুভোজী মুনিজনও কন্দর্পশরপীড়িত হইয়া পড়িতেন। দুহিতা যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে, রাজা চিত্রাঙ্গদ ও তদীয় মহিষী সীমন্তিনী কন্যার রূপ গুণানুরূপ জামাতা জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। রাজা চিত্রাঙ্গদ চিত্রকলাসুনিপুণ চিত্রকর দ্বারা নন্দিনীর আলেখ্য প্রস্তুত করাইয়া, তাহার অনুকৃতি আলেখ্যনিচয় নানাদিগ্দেশস্থ ভূপতি-সভায় আলেখ্যবিক্রেতা দ্বারা বিতরণ করাইলেন। অথচ কেহ জানিতে পারিল না যে, তাহার আদেশেই বিতরিত হইতেছে। ঐ সমস্ত আলেখ্য দর্শনে নানাদেশীয় ভূপতিগণ কন্দর্পশর-নিপীড়িত হইয়া কীর্ত্তিমালিনীর পাণিগ্রহণ বাসনায়, নিষধরাজ-সমীপে স্ব স্ব আলেখ্য সহ দূত প্রেরণ করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করিয়াছিলেন না। রাজা চিত্রাঙ্গদ ভূপতিবর্গপ্রেরিত আলেখ্যসমূহ গ্রহণ করিয়া, মহিষীর নিকট দুহিতার স্বীয় নির্ব্বাচন ও অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবার জন্য তাঁহার করে আলেখ্যগুলি অর্পণ করিলেন। সীমন্তিনী আলেখ্য-গুলি গ্রহণ করিয়া, দুহিতার কোন প্রিয়তমা সখীর করে প্রদান করিয়া, তাঁহার স্বাধীন নির্ব্বাচন ও অভিমত পরিজ্ঞাত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন।

কীর্ত্তিমালিনী এই ঘটনার ২।৩ দিন হইতেই যেন নৈশকমলিনীর ন্যায় ম্লান হইতেছিলেন; এরূপ সময় তাঁহার প্রিয়তমা সহচরী মাতৃদত্ত আলেখ্যস্তূপ তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিয়া, মাতার অনুরোধ বিজ্ঞাপন করিল। কীর্ত্তিমালিনী মাতৃপ্রেরিত আলেখ্যগুলি দর্শনে, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, শুষ্কহাস্য পুরঃসর, দীন মধুর স্বরে বলিলেন—"সখি, আমি রাজকুমার-গণের আলেখ্য দর্শন করিব না; কারণ, আমি মনে করিয়াছি, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, পুরুষের দাসীত্ব স্বীকার না করিয়া, কুমারীব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক উমাকান্তপদে আত্মসমর্পণ করিয়াই স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিব।" সখীগণ তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্পশ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে প্রবোধ ও দাম্পত্য-জীবনের সুখ প্রলোভন দিয়াও বিফল মনোরথ হইল। তাঁহার প্রিয়তমা সখী তাঁহার তথাবিধ সঙ্কল্পে সাতিশয় দুঃখিনী হইয়া, মাতৃ-চরণে তাবৎ বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। মহিষী সীমন্তিনী দুহিতার এইরূপ সঙ্কল্পশ্রবণে অত্যন্ত ম্রিয়মানা হইয়া, স্বয়ং দুহিতাকে তথাবিধ সঙ্কল্পের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন প্রকার

প্রত্যুত্তর পাইলেন না। তিনি কুমারী জীবনের নানাবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া, কন্যার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন জন্য অশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্যা হইলেন না। অগত্যা স্বামি-সকাশে দুহিতার সঙ্কল্প বিবৃত করিলেন। রাজা চিত্রাঙ্গদ রাজ্ঞী-প্রমুখাৎ দুহিতার সঙ্কল্প পরিজ্ঞাত হইয়া নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। যুবতীকন্যার বিবাহ না দেওয়ায় নানাপ্রকার কলঙ্ক ও বিপদাশঙ্কায় তিনি দিন দিন মহাদুঃখিত হইতে লাগিলেন। যুবতীকন্যার অনভিমতে, বিবাহ দেওয়া অসঙ্গত মনে করিয়া উৎকট চিন্তায় ও দুঃখে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই সময় তদীয় গুরুদেব মহাযোগী ঋষভদেব উপস্থিত হইলেন। গুরুদেবকে সমাগত দেখিয়া, রাজা চিত্রাঙ্গদ পরম পুলকিত হইয়া পাদ্যার্ঘ্যদ্বারা অভ্যর্থনাপূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন, যোগিবর আসন পরিগ্রহ করিয়া আশীর্ব্বাদ পুরঃসর কুশল প্রশ্নদ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। রাজা গুরুদেবের নিকট দুঃখিতভাবে কন্যার বৈবাহিক সঙ্কল্প বিবৃত করিলেন। ঋষভদেব চিত্রাঙ্গদের তথাবিধ উদ্বেগের কারণ শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল ধ্যানস্থ হইয়া সহাস্যবদনে রাজারে অভয় প্রদান করিয়া অন্তঃপুর গমন করিলেন। রাজ্ঞী সীমন্তিনী গুরুদেবকে দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। তিনি সস্নেহে রাজ্ঞীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কীর্ত্তিমালিনী প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। কীর্ত্তিমালিনী যথানিয়মে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে তপঃপ্রকোষ্ঠে নিমীলিত নেত্রে ইষ্টদেবতার ধ্যানস্থ হইয়া সুখাসীনা ছিলেন। ঋষভদেব তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তদবস্থ দর্শনে পরম হৃষ্ট হইলেন। তিনি কীর্ত্তিমালিনীর ধ্যানভঙ্গ না করিয়াই তাঁহার সম্মুখস্থিত গুরুনিমিত্ত কল্পিত আসনে উপবেশন করিলেন। অচিরকাল মধ্যেই ধ্যানভঙ্গ হইবামাত্র সম্মুখেই গুরুদেবকে উপবিষ্ট দর্শনে রাজকুমারী অভীষ্ট সিদ্ধি সম্ভাবনায় পরম পুলকিত হইয়া তাঁহার চরণোপান্তে পতিত হইলেন। যোগিরাজ সহাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বৎসে! তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হউক। উমাপতির কৃপায় উমা যেমন পতিলাভে প্রহৃষ্ট হইয়াছিলেন তুমিও সেইরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বীরপুরুষের গলায় বরমাল্য প্রদানে হৃষ্ট হইবে।" রাজকুমারী গুরুদেব প্রমুখাৎ স্বীয় অচিন্তিতপূর্ব্ব স্বপ্নাভাস শ্রবণে চমৎকৃত ও পুলকিত হইয়া ব্রীড়া নম্রবদনে উপবিষ্টা রহিলেন। ঋষভদেব বলিলেন,—"অয়ি শুচিস্মিতে! আমি ধ্যানবলে তোমার স্বপ্নবিবরণের সারাংশ পরিজ্ঞাত হইলেও তুমি আমার নিকট তোমার স্বপ্নবিবরণ অবিকল বর্ণনা কর।" রাজকুমারী গুরুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিলে যোগিরাজ পুলকিত হইয়া, আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন;—"বৎসে তুমি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, শিবসেবায় মনোনিবেশ কর। আশুতোষের প্রসাদাৎ তোমার স্বপ্নদৃষ্ট বীরপুরুষ অচিরে কীর্ত্তিমালায় সুশোভিত হইয়াই কীর্ত্তিমালিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন।" এইরূপে রাজকুমারীর হতাশহৃদয়ে আশাপ্রদান করিয়া তথা হইতে নির্গত হইয়া রাজা ও রাজ্ঞীকে প্রীতিপ্রফুল্ল-চিত্তে সহাস্যবদনে অভয় প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন তোমরা নিশ্চিন্ত হও, তোমাদের দুহিতা অচিরকালমধ্যেই মহাবীর রাজকুমারকে বরমাল্য প্রদান করিয়া তোমাদের হতাশহৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিবে। আমি রাজকুমারীর তথাবিধ সঙ্কল্পের কারণ ও বিবরণ

বিবৃত করিতেছি। একদা রজনীর শেষ যামার্দ্ধে রাজকুমারীর এক আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন করিয়াই এরূপ সঙ্কল্প করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বপ্নবিবরণ এই,—রাজকুমারী যথানিয়মে মহেশ্বরের সায়ংকালীন নিরাজন দর্শন করিয়া শিবালয় হইতে নির্গত হইতেছিলেন, এমন সময়, সম্মুখেবহুজন কোলাহল শ্রবণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন এবং তোরণসমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তোরণ পার্শ্বস্থিত লৌহময়সিংহ যেন হঠাৎ সজীব হইয়া সর্ব্বলোকভয়াবহ এক গর্জ্জন করিল। সিংহগর্জ্জন শ্রবণমাত্র, তাঁহার সহচরীগণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। তিনিও ভূপতিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ লোপ হইল না। তিনি পতিতা হইবামাত্র ঐ সিংহ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে পতিত হইয়া যেমন তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, অমনি এক বীর যুবক চকিতের মধ্যে লম্ফপ্রদান করিয়া সিংহের স্কন্ধে খড়্গ প্রহার করিলেন। সিংহ তৎক্ষণাৎ ভীষণতর গর্জ্জন করিয়া ভূপতিত হইল। সিংহের গর্জ্জনে তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হইল। তখন ঐ বীরপুরুষ দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়াই বামহস্ত দ্বারা কুমারীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে অভয় প্রদান করিলেন। কুমারী কথঞ্চিৎ আত্মসংযম করিয়া বীরপুরুষকে বলিলেন হে মহাত্মন্! আপনি আমার সম্পূর্ণ অদৃষ্ট ও অপরিচিত, আপনি আমাকে সাক্ষাৎ কৃতান্তকবল হইতে জীবনদান করিলেন আমার পিতা নিশ্চয়ই আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন। বীর যুবক সহাস্যে বলিলেন, "অয়ি বরাননে! আমি বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তোমার এই করপল্লবই গ্রহণ করিলাম।" এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কুমারীর নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং কোকিলাদি বিহঙ্গগণ চতুর্দ্দিক হইতে শ্রুতিমধুর কলরব করিয়া উঠিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে কুমারী যথানিয়মে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিলেন, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি ও চিত্তপট হইতে স্বপ্নবিবরণ অপনীত হইল না। তিনি সুস্থ হইয়া এই জন্যেই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, জাগ্রৎ অবস্থাতেই হউক আর স্বপ্নাবস্থাতেই হউক, একজনকে পাণিদান করিয়া অন্যকে পাণিদান করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া নিরয়গামিনী হইতে হইবে। স্বপ্নে যে বীর তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সন্ধ্যাসমাগম জন্য ধরিত্রী কথঞ্চিৎ তমসাবৃত হওয়ায় ঐ বীরকুমারের প্রকৃত মূর্ত্তি ও রূপ কুমারী সম্যক্ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। সুতরাং তোমার যত্নসহকারে ভূতলস্থ যাবতীয় বীরকুমারের আলেখ্য আনয়ন করিলেও কুমারী তদ্দর্শনে ঐ বীরের আলেখ্য নির্ব্বাচনে সম্যক্ সমর্থ হইবেন বলিয়াও তাঁহার বিশ্বাস নাই। এই নিমিত্ত তোমাদের ধর্ম্মভীতা দুহিতা দ্বিচারিণী হওয়া অপেক্ষা অনূঢ়া থাকিয়াই শিবিসেবায় জীবন যাপন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

গুরুদেব-প্রমুখাৎ দুহিতার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও সঙ্কল্প শ্রবণে রাজা ও রাজ্ঞী শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দুহিতার তথাবিধ একব্রতাবলম্বনরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা শ্রবণে মনে মনে গৌরব বোধ করিয়াও, তথাবিধ অবস্থায় কুমারীর পরিণয় সম্পাদন অসম্ভব মনে করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। যোগিবর সহাস্য বদনে তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন— তোমরা দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর; আমি ইহার সদুপায় স্থির করিয়াছি। ক্ষত্রিয়-কুমারীর

স্বয়ম্বর প্রথানুসারে পরিণয়ই শ্রেষ্ঠ পরিণয়। সত্বর দুহিতার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ কর। ঐ স্বয়ম্বরে ঘোষণা করিয়া দিতে হইবে—"যে বীরপুরুষ এক খড়্গ প্রহারে তোমার শিবালয় তোরণ-পার্শ্বস্থিত লৌহময় সিংহের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূপাতিত করিতে পারিবেন, রাজকুমারী তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিবেন।" গুরুদেবের বাক্যাবসানে রাজা চিত্রাঙ্গদ কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে বলিলেন। গুরো! আপনার আদেশ শিরোধারণ করিয়াই স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিব, কিন্তু এক খড়্গপ্রহারে লৌহময় সিংহের মস্তকচ্ছেদন অসম্ভব বলিয়াই আমার চিন্তা হইতেছে। যোগিরাজ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমরা ঐরূপ কঠিন পণজন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিবে না। আমি দিব্যচক্ষেই দর্শন করিতেছি, মহেশ্বরের কৃপায় নিশ্চয় সেই স্বপ্নদৃষ্ট বীরপুরুষই লৌহময় সিংহের মস্তক দ্বিধা করিয়া অমানুষিক বীরত্ব ও কীর্ত্তিবিকাশে কীর্ত্তিমালিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন।

গুরুদেবের আশ্বাস বাক্যে রাজা ও রাজ্ঞী শান্তিলাভ করিয়া, যথাবিধানে তাঁহার সৎকার করিলে তিনি স্বয়ম্বরকালে স্বয়ং উপস্থিত হইবেন এইরূপ বলিয়া যথেচ্ছ গমন করিলেন।

৫ম স্তবক।

অনন্তর নিষধরাজ মন্ত্রভবনে গমন করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত গুরুদেবাদিষ্ট স্বয়ম্বর সম্বন্ধে, ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিলেন। স্বয়ম্বরসমাজ নির্ম্মাণ, অভ্যাগতব্যক্তিগণের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্যাদি-সংগ্রহ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া, জ্যোতির্ব্বিৎপণ্ডিতদ্বারা, স্বয়ম্বর নিমিত্ত দিনাবধারণ করিলেন। বিশুদ্ধকালে, বিহিত পবিত্র দিন অবধারিত করাইয়া উপযুক্ত দূতদ্বারা স্বয়ম্বরপণ ঘোষণাযুক্ত নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিয়া নানাদেশীয় মহীপালগণকে আমন্ত্রণ করিলেন। স্বাধ্যায়নিরত বেদপারগ তপোবলযুক্ত ব্রাহ্মণদ্বারা দেব, যক্ষ, সাধ্য প্রভৃতি স্বর্গবাসিদিগকে ও ভূদেব-মহর্ষি-ঋষিমুনি প্রমুখ বিপ্রগণকেও স্বয়ম্বর দর্শনার্থ আমন্ত্রিত করিলেন। তৎপরে নানা-বিধ চর্ব্য-চূষ্য লেহ্য পেয় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া, স্বয়ম্বর সমাজ প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজপুরীর সিংহদ্বার হইতে যে প্রশস্ত রথ্যা দক্ষিণবাহিনী হইয়া নগরপ্রাকার ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। ঐ রথ্যার পূর্ব্বপার্শ্বে, রাজপুরীর অনতিদূরে, রাজ্যের নৈমিত্তিক উৎসবাদি সম্পাদনার্থ যে প্রাচীরবেষ্টিত ও হর্ম্ম্যরাজিসুশোভিত প্রশস্ত সমতলক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল, ঐ সমতল ক্ষেত্রই স্বয়ম্বর-সমাজ নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হইল। রাজধানীর বহির্ভাগস্থ দুর্গসন্নিহিত যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছিল, ঐ প্রান্তর বহুচত্বরে বিভক্ত করিয়া, প্রতি চত্বরে জলাশয়াদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, স্বয়ম্বর সমাগত মহীপালগণের হস্ত্যশ্বরথপদাতি প্রভৃতির অবস্থান জন্য নির্দ্ধারিত হইল। যে প্রশস্ত রথ্যাপার্শ্বে স্বয়ম্বর-সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ঐ রথ্যার উপরিভাগে ও পার্শ্বদেশে নিয়মিত ব্যবধানে তোরণ সমূহ নির্ম্মিত হইল। ঐ তোরণসমূহ বিবিধ কারুকার্য্য-প্রজ্বলিত নানাবর্ণ দীপগোলক, ধ্বজপতাকা ও মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত। রথ্যার উভয় পার্শ্বে

গন্ধতৈলপূর্ণ দীপাধার সমন্বিত বিচিত্র আলোকস্তম্ভ, লম্বমান বিচিত্র সুগন্ধ মাল্য ও ধ্বজপতাকা-দ্বারা সুসজ্জিত হইল। রথ্যার পার্শ্ববর্ত্তী তোরণসমূহের সর্ব্বোচ্চ তোরণই স্বয়ম্বর সমাজের তোরণ। তোরণ হইতে অনতিদূরে, স্বয়ম্বর-সমাজের উভয় পার্শ্বে সুধাধবলিত দ্বিতল সৌধমালা তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতমালার ন্যায় সুশোভিত। ঐ সৌধমালার বহির্ভাগে কিয়দ্দূরে প্রাচীরবেষ্টন। প্রাচীর ও সৌধাবলির মধ্যবর্ত্তী ভূমি পুষ্পগুল্মবৃতি দ্বারা বিভক্ত করিয়া, ভূপতিগণের অনুচরাদির বাসস্থান ও রন্ধনাগার সমন্বিত হইল। সৌধাবলির সম্মুখস্থ কারুশিল্প-মণ্ডিত স্তম্ভমালাসমন্বিত অলিন্দ স্থানানুযায়ী বিচিত্র সুগন্ধ মাল্য ও স্ফটিকদীপগোলক সজ্জিত। সৌধাবলির হস্তিদন্ত-খচিত দ্বারসমূহ সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত থাকায় অত্যন্ত সুদৃশ্য হইয়াছিল। বিভিন্ন মহীপালের প্রয়োজনারূপে প্রকোষ্ঠগুলি সুবিভক্ত। প্রতিবিভাগে সমদূরবর্ত্তি মনোহর মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত সোপানমার্গ প্রতি বিভাগে নানাবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত রাঙ্কববসনমণ্ডিত আসন, দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা, বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ। সৌধাবলির কুট্টিমভূমি মণিময় কারুশিল্পযুক্ত শিলাপট্টে উদ্ভাসিত। সৌধাবলি মধ্যস্থ প্রাঙ্গণে স্বর্ণমণ্ডিত মণিরত্ন-খচিত স্তম্ভমালা চতুরস্র বাহুরূপে সুনির্ম্মিত। ঐ স্তম্ভাবলির শিরোভাগে বিচিত্র স্বর্ণসূত্রবিজড়িত, মনোহর ক্ষৌমচন্দ্রাতপ সুবিন্যস্ত হওয়ায়, নক্ষত্রমালাখচিত গগনপটের ন্যায় সমুজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছিল। ঐ সমস্ত স্তম্ভমূলে বিস্ফুরিতব্য গন্ধদ্রব্যপূর্ণ রত্নময় ফলপুষ্পসমন্বিত হিরণ্যতরুরাজি স্থাপিত, তদপেক্ষা কিয়দুচ্চে হিরণ্য পুষ্পশোভিত রজতলতিকা, অর্দ্ধবৃত্তাকারে সুসংযোজিত থাকায়, সভামণ্ডপ সুগন্ধবিকীর্ণ ও অলোকসামান্য তেজঃপুঞ্জপ্রদীপ্ত হইয়াছিল। ঐ স্তম্ভশ্রেণী মধ্যে মণিময় স্ফাটিক দীপ-গোলক প্রলম্বিত, ও স্তম্ভসমূহ বহুবিচিত্র সমুজ্জ্বল চিত্রোপশোভিত হওয়ায়, অত্যন্ত দৃষ্টিমনোহর ও চিত্তবিনোদন হইয়াছিল।

সভামণ্ডপের পূর্ব্বখণ্ডে, উভয়পার্শ্বে সুরঞ্জিত রত্নখচিত বেদিকোপরিভাগে রাঙ্কবাস্তরণ আস্তৃত হইয়াছিল ও দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষাদি ও মুনিঋষি প্রমুখবিপ্রবর্গের উপবেশন জন্য শ্রেণীবিভক্ত আসন কল্পিত হইয়াছিল। উহার সম্মুখে উভয়পার্শ্বে মহীপালগণের উপবেশন জন্য সুকোমল মনোরম কারুকার্য্যসমন্বিত ক্ষৌম-আস্তরণ শোভিত রজতাসনসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুশোভিত। রাজন্যবর্গের আসনের প্রতীচ্যভাগে নাগরিক ও জানপদদর্শক মণ্ডলীর উপবেশ-নার্থ উভয়পার্শ্বে নিম্নতর বেদিকা বিচিত্র আস্তরণমণ্ডিত। সভামণ্ডপের কুট্টিমভূমি সভাস্থ জনগণের মনোরঞ্জনার্থ সমুপস্থিত তূর্য্যাজীব, গায়ক, নর্ত্তক ও অভিনেতৃবর্গের উপবেশ-নার্থ সুরঞ্জিত আস্তরণে মণ্ডিত।

সভামণ্ডপ হইতে তোরণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুপ্রশস্ত সুরঞ্জিত বর্ত্ম। ঐ বর্ত্মের উভয়পার্শ্বে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত নাতিপ্রশস্ত ভূখণ্ড। বর্ত্মের উভয়পার্শ্বে ও ভূখণ্ডদ্বয়ের চতুঃপার্শ্বে স্বল্পোচ্চ বিচিত্র পুষ্পপাদপ ও মঞ্জরীজালমণ্ডিত গুল্মরাজি সুরুচি বিন্যস্ত। ঐ সমস্ত পুষ্পপাদপ ও গুল্ম-রাজি নবকিশলয়, ও পুষ্পশোভিত হইয়া এবং পুষ্পসুরভিমত্ত মধুব্রতগণ সমাবৃত থাকায়

দর্শকমণ্ডলীর অতীব চিত্তবিনোদন হইয়াছিল। ঐ বর্ম্মের একপার্শ্বে মণিরত্নখচিত হিরণ্য-উৎস স্বচ্ছ সুশীতল গন্ধবারি উৎকীরণ পূর্ব্বক সভাস্থ জনগণের শ্রমাপনোদন ও চিত্তবিনোদন জন্য স্থাপিত। অন্য পার্শ্বে অত্যুচ্চ মণিময়পীঠে স্বয়ম্বর পণ-বিষয়ীভূত বিবিধ রত্নভূষণ ভূষিত আয়সকেশরী স্থাপিত হইল। স্বয়ম্বর দিনের পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চদশ দিবস নৃত্যগীত ও অভিনয় প্রভৃতি জন্য নির্দ্ধারিত হইল।

স্বয়ম্বরদিন নিকটবর্ত্তী হইলে সভামণ্ডপে যথানিয়মে নৃত্য, গীত ও অভিনয় আরম্ভ হইল। রাজধানীর বিভিন্নস্থানে বাদ্যোদ্যম, মল্লক্রীড়া ও নানাবিধ প্রমোদাভিনয় আরম্ভ হইল। স্বয়ম্বর-প্রাক্ পঞ্চদশ দিবস হইতে রঙ্গোপকরণে হাবভাব লাবণ্যযুক্ত সুনিপুণ নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ নানা-বিধ নৃত্যকলা প্রদর্শন এবং অভিনেত্রীগণ নানাবিধ শ্রুতিমধুর তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত ও অভি নয় দ্বারা সভামণ্ডপাগত দর্শকবৃন্দের চিত্ত বিনোদন পূর্ব্বক দিন দিন সভার শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। দেবালয়সমূহে বেদপাঠ প্রভৃতি মাঙ্গলিককার্য্য আরম্ভ হইল। নানাদিক হইতে দ্রব্যসম্ভার আসিতে লাগিল। কোনস্থানে ব্রাহ্মণভোজন, কোন স্থানে দরিদ্র দীন-হীন জনগণকে অন্ন বস্ত্রাদি বিতরণ আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" রবে ও নানাবিধ আনন্দকোলাহলে রাজধানী পরিপূরিত হইয়া উঠিল। স্বয়ম্বর দিন নিকটবর্ত্তী হইলে, নানাদিগ্দেশ হইতে মহীপালগণ হস্ত্যশ্বরথপদাতিকসহ আগমন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব, রথের ঘর্ঘর শব্দে ও সৈন্যগণের কোলাহল ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন মহীপালের বিভিন্ন চিহ্নাঙ্কিত ধ্বজপাতাকা, সৈন্যগণের বিভিন্ন বেশ ও ভূষণ সৌন্দর্য্যে পৃথ্বী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতে লাগিল। অভ্যাগত মহীপালগণ মহাবাহু সুবিনীত চিত্রাঙ্গদ কর্ত্তৃক বিবিধ উপচারে অভ্যর্থিত হইয়া দ্বারদেশস্থ বেদিকোপরি ফলপল্লবান্বিত পূর্ণকলসবিশিষ্ট সৌধচত্বরে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সকলেই চিত্রাঙ্গদ কর্ত্তৃক পারিপাট্য সহকারে সুসৎকৃত হইয়া হর্ষোৎ-ফুল্লমানসে দৈনন্দিন নৃত্যগীতাদি উৎসব দর্শনে পরমপ্রীত হইয়া রমণীললামভূতা রমণীয় রমণী-রত্ন কীর্ত্তিমালিনীর প্রাপ্তি-আশায় কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। যামিনী সমাগত হইলে নিদ্রাদেবী, স্বামীর পরনারীগতভাব বুঝিতে অসমর্থ কামিনীর ন্যায় যথাকালের বহুক্ষণ পরে, ভূপালবর্গের নয়নাভিমুখী হইতে লাগিলেন। প্রত্যূষকালে সমবয়স্ক কোকিলকণ্ঠবাগ্মী, কিশোরবয়স্ক বন্দিগণ তানলয় সংযোগে স্তুতিপাঠ করিয়া, মহীপাল-গণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে লাগিল। যজ্বা ভূরিদক্ষিণ স্বাধ্যায়নিরত, পবিত্রচেতা, যতব্রত, যশো-লিপ্সু নরপতিগণ পরস্পর যশোজিগীষা পরতন্ত্র হইয়া, সমাগত মুনিঋষিপ্রমুখ বিপ্রবর্গকে ও দীনদুঃখিগণকে, স্ব স্ব সমানীত সুলক্ষণা গাভী, ধন, রত্ন, বস্ত্র ও বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দান করিতে লাগিলেন। সূত, মাগধ, বৈতালিক, নট, নর্ত্তক, ও নানাদেশীয় মল্লগণ, স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রদর্শনে নরপতিগণের তুষ্টিসাধন পূর্ব্বক বহু ধনরত্ন ও পারিতোষিক লাভ করিতে লাগিল। এইরূপে স্বয়ম্বর প্রাক পঞ্চদশদিবস অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন নৃত্যগীতাদি দর্শন

জন্ত যথাসময়ে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ বিচিত্র বেশভূষা সমাধান পূর্ব্বক উপযুক্ত আসনে অধ্যাসীন হইয়া প্র,ত্যেকেই স্ব স্ব অস্ত্র ও বাহুবলের শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞানে মত্ত হইয়া মদস্রাবী মাতঙ্গযূথের ন্তায় ঈর্ষাকষায়িত-লোচনে পরস্পর পরস্পরের বদন ও ওজস্বিতা দর্শনে কীর্ত্তিমালিনীলাভে কৃত-নিশ্চয় হইয়া, পীনবক্ষঃস্থলে আকাশ কুসুমমালা ধারণপূর্ব্বক, আহ্লাদে মগ্ন হইতে লাগিলেন।

৬ষ্ঠ স্তবক।

দশার্ণভূপতি পাষাণহৃদয় বজ্রবাহু ক্রূরবুদ্ধি কনিষ্ঠ পত্নীর প্ররোচনায় মোহান্ধ হইয়া, পতি-পরায়ণা ধর্ম্মশীলা পট্টমহিষীকে সপুত্রা নির্ব্বাসিতা করিয়া, তুষানলের ন্তায়, দিন দিন দগ্ধ হইতে লাগিলেন। মায়াবিনী পিশাচীর মনে মনে আশঙ্কা ছিল, পাছে রাজা স্বীয় ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া, সপুত্রা সুনীতিকে পুনরানয়ন করেন। এজন্য সে সর্ব্বদা ছায়ার ন্তায় পতির আনুগত্য করিয়া চিত্তবিনোদনে যত্নবতী ছিল। বজ্রবাহু স্বীয় ভ্রান্তি বুঝিতে সক্ষম না হইলেও ক্রমশঃ রাজকার্য্যে অনাবিষ্ট-চিত্ত হইতে লাগিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জেও তাঁহাকে আর পূর্ব্ববৎ ভক্তি করিত না, মন্ত্রিগণ ও অমাত্যবর্গও বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনে শৈথিল্য করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই মনে মনে তাঁহাকে স্ত্রীজিত, কাপুরুষ, পক্ষপাতী ও নির্ম্মম জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। সামন্ত ও করদ রাজগণও সুনীতি-নির্ব্বাসন পরিজ্ঞাত হইয়া, তাঁহার প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। প্রত্যেকেই তাঁহার অধীনতায় অগৌরব মনে করিতে লাগিল। কেহই তাঁহার আজ্ঞাপালনে সন্তুষ্টচিত্ত থাকিল না। স্থানে স্থানে প্রকৃতিপুঞ্জ বিদ্রোহ উত্থাপনে পাপ মনে করিল না। রাজ্যের শাসনপরিচালন নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল।

প্রতিবেশী মহীপাল মগধরাজ হেমরথ পরমধার্ম্মিক রাজনীতিজ্ঞ ও মহাবলশালী। তিনি রাজা বজ্রবাহুর দুষ্কৃতি সংবাদ শ্রবণে তাঁহাকে কাপুরুষ, স্ত্রীজিত ও সদসদ্বিবেকপরিশূন্য মনে করিয়া, নিতান্ত ঘৃণা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজনীতি ও যুদ্ধনীতিতে বিচক্ষণ। তিনি দশার্ণরাজের কাপুরুষতা জন্ত রাজনীতি অনুসারে, তথাবিধ স্ত্রীজিত রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যগ্রহণ রাজনীতিবিশারদ ক্ষত্রিয় রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তিনি দশার্ণ-রাজ্যে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলেন এবং ভেদনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক দশার্ণরাজ্যমধ্যে প্রজা-বিদ্রোহের উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোন কোন সামন্ত ও করদরাজাকে দশার্ণরাজ বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। এইরূপ কূটরাজনীতি অবলম্বনে, তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র জয়ের নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিলেন।

রাজা হেমরথ দশার্ণরাজ্য জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যে মহাবল পরিবৃত হইয়া দশার্ণরাজ্য বিজয়বাসনায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হস্ত্যশ্ব-রথ-পদাতি চতুরঙ্গিনী সেনা পরিবৃত হইয়া তিনি দশার্ণ-রাজ্যের সীমান্তে

উপনীত হইয়া, কোন কোন দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতিকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক ধনিগৃহ লুণ্ঠন ও সামন্তরাজাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক স্বপক্ষে আনয়নের জন্য যত্নবান হইতে উপদেশ দিলেন। ঐ সমস্ত সেনাপতিগণ অগ্রসর হইয়া ধনিগৃহ লুণ্ঠন, শস্যসম্ভার আত্মসাৎ করিয়া, প্রজাদিগকে স্ববশে আনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহারা অবাধ্য হইল, তাহাদিগের গৃহদাহ ও গৃহোদ্যান বিধ্বস্ত করিয়া গৃহজাত দ্রব্যাদি, বালক ও যুবতী রমণীগণ লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করিতে লাগিল।

মাগধ সৈনিকগণের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অত্যাচার কাহিনী অনতিবিলম্বে বজ্রবাহু সকাশে পৌছিল। তিনি অকস্মাৎ এই সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত পর্য্যাকুল হইয়া মন্ত্রিদিগকে আহ্বান করিয়া অনতিবিলম্বে প্রতিযুদ্ধের পরামর্শ করিয়া রাজ্যমধ্যে যুদ্ধঘোষণা প্রচার করিলেন; কিন্তু রাজ্যমধ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা হেতু ও তাঁহার প্রতি অমাত্য, সৈনিক ও নাগরিকগণের শ্রদ্ধাহীনতা ও অনুরাগাভাব হেতু, আশানুরূপ যুদ্ধোদ্যোগে বিলম্ব হইতে লাগিল। তাঁহার কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর পুত্র সুবাহু প্রকৃতিপুঞ্জের ও অমাত্যবর্গের অপ্রিয় হেতু যুদ্ধকৌশল পারদর্শী না হওয়ায় যুদ্ধায়োজনের আরও ত্রুট হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতিযুদ্ধের আয়োজন করিতে করিতে, মগধরাজ হেমরথ মহাবিক্রমে ও বিশালবেগে, রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাজা বজ্রবাহু, উপযুক্ত আয়োজন না হইলেও, যথাসম্ভব সৈন্যসামন্ত সহ প্রতিযুদ্ধ করিতে নির্গত হইলেন। মহেষ্বাস বজ্রবাহু স্বয়ং রথারোহণ পূর্ব্বক বিপুল বিক্রমে অসাধারণ কৌশলে শত্রুসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। কুমার সুবাহু ও অন্যান্য সেনাপতিগণ অসাধারণ বিক্রমে শত্রুসৈন্য বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা বজ্রবাহুর অসাধারণ যুদ্ধ-নৈপুণ্যে মাগধ সৈন্যগণ ভীত ও ত্রস্ত হইয়াও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্যদিকে কুমার সুবাহু ও সেনাপতিগণ মাগধসৈন্যগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু মাগধসৈন্যের দৃঢ়তা ও লঘুহস্ততা বশতঃ তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমত সময় মগধসেনাপতি সুবাহুর সারথির মস্তকচ্ছেদ ও তাঁহার ধনুর গুণচ্ছেদ করিলেন। তখন সুবাহু হতসারথি ও ছিন্নধন্বা হইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং খড়্গহস্তে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরকাল মধ্যে মাগধসেনাপতি তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দীকৃত করিলেন। এদিকে রাজা বজ্রবাহু মাগধ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুসৈন্য বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। বজ্রবাহু কর্তৃক বহুসৈন্য বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া রণদুর্ম্মদ রাজা হেমরথ বজ্রবাহুর সম্মুখীন হইলেন। উভয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অরণ্যমধ্যে মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গ সহ কেশরীর যেরূপ যুদ্ধ হয়, উভয় বীরে সেইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরের বাণাঘাতে বিদ্ধ হইতে লাগিলেন। পরস্পরে বাণবিদ্ধ হইয়া অরণ্যমধ্যে পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। উভয়ের বাণবর্ষণে সমরস্থল অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল। প্রত্যেকেই স্বীয় লঘুহস্ততা দেখাইয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর হেমরথ

ক্রোধান্ধ হইয়া সুদৃঢ় সায়কনিচয়ে বভ্রুবাহুর তূণীর ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বভ্রুবাহু অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া জ্যারোপণ করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ হেমরথ তাঁহার দ্বিতীয় শরাসনও ছেদন করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার সারথির মস্তকচ্ছেদ করিয়া অশ্ববিনাশ করিলেন। রাজা বভ্রুবাহু হতাশ্ব হতসারথি ও ছিন্নধন্বা হইয়া গদা গ্রহণ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভূতলে পতিত হইয়া বভ্রুবাহু গদাগ্রহণে হেমরথের সৈন্যবিনাশ আরম্ভ করিলেন। হেমরথও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রাজা হেমরথ প্রবলবেগে বভ্রুবাহুর দক্ষিণ স্কন্ধে আঘাত করিলেন। গদাঘাতে বভ্রুবাহুর হস্ত হইতে গদা পতিত হইল, তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন হেমরথ ক্রোধান্ধ হইয়া, তাঁহাকে বন্দী করিলেন। রাজা বভ্রুবাহু বন্দীকৃত হইলে, তাঁহার সৈনিকগণ কতক পলায়ন করিল, অবশিষ্ট সৈন্য বন্দীকৃত হইল। বলবান্ মগধসৈন্যগণ দশার্ণরাজ্য পরাজয় করিয়া জয়োল্লাসে নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা রাজকীয় অশ্ব, গজ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশু ও বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজমহিষী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণকে বন্দী করিল। রাজা হেমরথ এইরূপে দশার্ণরাজ্য জয় করিয়া সপুত্র রাজা বভ্রুবাহুকে ও অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাবর্গকেও কারারুদ্ধ করিয়া দশার্ণ রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। দশার্ণ রাজ্য মধ্যে হাহাকার রব পড়িয়া গেল। দশার্ণ রাজদুর্গ মগধ সৈন্যাবাস হইল। দুর্গে মগধের জয় পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সদাচার সংরক্ষণ।

আজকাল এই কলির প্রবল প্রভুতার সময়ও কি জানি কি কারণে সনাতন ধর্ম্মের প্রতি লোকের আদর বর্দ্ধিত হইতেছে। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের প্রভা যেমন একবার চরম ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়,—মৃত্যুর প্রাক্কালে মুমূর্ষুর যেমন ক্ষণিক নীরোগ অবস্থা হয়, বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মানুরাগ সে জাতীয় নহে। ইহা ক্ষণিক নহে, পরন্তু ধর্ম্মের প্রতি এ অনুরাগ চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া আমাদের সম্পূর্ণ আশা ও ধারণা। মনে হয় যে ব্রহ্মণ্যদেবের অলৌকিক কৃপায় আমাদের সনাতন-ধর্ম্ম পুণ্য-ভারতে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—যিনি এই ধর্ম্মের কিঞ্চিন্মাত্র গ্লানি দেখিলে বিক্ষুব্ধ হইয়া স্বয়ং অবতার ক্লেশ সহকরতঃ অধর্ম্মের ভ্রুকুটীবিভ্রম হইতে ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া তাহাকে তাঁহার উজ্জ্বল সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই ভূতভাবন বিভু জগদীশ্বরের কৃপাকণা ভারতবাসী বর্ণাশ্রমাচারী প্রজাপুঞ্জের উপর পতিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত এই নবধর্ম্মভাবকে সজীব করিয়া রাখিবে। কেবল

বঙ্গে নহে,—এই ধর্ম্মভাবের সজীবতা আজ নিখিল ভারতের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। আশা হয় আমাদের এই জীবনেই বিনষ্টপ্রায় ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে বিচিত্র বিজয় বৈজয়ন্তী ভারতের অম্বরতলে উড্ডীন দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিব এবং মেঘমন্দ্রে পুলকিত শিখিকুলের মত ধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভির মধুর ধ্বনিতে—স্থল, জল, ব্যোম, তপন, পবন প্রতিধ্বনিত শুনিয়া কর্ণকুহর শীতল করিব এবং এই নরজীবনের চরিতার্থতা অনুভব করিব। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন, ব্রাহ্মণ-সভা, নিখিল ভারতীয় সনাতন-ধর্ম্ম মহাসম্মিলন প্রভৃতির অনুষ্ঠান এবং তাহাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও বিষয়ী ধনিগণের সহযোগ দেখিয়া আমাদের মনে যেমন একদিকে এই আশার আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্যদিকে যখন দেখি নব্যশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বেদানুশাসিত চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি হিন্দুর চিরন্তন প্রথা অমান্য করিয়া দলে দলে যথেচ্ছাচারী ও অভোজ্যভোজী হইতেছেন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি ত দূরের কথা গায়ত্রী বর্জ্জিত হইয়াছেন, তখন বস্তুতই নিরাশার ঝঞ্ঝাবাতে দিশেহারা হইয়া অকূল সাগরে পথহারা তরণী রক্ষণ ব্যাকুল কর্ণধারের মত আকুল হইয়া পড়ি।

এ অবস্থায় ধর্ম্মপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই এই সকল উন্মার্গগামী বালক, যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্তদিগকে অধর্ম্মের কুপথ হইতে আকর্ষণ করিয়া ধর্ম্মের কান্ত ও জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রদর্শন করতঃ তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ অঙ্কুরিত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বিগত সনাতন ধর্ম্ম মহাসম্মিলনে মাননীয় মিথিলাধিপতি বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ, এবং অবলম্বন ভিত্তি। ধর্ম্মহীন হইয়া ভারত এক মুহূর্ত্তও থাকিতে সক্ষম নহে। বিজ্ঞান ও ধনাদি দ্বারা ভারতের বাহ্য সৌন্দর্য্যের অভিবৃদ্ধি বিষয়ে যতই চেষ্টা হউক না, যতক্ষণ ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে অধিবাসী-বৃন্দের প্রত্যেকের হৃদয়ে অণু অণুরূপে ধর্ম্মভাব অনুস্যূত না হয়, ততক্ষণ কোন প্রকারেই ভারতের অস্তিত্ব ও স্থিরতা স্বীকার করা যায় না। আন্তরিক ধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত কোনরূপেই বাহ্য উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে না। তাহা যদি হইত তবে ধন, জন, বিজ্ঞানাদি দ্বারা বাহ্যতঃ সমুন্নতরূপে প্রতীয়মান হইলেও জর্ম্মণজাতি আজ জগতের সমক্ষে হেয়, অসভ্য, বর্ব্বররূপে পরিগণিত হইত না। ধর্ম্মই যে মনুষ্য-সমাজের প্রকৃত উন্নতির একমাত্র নিদান, তাহা বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমর প্রতিপন্ন করিয়াছে, এবং ইহাই ভৈরব সমর-সাগর মন্থনের অমৃতময় ফল।

এই ধর্ম্ম যে রীতিতে রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করাই আমাদের প্রথম ও প্রধানতম কর্ত্তব্য, এবং ঐ ধর্ম্মভিত্তিকে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে,—প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ রোপণ করিবার অভিপ্রায়ে এবং সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট করতঃ সমগ্র বর্ণাশ্রমাচারিগণকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্যই এই মহাসম্মিলনের অনুষ্ঠান।

মহর্ষিগণ এ সংসারে মানবজীবনের চারিটী প্রধান উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—এই চারিটীর প্রাপ্তির জন্য পুরুষ অনুক্ষণ উৎসুক।—ইহাদের নাম—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ইহাদের মধ্যে পুরুষার্থ অর্থ ও কাম,—ধর্ম্ম অপেক্ষা অপকৃষ্ট। যখন এই অর্থ ও কাম ধর্ম্মের

সহিত অবিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত হয়, তখনই ধর্ম্মাঙ্গ হইয়া সুখের কারণ হইতে পারে। নতুবা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর ও অবশ্য পরিত্যাজ্য। আর মোক্ষ,—যে মোক্ষ, অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া পরম সুখ উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহার প্রাপ্তি ও ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে, ধর্ম্ম ব্যতীত মোক্ষ লাভ অসম্ভব। কূর্ম্মপুরাণে এ বিষয়ে সুন্দর ভাবে উক্ত হইয়াছে—

"পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জ্জিতৌ।
সর্ব্বলোকবিরুদ্ধং চ ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু॥
ধর্ম্মাৎ সংজায়তেঽর্থো ধর্ম্মাৎকামোঽভিজায়তে
ধর্ম্মএবাপবর্গায় তস্মাদ্ধর্ম্মংসমাশ্রয়েৎ॥"

তবেই যখন এই জীবনের চারিটী প্রধানত উদ্দেশ্যই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্ম্মই তাহাদের সকলের মূল ভিত্তি, তখন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে কি ইহজীবনের সুখ ও অভ্যুদয়, কি অন্তে নিঃশ্রেয়স লাভ, সকলই ধর্ম্মদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তাই মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন—

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীকুল্লূকভট্ট,—

"বেদপ্রমাণকঃ শ্রেয়ঃসাধনং ধর্ম্মঃ"—এই বলিয়া মনুকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ বিশদ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা মঙ্গলকর এবং বেদ হইল যাহার প্রমাণ বা মূল তাহাই হইল ধর্ম্ম। ভবিষ্যপুরাণেও ঠিক এই কথাই দৃষ্ট হয়—

"ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃসমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণম্।
স চ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো বেদমূলঃ সনাতনঃ॥
অস্য সম্যগনুষ্ঠানাৎ স্বর্গোমোক্ষশ্চজায়তে।
ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্যমতুলঞ্চ খগাধিপ॥"

মহর্ষি জৈমিনিও মীমাংসা দর্শনে—

"চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ"—এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ ইহলোক ও পরলোকের শ্রেয়ঃ সাধন অর্থকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অতএব যাহারা সুখ ও মঙ্গলের অভিলাষী, ধর্ম্মের আশ্রয় তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহারই প্রভাবে স্থায়ী ও পরম সুখ লাভ করা যায়।

বেদাদি নির্দ্দিষ্ট আচারাবলীর যথাযথ অনুষ্ঠানের নামই সনাতন ধর্ম্ম। সেই সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তি হইল—বেদ,—স্মৃতি, এবং সদাচার। ভগবান মনুই এই কথা বলিয়াছেন—

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলঃ স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।"

সমুদয় বেদ, বেদবিদ্গণের স্মৃতি, এবং তাঁহাদের ব্রহ্মণ্যতাদিরূপ শীল প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ। গরুড়পুরাণেও এই কথা বলা হইয়াছে—

"শ্রুত্যুক্তঃ পরমোধর্ম্মঃ স্মৃতিশাস্ত্রগতঃ পরঃ।
শিষ্টাচারেণ শিষ্টানাং ত্রয়োধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ॥"

বেদোক্ত ধর্ম্মই পরম বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম,—স্মৃতিশাস্ত্রেও পর ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। শিষ্ট পরম্পরা অনুষ্ঠিত সদাচারও উত্তম ধর্ম্ম, এই তিনই সনাতন ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের এই ত্রিবিধ মূলের মধ্যে অদ্য সদাচার সংরক্ষণের উপায় নির্দ্ধারণ বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি।

এই সদাচার যে অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের বচন এই—

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্নিবদ্ধং স্বেষুকর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ॥"

শ্রুতি ও স্মৃতিতে নিবদ্ধ আপন আপন কর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ ধর্ম্মের মূল স্বরূপ সদাচার সকল অতন্দ্রিত ভাবে পরিচালন করিবে।

কেননা—

"আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥"

সদাচার হইতে দীর্ঘজীবন লাভ হয়, আচার হইতে ইচ্ছানুরূপ সন্ততি লাভ হয়। আচার হইতে অক্ষয় ধন লাভ হয় এবং ইহাই সকল অলক্ষণ বিনাশ করে। যে হেতু—

"দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোহল্পায়ুরেব চ॥"

দুরাচারী ব্যক্তি ইহলোকে নিন্দিত হয়, সর্ব্বদা দুঃখভাগী ও নানারূপ রোগে আক্রান্ত হয়। আর তাহার জীবন অল্পকালেই বিনষ্ট হয়। আর—

সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্ধধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥

সর্ব্বপ্রকার লক্ষণহীন হইয়াও মনুষ্য যদি সদাচারশালী শ্রদ্ধালু ও অসূয়াশূন্য হয় তবে শতবর্ষ জীবিত হয়।

এক্ষণে এই সদাচার বলিতে কি বুঝি? শ্রুতি ও তদনুসৃত স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমাচারীদিগের জন্য সামান্যভাবে এবং বর্ণ ও আশ্রমভেদে বিশেষভাবে যে সকল নিয়ম পালনের বিধি ও নিষেধ নিবদ্ধ হইয়াছে, সে গুলির যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের নামই সদাচার পালন।

সামান্য ধর্ম্মসম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মপালনম্॥"

ভগবান মনু সংক্ষেপ পাঁচটী সাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সাহজিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥"

এই সাধারণ ধর্ম্মগুলি কেবল ভারতবাসী বর্ণাশ্রমাচারিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। যাঁহারা খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা খৃষ্টানদিগেরও অবিকল এই একইরূপ ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিয়াও আনন্দলাভ করিবেন এবং যখন সুসভ্য-ইয়ুরোপ ও আমেরিকাবাসিগণই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিঃস্বার্থতা, সত্যভাষণ, নিয়ম পালনাদিকে জীবনের আদর্শ ধর্ম্মরূপে স্বীকার করেন, তখন কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মের ব্যাপকতা গম্ভীরতা ও প্রাচীনতা বিষয়ে অনুমাত্র সন্দিহান হইবে। এই ত গেল সামান্য ধর্ম্মের কথা।

অতঃপর ব্রাহ্মণের যজন যাজনাদি, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যপালনাদি, বৈশ্যের কৃষিগোরক্ষাদি, শূদ্রের দ্বিজসেবা এই বিশেষ ধর্ম্ম বা আচার সকলেই বিদিত আছেন অতএব পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিতে চাই না। এই সকল সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের যথাযোগ্য প্রতিপালনের নামই সদাচারপালন।

পূর্ব্বে শ্রুতি ও সদাচার প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মের প্রমাণরূপে উক্ত হইলেও,—বেদ আবার সকল মূলের মূল "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ।" কখন প্রত্যক্ষভাবে কখনও বা পরোক্ষভাবে বেদই সমস্ত সদাচারের প্রমাণ। এ বিষয়ে কুল্লূকভট্ট মনুসংহিতার ২য় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"বেদো ধর্ম্মে প্রমাণং ক্বচিৎ প্রত্যক্ষঃক্বচিৎ স্মৃত্যাদ্যনুমিতঃ —ইত্যেবং তাৎপর্য্যম্।" যদি কেহ বলেন বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এমন অনেক আচার দৃষ্ট হয়, যাহা বেদে পাওয়া যায় না, সুতরাং বেদ সকল সদাচারের মূল হইল কিরূপে? এই আক্ষেপের উত্তরে বলা হইয়াছে—"ক্বচিৎ স্মৃত্যাদ্যনুমিতঃ" অর্থাৎ বেদের অনেক শাখা কালবশতঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই লুপ্ত বা উৎসন্ন এবং বিপ্রকীর্ণ অংশে নিবদ্ধ বিধি নিষেধগুলির তাৎপর্য্য ত্রিকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ সংহিতাদিতে সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্ম ও সদাচারের প্রতি, বেদকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপে প্রমাণ স্বীকারে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। এই হেতুই বর্ণাশ্রমাচারিগণের মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। যাহা বেদাতীত, বেদবিরুদ্ধ অথবা বেদে উপনিবদ্ধ নহে। তাই মনু বলিয়াছেন—

"যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়োহিসঃ॥"

আমরা বলি শুধু মনুসংহিতায় কেন, সকল স্মৃতি, পুরাণ ও নিবন্ধে যাহা কিছু উপনিবদ্ধ হইয়াছে সে সকলই বেদ হইতে সংগৃহীত। এ হেন বেদকে কৃষকের গীত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার প্রথম অবস্থায় অপনাদের অজ্ঞতাবশতঃ বেদগুলিকে "কৃষকের গীত" বলিয়া অবজ্ঞা ও উপহাস করিতেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে প্রাচ্যসাহিত্যালোচনার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এ মোহান্ধকার ঘুচিয়াছে, তাঁহারা নিজেদের এ ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান সংস্কৃতাভিজ্ঞ পাশ্চাত্যবিদ্বদ্গণের

মধ্যে অগ্রণী অধ্যাপক ম্যাগডোন্থাল (A. A. Macdonell M. A. Ph. D Boden Professor Oxford) স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে "The Rigveda is not a collection of primitive popular poetry, as it was apt to be described at an earlier period of Sanskrit studies"—ইহাই ত বিদ্বানের কথা,—বিবেচকের কথা। কেননা হিন্দুর আচার, হিন্দুর পূজাপদ্ধতি, হিন্দুর চাতুর্ব্বর্ণ্য, এক কথায় হিন্দুর জাতীয় জীবনের প্রারম্ভ আমরা বেদে দেখিতে পাই। হিন্দুধর্ম্মেরই বীজ বেদে নিহিত এবং হিন্দুর সভ্যতা বেদের প্রতিচরণে প্রতিফলিত। হিন্দুগণ কিরূপে এই বৈশিষ্ট্যাগত ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া এই বিশাল ভারতভূমিতে বিস্তারলাভ করিলেন তাহার আদিম ইতিবৃত্ত জানিতে হইলে বেদপাঠই অন্যতম সহায়। হিন্দুর মধ্যে যে এক সম্প্রদায় "একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্বীকার করেন, এবং তদপেক্ষা বিস্তৃততর সম্প্রদায় ত্রিমূর্ত্তির পূজা করেন এবং প্রায় আপামর সাধারণ যে তেত্রিশ কোটী দেবতাকে মানিয়া থাকেন, উপাসনাগত এই সকল সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার পদ্ধতিই বেদে প্রথম সূচিত হইয়াছে। এ বিষয়টী লইয়া "ভারতবর্ষ" নামক সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্‌লা সাময়িক পত্রে বৎসরাধিক কাল সুবিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং আরও দেখাইয়াছি—বেদ যেন একটী সুপুষ্ট বীজ—যাহা হইতে এই বিশাল হিন্দুসমাজরূপ বটতরু পুরাণ, দর্শন, স্মৃতি, মীমাংসা, আচার, রীতিনীতি, সম্প্রদায়ানুসারে বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতিরূপ শাখাপ্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া বিশালভারতবর্ষের উপর বিরাজ করিতেছে। আমরা এইরূপে ঐ অপৌরুষেয় বেদের গভীর ও তদ্গত আলোচনাদ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণ করিতে পারি যে, জগতের সর্ব্বদেশের সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম ও দার্শনিকতত্ত্ব ও বেদের প্রথম প্রভাতালোকে উদ্ভাসিত ও বিকাশিত হইয়া জগদ্বাসিগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নানারূপে প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় এই যে আমরা ভারতবাসী হিন্দুগণ, আমাদেরই নিজস্ব—আমাদেরই মহনীয় পূর্ব্বপুরুষ গণের তপস্যা ও সত্যের প্রথমজ্যোতিঃ,—জ্ঞানরাজ্যের প্রভাততপন বেদের দিকে পশ্চাৎ করিয়া উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় মরীচিকাভ্রান্ত মৃগগণের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ইহার ফলেই আমরা জাতীয়তা হারাইয়াছি, একতা হারাইয়াছি, মানসিক স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছি, শান্তি হারাইয়াছি। আর চলিবে না, আমাদের পরমপূজ্য ও আদরের বস্তুর উপর এখন অশ্রদ্ধা ও অনাদর কখনই মঙ্গলাবহ হয় না, তাই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। অতএব হে ভ্রাতৃবৃন্দ, হে ব্রাহ্মণতনয়গণ! তোমরা তৎপর হও, অনুমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হও। তবেই সদাচারের পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হইবে ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন দেখিতে পাইবে, এবং মঙ্গলমুরজের মধুরধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বেদের আলোচনা দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, বঙ্গের ভূমি কেবল আজ বলিয়া নহে, বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া বেদালোচনায় পরাঙ্মুখ।

আবার এই বঙ্গদেশে কত বিভিন্নযুগে কতভাবে বেদালোচনা নবীন উদ্যমে প্রবর্ত্তিত

হইয়াছিল কিন্তু কালবশে সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইয়াছে। দেখুন আদিশূর বঙ্গে বেদালোচনার জন্য এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অবনতি দেখিয়া তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে কাণ্যকুব্জ হইতে পাঁচজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ আজিও প্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। ইহারা প্রথম প্রথম বেদালোচনা দ্বারা বঙ্গভূমিকে প্রবল বৌদ্ধপ্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া, বেদের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালার মাটির দোষে, জল হাওয়ার দোষে তাঁহাদের বংশধরগণই বেদালোচনায় বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন এবং প্রায়শ্চ বৈদিক ক্রিয়াকলাপেও উদাসীন ও বীতশ্রদ্ধ এমন কি গায়ত্রী পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হইতেছেন। সেই স্বাধ্যায়পূত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরগণ যে এখন পরিবর্ত্তিত হইবেন, তাহা ভাবিতেও হৃদয় দুঃখে ও ক্ষোভে অভিভূত হয়, নয়ন ফাটিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। দেখিয়া শুনিয়া বাঙ্গলার মাটীর ও আমাদের অদৃষ্টের দোষ ভিন্ন আর কি বলিব? এদেশ হইতে বেদের অন্তর্ধানের প্রধান কারণ এই যে বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবের পর এ বঙ্গদেশে কলাপ হইতে আরম্ভ করিয়া সুপদ্ম, মুগ্ধবোধ প্রভৃতি যতগুলি ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, সে সকলগুলিতেই বৈদিকপ্রকরণ ছাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে বেদ হইতে আমরা এতদূরে আসিয়া উপনীত হইয়াছি যে নিরক্ষর কৃষকের নিকট সংস্কৃত শ্লোকের মত আমাদের সকলের নিকট,—কি ব্যুৎপন্ন পুরোহিত, কি স্বনামধন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলের নিকট বেদের মন্ত্র বিকট, দুর্ব্বোধ ও দুরুচ্চার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যদিকে আবার আমাদের দশকর্ম্ম, পূজা, হোম, সংস্কারাদি ভূরি ভূরি বৈদিক মন্ত্রে পরিপূর্ণ। যদি অর্ব্বাবগতি অভাবে ঐ সকল মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চারণ না হয় তবে ক্রিয়াকলাপ ত পণ্ড হয়ই; অধিকন্তু মঙ্গলফলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই প্রসূত হইয়া থাকে। সুতরাং দিন দিন আমরা অমঙ্গলে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। কলিকাতার ব্রাহ্মণসভা বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কথঞ্চিৎ উপকার সাধন করিয়াছেন বটে; কিন্তু শিক্ষার্থিগণের মুষ্টিমেয় সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে আশা অপেক্ষা নিরাশাই প্রবল হইয়া উঠে। এই বিশাল বঙ্গদেশে কেবল একটিমাত্র বেদবিদ্যালয়ের কর্ম্ম নহে, গ্রামে গ্রামে ঐরূপ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন; তবে বেদের পুনরুদ্ধার হইবে, ক্রিয়াকলাপ বিশুদ্ধ ও সফল হইবে, তবে সদাচার অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইবে। মূলাভাবে যেমন বৃক্ষের অবস্থিতি অসম্ভব, সেইরূপ বেদালোচনার অভাবে সদাচার ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভব। ইহা একা ব্রাহ্মণসভার পক্ষে দুঃসাধ্য, এই মহাসম্মিলনে সমুপস্থিত বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণমণ্ডলীর যুগপৎ ও সমবেত চেষ্টাদ্বারা কেবল এ কার্য্য সাধিত হইতে পারে, অন্যথা নহে।

সদাচার রক্ষা বিষয়ে সম্মিলনের পক্ষে প্রধানত কর্ত্তব্য হইল—পবিত্র ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান ছাত্রাবাসগুলির স্লেচ্ছাচার ও নারকীয় ভাবের উল্লেখ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে চাহি না। এই সকল ছাত্রাবাসে অবস্থান হেতু হিন্দুসমাজে যে কুফল সংক্রামিত হইতেছে, তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি,—যদি এই স্রোতঃ ফিরাইতে চাহেন, তবে এই সকল পাষণ্ডালয়ের

আমূল সংস্কার সাধনের দিকে এই সম্মিলনের দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি নিজেদের সামর্থ্যে একার্য্য সফল না হইবার সম্ভাবনা দেখ, তবে এ প্রস্তাবে উদার গভর্ণমেণ্টের সহযোগের জন্য আবেদন নিবেদন করিতে হইবে। মোটকথা অবিলম্বেই ও অবশ্যই এইরূপ পবিত্র ছাত্রাবাস সংস্থাপন—অন্ততঃ একটী আদর্শ আবাসের প্রতিষ্ঠা যে কোন উপায়ে করিতে হইবে। রাজা শশিশেখরেশ্বর, রায় ব্রজেন্দ্রকিশোর, মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ থাকিতে একার্য্য অসম্ভব নহে।

আর একটী কার্য্য ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়,—কদাচারী, মূর্খ অভোজ্যভোজী, গৃধ্নু অপগণ্ড পুরোহিতবর্গকে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া যথোচিত শিক্ষা ও পরীক্ষা দ্বারা সৎপুরোহিত প্রস্তুত করিয়া তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দশ কর্ম্মের পুঁথি বিশুদ্ধ করিয়া মুদ্রিত করিতে হইবে, বৈদিক মন্ত্রগুলি মূলবেদের সহিত মিলাইয়া সংশোধন করতঃ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পুরোহিত-দর্পণ প্রভৃতি অশুদ্ধ পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া বিশুদ্ধ পুঁথির প্রচার করিতে হইবে। তন্ত্রের রাজ্য এ বঙ্গদেশে একখানি বিশুদ্ধ তন্ত্রসার মিলে না, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা কি আছে? কাল বিলম্ব না করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান আরম্ভ করা প্রথম কার্য্য। এগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যদি সম্মিলনের সভ্যবৃন্দ একান্তভাবে উদ্যোগী হন, তবে আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি যে দেশে একদিন না একদিন পুনরায় মধুর প্রাধ্যায়নধ্বনিতে অম্বরতল মুখরিত হইবে। আবার হব্যগন্ধের সঞ্জীবন শক্তিদ্বারা আমাদের সকল দুরিত বিনষ্ট হইবে এবং হুতাগ্নির শিখাঞ্জন দ্বারা বিটপিকুলের স্নিগ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে পবিত্র পুলক সঞ্চার হইবে।

শ্রীভববিভূতি বিদ্যারত্ন।

হিন্দু।

(১)

জলধি মথিয়া, মেদিনী দলিয়া, লঙ্ঘি তুঙ্গ শৈলশির।
জাগায়েছ তুমি, এ ভারতভূমি, সিঞ্চি পূত শান্তি-নীর।
লভিল কান্তি, লভিল শান্তি, মুক্তি লভিল ভারতবর্ষ;
জুড়াল বক্ষঃ, দানিল মোক্ষ, পূত তোমার চরণ স্পর্শ।
স্থাপিলে হর্ষে, ভাররতবর্ষে, বিজয়কেতন সিংহাসন;
আর্য্য-গৌরব যশঃ সৌরভ, বঙ্গ-কানন নন্দনবন।
সাধনে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, শান্তি সলিল-বিন্দু,
মুক্তহস্তে, আশীষ ধারা—ঢালিছ বিশ্বে:হিন্দু।

(২)

হে সৌম্য প্রবীণ, লালসা-মলিন হৃদয় পরশি মোর,
গুঞ্জিয়া বীণ, মুঞ্জরি ক্ষীণ, প্রেম দানে কর ভোর।
মোহান্ধ হিয়া, দাওগো ভাঙ্গিয়া, বাজায়ে বোধন-তূর্য্য ;
নবগৌরবে উঠুক জাগিয়া মোদের বিবেক-সূর্য্য।
হে দেব ধীমান্ ত্যজ অভিমান, লও গো প্রণাম পায়,
বিপুল বিশ্ব হইতে শিষ্য, চরণে শরণ চায়।
 সাধনে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, শান্তি সলিল-বিন্দু,
 মুক্ত হস্তে, আশীষ ধারা—ঢালিছ বিশ্বে হিন্দু।

(৩)

ধরণী শ্যামল, পাতিয়া আঁচল সদা চাহে পদধূলি,
গভীর সুনীল সাগর-সলিল, নমে পদে ঢেউ তুলি ;
সে পদ পরশে, লতিকা হরষে, ঢ'লে পড়ে ভূমিতলে,
বৃক্ষ দিতেছে, অর্ঘ্য তাহার—পত্রে পুষ্পে ফলে ;
কীর্ত্তি বিপুল, শৌর্য্য অতুল, কাননে বিহগ গায়,
শ্যাম অঙ্গ জননী বঙ্গ, অঙ্কে ডাকিছে আয়।
 সাধনে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, শান্তি সলিল-বিন্দু,
 মুক্ত হস্তে, আশীষ ধারা—ঢালিছ বিশ্বে হিন্দু।

(৪)

পুণ্য পরশ, স্নিগ্ধ সরস—প্রস্তরীভূত হিয়া—
ছুটিছে গলিয়া, বিঘ্ন দলিয়া, লুটিতে চরণে গিয়া।
চন্দন পূত হে আর্য্যসুত ! অতিথি আজিকে আমি,
গরলে দেহ, অনলে গেহ, জ্বলিছে দিবস যামি ;
নয়নে দীপ্তি, জীবনে তৃপ্তি, করগো শান্তি দান,
সাম ঝঙ্কারে, গভীর ওঙ্কারে, উঠুক জাগিয়া প্রাণ।
 সাধনে শক্তি হৃদয়ে ভক্তি, শান্তি সলিল-বিন্দু,
 মুক্ত হস্তে, আশীষ ধারা—ঢালিছ বিশ্বে হিন্দু।

(৫)

তপন তপ্ত বিশ্বে, ব্যাপ্ত অমিয় পুরিত সিন্ধু,
আঁধার আকাশে কে তুমি স্নিগ্ধ বিমল শারদ ইন্দু।
তোমারি কুঞ্জে, বিহগ গুঞ্জে, তটিনী গাহিছে গান,
বিলাইছে নিতি, অনাবিল প্রীতি, মুক্ত ভকত প্রাণ।

বিলাসের লেশ করিয়াছে শেষ, গভীর ওঙ্কার বাণী ;
হৃদিমাঝে পূত সদা বিরাজিত, অসীম পরাণ খানি।
সাধনে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, শান্তি সলিল বিন্দু,
মুক্ত হস্তে, আশীষ-ধারা ঢালিছ বিশ্বে হিন্দু।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

অদৃষ্টবাদ। *

অনাদি অনন্ত-দুঃখ-বহুল সংসারগত মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ সুখপ্রিয়তা নিবন্ধন বিষয়ের আপাত মাধুর্য্য দেখিয়া আত্মহারা হইয়া মরীচিকা দর্শনে তৃষার্ত্তের মত সুখমরীচিকাময় সংসারে আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং যখন মনুষ্যগণ নিম্নস্থ ব্যক্তির উপরি গমন মত সহৃদয় মাত্রেরই প্রতিকূলভাবে অনুভূত অসহ্য দুঃখাবস্থা হইতে সকলেরই একান্ত স্পৃহণীয় সুখাবস্থায় উপনীত হন; তখন চিরবাঞ্ছিত লাভবশতঃ আনন্দে বিভোর হইয়া অভীষ্ট প্রদানহেতুক জগদীশ্বরের নিষ্পক্ষপাতিতা ও দয়ালুতা হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় তাঁহারই গুণকীর্ত্তন করতঃ বলিয়া থাকেন যে জগদীশ্বর! আপনি বস্তুতঃ দয়াময়, সে কারণে আজ আমি এই ভীষণ দুর্দ্দশা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।

যখন আবার হঠাৎ প্রতিকূল দশায় আনীত হন, তখন সেই সংসারের সুখদুঃখ-সংমিশ্রণ-শূন্য জগদীশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি নির্দ্দয়তা প্রভৃতি নানারূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা বুঝিয়াও বুঝেন না যে, আনন্দময় জগদীশ্বরের ইচ্ছাই একমাত্র আমাদের সুখদুঃখ বিধানের হেতু নহে।

জগদ্ বৈচিত্র্য সাধনে জীবগণের অদৃষ্টই একমাত্র সুখদুঃখের নিয়ামক। সর্ব্বজনাতীত শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের ঐশীশক্তি স্থানীয় ইচ্ছাই একমাত্র বিচিত্র সৃষ্টিদ্বারা সুখদুঃখ-নিয়ামিকা এই কথা বলিলে সেই ভগবানকে সাধারণ অজ্ঞলোকমত রাগ-দ্বেষসম্পন্ন এবং অকারণ একজনকে সুখী ও অপরকে দুঃখী করা জন্য বাস্তবিকই নির্দ্দয় বলিতে হয়।

কারণ এই অসীম প্রপঞ্চের অন্তর্গত দেবগণ যেরূপ তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ, এই অজ্ঞানোপহত পশুপক্ষী প্রভৃতি জীব এবং দুঃখমিশ্রিত সুখভোগ পরায়ণ এই মনুষ্যগণ তাঁহারই সৃষ্ট পদার্থ বলিতে হইবে। কিন্তু তথাপি এই সৃষ্টপদার্থের মধ্যে এত পার্থক্য কেন?

---

* যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে পঠিত।

কেন তিনি এই বিশ্বপতি হইয়া দেবগণকে সুখময় ও বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন করিলেন, আর ওই পশুপক্ষীকে অজ্ঞানাবৃত করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করাইতেছেন, আর কেনই বা এই মাদৃশ মনুষ্যগণের মধ্যে অহর্নিশ ঘোরতর তারতম্য ঘটাইতেছেন ?

এই পার্থক্য সম্পাদন করিয়া ক্রীড়া করা ত জগৎপতি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবানের পক্ষে মানায় না।

আজ এই পৃথিবীর কোনস্থানে কেহ বা শীতল মৃদুল মধুর নৈশ-সমীরণ-সেবিত সুধাকর-সুধাময়-কিরণ-শোভিত বিশ্বাভিরাম রমণী-কেশবৃন্দসদৃশ-কমনীয়-মধুকর-শ্রেণী-অলঙ্কৃত-কমল-কুট্মলশোভিত-সরোবর-তীরে যুবজন হৃদয়লক্ষ্মী কামিনীর নূপুর-রবমিশ্রিত বীণাধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া কালযাপন করিতেছেন।

কেহ বা গভীর নিশীথে কর্ণকুহর-বিদারণ-ধ্বনি-মুখর শৃগাল-কুক্কুর-পরিপূর্ণ ভীষণ শ্মশান-ক্ষেত্রে চিতানলে প্রাণাধিক-প্রিয়তম হৃদয়রত্ন দম্পতীর আনন্দগ্রন্থি একমাত্র পুত্রকে দগ্ধ করিয়া সারাজীবনের আশা জলাঞ্জলি দিয়া অনবরত রোদনহেতুক উজ্জ্বল-নয়না আলুলায়িত-কেশা শরীরিণী করুণমূর্ত্তি প্রণয়িনীর নৈরাশ্যমাখা উৎকট হাহাধ্বনি শ্রবণ করিয়া দুঃখের একমাত্র বিশ্রাম নিকেতনরূপে জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করিতেছেন।

কোথায় বা যৌবন-ভরালসা কামিনীর কমনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে দর্শকের হৃদয় অমৃতময় প্রলেপ লিপ্ত হয়। কোথায় বা জরাজীর্ণকলেবরা করালকালভুজঙ্গ-কবলসন্নিহিতা বৃদ্ধা নিরীক্ষিতা হইয়া দর্শকের হৃদয়ে আতঙ্ক সঞ্চারিত করিতেছে।

কোথায় বা গূঢ়রহস্যময় বেদান্তাদি দুরববোধ শাস্ত্রের গভীর গবেষণা-ব্যাপৃত পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা অতুলনীয় আনন্দ ভোগ করিতেছেন, এবং বংশ, দেশ, এমন কি বিশ্বম্ভরা পর্য্যন্তকে পবিত্র করিতেছেন। কোথায় বা কতিপয় দুরাত্মা মদ্যপান-মত্ত হইয়া বৃথা কলহ করিতেছে এবং স্ব স্ব বংশ, দেশ, এমন কি স্বর্গবাসী নিজ নিজ পিতৃপুরুষকে পর্য্যন্ত নরকস্থ করিয়া উৎকট নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছে। এই সকল বিরুদ্ধ সমাবেশ দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে মগ্ন কোন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন—

"ক্বচিদ্ বীণাবাদ্যং ক্বচিদপি চ হাহেতি রুদিতং
ক্বচিন্ নারী রম্যা ক্বচিদপি জরাজর্জ্জর-বপুঃ।
ক্বচিদ্ বিদ্বন্মোদঃ ক্বচিদপি সুরামত্ত-কলহো
ন জানে সংসারং কিমমৃতময়ং কিং বিষময়ম্ ॥"

অর্থাৎ কোথাও মধুর বীণাধ্বনি, কোথাও বা দারুণ হাহাকার। কোথাও সুন্দরী রমণী কোথাও বা জরাজীর্ণা বৃদ্ধা। কোথাও পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা অতুল আনন্দভোগ করিতেছেন, কোথায় বা মদমত্ত ব্যক্তিগণের উৎকট মদসেবা জন্য বৃথা কলহ। এই সকল বিরুদ্ধ বৈচিত্র্য দেখিয়া শুনিয়া সংসার সুখময় বা দুঃখময় ইহা স্থির করিতে পারা যায় না।

কোন দরিদ্র গৃহস্থের বা ৫।৭টী পুত্র উৎপন্ন হইতেছে। এবং তাহার প্রত্যেকই প্রচুর বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া আরাধ্যমাতা লক্ষ্মীদেবীর কৃপাপাত্র হইয়া দেশ উজ্জ্বল করিতেছে।

আর কোন ধনী গৃহস্থের বা একটীমাত্র পুত্র উৎপন্ন হইয়া যৌবনদশা উপস্থিত হইলে বহু শিক্ষকের তত্বাবধারণ সত্বেও দুর্বৃত্তগণের সংসর্গে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় আপাতরম্য স্রকৃচন্দন-বনিতাদি ভোগে বদ্ধপরিকর হইয়া নরকের প্রশস্ত দ্বার উন্মোচন করে। এবং পিতৃপিতামহ ভুক্ত সম্পত্তি সকল অনুল্লঙ্ঘ্য মদ্যপানাদির আশায় বিক্রয় করিয়া অবশেষে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পাশববৃত্তির চূড়ান্ত পরিচয় দিতে থাকে। কলিকালে প্রায় ঘরে ঘরে এইরূপ কুসন্তান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোকের আধিক্য দর্শনে বিমুগ্ধ কোন কবি কলির চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

"বিদ্যাসাগর-পারমারদ চিরাদাচারিতাচোরিতা
ধর্ম্মোনর্ম্ম বভুব কর্ম্ম চ দদৌ মর্ম্মস্পৃশং যাতনাম্।
নীতি ভীতিমুপাগতা ধৃতিমতী প্রেতে প্রযাতোন্নতিঃ
স্ত্রী দাসী গণিকামতা কুলভুবাং প্রায়ঃ প্রবৃত্তে কলৌ॥"

অর্থাৎ কলি সমাগমে সদ্‌বিদ্যা লুপ্তপ্রায়, সদাচার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম-আচরণগুলি ঠাট্টা-বিদ্রূপের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পূর্ব্বকালে কর্ম্ম করিলে সুখ-শান্তি পাওয়া যাইত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কর্ম্মদ্বারা দারুণ যন্ত্রণালাভ হয়। বর্ত্তমান সেব্য নীতি দ্বারা আর অভয় পাওয়া যায় না, উহা এখন ভীতিস্থান, সদ্গতি না হওয়ায় প্রেতের সংখ্যা বাড়িতেছে, পরিণীতা স্ত্রী দাসী হইতেছে এবং বেশ্যাগণ বড় মনোনীত হইতেছে।

এই সকল বিষম সৃষ্টি করিয়া কৌতুক দর্শন কখনই জগদীশ্বরের কর্ত্তব্য নহে, তিনি যে সকলের, তিনি যে আনন্দময়। সুতরাং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দুঃখ দেখিবেন কেন?।

তিনি যে আপ্তকাম, কোন্ স্বার্থের প্রবল লোভে পড়িয়া এই বিষম নির্ম্মাণ করিবেন।

তিনি যে জগৎপিতা, তাঁহার নিকট যে সকলেই সমস্নেহপাত্র, সকলই সমান পোষ্য। তিনি যে ক্রোড়ে করিয়া সকলকে চিরানন্দময় করিতে ব্যস্ত। তিনি দয়াময়। তিনি স্থাবর জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষী, মনুষ্য এবং দেবগণের অন্তরে সমভাবে বিরাজমান। তাঁহার সহিত এই জীবভোগ্য সুখ দুঃখের কোন সংশ্রব নাই! আমরা আমাদের এই দুরপনেয় অল্পজ্ঞতা নিবন্ধন সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার প্রতি সুখ দুঃখের সংশ্রব রাখিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। আমি এই সম্বন্ধে বহুকথা বলিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করি না।

প্রায় প্রতি পাঠক মহোদয়ের বিদিত আছে যে পূর্ণব্রহ্ম জগদীশ্বরের অবতার শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় অলৌকিক-বলবীর্য্য-সমন্বিত অর্জ্জুন-হৃদয়ালোক তনয় অভিমন্যু, ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণ প্রমুখ প্রবল পরাক্রান্ত বীরগণ রচিত দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ করিয়া কুরুক্ষেত্রস্বরূপ সমর শ্মশানে পাণ্ডব সমৃদ্ধিমূল ভগবান্ সহায় থাকিতেও নিঃসহায় ভাবে আত্মবলি প্রদান করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির হৃদয় কিরূপভাবে ঘোর শোক তিমিরাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রাণ অর্জ্জুন সমক্ষে থাকিলে কি অভিমন্যুর ঐরূপ দশা ঘটিত। কেনই বা সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণদেব জানিয়া শুনিয়া ও অর্জ্জুনকে ঐ ব্যূহ হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়াছিলেন। অন্ততঃ তিনি নিকটে থাকিলে অবশ্যই অভিমন্যুর কাতরধ্বনি পিতার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কেনই বা সুভদ্রার হৃদয়নিধি বংশপ্রদীপ অভিমন্যুকে নিঃসহায়তা সত্বেও ঐরূপ ব্যূহ প্রবেশে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সকল বিষম ঘটনার মূল একমাত্রই অদৃষ্টই বলিতে হয়। এই অদৃষ্টের নাম ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম জীবাত্মার ধর্ম্ম। নিম্নাভিমুখ জলের গতির মত অদৃষ্টের গতি সহসা ফেরান যায় না। এই সকল দেখিয়া কবিবর মহাত্মা শিহ্লনদেব বলিয়া গিয়াছেন—

"নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধে স্তেঽপি বশগা
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥"

অর্থাৎ দেবগণকে নমস্কার করি, কারণ তাঁহারা স্বাধীনচেতা, এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অথবা স্বাধীনতা-নিবন্ধন তাঁহারা প্রশংসা যোগ্য হইতেই পারেন না; কারণ তাঁহারাও সেই বিধাতার আজ্ঞাবহ। তবে বিধাতাই নমস্য, কারণ তাঁহার মত স্বাধীন কেহ নহে। না; তাহাও হইতে পারে না, কারণ তিনিও কর্ম্মানুসারে ফলদান করিয়া থাকেন। ফল যখন কর্ম্মাধীন, তখন দেবতাগণ বা বিধাতার বাধ্যতা স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। সেই কর্ম্ম উদ্দেশে বারম্বার নমস্কার করি; যাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তি বিধাতারও নাই।

আত্মা দুই প্রকার,—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা,—ইহা ন্যায় বৈশেষিকসম্মত। এই পক্ষে "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ। অর্থাৎ ব্রহ্ম দুই প্রকার, পর এবং অপর। পরশব্দের অর্থ পরমাত্মা এবং অপর শব্দের অর্থ জীবাত্মা। আত্মা এক হইলে তাঁহাকে দ্বে এই শব্দের দ্বারা দুই বলা চলে না। অদৃষ্ট এই জীবাত্মার ধর্ম্ম, পরমাত্মার নহে।

অদৃষ্ট শব্দের অর্থ ধর্ম্ম, এবং অধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম গুণপদার্থের অন্তর্গত। পুণ্য এবং পাপ ইহাদের অপর পর্য্যায়। এই অদৃষ্টকে দেখিতে বা অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সুতরাং ইহা অতীন্দ্রিয়। সুখ দুঃখাদি বিচিত্র বিচিত্র কার্য্য-কলাপ দ্বারা অনুমেয় হইয়া থাকে মাত্র। যে ব্যক্তি নির্ম্মল সুখভোগ-পরায়ণ সে ধার্ম্মিক। আর যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগী সে মহাপাপিষ্ঠ।

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ভিন্ন সকল পদার্থ অচেতন।

যে কোন অচেতন কোন কার্য্য করিতে গেলে কোন চেতনের সহায়তা না পাইলে কার্য্য করিতে পারে না। তাই আজ অচেতনের অন্যতম অদৃষ্ট কখনও বা পরমাত্মার সহায়তা পাইয়া জীবের অসাধ্য এই তৃণাদি বিশ্বনির্ম্মাণ করিতেছে। কখনও বা জীবের সহায়তা পাইয়া ঘটপটাদি নানাবিধ ব্যবহার্য্য ভোগ্যবস্তু সম্পাদন করিতেছে। অদৃষ্টের দোষ

পরাধীনতামাত্র। সংসার অনাদি ; সুতরাং এই অদৃষ্টও বীজাঙ্কুর মত অনাদি। এই অদৃষ্টই একপ্রকার বিশ্বপ্রপঞ্চের দুর্দ্দমনীয় প্রবলপরাক্রান্ত রাজা। ইহার আজ্ঞালঙ্ঘন কাহারও সাধ্য নহে। কখনও রাজা ধর্ম্ম প্রবলভাবে উঠিয়া অসাধ্য সাধন করিয়া তুলে, তখন ধূলিমুষ্টিও সুবর্ণ-মুষ্টিতে পরিণত হয়। যখন আবার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা অধর্ম্ম প্রবলতা গ্রহণ করে, তখন অনায়াসসাধ্য কর্ম্ম ও সাধন করিতে পারা যায় না। সেই সময় বাস্তবিক সুবর্ণমুষ্টিও ধূলিমুষ্টিতে পরিণত হইয়া পড়ে। একের জয় এবং অপরের পরাজয় ইহা অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই অদৃষ্টই ঐহিক পারলৌকিক সদ্গতি ও অসদ্গতির একমাত্র নিয়ামক। সৎকর্ম্মদ্বারা শুভাদৃষ্ট এবং অসৎ কর্ম্মদ্বারা অশুভাদৃষ্ট সমুৎপাদিত হয় বলিয়াই আর্য্যপাদ মনীষিগণ মনুষ্যগণকে সৎকর্ম্মে ব্যাপৃত করিবার মানসে যাগাদি ভূরি ভূরি প্রশস্ত কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন।

যাগাদি কোন কর্ম্মই চিরস্থায়ী নহে ; সুতরাং যাঁহারা পরলোকপ্রার্থী হইয়া যাগাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পরলোকপ্রাপ্তি কেমন করিয়া ঘটে ? কৈ পরলোকপর্য্যন্ত ত ঐ যাগ কর্ম্ম থাকে না ? সে ত পরলোক প্রাপ্তির বহুপূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই আশঙ্কা রূপ অন্ধকার যদি দূর করিতে চাও, তবে সেই অদৃষ্টালোকের সহায়তা গ্রহণ কর।

যাগাদি কর্ম্ম সামান্যকালের জন্য অবস্থান করিলেও অদৃষ্ট উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হয়।

দর্শন শাস্ত্রে কথিত আছে যে বিশ্বরাজ্য সম্রাট্ জগদীশ্বরের রাজধানী-বিশেষ দেবলোক গমন করিয়া অনির্ব্বাচ্য সুখ ভোগ করার নাম স্বর্গ ভোগ, এই স্বর্গ ভোগই ফল, এই ফলের উৎপাদন পক্ষে করণ স্থলাভিষিক্ত হইতেছে যাগ। এবং করণ থাকিলেই ব্যাপার থাকে বলিয়াই ঐ অদৃষ্টকে ব্যাপার বলিতে হয়। করণের দ্বারা কার্য্য উৎপাদনপক্ষে যে কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে সর্ব্বত্র করণের থাকা প্রয়োজন, এমত নহে ; কারণ করণ না থাকিলেও কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু ব্যাপারের পূর্ব্বে থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এইজন্যই ব্যাপারবৎ কারণকেই করণ আখ্যা দেওয়া যায়।

তাই আজ স্বর্গাদি বিষয়ের পূর্ব্বে যাগ না থাকিলেও ব্যাপার স্থলাভিষিক্ত অদৃষ্টের সাহায্যে করণ ভূত যাগ স্বর্গ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। এই অদৃষ্টই অহর্নিশ পরিবর্ত্তন রূপ ঘূর্ণনশালী সংসার-চক্র-ভ্রমণ দণ্ড। যেরূপ কুম্ভকার দণ্ডের সহায়তা পাইয়া তবে চক্র ঘূর্ণন দ্বারা ঘটাদি নির্ম্মাণে সমর্থ হয়; সেইরূপ এই বিশ্বরাজ্য নির্ম্মাণ কুম্ভকার জগদীশ্বর অনাদিকাল হইতে হইতে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তমান সৃজ্যমান জীবগণের অদৃষ্ট রূপ দণ্ড গ্রহণ করিয়া এই অনন্ত, অপরিসীম, অপর্য্যাপ্ত, প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তন-শীল দেবগণালঙ্কৃত স্বর্গ-ভূমি, পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি জীব-বেষ্টিত এই পৃথিবী ও নাগলোক চিত্রিত পাতালাদি জীবশক্তি বহির্ভূত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন।

অদৃষ্টেরই তারতম্য অনুসারে এরূপ সৃষ্টির বৈচিত্র্য ; সুতরাং আজ এই মেদিনী নানাবিধ নানাবর্ণ নানাকৃতি মধুর কটু তিক্ত প্রভৃতি রসপূরিত ফলপূর্ণা।

ভোক্তৃগণের ভোগাদৃষ্টই এক সকল ভোগ্য প্রসবিতা। নচেৎ এই বিচিত্র সৃষ্টির অবকাশ কোথায় থাকিত ?

কেহ বা ধনী কেহ বা দরিদ্র, কেহ বা দাতা কেহ বা ভিক্ষুক, কেহ বা সবল কেহ বা

দুর্ব্বল, কেহ বা নীরোগ কেহ বা রোগী, কেহ বা সুখী কেহ বা দুঃখী, কেহ বা চক্ষুষ্মান কেহ বা অন্ধ, কেহ বা পণ্ডিত কেহ বা মূর্খ, কেহ বা প্রহরিগণবেষ্টিত মর্ম্মর প্রস্তর-খচিত ধবলিত বিশ্বরাজ্য পতাকায়মান উচ্চ সৌধতলে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কের উপর মনোহর কোমল শুভ্র শয্যাসমাসীন,এবং নানাবিধ ভোগাবস্তু লাভবশতঃ সুখসাগর মগ্ন,আর কেহ বা প্রচণ্ড রৌদ্রতাপিত বালুকাময় মরুভূমিগত স্বল্পচ্ছদ বৃক্ষতলে ক্ষুধানলোৎপীড়িত হইয়া শয়ন করিয়া আছে। কেনই বা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জঘন্য চণ্ডালবৃত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ?

এই সকল অসংখ্য দৃষ্টান্তের দিকে তাকাইলে ইহাই জানা যায় যে, অদৃষ্ট পার্থক্যই এইরূপ জীবগত পার্থক্য হেতু। পূর্ব্বেও জানাইয়াছি এবং এখনও জানাইতেছি যে এই সকল অবস্থা সহসা পরিবর্ত্তনীয় নহে। ইহাই লক্ষ্য করিয়া বৈরাগ্যশতককার ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

"আকাশমুৎপতু গচ্ছতু বা দিগন্তম্
অম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টম্।
জন্মান্তরার্জ্জিত শুভাশুভকৃন্নরাণাং
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্মফলানুবন্ধি ॥"

অর্থাৎ আকাশেই থাক, বা দিগন্তেই বিশ্রাম কর, সমুদ্রের ভিতরেই যাও বা আপন আপন ইচ্ছামত স্থানেই থাক। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। যেমন ছায়া ছাড়িয়া যাওয়া যায় না, তেমন কর্ম্মফলও দুস্ত্যজ। সর্ব্বজ্ঞানময়ী শ্রুতি বলিতেছেন—

"এষহ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্য উন্নিনীষত এষউ এবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যা-মধো নিনীষতে" (কোঃ ব্রাঃ ৩।৮)

"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন (বৃঃ ।২॥১৩।)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালকর্ম্ম করে, সে ব্যক্তি উচ্চ লোকে গমন করিতে পারে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম্ম করে, সে নরকস্থ হয়।

পুণ্যকর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম সঞ্চয় আর পাপকর্ম্ম করিলে পাপ হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেব ভগবদ্‌গীতায় (৪ অধ্যায়—১১) বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার যেরূপ উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ফল দিয়া থাকি। এবং অদৃষ্টই বিচিত্র সংসারের হেতু হইলেও দুরপনেয় মোহরশি দ্বারা আচ্ছন্নতা বশতঃ জীবগণ বুঝিতে পারে না। এই কথা ভগবান্ স্বয়ং গীতার ৪র্থ অধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানিগুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥"

ক্রমশঃ।

শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ।

কর্ম্ম।

শাস্ত্রীয় কর্ম্ম যথা বিধানে অনুষ্ঠান না করিয়া জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ভ্রম। কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, সেই বিষয়ের জ্ঞান-সোপানটী ক্রমে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে হয়। শস্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে শস্যাদি লাভের উপায়ের প্রতি প্রথম হইতে যত্ন, দৃষ্টি রাখিতে হয়। শস্যের প্রথমাবস্থায় সেই শস্যের তৃণকে যত্নে রক্ষা করিতে না পারিলে শস্যলাভ হয় না। শস্যলাভ হইলে তখন সেই শস্যের তৃণ পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু প্রথম হইতে শস্যের তৃণ রক্ষার্থে যত্ন দৃষ্টি রাখিতে না পারিলে শস্যলাভ হয় না। সেইরূপ জ্ঞানলাভের উপায় কর্ম্ম। জ্ঞানরূপ শস্যের কর্ম্মই তৃণ। জ্ঞানরূপ শস্যের কর্ম্মরূপ তৃণ প্রথমাবধি সযত্নে রক্ষিত না হইলে জ্ঞানলাভ ঘটে না। মূল বিষয় সম্যক্ অবলম্বন ব্যতীত বিষয়টীর সম্যক্ অভিজ্ঞতা জন্মে না, যেমন প্রথমাবধি তৃণ বা পলালে অবলম্বন ও যত্ন দৃষ্টি রাখিতে না পারিলে শস্যলাভ হয় না, সেইরূপ কর্ম্মে প্রথমাবধি যত্ন দৃষ্টি এবং অবলম্বন রাখিতে না পারিলে জ্ঞানলাভ হয় না। যথা ঃ—

"গ্রন্থমুদ্দিশ্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্‌গ্রন্থমশেষতঃ ॥"

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পলালবৎ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য হয়। ভগবান কর্ম্ম দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের বিধান করিতেছেন এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধন করিতেছেন; সুতরাং কর্ম্মদ্বারা ভগবানের তুষ্টি সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। ভগবান সকল পদার্থের মূল। ভগবান হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। বেদোক্ত যজ্ঞই অন্যতম কর্ম্ম। যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রাণীর উদ্ভব, এবং সংসার-চক্রের গতির সাহায্য বিধান সংসাধিত হয়। খেচর, ভূচর, বৃক্ষলতা, সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পরমাণু পর্য্যন্ত সকলেরই কর্ম্ম সাহায্যে এই ব্রহ্মাণ্ডের গতি ও স্থিতির রক্ষাকার্য্য সাধিত হয়। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছাতেই হউক সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়। অধিকার ভেদে কর্ম্ম সকাম ও নিষ্কাম আখ্যায় দ্বিধা বিভক্ত। জগৎপিতা তাঁহার উপযুক্ত সন্তানগণের মঙ্গল কামনায় পবিত্র বেদে কর্ম্মকাণ্ডের প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞানান্বেষণে উভয় কুল বিনষ্ট হয়।

"তেষাং বুদ্ধি বিচলনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধা নিবৃত্তে—
জ্ঞানস্য চানুৎপত্তে স্তেষাং উভয়-ভ্রংশঃ স্যাৎ।"

(স্বামিকৃত টীকা)

সকাম ও নিষ্কাম বৈদিক কর্ম্ম-সোপান ক্রমোত্তরণ করিতে থাকিলে ঐ কর্ম্ম হইতেই জ্ঞানোন্মেষ হইবে। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না জন্মিলে সম্যক্ প্রকারে জ্ঞানালোচনা করা যায় না। এই হেতু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত। কর্ম্মদ্বারা স্বভাব গঠিত ও

নিয়মিত হয়। আর স্বভাবই জীবগণকে কর্ম্মে প্রযুক্ত করে। কর্ম্মই আত্মার সৎপ্রবৃত্তির পরিপুষ্টি এবং কুপ্রবৃত্তির বিনাশ সাধন করে এবং বিশেষতঃ আমরাই কর্ম্মকে সত্যের দিকে মহিমার দিকে প্রচলিত করিতে কেবলমাত্র সমর্থ। আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের শিক্ষা, আমাদের ভগবৎপ্রাপ্তির কার্য্য, আমাদের জীবনযাত্রা, আমাদের সকলই আমাদের শাস্ত্রীয় কর্ম্মের দ্বারা নির্ণীত॥ কর্ম্মই আমাদের অদৃষ্টের অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া লয়। কর্ম্ম হইতেই বিষয় সুখ শান্তি, কর্ম্মে শ্রী আসিয়া আমাদিগকে বরমাল্য দান করে। এবং অবশেষে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মোক্ষলাভ হয়। জ্ঞানান্বেষীর অপেক্ষা কর্ম্মীর শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়। কুলপরম্পরায় বর্ণ ও আশ্রমানুযায়িক বৈদিক কর্ম্মে শাস্ত্র বিধি আছে বলিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে নিষ্কাম ভাবেও করিতে করিতে হৃদয়ে জ্ঞান, অহৈতুক ভক্তি ও শান্তির অভ্যুদয় হয়; হৃদয় নিষ্পাপ হয়। পাপের মুলোৎপাটন হওয়ায় উহার আর রক্তবীজের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ নবীন মূর্ত্তি ধারণের শক্তি থাকে না। ঐ শক্তি চির বিনষ্ট হইলে তখন আপনার সত্তা ভগবানে নিমজ্জিত হয়। এবং ভক্তিসমাহিত চিত্তে ভগবানের পূজা, যজ্ঞ এবং সর্ব্ব কর্ম্ম ভগবদর্থে অনুষ্ঠিত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যথানিয়মে নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পরম-ধামের পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বেদব্রত (ব্রহ্ম র্য্য), সমাবর্ত্তন, বিবাহ এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ—বেদ এবং পুরাণ পাঠ ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলিকর্ম্ম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সৎকার নৃযজ্ঞ,—এতদ্ব্যতীত সপ্ত পাকযজ্ঞ, সপ্ত হবির্যজ্ঞ, সপ্ত সোমযজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস-মাঙ্গল্য, অকার্পণ্য ও অস্পৃহারূপগুণবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিচার দ্বারা ব্রহ্মসাদৃশ্য অবস্থা লাভ হয়। বর্ণাশ্রমীর ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশ ধর্ম্ম লক্ষণ সর্বতোভাবে সেবিত হওয়া প্রয়োজন। লৌকিক এবং বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়। মানসিক যত্নে মনুষ্য-কৃত কর্ম্মের প্রতিকার হয় এবং মন্ত্র ঔষধ ও পুরুষকার দ্বারা দৈব প্রতিকুলতা প্রশমিত হয়। মন্ত্র এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে পাপ ক্ষয় হইয়া তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।

জগতের এবং আত্মার কল্যাণ-কারক যে সমস্ত ক্রিয়া শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রাদিতে বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধ্যাদি ও জগতের পোষণাদির নিদান। বিহিত কর্ম্ম, ফল কামনা পুরঃসর অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গাদি লাভ হয়, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হয় না। বাসনাই চিত্তের মলা। মনের শক্তি ও ক্রিয়া বিকাশে সংস্কার সঞ্চিত হয়। তন্মধ্যে যে জাতীয় সংস্কার-গুলি অবিদ্যার কারণ তাহারই নাম বাসনা। এই বাসনার উচ্ছেদ হইলেই চিত্ত প্রসন্ন হয়, চিত্ত প্রসন্ন হইলেই আত্মানন্দের উপলব্ধি হয়। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বাসনার সঞ্চয় হইতে পায় না। বিধি বিহিত নিষ্কাম-কর্ম্ম ও ব্রহ্ম-বিচার তত্ত্বজ্ঞানের

সোপান। এই কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের আবিলতা বিনষ্ট হইয়া নির্ম্মল চিদানন্দের উদ্বোধ হয়। স্বাত্বিকা নিষ্ঠা হইতে বুদ্ধিশুদ্ধি এবং বুদ্ধিশুদ্ধি হইতে: পরমাত্মজ্ঞান এবং পরমাত্মজ্ঞান হইতে অজ্ঞানের নাশ এবং অজ্ঞানের নাশ হইতে বন্ধন ছিন্ন হয়। বন্ধন ছিন্ন হইলে ভগবৎ জ্ঞান লাভ হইয়া ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। আত্মানদীতে অভিষেক করিলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয়। আত্মা নদীর স্বরূপ, ইন্দ্রিয়সংযম পুণ্যতীর্থ স্বরূপ, সত্য উদকস্বরূপ, শীল তট-স্বরূপ, এবং দয়া উর্ম্মি স্বরূপ, ইহাই শৌচ সদাচারের চিহ্ন। শৌচ ও সদাচার সম্পন্ন কর্ম্মই ধর্ম্মের মূল। বৈদিক ক্রিয়া কলাপ যাহা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে—তাহার অনুষ্ঠান না করা হেতু জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞব্যক্তির যে পাপ হয়, ঐ পাপকার্য্যের ফল ভোগ হইয়া থাকে, ঐ ফলভোগ তত্ত্বে যিনি অভিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তাহাকেই কর্ম্ম বলেন, ইহাই অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন। দেবতার উদ্দেশীভূত কর্ম্মসমূহের যে ফল তাহাতেই তত্ত্বজ্ঞান হয়, আর স্বপ্নাবস্থাতে যে কর্ম্ম করা যায় তাহা এবং মায়া নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া যে সমস্ত লৌকিক কর্ম্মাদি করা যায়, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ঐ উভয় কর্ম্মই মিথ্যা। মিথ্যা বলিয়া তাঁহারা এই কর্ম্মকে কর্ম্মে অকর্ম্ম বলেন। এই অভিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল দেবলোক প্রাপ্তি এবং চিত্তশুদ্ধি। শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন কর্ম্মের ফল তত্ত্বজ্ঞান। পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ হইতে মুক্তিকামী বিহিত কর্ম্মসমূহে ফল কামনা পরিশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি এবং মুক্তি লাভে অধিকারী হইয়া থাকে। গর্ভাধানাদি বৈদিকসংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারিলে চিত্ত নির্ম্মল ও পরিমার্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ব প্রধান হয়। মহাযজ্ঞ, সোমযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ, পাকযজ্ঞ, বেদসংহিতা অধ্যয়ন, প্রাণায়াম, জপ, উৎক্রমণ, ভস্মসমূহন, অস্থি সঞ্চয়ন, ও শ্রাদ্ধ এই সকল কর্ম্ম সংস্কারে সংস্কৃত হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যজুর্ব্বেদ বলিয়াছেন:—

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্ প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্।
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্ শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাম্।
বাসো যজ্ঞেন কল্পতাম্ মনো যজ্ঞেন কল্পতাম্।
আত্মাযজ্ঞেন কল্পতাম্ ব্রহ্ম যজ্ঞেন কল্পতাম্।
জ্যোতি র্যজ্ঞেন কল্পতাম্ স্বংযজ্ঞেন কল্পতাম্।
পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাম্ যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্।

যজ্ঞেরদ্বারা যজ্ঞ পুরুষ লাভ হয়। এই জন্য ভগবান মনু বলিয়াছেন—বেদ, পুরাণ, গীতা চণ্ডী, রামায়ণ—মহাভারতপাঠ, ব্রহ্মচর্য্য, নিত্য হোম, ত্রৈবিদ্য নামক ব্রত, দেব, ঋষি এবং পিতৃতর্পণ, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা শরীর মন ও আত্মা বিশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম বিচারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ। কেবল শুক্ল ও শুক্ল কৃষ্ণ। জপাদি এবং বেদবিহিত হিংসারহিত কর্ম্ম ও বৈদিক সংস্কারাদি কেবল শুক্ল কর্ম্ম, আর হিংসাযুক্ত বেদবিহিত যাগাদি কার্য্য শুক্ল কৃষ্ণ। পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে বৈদিক কর্ম্মাদি করিতে করিতে হৃদয়ে

জ্ঞান, অহৈতুক ভক্তি, ব্রহ্মবিবেক ও শাস্তির অভ্যুদয় হয়। সুতরাং সাধনার অগ্রসরে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, ও ব্রহ্মবিবেক ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। এই কর্ম্মমিশ্রিত পথই ভগবানের অভিমুখে সাধককে অগ্রসর করিয়া দেয়। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী প্রয়াগের যুক্ত বেণীতে সম্মিলিত হইয়া যেমন মহাতীর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান, ব্রহ্ম বিবেক ও ভক্তির চারিটী ধারা ভগবৎচরণে গিয়া মিলিত হইলে সাধক ধন্য কৃতকৃত্য হন। সাধকের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য কেবল কর্ম্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ভক্তি, কেবল ব্রহ্মবিবেক যথেষ্ট নহে। কর্ম্ম, জ্ঞান, ব্রহ্মবিবেক এবং ভক্তি সমন্বয় দ্বারা সাধক যদি সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারেন তবেই সাধনার চরম যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি, তাহাতে সিদ্ধি লাভ হয়। কারণ জীব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অংশ। সে নিজেও সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্ম অগ্নি, জীব স্ফুলিঙ্গ। জীবের সদ্ভাব, চিদ্ভাব, আনন্দভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে জীবস্ফুলিঙ্গ,—ব্রহ্মাগ্নির পূর্ণত্বে বিকাশিত হয়। সাধকের চারি ভাবের বিকাশোপযোগী চারিটি ধারা—কর্ম্ম, জ্ঞান, ব্রহ্মবিবেক ও ভক্তি। এই চারি ধারার সমন্বয়ে সাধকের জীবন মুক্তি ঘটে। তখন জীব আর জীব থাকে না, জীব ব্রহ্ম হন। জীব ব্রহ্মে মিলিয়া এক হইয়া যায়। জীবত্ব আর থাকে না, ব্রহ্মত্বের আবির্ভাব হয়। নদীর জল সাগরে মিশিয়া সাগরই হয়। নদীর আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই সাধনার চরম, ইহার আর পর নাই। এই সংসারে আমিত্ব জ্ঞানে ঐক্যদৃষ্টি, আমিত্বে অভেদজ্ঞান দ্বারা নিজস্বার্থ পরার্থের সহিত একীকরণ অর্থাৎ সকলই আমি, আমি ভিন্ন তুমি বলিয়া পদার্থের অস্তিত্বের অভাব, এই অভাবের অধিকারে জ্ঞানোদয় হইলেই পরমানন্দ সাগরে লীন হইয়া মুক্তি গতিলাভ হইবে। তখন বুঝিবে অহঙ্কারাস্পদ আমি এই ভাব বিদূরিত হইয়া আমি—অহং বিনির্ম্মুক্ত, যে আমাতে সুখ দুঃখ শোক মোহের সংশ্রব নাই,—সেই আমি—এই ভাব হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তখন আরও বুঝিবে, তোমার অহঙ্কারাস্পদ আমিকে ভগবানে সমর্পণ করিয়া আত্মোৎসর্গ—আত্মসমর্পণ—বাক্য, মন, শরীর এবং অন্যান্য সকলইন্দ্রিয় সম্পাদিত সমস্ত কর্ম্ম—পরমব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পারিয়াছে। এই ভাবে ভগবানে আত্মোৎসর্গ—আত্মসমর্পণই মুক্তি। পরাভক্তিদ্বারা ভগবানে আত্মসমর্পণ হয়। সেই পরাভক্তি দ্বারাই ভগবানকে জানিতে পারা যায় ও দর্শন হয়। সেই হেতু গীতায় ভগবানের সার উপদেশ—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

গীতা ১৮। ৬৫।

"মন্মনা" মচ্চিত্ত হও, "মদ্ভক্ত" মদ্ভজনশীল হও "মদযাজী" মদযজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর, এইরূপ হইলে, আমার জ্ঞান লাভ করিয়া "মামেবৈষ্যসি" আমাকে পাইবে। ভগবানের এই উপদেশে ভগবদ্ভক্তির অবশ্যম্ভাবী মোক্ষফল অবধারণ করিয়া ভগবৎশরণৈকপরায়ণ হইলে ভগবৎ লাভ হয়। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার করিয়া

শ্রীকৃষ্ণ শরণ, শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ আত্মনিবেদন, গীতার অতিগুহ্য ঈশ্বরবাণী। কর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ, জপ, তপ, প্রাণায়াম (প্রাণক্রিয়া) ও যোগাদি পরিহার করিয়া আমাকে আশ্রয় কর আমিই সমস্ত মঙ্গল বিধান করিব।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

গীতা। ১৮। ৬৬

আমাকে ভক্তিদ্বারা সমস্তই হইবে এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া "সর্ব্বধর্ম্ম" অর্থাৎ বিধির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া মদেকশরণ হও। এইরূপ হইলে ধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ নিমিত্ত পাপ হইবে, ইহা ভাবিয়া শোক করিও না, কারণ মদেকশরণ তুমি, তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে আমি মুক্ত করিব।

পরম কারুণিক শ্রীভগবানের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধান এবং পরম করুণার নিকেতন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম। আর্য্যশাস্ত্রমতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আর রাম কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। ইঁহাদের পরস্পরকে অভিন্ন জ্ঞানে একাত্মস্বরূপে পূজা, সেবা, উপাসনা করিবার শাস্ত্রবিধি বলিয়াই দেবাদিদেব শ্রীবিষ্ণুকেই সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানের সমস্ত ফল সমর্পণ করা হয়। ইঁহারা পাঁচে এক এবং একে পাঁচ। গুণকর্ম্ম এবং উপাধিভেদে কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা, কেহ পালনকর্ত্তা এবং কেহ সংহার কর্ত্তা হইয়াছেন। ইহারাই প্রয়োজনানুরোধে পৃথিবীর ভার হরণ, অধর্ম্মের নাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন হেতু রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক পরমব্রহ্মই প্রকৃতি পুরুষাত্মক। একই ব্রহ্ম স্ত্রী ও পুরুষ দুই হইয়াছেন। সেই একই ব্রহ্ম আদ্যাশক্তি হেমবরণা দুর্গারূপে জগৎ সৃষ্টি, জগদ্ধাত্রীরূপে জগৎ পালন এবং কালীরূপে জগৎ সংহার করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিন পরমাত্ম-স্বরূপে একই পরমেশ্বর। তদ্রূপ দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবানী পরমাত্মশক্তি ব্রহ্মরূপে একই পরমেশ্বরী। এইভাবে অভিন্নজ্ঞানে রাম কৃষ্ণে; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে; আর স্ত্রীরূপে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, শিবানীকে; দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রীকে পূজা উপাসনায় পরমাগতি মুক্তিগতিলাভ হয়। ভেদজ্ঞানের মূল অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের নাশ না হইলে ভেদজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ হয় না। মূলোচ্ছেদ হইলে—অজ্ঞানের নাশ হইলে সাধক তখন দেখেন রামের পূজায় কৃষ্ণপূজা, বিষ্ণুর পূজায় শিবপূজা, দুর্গা পূজায় কালীপূজা। ইঁহাদেরকে একে সকল, সকলে এক—ভাবিয়া সকল ছাড়িয়া এক বিষ্ণুকেই সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানের সমস্ত ফল অর্পণ করা হয়। ইঁহারা সকলেই এক পরমাত্মা পরম-ব্রহ্ম। সকলেই পূর্ণশক্তিতে শক্তিমান। এই এক ব্রহ্মশক্তি পূর্ণশক্তিতে এই সকল বিভিন্ন-রূপে ও উপাধিতে প্রকাশমান হইয়াছেন। এইজন্যই শ্রীভগবান গীতাতে বলিয়াছেন, সর্ব্বকর্ম্ম ছাড়িয়া আমারই আশ্রয় কর, আমারই শরণ লও, আমা হইতে কৃতকার্য্য হইবে। এই যে আমার শব্দ—ইহা রাম কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; আবার স্ত্রীরূপা ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী মহেশ্বরী; দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিতে সমানভাবে প্রযোজ্য। ইঁহাদের একের শরণে

একের আশ্রয়ে সকলেরই শরণ ও আশ্রয় লওয়া হয়। ইহাই শাস্ত্রের সমাধান এবং সেইজন্যই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ। যথার্থ জ্ঞানলাভ ব্যতীত ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় না। ভেদজ্ঞানই অজ্ঞান—সর্ব্বনাশের মূল। এই ভেদজ্ঞান নাশের জন্যই ভগবৎ-পরায়ণ হইয়া ভগবৎ পূজাদি কার্য্য করিবার শাস্ত্রবিধি।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

গীতা ৫।৩৭

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যথার্থ জ্ঞানলাভ না হইলে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় না। এই যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্যই শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ডের প্রকাশ। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে অজ্ঞানের নাশে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যথার্থজ্ঞান উদিত হয়।

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ-সমাজ।

হিন্দুর সমাজশক্তি দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। প্রতীচ্য ম্লেচ্ছভাব সমাজ-শরীরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। সমাজে বর্ণগত সম্মান আর নাই। একজাতি আর এক জাতিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া প্রাধান্য চাহে। ব্রাহ্মণেতর প্রত্যেক জাতিরই ঊর্দ্ধে উঠিবার একটা প্রবল চেষ্টা দেখা যাইতেছে। কেহ কাহাকে মানিতে চাহে না। এই বিষম সমাজদ্রোহের যুগে ব্রাহ্মণ তাঁহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমাজ-শাসনের ভার গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বের সেই সম্মান, সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন। ইহাই ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর মূল উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান অবস্থায় সংস্কার প্রয়োজন, একথা কেহই অস্বীকার করেন না, কিন্তু দেখিতে হইবে সংস্কার শেষে সংহারে পরিণত না হয়। দেশে বৈদ্য ও কায়স্থে লড়াই বাধিল, কে বড় কে ছোট প্রশ্ন উঠিল, তাহা দেখিয়াই যদি ব্রাহ্মণরা প্রতীচ্যের অনুকরণে একটা কন্‌ফারেন্স বসাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া জয়পতাকা তুলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার এত আয়োজন অনুষ্ঠান বৃথা। যে ছোট সে বড় হইবার আশা করিতে পারে, কিন্তু যে বড়—ছোটর সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া তাহার পক্ষে কদাচ শোভন নহে। তাহাতে সংস্কার না হইয়া সংহার হয়। 'জিতিলে পৌরুষ নাই, হারিলে অপযশ!'—এই প্রবাদবচনের দিকে লক্ষ্য করিলেই কথাটার বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে।

সংস্কারই যদি মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে সংযম চাই; সৎশিক্ষা চাই; শাস্ত্রজ্ঞান চাই। অস্থায়ী সম্মিলনে এই তিনটির একটিও আশা করা যায় না। তবে সম্মিলনে এই তিনটির

প্রকৃষ্ট পন্থা আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু দুরূহ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, এক দুই বা তিনদিনের আলোচনায় আশানুরূপ ফল ফলে না। শুনিয়া আসিতেছি, ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্যতম আলোচ্য বিষয় পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন। কালীঘাটে ব্রাহ্মণসম্মিলনীর মহা অধিবেশন, কলিকাতার শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর আত্মহত্যার বহুপূর্ব্ব হইতে পণপ্রথার উচ্ছেদসাধনের প্রস্তাব চলিয়া আসিতেছে। এমন কি এই নগণ্য লেখক নিজে "স্বভাব" কুলীন হইয়াও পণপ্রথার বিরুদ্ধে বহুপূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু বলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার ফল কি? তাহার ফল হ্রাস ত নহেই, বরং বৃদ্ধি! প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি, পাত্রের পিতা পুত্রের বিবাহে পণ লইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া, এমন কি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, সমাজের নেতাগণকে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত করিয়া, তাহাদের নিকট পুত্রের পাঠের ব্যয় গ্রহণ করিয়া, শেষে তাহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া উপযুক্ত পুত্রের বিবাহে মোটারকমের পণ লইয়া বসিলেন। দেখিতেছি, যিনি পণপ্রথার কুফলকীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিলেন, তাঁহারই অবিবাহিত পুত্র বর্ত্তমান জানিয়া দুইদিন পরে কোন কন্যাদায়গ্রস্থ ব্রাহ্মণ যুক্তকরে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি বলিলেন, "তাই ত, মশাই, কি করি বলুন? গিন্নি যে শোনে না। দু'হাজারের নীচে ছেলের বিয়ে কিরূপে দেওয়া যায়?"

ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মুখের কথায় পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন হইবে না। রোগ দূর করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে মূল ব্যাধির চিকিৎসা করিতে হইবে। গোড়ার গলদ দূর করিতে হইবে। উপরে প্রলেপ ভিতরে কোন কাজেই লাগিবে না।

পণপ্রথা ত একটা উপসর্গ মাত্র,—জ্বর হইলে যেমন মাথা ধরে। আসল ব্যাধি, আমাদের সমাজে ইতরভদ্র পরস্পরের মধ্যে আর সেই সহানুভূতি নাই, সহৃদয়তা নাই। আছে মাত্র পরস্পরের মধ্যে একটা রেষারেষি ভাব। ঋষিগণ যে অর্থকে অনর্থের মূল ধরিয়াছিলেন, এখন সেই অর্থেরই সম্মান। আর গুণের আদর নাই, বিদ্যার গৌরব নাই। একটা সভা-সমিতি করিতে হইলে, যাঁহাদের অর্থবল আছে, অধিকাংশক্ষেত্রে বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাদের একজন সভাপতি মনোনীত হন। * তিনি সভাপতির উপযুক্ত কি না, সে প্রশ্ন উঠে না। কাজেই প্রকাশ্যে কেহ কোন কথা বলিতে না পারিলেও, ভিতরে ভিতরে অশান্তি ও অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠে।

অর্থশালিগণকে বাদ দিয়া সমাজসংস্কারের কথা বলিতেছি না। কারণ তাহা অসম্ভব। সুধু জনবলে কাজ হয় না, ইহাতে অর্থবলেরও বিশেষ প্রয়োজন। অর্থশালিগণ এতকাল

* ব্রাহ্মণসম্মিলনীর সভাপতি মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া, একথা বলিতেছি না, সাধারণ সভাসমিতিতে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই আলোচনা করিতেছি।—লেখক।

সমাজের রক্ষক ছিলেন, এখনও তাঁহাদিগকে সেই আসনে রাখিতে হইবে, কিন্তু সমাজ-পরিচালনার ভার গুণবান, ব্রাহ্মণ সাধারণের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য দিতে গেলে সমাজ সংস্কারের পথে না গিয়া ধ্বংসের পথে যাইবে। তবে ইহা স্থির যে যিনি গুণে বড় হইবেন, তাঁহাকে ছোট করে কে? তিনি অর্থশালী না হইলে ক্ষতি নাই। অর্থশালী হইলে পরম লাভ।

দেশের ধনবান্ ব্যক্তিগণের প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া এই কথা বলিতেছি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ধনবান ব্যক্তিগণ সমাজে যে অনিষ্টের বীজ ছড়াইতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিতেছি। এত আলোচনাতেও পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন হয় না। তাহার কারণ কি? দেশের মধ্যে যাহারা ধনধান তাঁহারা পরোক্ষভাবে দরিদ্রকে ঘৃণা করেন, ইহা, সাধারণ কথা। কোন পেয়াদার পুত্রকন্যার সহিত কোন হাকিমের পুত্রকন্যার বিবাহের কথা কেহ শুনিয়াছেন কি? এ রকম প্রস্তাবই বোধ হয় কেহ শুনেন নাই, বিবাহ ত দূরের কথা। এমন কেন হয়? দুষ্কুল হইতে কন্যারত্ন আহরণের কথা এখন উপকথার মধ্যে। এখন দেখা যায়, এক রাজার সহিত অন্য রাজার মেয়ের বিবাহের ঘটা। পাত্রপাত্রীর রাশিচক্র কোনরূপে মিলিলেই যথেষ্ট। পাত্রপাত্রী সুশ্রী অথবা বিশ্রী হউক, রাজযোটক হউক বা না হউক, তাহাতে বড়-একটা-কিছু আসে যায় না। বর্ত্তমান সমাজে ধনই একমাত্র কাম্য। কারণ-ধনের সম্মান—ধনেরই আদর। ইহাই আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

সাধারণভাবে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব। ধনীরা যখন সামাজিক ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে দরিদ্রের সহিত মিশিতে ইচ্ছা করেন না, দরিদ্ররাই বা সে আশা করে কেন?

কথাটা খুব সহজ। কিন্তু ইহারই মূলে যত দলাদলির সৃষ্টি, এবং এই দলাদলির জন্য দোষী ধনীরা। একে ত ধনীরা দরিদ্রদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে নারাজ, তাহার উপর পুত্রকন্যার বিবাহে তাঁহারা বাজী পোড়াইয়া, খেমটা নাচাইয়া, এবং আরও কত-কি করিয়া যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহাতে প্রতিবৎসর নিজের সমাজে কত কন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র পিতা কন্যাদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেটা তাঁহারা ভাবিতেই চাহেন না। কোন কোন বড়লোকের বাড়ীতে বার্ষিকদানের একটা পরিমাণ স্থির করা থাকে। কিন্তু সে দান পায় কয়জন লোক? বিনা সুপারিসে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, সে প্রার্থনা ত অরণ্যে রোদনের মতই নিষ্ফল হয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। তাই বলিতেছি, পণপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার পূর্ব্বে গোড়ার গলদ দূর করিতে হইবে, ধনের গরিমার আসনে গুণ-গরিমাকে বসাইতে হইবে, সমাজ অঙ্গে সর্ব্বত্র সমদর্শন হইতে হইবে, কিন্তু সে হৃদয় যে আমাদের নাই। এখন আমরা যাহাতে সেই হৃদয় ফিরাইয়া পাই, যাহাতে 'সত্যঞ্চ সমদর্শনঃ' ভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমাদের সমাজে হয়, তাহাই করিতে হইবে। নতুবা হুজুগে মাতিয়া লাভ কি?

আমরা সংযমশিক্ষা চাই। তথাকথিত উচ্চশিক্ষা নহে, সুশিক্ষা চাই। উচ্চশিক্ষার কুফল—অহঙ্কারের অবতারের বিকট মূর্ত্তি আমরা ত প্রতিনিয়তই দেখিতেছি। আমরা পূর্ব্বসমাজপতিগণের আদর্শে ধন চাই না, মান চাই। আমরা পুরাতনের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মের পথে জ্ঞান, এবং জ্ঞানের পথে ভক্তি চাই।

আমরা মানুষ হইতে চাই, কিন্তু মনুষ্যত্ব আমরা যে হারাইয়াছি। আমাদের গৃহিণীগণ যাহাতে গৃহকর্ম্মে পটু হন, আমাদের গৃহে গৃহে গৃহিণীগণ যাহাতে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করেন, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আছে কি? একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখ ভুলিয়া, হয় গৃহিণীর মধুময় উপদেশে, নহে ত নীচ স্বার্থেরপ্রেরণায় আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতে ব্যগ্র।

সমাজের উন্নতি হইবে কিসে? অগ্রে সমাজের দোষগুলি দূর করিতে হইবে। তাহার পর উন্নতির জন্য মাথা তোলা সাজিবে।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণই হিন্দুসমাজের মুখপাত্র। শাস্ত্রের বিধিনির্দ্দেশে সমাজকে চালাইতে হইলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের অভাব-অভিযোগে কর্ণপাত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেন, নস্য টানিয়া, টিকি ঝুলাইয়া ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন ইত্যাদি। তাঁহাদের দারিদ্র্যের কথা উঠিলে তৎক্ষণাৎ উত্তর পাওয়া যাইবে,—"কেন, বুনো রামনাথ কিরূপে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন? এখানকার ব্রাহ্মণদের আকাঙ্ক্ষা বেজায় বাড়িয়া উঠিয়াছে।" অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অর্থলিপ্সা প্রবল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে সকলেই দরিদ্র নহেন, তাঁহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংখ্যাও অনেক। কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত যৎকিঞ্চিৎ পাইয়া অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিলে, অভাবের দোহাই দিয়া তাঁহার পক্ষ বরং সমর্থন করা চলে, কিন্তু কাল কি খাইব বলিয়া যাঁহাকে ভাবিতে হয় না, তিনি শাস্ত্রদর্শী হইয়াও শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করেন কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহা দূর করা আবশ্যক।

ব্রাহ্মণেতর কোন জাতিই ব্রাহ্মণকে তাদৃশ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, সে জন্য দোষী ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের অভাব-অভিযোগের কথাও বলা উচিত।

এযুগে অনেক তার্কিক বলেন,—হিন্দুর শাস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণেরা নিজের সুবিধামত বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন। সে যুগের ব্রাহ্মণেতর জাতি যেন মূর্খ ছিল, তাই তাহারা না বুঝিয়া ব্রাহ্মণকে অবাধে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে দিয়াছিল। এখন সকলেই নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, আর কেন তাহারা ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিবে?

সিদ্ধান্তটা নিতান্ত অসঙ্গত। ক্রিয়াকাণ্ডহীন ব্রাহ্মণকে অন্য কেহ ভক্তি না দেখাইলে তিনি ব্রাহ্মণ অভিমান দেখাইতে পারেন না, কিন্তু সেকালের শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপর ছিলেন, একথা কিরূপে মানিব? তুচ্ছ কামিনী-কাঞ্চনের মায়া ত্যাগ করিয়া, বনের ফলমূল খাইয়া যাঁহারা আমরণ সমাজের হিতকামনায় কঠোর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,

তাঁহারা স্বার্থপর ছিলেন, এমন কথা একমাত্র গায়ের জোরে বলা যাইতে পারে। ঐহিক সুখের একমাত্র সারবস্তু অর্থ। অর্থোপায়ের যত কিছু পন্থা সবই তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তুমি রাজ্য লও, তুমি কৃষিকর্ম্মের ভার লও, তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য কর,—দুধে ভাতে থাও। সবই তোমাদের রহিল, আর আমার? আমি ইহকালের কিছুই চাই না। সেই আমি, সেই ব্রাহ্মণ স্বার্থপর? পর-দার তোমার পক্ষে পাপ, আমার পক্ষে নহে,—কৈ, এমন কথা ত ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই! আমি সংযমী হইয়া পরকালের চিন্তায় কাল কাটাইব, তুমি ক্ষুধার সময় এই চিরভিখারীকে একমুষ্টি ভিক্ষা দিও, তাহাতেই আমি তৃপ্ত। এমন ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর বলা যায় কি? যে ব্রাহ্মণ-সমাজের ভিত্তি সত্ত্বগুণের উপর প্রতিষ্ঠিত, নীচ স্বার্থপরতা বা মনের অন্য কোন কলুষভাব সেখানে স্থান পাইতে পারে না। সহজ বুদ্ধিতে যাহা না আসে, তাহাই দোষের, এমন ধারণা মূর্খতা পরিচায়ক। যে আদর্শে সে যুগের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সমাজ পরিচালন করিতেন, এখন আর সে আদর্শে সমাজ-শাসন চলে না। দোষ সে যুগের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নহে, তাঁহাদের আদর্শেরও নহে। দোষ আদর্শভ্রষ্ট এ যুগের ব্রাহ্মণগণের।

এখন দেখিতে হইবে, ব্রাহ্মণের এই অধঃপতনের কারণ কি?

হিন্দুরা প্রথম ধাক্কা খায় বৌদ্ধদের হাতে, খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে। রাজা বিম্বিসার বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথম দীক্ষিত হইলেন। তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণেতর জাতির অনেক লোকই ব্রাহ্মণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। অসন্তোষের কারণ, ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা ও আচার-ব্যবহার তাহাদের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছেন, শূদ্র দৈবক্রমে সম্মুখে আসিল, ব্রাহ্মণের আর আহার হইল না। সে সময়ে সামাজিক শাসনও বড়ই কঠোর। এখন যে সকল অপরাধ আমরা হাসিয়া উড়াইয়া দিই, তখন তাহা উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না। সামান্য অপরাধে কথায় কথায় প্রায়শ্চিত্ত। উপায়ান্তর ছিল না বলিয়াই স্থলবিশেষে লঘুপাপে গুরুদণ্ডও হইত। আমরা রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিব, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা সমাজকে পুষ্ট করিব, আর আমাদের পালিত ব্রাহ্মণ কথায় কথায় আমাদিগকে সাজা দিবেন,—এ ত বেজায় অত্যাচার!—ব্রাহ্মণেতর জাতির ভিতরে ভিতরে এইভাব পুষ্টিলাভ করিল। * সেই সময়েই বিম্বিসার ঘোষণা করিলেন,—"তোমরা জাতিভেদ উঠাইয়া দাও। কর্ম্মের দ্বারা তোমরা সকলেই সমান। ব্রাহ্মণের অযথা পীড়ন সহ্য করিবার আর আবশ্যকতা নাই। সদ্দৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদ্‌বাক্য, সদ্‌ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকাহরণ, সচ্চেষ্টা, সৎস্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি,—এই অষ্টবিধ উপায়ে আমরা ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতে পারিব।"

* লেখক—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রারম্ভকালীন সমাজের যে অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ-সমাজে"র সিদ্ধান্ত বলিয়া কেহ যেন না বুঝেন। ইতি সং।

বুদ্ধের ধর্ম্মে জাতিবিচার তিরোহিত হইল। ধর্ম্মপথে উন্নতির ন্যূনাধিক্যবশতঃ ব্যক্তিগত বিভিন্নতা দৃশ্যমান হইলেও তাহাদিগের মধ্যে জাতিগত বিভিন্নতার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর নবধর্ম্মে পরিবর্জ্জিত হইল। অতি নীচ জাতীয় শূদ্রও নবধর্ম্মে দীক্ষিত এবং সাধনমার্গে উন্নতিলাভ করিয়া সর্কলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। *

রাজা দীক্ষিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরবর্গও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ব্রাহ্মণেতর জাতীয় প্রজারাও দলে দলে বৌদ্ধ হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্জিকা সংস্কার।

দেশের পক্ষে লজ্জাকর, ধর্ম্মের পক্ষে হানিজনক পঞ্জিকাভ্রমের সংশোধনে যত্নবান পূজ্যপাদ 'ব্রাহ্মণসভাকে' মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যথাবিহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কয়েকটি কথার অবতারণা বিধেয় বোধ হইতেছে।

সংশোধনের পূর্ব্বে ভ্রান্তি নির্দ্দেশ ও শোধনের শাস্ত্রীয়তা ও যৌক্তিকতা নিরূপণের জন্য সভা সর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর মত সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, দুই শ্রেণীর লোক এ বিষয়ে মতামত প্রদান করিবার অধিকারী। প্রথম, যথার্থ জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলনপর জ্যোতির্ব্বিদ্, দ্বিতীয় স্মৃতিশাস্ত্র আলোড়নাভ্যস্ত স্মার্ত্ত পণ্ডিত। জ্যোতির্ব্বিদ্—প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, পুরাতন, অধুনাতন, সর্ব্ববিধ জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্যক্ আলোচনা করিয়া সেই শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বানুসারে পরিবর্ত্তন আবশ্যক কিনা, আবশ্যক হইলে কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা স্থির করিবেন এবং স্মৃতশাস্ত্রবিৎ সতর্কতার সহিত সমাধান করিবেন জ্যোতিঃপরিবর্ত্তনে স্মৃতিবিরোধ উৎপন্ন হয় কিনা।

এই কার্য্যের গুরুত্ব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে স্বতই মনোমধ্যে আতঙ্কের উদয় হয়, কার্য্যকরী শক্তি নিষ্পন্দ হইয়া পড়ে, সাগর বন্ধনোদ্যত বৃক্ষমার্জ্জারের কথা স্মরণ হইয়া হৃদ্‌গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়, উৎসাহ ভঙ্গ হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে অণুমাত্র দ্বিধা না করিয়া যথার্থ পণ্ডিত ও পণ্ডিতাভিমানী, শাস্ত্রজ্ঞ ও

---

* বুদ্ধদেব ভগবানের অবতার। ধর্ম্মের গ্লানি দূরীকরণ জন্যই ভগবানের আবির্ভাব হয়। হিন্দুর জাতিবিচার ধর্ম্ম। অতএব এই ধর্ম্মকে রহিত করা অবতারের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝিয়া পরবর্ত্তীকালে তৎসম্প্রদায়েরাই অদূরদর্শিতাবশতঃ জাতি বিচার দোষ-দুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল। ইতি সং

তন্মধ্যের, অধিকারী ও অনধিকারী সকলেই সমভাবে মতামত প্রকাশ করিতেছেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, বিলক্ষণ জিগীষাও প্রকাশ পাইতেছে। কেবল বিষয়গত গুরুত্ব-জনিত শঙ্কা বা সঙ্কোচ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্রই, হৃদয় অকুতোভয়, সাহস অপরিমেয়। ব্রাহ্মণসভা কি করিতেছে বা কি করিবেন জানিনা, তাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা সহজেই পাণ্ডিত্য ও প্রগল্‌ভতার প্রভেদ বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে পাণ্ডিত্য, প্রগল্‌ভতা নির্ব্বাচন অতি সুকর। কিন্তু সাধারণ জনসমাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। কোন্‌টিতে জ্ঞানালোক, কোন্‌টিতে তর্কচাতুর্য্য সন্নিবিষ্ট, কোথায় শাস্ত্রীয় সত্য, কোথায় বা দাম্ভিকতা অবস্থান করিতেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সদ্‌যুক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রীয়মত সংগঠনে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার মানসে ১৩১১ সালে আহূত বোম্বাই পঞ্চাঙ্গশোধনসভার নির্ণয় যথাযথ প্রদর্শিত হইল। দ্বারকামঠের অধীশ্বর জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তশাস্ত্রজ্ঞ, আধুনিক গণিতশাস্ত্রে সুনিপুণ ব্যক্তিগণ এবং পঞ্জিকাকারগণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া, পঞ্জিকার সংস্কার জন্য এক মহাসভা স্থাপিত করেন। দৃক্‌প্রত্যয়সিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরোধে শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ পঞ্জিকার গণনা কিরূপ করিতে হইবে, ইহা নির্ণয় করাই ঐ সভার বিচার্য্য বিষয় ছিল। এই ধর্ম্মনির্ণয়ে, সমবেত পণ্ডিতগণ, বিচারস্থলে, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছিলেন। আট দিন ব্যাপিয়া তাঁহারা পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবন ও তাহার যথাশাস্ত্র সমাধান ইত্যাদি করিয়া, পুনঃ পুনঃ পরামর্শ পূর্ব্বক, স্থূনানিখনন্যায়ে, আট দিন বিচারের পর, প্রধানতঃ সাতটী প্রশ্ন ও তাহার সমাধান, সর্ব্বসম্মতিক্রমে মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ শুক্রবার তারিখের হিতবাদী পত্রিকায়ও এই প্রশ্ন ও সমাধান কয়টী সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

প্রথম প্রশ্ন।—পঞ্জিকা গণনা করিতে সূর্য্যের বৎসরের পরিমাণ কত দিন, কত দণ্ড, কত পল, ইত্যাদি স্বীকার করিতে হইবে? এবং সূর্য্য ভিন্ন অন্য গ্রহের গতির মান (যেমন এক দিনের গতি) কিরূপ স্বীকার করিতে হইবে?

উত্তর।—সূর্য্য-সিদ্ধান্তোক্ত বর্ষমান, স্বীকার করিতে হইবে। সূর্য্যাতিরিক্ত গ্রহগতিতে, বেধোপলব্ধ বীজ (যন্ত্রাদির দ্বারা গ্রহগতির পরীক্ষা করিয়া যে অন্তর পাওয়া যায় তাহা) সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন।—বৎসরে অয়ন গতির মান, কি স্বীকার করিতে হইবে?

উত্তর।—সূর্য্য-সিদ্ধান্তোক্ত সূর্য্যের বর্ষপরিমাণ, যাহা স্বীকার করা হইয়াছে, তদনুসারে বর্ষে, অয়নগতি কিঞ্চিৎ অধিক ৫৮ বিকলা হইবে। তাহাতেও যদি বেধস্থলে বৈগুণ্য উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে, বেধোপলব্ধ বীজ সংস্কার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয় প্রশ্ন।—অয়নাংশ, ভিন্ন ভিন্ন মতে ১৮ হইতে ২৩ অংশ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। গ্রন্থারম্ভ কালে অয়নাংশ কত স্বীকার কবিতে হইবে?

উত্তব।—আমাদের গ্রন্থারম্ভকাল, শকাব্দা ১৮২৬ ইহাতে ২২ অংশেব অধিক ও ২৩ অংশেব কম অয়নাংশ, স্বীকাব কবিতে হইবে।

চতুর্থ প্রশ্ন।—আবম্ভ স্থান (ভগণাদি) কি, স্বীকাব কবিতে হইবে?

উত্তর।—ক্রান্তিবৃত্তে আরম্ভস্থান, অয়নাংশ অনুসারে সচল ও নিশ্চল, দুই'ই স্বীকাব করিতে হইবে। এবং পঞ্জিকায় সায়ন সংক্রান্তি ও নিবয়ণ সংক্রান্তি, দুইই দেখাইতে হইবে। অয়নারম্ভ দ্বয়, প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইবে।

পঞ্চম প্রশ্ন।—দৃক্‌প্রত্যয়েব জন্য বেধোপলব্ধ নব্য সংস্কাব, গ্রহণ কবা যাইবে কি না?

উত্তব।—দৃক্‌প্রত্যয়েব জন্য যে বিষয়ে যে যে সংস্কার আবশ্যক সে'সকলই বীজ সংস্কাররূপে গ্রহণ কবিতে হইবে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন।—তিথি কিরূপে সাধন করিতে হইবে?

উত্তব।—স্ফুট চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে তিথিমান সিদ্ধ কবিতে হইবে, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় রীতিতেই করণ গ্রন্থে দেখাইতে হইবে।

সপ্তম প্রশ্ন।—মধ্যরেখা স্বীকার্য্য?

উত্তর।—উজ্জয়িনী গতা মধ্যবেখা স্বীকার্য্য।

করণ গ্রন্থে, নক্ষত্র সাধন, সাভিজিৎ ও নিরভিজিৎ, এই উভয় প্রকাবেই দেখাইতেহইবে।

এই প্রশ্নোত্তরেব ব্যাখ্যারূপে, যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে তাহা এই।

এই প্রশ্নোত্তরে বেধোপলব্ধ, এই স্থলে মূল সিদ্ধান্তোক্ত স্থিবচরযন্ত্রদ্বাবা উপলব্ধ বেধই গ্রাহ্য কোটিতে ধরিতে হইবে। যদি তাহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্যকাল নির্ণয়ে সমর্থ, এরূপ অন্য যন্ত্রদ্বারাও কার্য্য নির্ব্বাহ করা দোষাবহ নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরে নূতন করণ গ্রন্থ নির্ম্মাণস্থলে, গ্রহলাঘব গ্রন্থেবই সংস্কাব কর্ত্তব্য। যেহেতু তাহার প্রচলন অধিক এবং তাহাব সংশোধনও সুখসাধ্য।

চতুর্থ প্রশ্নোত্তরে ভগণের আদি বিন্দুর নিশ্চল পক্ষে, রেবতী তারাকেই ভগণেব আদিবিন্দু, মানিতে হইবে, ইহা সাতজন পণ্ডিত বলেন। অবশিষ্ট সকলেই প্রকৃত প্রশ্নেব অনুকূল উত্তর বলেন। এজন্য বহু সম্মত গ্রহণ কবা হইয়াছে। আব সমস্ত বিষয়ে, সকল পণ্ডিতেরাই যথাস্থিত ও অনাকুলভাবে সম্মতি করিয়াছেন। তাঁহারা এই নির্ণয় অনুসারে পঞ্জিকা সাধনার্থ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে, তৎক্ষণাৎ এগার জন পণ্ডিতকে উপযুক্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রদান করিয়া সত্বর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনায় ইচ্ছা রহিল। ক্রমশঃ।

লিখিতমিদং কেনচিদ্
জ্যোতিঃ শাস্ত্র পঞ্চাননোপাধিকেন।

সংবাদ।

সাটুই কুমারপুর শাখা-ব্রাহ্মণ-সভা।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রাহ্মণ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত তরঙ্গবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সাটুই কুমারপুর গ্রামে—সাটুই, চুমরীগাছা, কাঁঠালিয়া, নগর, কুমারপুর, জালালপুর, মৃজাপুর, মেলেনী প্রভৃতি ৮ খানি গ্রাম লইয়া একটী শাখা-ব্রাহ্মণসভা স্থাপিত হইয়াছে। সভার কার্য্যকরী-সমিতির সদস্যগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চট্টরাজ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধারমণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ সরকার।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টরাজ।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত শ্রীপতি চট্টরাজ।

সহকারী কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায়।

ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক—শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যরত্ন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজরাজ ভট্টাচার্য্য।

সতাং সঙ্গঃ।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু তুলসী দাস সেন মহাশয়ের আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এচ, ডি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে পূর্ব্বপূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও "সতাং সঙ্গ" নামক সভার অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, এবং সুসঙ্গের মহারাজপ্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষিত স্বনামখ্যাত ব্যক্তিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় যেমন প্রবন্ধাদি পাঠ হইয়া থাকে, তেমনই হইয়াছিল। কোন দিকে কোন আনন্দের ত্রুটি হয় নাই। এইরূপ সভার রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এইরূপ সভাসমিতি করিয়া যে সকল আলোচনা যেভাবে হইতেছে তাহাতে আমাদের আর্য্যত্বের গোড়ায় গলদ ঘটিবে না কমিবে?

দেশের এই দুর্দ্দিনে যাহাতে প্রকৃত প্রাচীনত্ব বজায় থাকে, সুশিক্ষিত চিন্তাশীল হিন্দু-সন্তানমাত্রেরই সর্ব্বদা স্বতঃপরতঃ তাহারই চেষ্টা করা উচিত। এ সভায় তাহার কিছু হইয়াছিল কি? আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সাহিত্যসম্মিলনের ন্যায় এ সভাও হিন্দুয়ানীর দিকে দৃষ্টি শূন্য; সুতরাং ইহাতে আমরা সম্পূর্ণ অনুরক্ত হইতে পারিতেছি না। কিন্তু উপস্থিত যে সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তির নাম জানিতে পারিয়াছি, তাহারা অনেকেই হিন্দু আস্তিক পুরুষ, তাই ভরসা। নিম্নে একটী গান ও প্রকাশ করা গেল।

বঙ্গভূমি।

বন্দেমাতরম্‌।

তুমি!　　　শস্য-শ্যামল অম্বরা।
জনমভূমি, জননী তুমি, ধরণী পূজিত ধরা।
আর্য্যসুত মুখরিত হইত তব সাম গীত,
নাচিত জাহ্নবী ধারা;
দেবতাগণ রজনী দিন শাসিত তব ধরা।
হিমাচল শেখর মণ্ডিত তুষারে,
কিরীট-সম ভাসিত সদা শুভ্র রবি করে,
চরণতল ধৌত করি, নমিত সদা সিন্ধুবারি,
বহিত সৌরভ ভরা;
তুমি হিম-শীত-মধু-বরষা-আতপ-
শরৎ শোভিত করা।
করুণাময়ী পুণ্যভূমি, ধরণীতলে ধন্য তুমি,
দীন দুঃখহরা;
অতিথি জনে, অতি যতনে, বিতর সুধা ধারা।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ-সভার পরীক্ষা।

নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা—পরিগৃহীত পরীক্ষা এবৎসর ১৩২৩ সাল আষাঢ় মাসের ২৬শে আরম্ভ হইবে। সর্ব্বশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা ২৬শে হইতে আরম্ভ হইবে ৪ দিবস হইবে। পূর্ব্ব পরীক্ষা দুই দিবস হইবে। উপাধি ও পূর্ব্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কারের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষাবাতা ছাত্রগণের—অধ্যাপকগণেরও যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। ছাত্রগণ পরীক্ষার জন্য সত্বর হউন। পরীক্ষার নিয়মাবলী ও আবেদন পত্রের ফরমের জন্য ব্রাহ্মণ-সভায় দরখাস্ত করুন। আষাঢ় মাসের ২০শে তারিখ পর্য্যন্ত আবেদন গৃহীত হইবে। পরীক্ষার বিষয়, নামধাম অধ্যয়ন স্থানের সম্পূর্ণ ঠিকানা, বেদ, শাখা, পিতার নাম, অধ্যাপকের নাম প্রভৃতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া নিজ নিজ প্রশংসাপত্রসহ আবেদন করিলেও তাহা গৃহীত হইবে।

—:*:—

দদ্রু বহ্নি বারি

(২)

(পারদ ও ক্রাইসোফেনিক বর্জ্জিত অদ্বিতীয় দদ্রুনাশক) পুরাতন কোচদাদে পরীক্ষা করুন, জ্বালা করে না, কাপড়ে দাগ লাগে না। ১টী /৫, ডজন ৸০ ভি পি ।০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এস্, সি, চ্যাটার্জ্জি, পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।—

বি, কুণ্ডু, এণ্ড সন্স, ৮২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"অপর্ণ সুধা

(৩)

(সহস্র সহস্র রোগীর দ্বারা পরীক্ষিত অদ্বিতীয় জ্বরঘ্নমিশ্র)।

প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র এরূপ আশু ফলপ্রদ জ্বরের ঔষধ অতি অল্পই দেখিবেন। একবোতল ১৲ টাকা ১ ডজন ৯৷০ ।

প্রাপ্তিস্থান—এস, সি চাটার্জ্জী পাঁচথুপী—মুর্শিদাবাদ।

দন্তবন্ধু

(১)

ইহাতে হিন্দুর অস্পৃশ্য কোন দ্রব্য নাই।

নিয়মিত ব্যবহারে কোন প্রকার দন্তরোগ জন্মিতে পারে না। অধিকন্তু দন্তোজ্জ্বল, মুখের দুর্গন্ধদূর, মাড়ীফুলা, দাঁতনড়া, রক্তপড়া প্রভৃতি যাবতীয় যন্ত্রণাদায়ক দন্তরোগ শীঘ্র সারিয়া যায়। রূপেগুণে "দন্তবন্ধু" মঞ্জন জগতের সম্রাট। ১টী ৵১০ ৬টী ৸৵০ ভি পি আদি ।০।

প্রাপ্তিস্থান—আর, সি, গুপ্ত, এণ্ড সন্স ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।—

বি, কুণ্ডু, এণ্ড সন্স ৮২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পোষাক বিক্রেতা।

৺প্যারিলাল দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

১১৯ ৯ং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

সিমলা, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, কল্মে, মান্দ্রাজী তাঁতের ও নানা দেশীয় মিলের সকল রকম ধোয়া ও কোরা কাপড় এবং তসর, গরদ, বাপ্তা, চেলি, নানা দেশীয় ছিট কাপড় এবং শাল, আলোয়ান, পার্শি, বোম্বাই সাড়ি প্রভৃতি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে

ছোট, বড়, কাটা ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসীগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠাইলে ভিঃ পিতে সমস্ত দ্রব্য পাঠান হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

একদর সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী। এককথা।

নানা দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নূতন নূতন ছাঁট কাটের সার্ট, কোট, পেণ্টুলেন চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সায়া সামিজ, সলুকা, ফ্রক্, করনেসন্ জ্যাকেট সলমার কাজ করা জ্যাকেট, টুপি, কোট, পার্শী ও বোম্বাই সাড়ী, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, সার্জ্জের চাদর, কম্ফটার, আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, অর্ডার দিলে আবশ্যক মত সাপ্লাই করা হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়া থাক

ছোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।

১৩।১৪ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী। এককথা।

নানা দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নূতন নূতন ছাঁট কাটের সার্ট, কোট, পেণ্টুলেন চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সায়া সামিজ, সলুকা, ফ্রক্, করনেসন্ জ্যাকেট, সলমার কাজ করা জ্যাকেট, টুপি, কোট, পার্শী ও বোম্বাই সাড়ী, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, সার্জ্জের চাদর, কম্ফাটার, আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, অর্ডার দিলে আবশ্যক মত সাপ্লাই করা হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়া থাকি।

কোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।

১৩।২৪ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীসত্যচরণ দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী।

নানা দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নূতন নূতন ছাঁট কাটের সার্ট, কোট, পেণ্টুলেন চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সামিজ, সায়া, সলুকা' ফ্রক, করনেসন্ জ্যাকেট, সলমার কাজ করা জ্যাকেট' টুপি, কোট, পার্শী সাড়ি এবং বোম্বাই সাড়ি সিল্ক ও গরদ, চাদর, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল সার্জ্জের চাদর আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে অর্ডার দিলে আবশ্যক মত সাপ্লাই করা হয় এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ অর্ডার দিলে সপ্লাই করিয়া থাকি।

ছোট বড় ও পছন্দ না হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।

[illegible] নং হারিসন রোড, মনোহর দাসের ষ্ট্রীট মোড়, বড়বাজার কলিকাতা।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্যান্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২২ সালের আশ্বিন হইতে ইহার চতুর্থ বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউননা কেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা একটু কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—মূল্যাদি ব্রাহ্মণ-সভার কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ১০৩নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

শ্রীপঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ।
৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণসমাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৯নং রামতনু বসুর লেনস্থ জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No. C—675.

৪র্থ বর্ষ। { ১৮৩৮ শক, ১৩২৩ সাল, আষাঢ়। } ১০ম সংখ্যা।

আবেদন।

(১)

এস গো জ্যেষ্ঠ, এস গো শ্রেষ্ঠ, এস ব্রহ্মার মুখজাত।
জ্ঞান অরুণে, রঞ্জিত পদ, অই সমুদিত নব প্রভাত॥

(২)

দীর্ঘ মোহনিশা, কাটিতেছে অই, তমসা টুটিয়া ফুটিছে আলো।
নয়নে নিদ্রা, ভাঙ্গেনি এখনো, জাগরণ-গীতি লাগেনি ভালো॥
শোন শোন তব, সঞ্জীবন গীতি, বিশ্ব প্রকৃতি ধরিছে তান।
হের হের অই, পূর্ব্বাশার ছটা, ভেঙ্গে যাবে ঘুম জাগিবে প্রাণ॥

(৩)

স্বার্থপরতার পঙ্ক শয়নে, মৃষার স্বপনে, কেটেছে দিন।
বিবেক বাণীর, শঙ্খ গর্জ্জন, ক্ষীণ হ'তে হ'তে হয়েছে লীন॥
(আজি) ক্ষেম লগনে পূর্ব্ব গগনে, নবারুণ রেখা যেতেছে দেখা।
ছিন্ন হবে তব, মতিভ্রম সব, অই যে অদৃষ্টে রয়েছে লেখা॥

(৪)

মনে পড়ে কি গো, বহু বরষের, সেই অতীতের, মহিমা রাশি।
শুকের মতন, শিশুর নয়নে, হেরিতে যখন উর্ব্বশী হাসি॥
যে সুর সুন্দরী, চরণের তলে, সুরেন্দ্র গরিমা হইত ক্ষুণ্ণ।
ধিক্কার করি, চির যৌবনে, সে তব সংযমে বলিত ধন্য॥

(৫)

কিবা অভিনব বিদ্যা গৌরব, বৃহস্পতি সুত দেখালে আনি।
দৈত্যের খড়্গ, বারিতে পারেনি, ভুলাতে পারেনি, দেবযানী॥

(৬)

পড়ে কিগো মনে, সে দিনের কথা, যে দিন বঙ্গে এলে প্রথম।
যোগ মহিমা, হেরি বিস্মিত, করে নৃপতি পদ বন্দন॥
রাজার দত্ত, সম্পদ যত, প্রত্যাখ্যাত করি গৌরবে।
গঙ্গাতীরেতে, কুটীর বাঁধিলে, তপঃস্বাধ্যায় মোক্ষ উৎসবে॥

(৭)

(তাই) রঘু-নন্দন, বুনো রামনাথ, নিমাই নিতায়ে পাইলে ঘরে।
ধর্ম্ম সঙ্কটে, শ্রীরামকৃষ্ণে, পেয়েছিলে তাই দেবের বরে॥
অই নিবে গেছে, অগুরুব ধূপ, মঙ্গল দীপ হয়নি জ্বালা।
পূজার সময়, যায় যে ব্রাহ্মণ, এখনো কি রবে, আপন ভোলা॥

শ্রীশৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায়।

সামাজিক-প্রসঙ্গ।

আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

কি আধ্যাত্মিক জীবনে কি আধিভৌতিক জীবনে উভয়ত্রই হিন্দু-জাতির অবনতি পরিস্ফুট। আধ্যাত্মিক জীবনের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্ম নাশ, চরিত্র নাশ এবং সমাজ নাশ হইতে বসিয়াছে। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মের উন্নতি, চরিত্রের উন্নতি, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের [illegible] অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আশা করা যায় না। কারণ কখনও জাতির প্রত্যেক [illegible] উন্নত হইবে এমন দৃষ্টান্ত মিলে না। তবে উন্নতের সংখ্যার আধিক্য হইলেই—সেই স্রোতে পড়িয়া অধমেরা ডুবিয়া ভাসিয়া সমাজ-সমুদ্রের তলদেশে তলাইয়া যায় বা পথে কোথায় আটক পড়িয়া লোক-চক্ষুর অগোচরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু অধুনা আমাদের সমাজে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা উপস্থিত; আধ্যাত্মিক অবনতির আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে, যাঁহারা বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক উন্নতি-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারাও নিজেদের সত্ত্বা বিসর্জ্জন দিয়া অবনতির দিকে চলিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। সমাজের চতুর্দ্দিকেই ইহার দৃষ্টান্ত ছড়ান আছে।

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কথাটা লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা আছে। যাঁহারা জগৎকে ক্রমোন্নতি-শীল বলেন—তাঁহারা জগৎ-পদার্থের মধ্যে আত্মা, মন, দেহ প্রভৃতি সমস্ত ধরিয়া উৎকর্ষের

হিসাবটা করেন। জগতে কত নূতন নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইতেছে, নূতন নূতন মতবাদ গঠিত হইয়াছে, নূতন নূতন দর্শন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে,—এ সমস্তই তাঁহাদের মতে আত্মার ক্রমিক উৎকর্ষের লক্ষণ। আত্মার উন্নতিটা অবশ্যই ইহাদের মতে কতকটা ভাবনা বা ধারণা শক্তির উন্মেষ, কতকটা কার্য্যকরী-শক্তির বিকাশ প্রভৃতিতেই সীমাবদ্ধ। ইহার ফলে হইতেছে এই যে—জগতে কতকগুলা "থিওরী"র সৃষ্টি ও বাহ্য-বিজ্ঞানের আবির্ভাব। এ হিসাবে সমষ্টিগত আত্মার চরমোন্নতি ফল ঐহিক ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি, এবং সেই বৃদ্ধির রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণকল্পে জাতির সর্ব্বশক্তি-নিয়োগ। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়—যেন এক একটী জাতি ধ্বংসকে নিবারণ করিবার জন্য দুর্গের পর দুর্গ সাজাইয়া, অস্ত্রের পর নূতন অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া এবং দর্শন-বিজ্ঞানকেও লোকের সেইরূপ মতবাদ গঠিত করিবার পথে নিয়োগ করিয়া জগতের সমক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত; এবং ইহার বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী যাঁহারা, তাঁহাদের ইহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আত্মনাশ।

"আত্মা অরে দ্রষ্টব্যো মন্তব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চেতি"—বলিয়া উপনিষদে যে আত্ম-স্থিতির কথা বলা হইয়াছে। আত্ম-প্রতিষ্ঠা বলিতে আমরা সেই আত্মার শ্রবণ, মনন, দর্শন, নিদিধ্যাসনকেই স্পষ্টভাবে বুঝিয়া থাকি। এই আত্মাই হিন্দুর সর্ব্বস্ব। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠায় হিন্দুর ঐহিক সমৃদ্ধি নহে—মোক্ষ—মুক্তি সংসার-নিবৃত্তি। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠাকেই লক্ষ্য করিয়া হিন্দুর শাস্ত্র, সমাজ, ধর্ম্ম, ইহকাল, পরকাল সব। এইজন্যই হিন্দু ঐহিক ভোগবিলাসের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া পরকালের ভাবনা আগে ভাবে। অবশ্য হিন্দুর এই আত্মপ্রতিষ্ঠায় বৈরাগ্যবাদ থাকিলেও ইহকালটাকে ত্যাগ করিবার উপদেশ কোথাও নাই। আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যশূন্য ইহকালটাই ত্যাজ্য। হিন্দুর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে আত্মপ্রতিষ্ঠা, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে আত্মরক্ষা, বৈশ্যধর্ম্মে আত্মপোষণ, শূদ্রধর্ম্মে আত্মসেবা বর্ত্তমান। ব্রাহ্মণের সমাজশাসন যে ব্রহ্মণ্যদেবের প্রতিষ্ঠা জন্য তাহা বিধাতার দান, অযথা আধিপত্যের জন্য ত নহে; ক্ষত্রিয়ের রাজ্যপালন প্রভৃতি যে ব্রহ্মণ্যদেবের রক্ষার জন্য, নিজের তৃপ্তি-বিলাসের জন্য ত নহে; বৈশ্যের শিল্প বাণিজ্য যে হিন্দুর আত্মরূপীর অঙ্গ সাজাইবার জন্য—ভোগের জন্য ত নহে; শূদ্রের সেবাবৃত্তি যে ব্রহ্মণ্যদেবের সেবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম—মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে ত নহে। হিন্দুর সকল কর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য এখানে বর্ত্তমান। এইজন্য হিন্দুর কাছে দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, ভোগবিলাস সবই সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য। এই আত্মা দেশে সুপ্রতিষ্ঠ হইলে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ধর্ম্মের উন্নতি—চরিত্রের উন্নতি, সমাজের উন্নতি চরমসীমায় উপনীত হয়। প্রতিষ্ঠা দুই রকমে হয়, বহির্জ্জগতের দিক দিয়া এবং অন্তর্জ্জগতের দিক দিয়া। বহির্জ্জগতের দিক্ দিয়া প্রতিষ্ঠা ত জগতের অনেক জাতিই করিয়া থাকে। আর অন্তর্জ্জগতের দিক্ দিয়া প্রতিষ্ঠা মাত্র হিন্দু জাতির একমাত্র লক্ষ্য। বহির্জ্জগতের দিক্ দিয়া প্রতিষ্ঠায় কেবলমাত্র বাহ্য জগৎটা অনেকটা আয়ত্ত হয়। আর অন্তর্জ্জগতের পথে প্রতিষ্ঠায় অন্তর্জ্জগৎ ত আয়ত্ত হয়ই, পরন্তু বাহ্যজগতের প্রতিষ্ঠাও হইয়া থাকে। যাঁহারা বলেন ঐহিক জগৎটা আগে দেখি

পরে অন্তর্জ্জগৎটা দেখিব—তাঁহাদের অন্তর্জ্জগৎ কোন দিনই লাভ হয় না। কারণ বাহ্য জগতের ছবিটা তাঁহাদের অন্তরের সঙ্গে সঙ্গে এমনি জড়াইয়া যায় যে—তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু অন্তর্জ্জগতের পথে তাহা হয় না। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ছবিটা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইলে বাহ্যজগৎটা তাহাকে আর আকর্ষণের দিকে সহসা লইয়া যাইতে পারে না। পরন্তু তাহারই অনুকূল হইয়া আপনার সত্ত্বা হারাইয়া ফেলে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির নাম দিয়া যে সমস্ত জাতি শুষ্ক মনোবিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞানের—উন্নতির পথে ধাবমান। তাঁহারা যে আত্মার দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই—ইহা সুনিশ্চয়। কারণ আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্থে আমরা যাহা বুঝি—তাহা তাঁহাদের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত নহে। এই সমস্ত দিক্ না দেখিয়া যাঁহারা দেশ ও সমাজসেবায় অগ্রসর, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তাহা আমরা মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি।

দেশাত্ম-বোধ।

"দেশকে আপনার বলিয়া জানা" সাধারণত এই অর্থেই দেশাত্ম-বোধ শব্দটার উদ্ভব। কি হইলে দেশটাকে আপনার বলিয়া জানা হয়, তাহা লইয়া অনেকের মত বিরোধ আছে। "আমার দেশ" বলিতে যে দেশ আমার মাতৃভূমি, যে দেশ আমার জাতির গৌরব নিকেতন, যে দেশের ধর্ম্ম আমার অস্থিমজ্জায় গ্রথিত, যে দেশের সমাজ আমার চরিত্র গঠনের সহায়, সেই দেশকে আমার বলিয়া জ্ঞানকেই এবং তদনুরূপ জীবন অতিবাহিত করাকেই সাধারণতঃ আমরা 'দেশাত্ম-বোধ' আখ্যায় অভিহিত করিতে পারি।

এক শ্রেণীর লোক আছেন—তাঁহারা দেশকে ভালবাসা, দেশের উপকার করা, দেশের জন্য প্রাণপাত করা, দেশের জনমণ্ডলীর সেবা করা প্রভৃতিকেই দেশাত্মবোধের পরিচায়ক স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন।

কিন্তু দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, আচার, অনুষ্ঠান, প্রভৃতির উপাসনাকে ইহারা দেশাত্মবোধের পরিচয় বলিতে কুণ্ঠিত না হউন—অন্ততঃ অনুসরণ করিতে নিতান্ত অস্বীকৃত। এই জন্য স্বদেশী আমলের সময়ও দেখা গিয়াছে,—উইলসন্ হোটেলের ডিনারভোজী বাবুর দল একহাতে মোরগ ও অপর হাতে গীতা লইয়া স্বদেশী হইয়া বসিয়াছেন। স্বদেশী আমলের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্, এখনও আমাদের শিক্ষিত যুবক, প্রৌঢ়দিগের অনেকেরই ধারণা যে—দেশের উপকার কর, দেশের সেবা কর, দেশের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কর, শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা কর, দেশের সাহিত্যের চর্চ্চা কর,—বস্—পুরাদম স্বদেশী হইবে, তোমার কাছে লোকে দেশাত্মবোধ শিখিবে। অথচ সমাজধর্ম্মটা ইহাদের নিকট হইতে বহুদূরে রহিয়া যায়। এইরূপ দেশাত্মবোধের ধারণাটা নিতান্তই বিলাতী। ইহা আমাদের দেশের জিনিষ নয়।

আমাদের মতে দেশাত্মবোধটা আরও ব্যাপক। ঐগুলি ত আছেই, তাহা ছাড়া আমরা আরও অনেকগুলি জিনিষ লইয়া দেশাত্মবোধকে বুঝিয়া থাকি। সেগুলি—সমাজ, ধর্ম্ম, আচার।

আমরা ভাবিয়া পাই না যে, সমাজধর্ম্ম প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দেশাত্মবোধটা কেমন করিয়া থাকিতে পারে। আমাদের মতে যে ব্যক্তি পুরাপুরি স্বদেশী, তাহার জন্য সভাসমিতি করিয়া স্বদেশ-হিতৈষিতার প্রচার করিতে হয় না। কারণ ধর্ম্মের টানে সমাজের টানে সে যে বাধ্য হইয়া স্বদেশী হইবে। স্বদেশী আমলের পূর্ব্বেও খাঁটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত পুরাপুরীই স্বদেশী ছিলেন, এখনও আছেন; এখনও তাঁহাদের ঘরে বিদেশী লবণ, চিনি, বিলাতী বেশভূষা প্রবেশ করে নাই।

দেশে সাধারণতঃ তুইটা কর্ম্মশক্তি আছে, একটা ভাবমূলক, একটা ধর্ম্মমূলক। ভাবমূলক কর্ম্মশক্তির প্রেরণায় যাহারা উত্তেজিত হয়, তাহাদের উত্তেজনা পর্য্যন্তই কর্ম্মশক্তি থাকে। উত্তেজনার অবসানে কর্ম্মকরীশক্তি আর থাকে না। আর এই উত্তেজনাও কথনও দেশে সকল সময়ে জাগাইয়া রাখা যায় না। কারণ এই উত্তেজনার স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ সমষ্টির মনের বলের উপর নির্ভর করে। সমষ্টির মনের বলও সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে অনেক সময় লোপ পাইয়া যায়।

কিন্তু ধর্ম্মমূলক উত্তেজনা অন্য রকম। ইহা দেশের মজ্জার উপর জন্মগ্রহণ করে বলিয়া—সাধারণ সকল প্রাণীর মধ্যেই ইহার সঞ্চার অল্পাধিক বিদ্যমান। বিশেষতঃ দেশের প্রাচীন স্মরণীয় জীবনের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধটা অত্যন্ত বেশী বলিয়া ইহা সহজেই লোকের মন অধিকার করে। বিশেষতঃ ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাও বাধ্য করিয়া লোকের মনে উত্তেজনা জাগাইয়া রাখে। ধর্ম্মের উত্তেজনার আরও একটী প্রধান কারণ—পাপের ভয়। এই পাপের ভয় আছে বলিয়া পুণ্যের দিকে—বিধির দিকে কর্ম্মশক্তি সহজেই প্রধাবিত হয়। এইজন্য দেশাত্মবোধের মূলে যদি ধর্ম্মবন্ধন—সমাজবন্ধন প্রভৃতি থাকে, তবে তাহা জাতির নিকট চিরস্থির হয়। নচেৎ ভাব যতদিন ততদিন স্বদেশিকতা—তার পর শূন্য। ধর্ম্মভিত্তির উপব প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশাত্মবোধ জাগানই হিন্দুব প্রধান কর্ত্তব্য। এই জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলিকে আমরা এই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলি।

সনাতনধর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্মের অর্থ যাহা নিত্য এবং যাহা অনাদি-পরম্পরায় প্রচলিত তাহাকে বুঝায়। সনাতন ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম; সকলের উদ্দেশ্যে প্রচলিত—সকলের জীবন লইয়া গঠিত। ইহাতে প্রাদেশিকতা নাই। এই সনাতন ধর্ম্মের মূল বেদ। বেদের কেহ স্রষ্টা নাই, কাজেই বেদোদিত ধর্ম্মের ও কেহ স্রষ্টা নাই। বেদ ভগবানের নিঃশ্বসিত। কাজেই সনাতন এই ধর্ম্মও নিঃশ্বসিতের মতই জগতের জীবন। এইজন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন;—

"ধাবণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাৎ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মই লোকধারণ করেন। ধারণ করেন বলিয়াই পণ্ডিতেরা তাহার ধর্ম্ম এই নাম দিয়াছেন। যাহাই লোকরক্ষাকর তাহাই ধর্ম্ম। কি বিশ্বব্যাপক উদার লক্ষণ।

ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ এই সনাতন ধর্ম্মেরই স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ঋষিগণ ধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন। পরন্তু ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র অনিত্য হইলেও নিত্যের জ্ঞাপক। যেমন ঈশ্বর নিত্য, কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতি অনিত্য কার্য্যজাতই ভগবানের জ্ঞাপক। পরমাণু নিত্য; কিন্তু স্থূল মৃৎপিণ্ড, জল, বায়ু, তেজঃ অনিত্য হইলেও সেই পরমাণুর স্বরূপ জ্ঞাপক। হিন্দু ধর্ম্মনির্ম্মাণ ধর্ম্ম শাস্ত্র দ্বারা নহে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ ধর্ম্মের আশ্রয়। এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥"

পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যাকরণাদি সহিত চতুর্ব্বেদ ধর্ম্মের আশ্রয়, অর্থাৎ ধর্ম্মের স্বরূপ ইহাতেই বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে ঋষিগণ বেদের নিগূঢ় ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম নির্ণয় করিতেন। ক্রমে এক এক জন ঋষি সেই ধর্ম্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া সেই পূর্ব্ব বর্ণিত ধর্ম্মই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বাপর কালে ধর্ম্মের স্বরূপের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপেরও হানি ঘটে নাই।

প্রলয়, কল্লান্ত প্রভৃতি আমাদের শাস্ত্রের বিষয়। ধর্ম্ম সনাতন হইলে প্রলয় বা কল্লান্তে ধর্ম্মের নাশ অবশ্যম্ভাবী, মনুষ্য নাই ধর্ম্ম কোথা থাকিবে? সনাতন ধর্ম্ম তাহা হইলে নষ্ট হইলে তাহার সনাতনত্ব থাকে কি করিয়া? এ আপত্তি করা যায় না। কারণ যাহা ধর্ম্ম তাহা ঈশ্বরের নিত্য প্রতিষ্ঠিত—ঈশ্বর তাহার প্রচারক। ঈশ্বর সনাতন ধর্ম্ম ও সনাতন। ঈশ্বরে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, প্রলয়েও অবিনাশী ধর্ম্ম দুই দিন মনুষ্যের অননুষ্ঠানে অনিত্য হয় না।

এই সনাতন ধর্ম্মের ক্রোড় হইতে কত জাতি বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, চীন, কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি ত মনুসংহিতার সময়েই বিশ্লিষ্ট হইয়া বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যুগ যুগান্তের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে অবশ্যই বুঝা যায়,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ" বলিয়া ভগবান্—পৃথিবীতে যে জাতি বিভাগ করিয়াছেন, সেই জাতির অধিকাংশ সনাতন ধর্ম্মের ক্রোড় হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া অনিত্য মনুষ্যকল্পিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাই হিন্দু সনাতনধর্ম্মীর সংখ্যা আজ অসংখ্য নহে।

"বঙ্গবাসী"র ধৃষ্টতা।

শূদ্র সম্পাদিত 'বঙ্গবাসী' শাস্ত্র ও স াজতত্ত্ব লইয়া মাঝে মাঝে যে অহঙ্কারজনক ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা প্রকৃত শাস্ত্রদর্শী সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণমাত্রেরই নিকট একান্ত হাস্যকর সন্দেহ নাই। প্রকৃত হিন্দুর কাগজ বলিয়া "বঙ্গবাসী"র একটা অভিমান আছে, তাহার হেতু পূর্ব্বে ইন্দ্রনাথ, এবং কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সম্পাদকের সময় অবশ্যই ছিল। এক্ষণে মূলে কিছুই নাই, অথচ অভিমানের সীমা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই অভিমান লইয়া 'বঙ্গবাস.' কয়েক সপ্তাহ 'ব্রাহ্মণ-সভার' বিরাট অঙ্গে স্চ ফুটাইতে বসিয়াছে। সর্ব্বংসহ ব্রাহ্মণ-সভার এজন্য কোন আক্ষেপ নাই, কারণ "বঙ্গবাসী"র মত ক্ষুদ্র মশকের দংশন এই বিশাল ব্রাহ্মণ-সমাজের অঙ্গে অনেক পড়িয়াছে, এখনও পড়িতেছে; তাহাতে ব্রাহ্মণ-সমাজের কোনই ক্ষতি হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তথাপি অন্যকে ত্যাগ করিয়া "বঙ্গবাসী"র প্রতি আমাদের এই কটাক্ষপাত কেবল শাস্ত্রদর্শী সামাজিকগণের অনেকের তাহার প্রতি একটা ভ্রান্ত শ্রদ্ধা আছে বলিয়া, হিন্দুর কাগজ বলিয়া একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে বলিয়া।

বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ কুলীনগণের পঠী সমীকরণ উপলক্ষে "বঙ্গবাসী" ব্রাহ্মণ-সভার কার্য্যকে "একাকারের প্রথম সোপান" নাম দিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে,—"বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলীনগণের মধ্যে বর্ত্তমান কালে যে চারি পঠী বিদ্যমান আছে—যাহার ফলে প্রত্যেক পঠীর কুলীনগণ বিভিন্ন পঠীর কুলীনগণের সহিত আদানপ্রদান করিতে পারেন না—এক্ষণে সেই পঠী সমূহ উচ্ছেদ করিয়া চারি পঠীর কুলীনগণের মধ্যে "করণ" অর্থাৎ বিবাহ কার্য্যাদি চালাইলে একাকার হইবে। যাহা এতদিন অকরণীয় ছিল কালধর্ম্মে ব্রাহ্মণ-সভা তাহা করণীয় বলিয়া মীমাংসা করিয়া একাকারের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিলেন।"

"বঙ্গবাসী"র প্রধান যুক্তি হইতেছে এই—"যাহা এতদিন অকরণীয় ছিল, তাহা করণীয় বলিয়া মীমাংসিত হইতে পারি না।" শাস্ত্রজ্ঞানহীন তথাকথিত সম্পাদকের এই যুক্তি নিতান্ত হাস্যকর। যাহা এতদিন অকরণীয় ছিল, তাহা কি প্রকার করণীয় হইতে পারে তাহা বুঝান যাইতেছে।

হিন্দু-সমাজ শাস্ত্রের অনুগামী। কালবিশেষে কিরূপে শাস্ত্রসম্মত সদাচার সমাজে সুরক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সমাজ-নেতৃগণ অবস্থা বুঝিয়া করিয়াছেন ও করেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-শ্রেণীর কৌলীন্যপ্রথা এই সদাচার রক্ষারই একটা সাময়িক ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য এ সকল ব্যবস্থা ঋষিকৃত নহে, মনুষ্যকল্পিত। কালক্রমে সেই মনুষ্যকল্পিত ব্যবস্থায় প্রকৃত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে অর্থাৎ শাস্ত্রানুশাসন রক্ষার অনুকূল না হইয়া বিরোধী হইলে তাহার সংশোধনকল্পে সমাজনেতৃগণের চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধারাবাহিক ভাবে সমাজ-নেতৃগণের এই প্রকার কার্য্য-প্রণালী চিরদিনই হইয়া আসিতেছে। সামাজিকগণের সদাচার

রক্ষাকল্পে ব্রাহ্মণ-সমাজে যে মেল বা পঠীবন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহার বিপরীত ফল স্বধর্ম্মানুরক্ত নিষ্ঠাবান সমাজনেতৃব্রাহ্মণগণ প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশের এবং কাশীর প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের নিকট প্রশ্ন করেন যে, পঠী বন্ধনাদির জন্য বাধ্য হইয়া মাতামহসগোত্রাবিবাহ, পিতৃপক্ষের এমন কি ষষ্ঠী এবং পঞ্চমীকন্যা পর্য্যন্ত বিবাহ সমাজে চলিতেছে। এই প্রকার অবিবাহ্যা বিবাহের প্রশ্রয় দিয়া সমগ্র সমাজকে পতিত এবং চণ্ডালাদিরূপে পরিণত করা উচিত? অথবা পঠীবন্ধনাদি ত্যাগ করিয়া যথা-শাস্ত্র বিবাহ পদ্ধতি অক্ষুন্ন রাখা উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই একবাক্যে বলিয়াছিলেন,—মাতামহসগোত্রাদি অবিবাহ্যা বিবাহ যাহাতে রহিত হয়, তাহাই কর্ত্তব্য, শাস্ত্র-মর্য্যাদার অনুরোধে পঠীবন্ধনাদি কাল্পনিক বন্ধন পরিত্যাগ করিলে কোন দোষ নাই। এই সিদ্ধান্ত বিক্রমপুর ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন, কালীঘাটব্রাহ্মণমহাসম্মিলন প্রভৃতি সর্ব্বত্রই আলোচিত ও পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে।

"বঙ্গবাসী" বলিয়াছেন—"আমাদের ধারণা শাস্ত্রনিষ্ঠ প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসী কোন হিন্দুই এমন সমাজভঙ্গসূচক অকল্যাণ কর ব্যাপারে সম্মতি দিতে বা সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন না।"

পারেন কি না পারেন তাহা ত দেখান গেল। "বঙ্গবাসী"র মুদীখানার আড্ডায় শাস্ত্রনিষ্ঠ প্রকৃতধর্ম্ম বিশ্বাসী এক্ষণে কয়জন বর্ত্তমান আছেন—তাহার একটা হিসাব পাইতে পারি কি?

যে সকল বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের নামোল্লেখ করিয়া বঙ্গবাসীর তথাকথিত সম্পাদক এই "করণে"র বিরোধী দলের সংখ্যা দেখাইয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকস্থলে বিলাতী সংস্রবদোষ আছে। এই কারণে সুসঙ্গের মহারাজপ্রমুখ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সমাজনেতৃগণ সে সকল সংস্রব বর্জ্জন করিয়াছেন, এবং করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পঠীবন্ধনে আবদ্ধ থাকিলে এইরূপ সংসর্গ দোষ একপ্রকার ত্যাগ করাও কঠিন হইবে। যে সকল বারেন্দ্র কুলীন সদাচারে পরাঙ্মুখ বিলাতী সংস্রবে দুষ্ট, এবং বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার প্রভৃতির সমাজপ্রবেশের পক্ষে ষোলআনা অনুরাগী তাঁহারাই এই শাস্ত্রানুমোদিত সদাচার রক্ষার প্রকৃত উপায় এই 'করণে'র বিরোধী। "বঙ্গবাসী" দেখিতেছি—ব্যবসার খাতিরে হিন্দুয়ানীর ফেরী করিয়া থাকেন, আবার ব্যবসার খাতিরে হিন্দুয়ানীর বিরোধী আচার সমাজে চালাইবার সহায়তা করিয়া থাকেন।

বহরমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের সভাপতি মহাশয় যুদ্ধসাহায্যার্থ বিদেশগত ব্রাহ্মণ-সন্তান প্রত্যাগত হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যবহার্য্য হইতে পারে এই মর্ম্মের কথা ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে যে "বঙ্গবাসী" এক দলের মন যোগাইবার বাজারে পসার জাঁকাইবার জন্য তারস্বরে বৈশাখ মাসে প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই "বঙ্গবাসী"ই ১৭ই আষাঢ়ের তারিখে একদিকে "একাকারের সোপান" লিখিয়া একদলকে আকর্ষণ করিতেছেন, অন্যদিকে, "তা ছাড়া স্যার গুরুদাস মেসোপটেমিয়া প্রত্যাগত নয়জন বাঙ্গালী যুবককে পুষ্পমাল্যে ভূষিত

করিয়া সম্মানিত করেন। উৎসবক্ষেত্রে কলিকাতার অনেক পদস্থ ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন।” লিখিয়াছেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ধার্ম্মিক হিন্দু এবং অন্যান্য পদস্থ সামাজিকগণ যাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন, তাঁহারা বিদেশ প্রত্যাগত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও যে সমাজের আদরণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, অতএব হে হিন্দুসন্তানগণ! তোমরা স্বচ্ছন্দে বিদেশে গমন কর।

এই ভাবে আর একদলকে নীরবে আকর্ষণ আদর আপ্যায়নের মোহ মদিরায় সুদূরস্থ হিন্দুসন্তানের জ্ঞান শক্তি বিলুপ্ত করিবার প্রয়াস সমাজের যে কত অনিষ্ট-কর তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই বোধগম্য। দুই প্রকারে সমাজধ্বংশ হইয়া থাকে। এক প্রকার সমাজের বিরুদ্ধে শাস্ত্রাচারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট চেষ্টা; এবং আর এক প্রকার সমাজ ধ্বংশকর কার্য্যে সামাজিকগণের ধীরে ধীরে প্রবৃত্তির উন্মেষণ। এই দুইয়ের মধ্যে শেষটাই বিশেষ সাংঘাতিক। পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় যাহারা মুখে অসদাচারের বিরুদ্ধে কথা কহে এবং অভ্যন্তরে অসদাচারের প্রসারের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে হিন্দুসমাজের মিত্র বলিয়া কোন বুদ্ধিমানই বিবেচনা করিতে পারেন না। সে সকল শত্রু সাবধানতার সহিত পরিহরণীয়। আমরা “বঙ্গবাসী”র এই ভাব অনেকদিন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। “বঙ্গবাসী”র সর্ব্বস্ব যোগেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর হইতে যে ভাব ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়াছিল; স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে বহির্ভূত হইয়া তাহার সমধিক বৃদ্ধি হইয়া এখন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

যাহারা প্রকৃতই রাজভক্ত, রাজ সাহায্যের জন্য যাহারা উদ্যত, অথচ স্বধর্ম্ম রক্ষা ও অখাদ্যবর্জ্জনে সম্যক্ তৎপর তাহাদের পক্ষে কি কর্ত্তব্য—সে বিষয়ে ব্যবস্থা দিবার সময় এখনও আসে নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ-সভার সিদ্ধান্ত কি, তাহা এখন আমরা প্রকাশ করিব না। কিন্তু “বঙ্গবাসী”র প্রচ্ছন্ন একাকারী ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিব।

১৩১০ সালের পূর্ব্বে এই বঙ্গবাসীতে কৌলিন্যের অত্যাচার লইয়া কত প্রবন্ধই না প্রকাশিত হইয়াছে, কত গানই না বাহির হইয়াছে; অথচ এক্ষণে সুর উল্টা। “বঙ্গবাসী”র কল্পতরু ৺ইন্দ্রনাথ এই কৌলিন্যের কাহিনী লইয়া “কল্পতরু”তে কত রসিকতাই না করিয়াছেন। সেই সবগুলা কি এখন কাহারও মনে নাই।

যাহার যাহাতে অনধিকার, সে সেই বিষয় লইয়া কথা কহে কেন?

“তপ্তমাসেচয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিব।”

বলিয়া অনধিকারী শূদ্রের দর্পবশতঃ ধর্ম্মোপদেশ করিবার অপরাধে ভগবান্ মনু যে দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাহার কারণ হইতেছে এই যে, শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হইবে বলিয়া, সমাজের অকল্যাণ হইবে বলিয়া। “বঙ্গবাসী”র তথাকথিত সম্পাদককে এই কথাটা স্মরণ রাখিতে বলিতেছি।

যশোহর সাহিত্য-সম্মেলনের দর্শন-শাখার

সভাপতির অভিভাষণ।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের দার্শনিক সাহিত্য যে ভাবে ও যে দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে অভিজ্ঞব্যক্তিমাত্রেই ইহা বুঝিতে পারিবেন যে, এখন আমাদের দেশে দার্শনিক সাহিত্যের উপর দিয়া একটা প্রবল পরিবর্ত্তনের ঝটিকা বহিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন—উত্তাপই ঝটিকার কারণ, আর সঙ্ঘর্ষণই সেই উত্তাপের কারণ। বিশ্ব-মানবের ভাবের আদান-প্রদানের মহাতীর্থ আমাদের এই ভারতবর্ষে এইরূপ ঝটিকা কত উঠিয়াছে এবং সেই ঝটিকার অন্তে ভারতীয় ভাবের প্রাধান্য স্থাপনের প্রভাবে, নবভাবে পরিবর্ত্তিত প্রাচীন ভাবের মহিমা দিগ্‌দিগন্তে কতবার সমুদ্ঘোষিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাচ্যদর্শনের লীলাক্ষেত্র পুণ্যভারতে আজ প্রতীচ্যদর্শনের সিদ্ধান্তসমূহের প্রচার ও বিস্তারে যে সঙ্ঘর্ষণ ঘটিতেছে এবং তাহারই পরিণাম স্বরূপ যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মস্তিষ্কে উত্তাপ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তজ্জনিত এই ঝটিকার পরিণতি ও গতির দিকের লক্ষ্য না রাখিয়া, আমরা যদি আমাদের ভাষায় দর্শনিক সাহিত্যের সৃষ্টি বা সমুন্নতির চেষ্টা করি, তাহা হইলে, আমরা অনেক স্থলেই অকৃতকার্য্য অথবা বিকৃতকার্য্য হইব, একথা বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের প্রত্যেক দার্শনিকেরই সর্ব্বদা স্মৃতিপথে আরূঢ় থাকা একান্ত উচিত।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের পরস্পর ভাব বিনিময়ের সন্ধিস্থলে অদ্য আমরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রতীচীর উত্তেজনাময়ী ও উন্মাদনাময়ী দার্শনিক কল্পনার সহিত ভারতের গাম্ভীর্য্য গরিমোজ্জ্বল শান্তিপ্রবণ দার্শনিক মতের সম্মেলনের দিনে এই সম্মেলনের পরিণতি কিরূপ হইতে পারে, তাহা অগ্রে আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ভারতীয় দর্শনের সহিত প্রতীচ্য দর্শনের লক্ষ্য ও নিদান সম্বন্ধে পার্থক্য এত অধিক যে, তাহা দেখিলে আশঙ্কা হয় যে, এই দুইটী ভাবরাজ্যের মধ্যে পরস্পরের মিলন্ বুঝি সম্ভবপর নহে; এবং এই মিলন যদি কোন দিন সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে হয় ত একের অস্তিত্ব অপরের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। দুইটীর বিশেষত্ব সমান ভাবে বজায় রাখিয়া, কোন এক বিশ্বজনীন বিরাট দর্শনান্তরের সৃষ্টি কোনদিন যে হইতে পারে, এরূপ আশা এখনও সুদূরপরাহত।

কেন যে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা বলি। আমি বলিতে চাহি যে যেখানে দুইটী ভাবরাজ্যের প্রয়োজন এবং উৎপত্তির মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেইখানে ঐ দুইটী ভাবরাজ্যের গতি ও প্রসার বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে মিলন বা সমন্বয় সম্ভবপর, এবং সেই মিলনের ফলে একটি নূতন বিরাটপ্রকৃতি ভাবান্তরের

সাম্রাজ্য বিশ্বমানবের হিতার্থ সংস্থাপিত হইতেও পারে। প্রাচ্য বা ভারতীয় দার্শনিক ভাব-রাজ্যের সহিত প্রতীচ্য বা ইউরোপীয় দার্শনিক ভাব-রাজ্যের লক্ষ্য এবং উৎপত্তি বিষয়ে আত্যন্তিক বৈষম্য থাকা নিবন্ধন এই দুইটি দার্শনিক ভাবরাজ্যের মধ্যে এই জাতীয় মিলন আপাততঃ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

প্রথমে এই উভয় জাতীয় দার্শনিকতার উৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। প্রতীচ্য দর্শনের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রতীচ্য দার্শনিক বলিয়াছেন—

"Philosophy commenced with the first act of reflection on the objects of sense or self consciousness, for the purpose of explaining them. And that first act of reflection, the method of philosophy began, in its application of an analysis, and in its application of a synthesis, to its object. The first philosophers naturally endeavoured to explain the enigma of external nature. The magnificent spectacle of material universe, and the marvellous demonstrations of power and wisdom which it everywhere exhibited, were the objects which called forth the earliest efforts of speculation. Philosophy was thus. at its commencement. physical not psychological ; it was not the problem of the soul, but the problem of the world, which it first attempted to solve.

Hamilton's Lectures on Metaphysics. Page 104.

এই প্রকার উক্তির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রতীচ্য দর্শনের আদিম অবস্থায়—এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বাহ্য জগতের বিস্ময়াবহ স্বরূপ দর্শনে চিন্তাশীল মানবের হৃদয়ে ইহার কারণ, স্থিতি ও গতির স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, তাহাই ইউরোপীয় দর্শনকে সৃষ্টি করিয়াছে, এই দর্শনের প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয় জড় জগৎ, আত্মা ইহার অবান্তর আলোচ্য মাত্র। এই আত্মদর্শন পরে ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইলেও বাহ্যজগতের তত্ত্বনির্দ্ধারণের জন্যই ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র যে মুখ্যভাবে ব্যাপৃত, তাহা এই উক্তির সাহায্যে আমরা বিশদভাবে বুঝিয়া থাকি।

এক্ষণে দেখা যাউক এই পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় মনুষ্যজাতির কোন্ অসাধারণ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে—বিখ্যাত প্রতীচ্য দার্শনিক-প্রবর মহামতি Aristotle (আরিষ্টটল) বলেন—

"The intellect, is perfected, not by knowledge but by activity"

আর এক স্থানে দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে কি ফললাভ হইতে পারে, তাহার নির্ণয়ার্থ প্রবৃত্ত হইয়া তিনিই বলিয়াছেন—

"The arts and sciences are powers, but every power exists only for the sake of action; the end of philosophy, therefore, is not knowledge, but the energy conversant about knowledge."

একুইনস (Aquinus) বলেন

"The intellect commences in operation, and in operation it ends."

Scotus (স্কোটাস) বলিতেছেন—

"That a man's knowledge is measured by the amount of his mental activity."

Malebranche (মেলব্রাঞ্চ) বলেন—If I held truth captive in my hand, I should open my hand, and let it fly, in order that I might again pursue and capture it."

Lessing (লেসিঙ্) বলিয়াছেন—

"Did the Almightly, holding in his right hand truth, and in his left search after truth, deign to tender me the one I might prefer,—in all humility but without hesitation, I should request search after truth."

Von Muller (ভন মুলর) বলিয়াছেন—

Truth is the property of God, the pursuit of truth is what belongs to man.

প্রয়োজন হইলে দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য বিষয়ে প্রতীচ্য দার্শনিক প্রবরগণের এইরূপ বহু উক্তিই এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু, যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা দ্বারাই প্রকৃত-প্রসঙ্গে যথেষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় ঐরূপ উক্তি আর উদ্ধৃত হইল না। এই সকল উক্তিদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, ইউরোপীয় দর্শনের অনুশীলন দ্বারা মানবের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের বিশুদ্ধি ও পরিপুষ্টি হয়, তাহা দ্বারা সত্য কি তাহা বুঝিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয় ও পরিপূর্ণ-ভাবে তাহা বুঝিবার সামর্থ্য উৎপন্ন হয়।

মানবের জীবনের সাফল্য কিসে হয়? তাহা নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহামতি হ্যামিলটন যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইউরোপীয় দার্শনিক আলোচনার চরম লক্ষ্য কি, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

তিনি বলিয়াছেন—

There are for man but two.—perfection and happiness. By perfection is meant the full and harmonious development of all our faculties corporeal and mental, intellectual and moral; by happiness, the complement of all the pleasures of which we are susceptible.

এই পরিপূর্ণতা ও সুখই মানবের চরম লক্ষ্য। যে পরিমাণে দার্শনিক আলোচনা এই পরিপূর্ণতা ও সুখের সম্প্রাপ্তির কারণ হইতে পারে, সেই পরিমাণেই দর্শনশাস্ত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। ইহাই হইল প্রতীচ্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের দর্শনের লক্ষ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত।

এখন একবার আমাদের ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি ও লক্ষ্য বিষয়ে আলোচনা করা যাক্।

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ইউরোপীয় দর্শনের উৎপত্তি, গতি ও প্রসারকে বুঝিবার জন্য প্রতীচীর ইতিহাস আমাদিগকে যেরূপ সাহায্য প্রদান করে ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি গতি ও প্রসার বিষয়ে অর্থাৎ ইহার ক্রমিক কালানুযায়ী বিকাশ সম্বন্ধে ইতিহাস আমাদিগকে সেরূপ সাহায্য প্রদান করিতে সমর্থ নহে। কবে কিভাবে কিরূপ সামাজিক অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া কোন্ প্রদেশে কোন্ মনস্বী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে এই ভারতে দার্শনিক চিন্তার স্রোতঃ উদ্ভাবন করেন, এখনও যথাযথভাবে তাহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমাদের করায়ত্ত হয় নাই। কখনও যে হইবে সে আশাও অদ্যাবধি সুদূরপরাহত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যুত ভারতীয় প্রাচীন মতানুসারে যাঁহারা এখনও পরিচালিত, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র কোন মানবের চিন্তাপ্রসূত নহে; সৃষ্টিপ্রবাহ যেরূপ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ ভারতীয় দর্শনপ্রবাহ ও অনাদিসিদ্ধ, সুতরাং, ইহার প্রথম উৎপত্তি কবে হইল তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব, ইহা মানবের অনুমান বা কল্পনা শক্তির সাহায্যে সৃষ্ট হয় নাই। মানবের সৃষ্টি কবে এই পৃথিবীতে হইয়াছে তাহা যেমন ইতিহাস বলিতে অক্ষম, সেইরূপ এই ভারতীয় দর্শন কবে ভারতের মনস্বী ঋষিগণের অন্তঃকরণে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ইতিহাস বলিতে অপারগ। ভারতীয় আস্তিক সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন কিনা এই স্থানে তাহার বিচার অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে আমরা ভারতীয় দর্শনের স্থিতি, গতি, ও প্রসারের পরিচয় যে সকল গ্রন্থে পাইয়া থাকি, তাহা অতি প্রাচীন, এমন কি ইউরোপীর প্রাচীনতম দার্শনিক থেল ও পাইথোগোরাস জন্মিবার শত শত বৎসর পূর্ব্বেও ঐ সকল গ্রন্থ ভারতীয় বিদ্বৎসম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এ বিষয়ে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ই বিপ্রতিপন্ন নহেন।

সেই সকল গ্রন্থ কি? তাহা ভারতের জ্ঞান গরিমার অত্যুন্নতবিজয়স্তম্ভ উপনিষদ্।

দেখা যাক্ এই উপনিষদে আমাদের দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি, স্থিতি, গতি ও প্রসার বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত সমুদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্ব্বা
তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং।
স ভরদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং।
শৌনকো বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি॥”
ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাই—

“তদ্ হ এতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ প্রজাপতির্ম্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ।”

এই দুইটি ও এই জাতীয় বহু উপনিষদ্‌বাক্য স্পষ্টতই বলিয়া দিতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা বা ভারতীয় দর্শনের সারতম অংশ প্রথমে বিশ্বকর্ত্তা ভুবন পালয়িতা ব্রহ্মার আস্য হইতে সমুদ্‌ভূত হইয়াছে; ইহা বিচিত্ররচনারূপ বাহ্যপ্রপঞ্চের অত্যদ্‌ভুত স্থিতি, গতি ও প্রসার বিলোকন জনিত মানবের বহুশাখময়ী কল্পনা-ব্রততীর কুসুমগুচ্ছ নহে।

প্রতিভাশালী মানব আত্মবুদ্ধির প্রভাবে এই দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে নাই, এই তত্ত্ববিদ্যা গুরুপরম্পরালব্ধ, সেই গুরুপরম্পরার আদি স্বয়ং পরমেশ্বর।

এই তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলনে মানবের জিজ্ঞাসা বৃত্তি বাড়িয়া যায় না, কিন্তু, ইহার প্রসাদে তাহার জিজ্ঞাসাবৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহার নিকটে অন্য কোন বস্তুই অজ্ঞেয় থাকে না বলিয়া তাহার জিজ্ঞাসা দগ্ধেন্ধন দহনের ন্যায় আপনিই প্রশান্ত হইয়া যায়।

তাই এই তত্ত্ববিদ্যার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতে যাইয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং কথং নু ভগবঃ স আদেশঃ” ইতি—
ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

কি সে বিদ্যা, যে বিদ্যার উদয় হইলে অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়?

“আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং।” বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পর আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎ কৃত হইলে সকল বস্তুই বিদিত হয় [অর্থাৎ আর কোন বস্তুই অবিদিত থাকে না।]

এই সর্ব্বাত্মভূত ভূমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে কি হয়?

“যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥”
মুণ্ডকোপনিষৎ।

যেমন গতিশীল নদীসমূহ নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিহার পূর্ব্বক সমুদ্রে মিশিয়া যাইলে তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ বিদ্বান্ও নিজ নিজ নামরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই পরাৎপর দিব্য সর্ব্বাত্মভূত পরম পুরুষে মিশিয়া এক হইয়া যায়, তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না।

পরবর্ত্তী বাক্যে এই উপনিষদ্ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

"স যো হ বৈ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

মুণ্ডকোপনিষৎ।

এই সকল উক্তি দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে ভারতীয় দর্শনের একমাত্র স্থির লক্ষ্য মোক্ষ বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। সেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি কিসে হয়, তাহারই নির্দ্ধারণের জন্য ভারতের বিভিন্নপ্রকার দার্শনিক সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার করিয়াছেন। উপায় নির্দ্দেশ বিষয়ে ঐ সকল বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যে মত ভেদ থাকিলেও ফল বিষয়ে কাহারও মত ভেদ নাই, ইহাই হইল প্রতীচ্য দর্শন হইতে ভারতীয় দর্শনের পরিস্ফুট বৈলক্ষণ্য।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

অদৃষ্টবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জীব স্বয়ং কোন কার্য্য করে না, জীবাত্মধর্ম্ম অদৃষ্টই সকল কার্য্য করিয়া দেয়। কেবল অহঙ্কার প্রাবল্যে আমি স্বয়ং কর্ত্তা এইরূপ অভিমান জীবের হইয়া থাকে মাত্র।

এইস্থানে প্রকৃতি শব্দের অর্থ জীবাত্মা এবং গুণ শব্দের অর্থ অদৃষ্টই বুঝিতে হইবে।

পূজ্যপাদ আচার্য্যশঙ্করও বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় পাদের ১ম অধ্যায়ে নিজ ভাষ্যে শস্য পক্ষে বর্ষুক মেঘমত সৃষ্টিপক্ষে জগদীশ্বরও সাধারণ কারণমাত্র বলিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন মেঘ বর্ষণ দ্বারা অঙ্কুরের উৎপাদন পক্ষে সহায়তা করে, অর্থাৎ ধান্যবীজ হইতে ধান্যোৎপত্তি পক্ষে মেঘ যেরূপ কারণ, মুদ্গ বীজ হইতে মুদ্গোৎপত্তি পক্ষেও সেইরূপ কারণ। সাধারণ কারণ কখনও কার্য্যগত বিশেষত্ব-সাধক হইতে পারে না। নচেৎ ধান্যবীজ হইতে মুদ্গ এবং মুদ্গবীজ হইতে ধান্য উৎপন্ন হইতে পারিত। মেঘরূপ সামান্য-কারণ-সম্মিলিত বীজগত বিশেষ বিশেষ শক্তিরূপ বিশেষ কারণই সেই কার্য্যগত বিশেষত্ব-হেতু। সৃষ্টি বিষয়ে জগদীশ্বরও তেমন সাধারণ কারণ। সৃজ্য বস্তুগত অসাধারণতা অর্থাৎ বিভিন্ন জাতীয়তা সেই অদৃষ্ট সাধিত, ঈশ্বর জন্য নহে।

সংসারের অনাদিত্ব বিষয়ে কোন কথা বলা যদিও আমার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তথাপি একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। প্রথম সৃষ্টি স্বীকার করিলে তখন অদৃষ্টের দুষ্প্রাপ্যতা ও জগদীশ্বরের রাগ-দ্বেষ-রাহিত্য-নিবন্ধন সংসার-বৈচিত্র্য সম্পন্নই হইতে পারে না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে এই অদৃষ্টকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ন দৃষ্ট অদৃষ্ট এই প্রকার যোগার্থ লইয়াই অদৃষ্ট এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যাজ্ঞিকগণ এই অদৃষ্টকেই অপূর্ব্ব বলিয়া থাকেন। পাতঞ্জল-দর্শনে অদৃষ্ট অর্থে বহুস্থানে কর্ম্মাশয় শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদি স্থলে অদৃষ্টার্থ লইয়া মায়া শব্দেরও প্রয়োগ আছে। এবং এই প্রমাণ দ্বারা অদৃষ্ট জগৎ প্রসবিতা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে। এই অদৃষ্টের উৎপাদক কর্ম্ম চারি প্রকার।

১ম অশুক্ল অকৃষ্ণ। ২য় শুক্ল। ৩য় শুক্ল কৃষ্ণ। ৪র্থ কৃষ্ণ।

যাঁহারা পরমেশ্বর-বিষয়ক শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি দ্বারা উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধবৃত্তি ও সংস্কৃতচিত্ত হইয়া জগদীশ্বর বই আর কিছুই জানেন না,—সেই সকল মহাপুরুষ যোগিগণের কর্ম্ম শুক্ল কৃষ্ণ বিলক্ষণ। অন্য তিন প্রকার কর্ম্ম অযোগীর পক্ষে জানিবে। যাঁহারা কেবল শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকেন, তাঁহাদের সেই সকল কর্ম্ম শুক্ল।

যাঁহারা যজ্ঞাঙ্গ বিধিবোধিত কার্য্যে রত থাকেন, তাঁহাদের কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ বিমিশ্র।

যাহারা কেবল দুষ্কর্ম্মে রত থাকে, তাহাদের কর্ম্ম কৃষ্ণ।

শুক্ল কৃষ্ণ বিলক্ষণ এবং শুক্ল কর্ম্ম সকল ভাবী উন্নতির, কৃষ্ণ কর্ম্ম সকল ভবিষ্যৎ অধোগতির এবং মিশ্রকর্ম্ম সকল মিশ্রফলের নিদান। কর্ম্মভেদই পারলৌকিক গতিবৈলক্ষণ্য-সাধক, এই পক্ষে ঋগ্বেদের ৮ম অষ্টকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৩য় সর্গস্থ (উচ্চা দিবি) ইত্যাদি ঋক্—

"উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥"

ইত্যাদি ভগবদ্গীতা—(১৪ অঃ ১৮ শ্লোক)

"(উর্দ্ধং সত্ববিশালেতি)" ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ ভবত্যধর্ম্মেণ।"

ইত্যাদি সাংখ্যকারিকা প্রভৃতি প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

ইহাদের অর্থ—ভাল কর্ম্ম করিলে স্বর্গলাভ হয়। সাত্ত্বিক কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের উত্তম লোকে গমন, রাজসিক কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যম স্থান লাভ, তামসিক অপকর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের নিকৃষ্ট স্থান প্রাপ্তি ঘটে।

মনুষ্য শরীর দ্বারা, মনের দ্বারা এবং বাক্যদ্বারা যাহা কিছু কর্ম্ম করে; সেই সকল কর্ম্মের একটা সূক্ষ্মাবস্থা অন্তঃকরণ-সম্বদ্ধ আত্মায় থাকিয়া যায়। অর্থাৎ বস্তুতঃ অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-কলাপ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইয়া অতি দৃঢ়রূপে আত্মায় অঙ্কিত হইয়া পড়ে। সেই সকল দাগ

কোন মতে মুছা যায় না। ঐ সকল দাগই কালক্রমে প্রবল হইয়া তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতা জীবকে বিভিন্ন অবস্থায় পাতিত করে।

সেই সকল দাগের নামই কর্ম্ম, অদৃষ্ট, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুণ্য, পাপ, দৈব, ভাগ্য, নিয়তি ইত্যাদি। ইহা কোন দার্শনিকের মর্ম্মার্থ।

শুক্লকর্ম্মজনিত অদৃষ্ট হইতে দেবশরীর, শুক্ল কৃষ্ণ কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট হইতে মনুষ্যশরীর, এবং কৃষ্ণ কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট হইতে পশুপক্ষী শরীর উৎপন্ন হয়। যখন যেরূপ শরীর উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ দেবতাই হউক মানুষই হউক, আর পশুপক্ষীই হউক, তখন অর্থাৎ নিজ নিজ আবির্ভাব কাল হইতে ক্রমশঃ তৎ তৎ শরীর লাভ হেতু অদৃষ্ট সেই সেই শরীরের অনুরূপ সংস্কার সকল জাগাইয়া দেয়। তাই মানুষ মানুষের মত, দেবতা দেবতার মত, পশুপক্ষীও পশুপক্ষীর মত সংস্কার লাভ করে।

সর্ব্বজ্ঞকল্প মহাত্মা যোগিগণের অশুক্ল অকৃষ্ণ কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট হইতে চিরবাঞ্ছিত আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ উৎপাদিত হয়। পশুপক্ষীর কর্ম্মদ্বারা কোন অদৃষ্টসঞ্চিত হয় না

প্রাচীন দার্শনিক সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পূজ্যপাদ কপিলমুনিও এই অদৃষ্টবাদের সম্পূর্ণ সমর্থক।। অদৃষ্টবাদ অস্বীকৃত হইলে এই প্রতীয়মান সংসার তত্ত্ব বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। তাই আজ আমরা এই অদৃষ্টবাদের শরণাগত।

এই অদৃষ্টদ্বারা জন্ম, জীবনীশক্তি, এবং সুখদুঃখ ভোগ এই তিনপ্রকার ফল সাধিত হয়। সুতরাং এই অদৃষ্টকে জন্মাদৃষ্ট, জীবনাদৃষ্ট, ও ভোগাদৃষ্ট বলিয়া বিশেষিত করা হইয়া থাকে।

এই অদৃষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত। একটী দৃষ্ট জন্মবেদনীয়, অপরটী অদৃষ্ট জন্মবেদনীয়। যে অদৃষ্ট বর্ত্তমান জীবনে কর্ম্মদ্বারা উৎপাদিত হইয়া বর্ত্তমানজীবনেই ফলপ্রদান করে, তাহাকেই দৃষ্ট জন্মবেদনীয় বলা হয়।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—পুণ্য এবং পাপ উভয়ই কামনা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন। সেই পাপপুণ্যের ফল কচিৎ ইহজন্মে, প্রায়শঃ পরলোকে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ভাষ্যকার বেদব্যাস পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদের ১২ সূত্রে বলিয়াছেন যে,—উৎকটতম ঈশ্বরাধনা প্রভৃতির শুভফল ইহজীবনেই হয়, যেমন শিলাদতনয় নন্দী উৎকট শিবারাধনা ফলে ইহজন্মেই মনুষ্যভাব ত্যাগ করিয়া দেবত্বলাভ করিয়াছেন। এবং উৎকটতমপাপের ফলে ইহ জন্মেই দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন রাজা নহুষ পুণ্যবলে ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণের অপমাননা ফলে অগস্ত্য শাপে দেখিতে দেখিতে ঘোররূপ অজাগর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জন্যই এই কথা প্রচলিত আছে—

"ত্রিভির্ব্বর্ষৈ স্ত্রিভির্মাসৈ স্ত্রিভিঃপক্ষৈ স্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈ রিহৈবফলমশ্নুতে॥"

অর্থাৎ অত্যধিক পাপপুণ্য করিলে তাহার ফল ইহজীবনেই তিন বর্ষ, তিন মাস, তিন পক্ষ অথবা তিন দিনের মধ্যে ঘটিবেই ঘটিবে।

ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্ত্তমান জীবনসাধ্য কর্ম্মদ্বারা অতীত জন্মসঞ্চিত কর্ম্মফল খণ্ডিত হইতে পারে। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও সেই জন্যই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

জন্মান্তর সঞ্চিত কর্ম্মফলের নাম অদৃষ্টজন্মবেদনীয়।

আচ্ছা মানিলাম অদৃষ্টবাদ। কিন্তু অম্বুরাশির বুদ্‌বুদ্‌মত পুনঃ পুনরাবর্ত্তনীয় সংসার-স্রোতমালার একদেশস্বরূপ অসংখ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব মানবজীবনের নিষ্পাদক কোন একটী কর্ম্মফল কোন একটী জীবনের কারণ, না উত্তরোত্তর বহুজীবনের কারণ? কিম্বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহুজন্ম সঞ্চিত অনেক কর্ম্মফল উত্তরোত্তর অনেক জীবন সম্পাদন করিয়া থাকে?

ইহার উত্তর দিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে এক একটী কর্ম্মফল যদি এক একটী জীবন নির্ব্বাহক হয়, তবে সকল লোকেরই বর্ত্তমান জীবনে সৎকর্ম্মে একেবারেই প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া পড়ে। কারণ সংসার অনাদি, সুতরাং কত কোটি কোটি জন্ম পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। তাহারই ফল কত জীবনে শোধ যাইবে, তাহারই ইয়ত্তা নাই, অতএব বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্ম কবে যে ফল দান করিবে, তাহা কে বলিতে পারে। এক কর্ম্মও অনেক জীবনাদি অনেক ফল দিতে পারে না। কারণ পূর্ব্বকথিত মত বর্ত্তমান জীবনে কর্ম্মের নিষ্ফলতা দোষ উপস্থিত হয়। অনেক কর্ম্মও অনেকজন্মাদি অনেক ফলপ্রদ হয় না। অনেক ফলপ্রদ স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে এই অনেক ফল যুগপৎ দিতে পারে না; ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেয়। তাহা হইলেই বর্ত্তমান জন্মে সৎকর্ম্ম করিবার পক্ষে প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। অগ্রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মগুলি অনেক জীবন ধরিয়া ফল প্রদান করুক, তাহার পর এই বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্ম কার্য্যে লাগিবে, সে বহুদিনের কথা।

এই সকল ভাবিয়া মনুষ্যগণ বর্ত্তমান জন্মে সৎকর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং অদৃষ্ট সম্বন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত যে, জন্ম ও মরণের মধ্য অবস্থায় যে সকল কর্ম্ম করা যায় তন্মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম মিলিত হইয়া গৌণ ও প্রধানভাবে অবস্থান করতঃ মরণসম্পাদনানন্তর তৎপর-বর্ত্তী জন্ম, জীবন, এবং সুখদুঃখ ভোগ সাধন করে। কতকগুলি বা প্রধান কর্ম্মের সহায় ভাবে থাকিয়া প্রধানকর্ম্মের ফল ভোগ যে অবস্থাতেই হউক না সেই অবস্থায় সেই গুলিরও ফল হয়। সেই জন্য স্বর্গেও কাহারও দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ম্লেচ্ছজন্মেও কেহ সুখভোগী হয়। কতকগুলি বা জ্ঞানযোগদ্বারা নষ্ট হয়।

এই জন্যই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে কর্ম্ম ফলপ্রদ হয় না।

শ্রুতিরও মন্তব্য—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে।"

অর্থাৎ—তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তির বিলম্ব থাকে, এবং সেই সময় কর্ম্মগুলিরও ফল হয়।

জ্ঞাননাশ্যতা পক্ষে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এবং কতকগুলি ফলোন্মুখীভূত

প্রবল কর্ম্মফলের নিষ্পেষণে অকর্ম্মণ্যবৎ বহুকাল থাকে। যখন ফলোন্মুখীভূত কর্ম্ম না থাকে, তখন সেই সকল কর্ম্ম স্বয়ং ফলপ্রদান করে। এই সকল স্থানে যে সকল কর্ম্মশব্দের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অর্থ অদৃষ্ট।

অদৃষ্ট পরলোকের হেতু ইহা স্বীকার করিলেও ভবিষ্যৎজীবনান্তরসম্পাদক বলিয়া স্বীকৃত হইবে কি প্রকারে?

পরলোক বলিতেও পৃথিবীস্থ জীবনান্তর বোধ হয় না, এইরূপ আকাঙ্ক্ষাকারীদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে স্বর্গে দেবদেহ প্রাপ্তি, নরকে নারকীয় দেহ প্রাপ্তি, এবং মর্ত্ত্যলোকে বর্ত্তমান দেহাদিযুক্ত কোন জীবদেহ প্রাপ্তি এই তিন প্রকার জন্মান্তর পরলোক। এই অদৃষ্টকে জীবগত ধর্ম্ম না বলিয়া ভোগ্যবস্তুগত ধর্ম্ম বলা চলে না। কারণ বস্তু অসংখ্য জীবাপেক্ষা অধিকতম; সুতরাং জীবের ধর্ম্ম না বলিয়া বস্তুর ধর্ম্ম বলিলে অতিরিক্ত গৌরব দোষ ঘটিয়া পড়ে। এই অদৃষ্ট-নাশ-সহকৃত আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির নাম মুক্তি; ইহা গীতার অনুমোদিত। এই পক্ষে প্রমাণ—

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"

অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে সকল অদৃষ্ট নষ্ট নয়। এই সকল জীবের—সকল অদৃষ্ট নাশের নাম মহাপ্রলয়। এই মহাপ্রলয় কোন কোন দার্শনিক স্বীকার করেন না। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গৌতমাবতার রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহাদের অন্যতম।

এই অদৃষ্টের সহিত পুরুষকারের অনাদিকাল হইতে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। এই ঘনিষ্ঠতা কার্য্য কারণ ভাব। বীজাঙ্কুর মত এই অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের মধ্যে কে পূর্ব্ববর্ত্তী আর কে বা পরবর্ত্তী—তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। দৈহিক চেষ্টার নাম পুরুষকার।

আমি অদৃষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিলাম—ইহার তত্ত্ব নির্দ্দেশ মাদৃশ অল্পজ্ঞ ব্যক্তির অসাধ্য।

প্রতি পদে পদে প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন—"গহনা কর্ম্মণোগতিঃ।"

শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ।

ব্রাহ্মণ-সমাজ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তাহার পর বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। খ্রীষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে এই ধর্ম্ম বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। জৈনধর্ম্মের মতে মানবগণ নিত্যসিদ্ধ, মুক্তাত্মা ও বদ্ধাত্মা। ইহাদের পঞ্চ প্রতিজ্ঞা বা কর্ত্তব্য—(১) চুরি করিও না; (২) মিথ্যা বলিও না; (৩) বধ করিও না বা কাহাকেও ক্লেশ দিও না; (৪) চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে ন্যায়পরায়ণ হইবে; (৫) অনুপযুক্ত আশা করিও না। ব্যস্ ইহাতেই মুক্তি।

সেই সময়ে ব্রাহ্মণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তখন অনেক ব্রাহ্মণ শাস্ত্রব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যে রাজ্যের রাজা যে ধর্ম্মের বিরোধী, সে ধর্ম্ম কতদিন টিকিতে পারে? কিন্তু তখনও সেই প্রবল রাজশক্তির পীড়ন সহ্য করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ নীরবে শাস্ত্র ও সদাচার প্রাণপণে রক্ষা করিয়াছিলেন, তারই ফলে হিন্দুধর্ম্ম প্রতিমাবিসর্জ্জনের পর পূর্ণঘটরূপে চণ্ডীমণ্ডপে এখনও বিরাজিত। ইহাতে বুঝা যায়, হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ কঠিন ভিত্তির উপর স্থাপিত।

চণ্ডীমণ্ডপে আর প্রতিমাপূজা হয় না, সে সঙ্গতিই যে আমাদের নাই; কিন্তু আছে পূর্ব্বস্মৃতি, আর আছে আমদের চোখের জল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব চূর্ণ হয় শঙ্করাচার্য্যের সময়। "আত্মার কল্পনা অবিদ্যা" সেই মতবাদের বিরুদ্ধে "সোহং"-বাদ প্রচার করিয়া শঙ্করাচার্য্য মৃতপ্রায় সমাজদেহে প্রাণসঞ্চার করেন। তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণ বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রায় একশত বৎসর পর রামানুজস্বামী একটি নূতন সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। একমাত্র বিষ্ণু এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। রামানুজের হাতে শুষ্কতরু আবার মুঞ্জরিত হয়।

একেশ্বরবাদী মহম্মদের ধর্ম্মও হিন্দুদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। ইহা অবশ্য পরের কথা। ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের সাক্ষাৎ ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই ভারতবর্ষে হিন্দুর উপর মুসলমানের অত্যাচার আরম্ভ। তৎপূর্ব্বেই ব্রাহ্মণগণ দিশেহারা হইয়াছিলেন, অনেকেই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন মহম্মদের ভক্তগণ মহম্মদের বাক্য—"বিধর্ম্মীর সহিত যুদ্ধ করিয়া মরিলে পরকালে অনন্ত সুখভোগের অধিকারী হওয়া যায়" —প্রতিধ্বনিত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করিলেন। সেই উদ্যত তরবারির সম্মুখে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত সমাজ শক্তি হারাইল। রহিল মাত্র একটা মূর্চ্ছিত সমাজ দেহ।

তাহার পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অত্যাচার হ্রাস হয়। হ্রাস না হইলে আর উপায় ছিল না। দেশের মধ্যে বিদ্রোহ, অরাজকতা ক্রমশঃই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মুসলমানগণ তখন বুঝিলেন,—গায়ের বলে প্রজার হৃদয় অধিকার করা যায় না।

এই সময়ে একে একে কয়েকজন শক্তিশালী পুরুষ আবির্ভূত হন। তাঁহারা বিভিন্ন-মতে বিবিধ সম্প্রদায় গঠিত করিয়া ইসলামধর্ম্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করেন। ঐ সকল ব্যক্তি মধ্যে যাঁহাদের নাম পাওয়া যায়,—তাঁহাদের কেহই হিন্দুর ত্রেত্রিশ কোটি দেবতার আরাধনা করিতে বলেন নাই। একসম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণের মধ্যে জাতিবিচারও ছিল না। কি ভাবে চলিলে সাপও না মরে, লাঠীও না ভাঙ্গে—এই মাঝামাঝি পথে চলিয়া তাঁহারা বিভিন্ন মত গঠন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। দেশের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই সে সময়ে একেশ্বরবাদ মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছিল, জাতিভেদপ্রথা অনাবশ্যক বুঝিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় মনু-পরাশর-হারিতের শাসনবাক্যের কি মূল্য থাকিতে পারে? বিভিন্নমত স্থাপন করিয়া অনেকেই সেই জন্য প্রচার করিলেন,—"বেশ ত তোমরা এক দেবতারই ভজনা কর। হরির ভজনা কর, না হয় বিষ্ণুর ভজনা কর, না হয় রামচন্দ্রের ভজনা কর, না হয় মহাদেবের ভজনা কর, যে কোন এক দেবতার ভজনা কর, কিন্তু সে দেবতা হিন্দুর হওয়া চাই।" স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়াই এক ঈশ্বর ভজনার অধিকার পাইয়া লোক আর আল্লা ভজিতে চাহিল না। ছোট বড় হইবার জন্য চিরকালই হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া আসিতেছে,—একটু সুযোগ পাইলে হয়! চর্ম্মকার ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিতে পায় না, সে জন্য সে চিরকালই অসন্তুষ্ট। এই শ্রেণীর লোক চিরকালই ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, যাহাতে জাতিভেদ প্রথাটা সমাজ হইতে উঠিয়া যায়। সুতরাং বৌদ্ধরা ও মুসলমানরা যখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঈশ্বরের কাছে সকলেই সমান, ঈশ্বরের কাছে ছোট বড় নাই, ঈশ্বরের কাছে জাতিবিচার নাই।" সে বড় বিষম যুগ। সে যুগে ঐ সকল মহাত্মা-দিগকেও ক্ষেত্র বুঝিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হইল। তাঁহারাও ঘোষণা করিলেন,—"জাতিভেদ আমাদের মধ্যেও নাই। যে প্রেমিক, যে ভক্ত, বাস্তবিকই যে ভেদজ্ঞান হীন, তাহার আবার জাতিবিচার কি?"

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামানুজের শিষ্য রামানন্দ এক সম্প্রদায় স্থাপন করেন। রামানন্দী সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্র। রামানন্দের মতে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বাহাড়ম্বর নিষ্ফল, কেবল ভক্তি ও প্রেমই মুক্তির কারণ।

এই সময়ে পঞ্জাবে কাণ কাটা যোগী গোরখনাথ এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। মহাদেবই এই সম্প্রদায়ের একমাত্র উপাস্য দেবতা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হন। তিনি প্রচার করেন,—"মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি হরি ভজে, শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।" *

---

* চৈতন্যদেব প্রভৃতি হিন্দুসংস্কারগণ কেহই জাতিভেদের বিরুদ্ধে বা শাস্ত্রকারের বিরুদ্ধে কোন ঘোষণা করিয়াছেন এরূপ কোন প্রমাণ নাই। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে, শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।" ইহা জাতিভেদের বিরোধী কথা নহে। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, তিনি জাতিভেদ মানিতেন। পরবর্ত্তী সম্প্রদায়ের নেতাদের দোষে সকল সম্প্রদায়েই মলিনতা প্রবেশ করিয়াছে। ব্রাঃ সং।

এই সময়ে "দোঁহা" রচয়িতা কবির প্রচার করেন,—"বেদ, কোরাণ, পুরাণ—কিছুরই মধ্যে ঈশ্বর নাই, ভক্তিতেই মুক্তি।"

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লভাচার্য্য গুজরাট প্রদেশে ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার মত—"সংসারী হইয়াও মানুষ যে কেবল ধর্ম্মসাধন করিবে, তাহা নহে, কিন্তু আচার্য্য হইয়া অপরকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবে।" সংসারত্যাগী না হইলে লোক ধর্ম্মসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, এই শিক্ষার বিরুদ্ধে বল্লভাচার্য্য বিষম প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

তাহার পর গুরু নানক আবির্ভূত হন। "হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাই"—তিনি এই মত প্রচার করেন। পরিবার ও গৃহত্যাগ দ্বারা ধর্ম্মকে সংসার হইতে স্বতন্ত্র করা তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য ছিল।

এই স্থলে সম্রাট আকবরের নাম উল্লেখযোগ্য বোধ করি। ষোড়শ শতাব্দীতে তিনি হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্মের সহিত মুসলমানধর্ম্মের সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মুসলমানের পর ইংরেজের রাজ্য। ইংরেজের অধীনে আমরা শান্তিতে আছি। ইংরেজ প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না বরং স্বধর্ম্মরক্ষায় অনেক রাজপ্রতিনিধির কাছে আমরা উৎসাহ পাইতেছি। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, এক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে সমর্থন করে না। কৃষ্ণের ধর্ম্ম খৃষ্টের ধর্ম্মেকে সমর্থন করে না, খ্রীষ্টের ধর্ম্মও কৃষ্ণের ধর্ম্মকে সমর্থন করে না। বরং একধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে, শ্লেষ প্রয়োগ করিতে পশ্চাৎপদ নহে। দশটি অনুশাসনের সারবত্তার দোহাই দিয়া অনেক খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মযাজক একদিকে যেমন হিন্দুগণকে অন্ধকার হইতে আলোকে অনিতে ব্যস্ত; হিন্দুরাও অন্যদিকে সুযোগ পাইলেই সংহিতার লম্বা লম্বা বচন আওড়াইয়া পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, পাশ্চাত্য সমাজ, পাশ্চাত্য প্রথা, পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের সম্বন্ধে দুই কথা শুনাইতে পারিলেই শ্রম সফল বোধ করেন। ধর্ম্মে ধর্ম্মে, জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে কবির লড়াই চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে পরধর্ম্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। কারণ যাহা সনাতন ধর্ম্ম, তাহার কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিতে পারে না। ভারতে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রচারকগণ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে অনেক পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের গতি বাধা পাইয়াছে—অনেকটা রাজা রামমোহন রায়ের হাতে। এ যুগে অনেক হিন্দু ব্রাহ্মদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা, কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, স্বীকার করিতেই হইবে,—রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মমতের প্রতিষ্ঠা দ্বারা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান না করিলে, হিন্দুগণ সমাজ সংস্কারের জন্য এত শীঘ্র মাথা তুলিতেই পারিতেন না। হিন্দুর ভারতে বৌদ্ধযুগে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ; মহম্মদীয় যুগে রামানন্দ গোরখনাথ, চৈতন্যদেব, কবীর, বল্লভাচার্য্য, নানক, এবং খ্রীষ্টিয়ান যুগে রামমোহন রায়। ইহারা সকলে হিন্দুমতের সংস্কারক না হইলেও একই উদ্দেশ্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু-

ধর্ম্মকে ধ্বংশের পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। * ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণাবাণী প্রচারের দ্বারা হিন্দুগণকে স্বধর্ম্মরক্ষায় যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন,—সে সকল কথা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখা প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য।

হিন্দুর শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃতশিক্ষার সমধিক প্রচলন আবশ্যক। দেশের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার আদর বহুকাল পরে আবার দেখা যাইতেছে। রাজ সরকার হইতে সংস্কৃতপরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সংস্কৃত-পরীক্ষোত্তীর্ণ বহুছাত্রই এখন উৎসাহ পাইতেছেন। তথাপি রাজসরকার হইতে আমরা আরও উৎসাহ চাই। ব্রাহ্মণ দেশের মধ্যে স্বায়ত্বশাসন বা কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার চাহে না। কৃষিকর্ম্ম বা ব্যবসা বাণিজ্যে দেহপাত করিতেও চাহে না। ব্রাহ্মণ চাহে মাত্র স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে, অধঃপতিত সমাজের উন্নতি করিতে, সদাচার ও সৎশিক্ষাদ্বারা বর্ত্তমান যুগকে অতীতে লইয়া যাইতে। রাজা ও রাজপ্রতিনিধি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের রক্ষক এবং কার্য্যের সহায়ক থাকুন, ইহাই ব্রাহ্মণের কামনা। আজকাল দেশের মধ্যে একটা বড় দল দেশের কথা লইয়াই ব্যস্ত। দেশের উন্নতি চাহ, ভাল কথা, কিন্তু গোড়ার গলদ দূর না করিলে দেশের উন্নতি হইবে কিসে? সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা জাতিকে রক্ষা না করিলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। উন্নতির জন্য একটা নূতন কিছু গড়িবার আবশ্যকতা নাই, পুরাতন যাহা তাহারই সংস্কার আবশ্যক।

সমাজ-সংস্কার যখন আবশ্যক, সমাজের ত্রুটিগুলির উল্লেখও তখন আবশ্যক। ত্রুটি সংশোধিত না হইলে সংস্কার দুরাশা।

(১) গুরুগিরি এখন একটা ব্যবসার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। অনেক ব্রাহ্মণের পেশা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়—"গুরুগিরি।" অর্থাৎ তাঁহারা বুঝাইতে চাহেন,—তাঁহারা যেন সাধারণ ব্রাহ্মণের মাথার মণি! এ যুগে সৎগুরুর বড়ই অভাব। একটা লোককে সৎগুরু হইতে সুযোগ দিতে হইলে অর্থসাহায্যের দ্বারা তাঁহাকে চমৎকারী অন্নচিন্তার দূরে রাখা উচিত। এই ভাবে বার্ষিক প্রণামীর ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই বার্ষিকী আদায়ের জন্য অনেক গুরু অসমর্থ শিষ্যকে উৎপীড়ন করিতেও ছাড়েন না। রাজার আইন—"বার্ষিকী" আদায়ের অনুকূলে থাকিলে,—"পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও বার্ষিক প্রণামীর টাকা না দেওয়ায় মায় ক্ষতিপূরণ এত টাকার দাবীতে এই নালিশ"—এই মর্ম্মের আর্জী আমরা

* হিন্দুর চক্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম, মহম্মদীয়ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভৃতি সব সমান। কারণ—যাহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী, তাঁহারা যাহাই হউন না কেন, তাঁহারা যে হিন্দু নহেন ইহা সুনিশ্চয়। এই জন্য ইংরাজের আমলে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের দ্বারা, হিন্দুর যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দ্বারা তদপেক্ষা ক্ষতি কম হয় নাই। এজন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কাছে হিন্দুর কৃতজ্ঞতার কিছুই নাই। ব্রাঃসং

প্রতিবৎসর হাজার হাজার দেখিতে পাইতাম। কথাটা শুনিয়া অনেক ব্রাহ্মণই হয়ত বিরক্ত হইবেন।

কিন্তু প্রলেপ দিয়া ঘা যে আর সারে না, ইহার উপর গুরুগিরি-ব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণের চরিত্র এতই কলুষিত যে, তাহা প্রকাশ করা যায় না। গুরুর পুত্র অনুপযুক্ত হইলে সে গুরুবংশ ত্যাগ করা চলিবে না, এমন বিধান হিন্দুশাস্ত্রে আছে কি? কায়েমী বন্দোবস্ত ছাড়িয়া সৎগুরুর সন্ধান কর। নতুবা যিনি নিজে অসংযমী, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে কিরূপে সংযমী হইতে পারিব? সমাজে যাহাতে সৎগুরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। *

(২) সহরে পল্লীগ্রামে বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান কর, দেখিবে, শত শত ব্রাহ্মণ-ত্রিসন্ধ্যা ত দূরের কথা—সারাদিনের মধ্যে দশবার গায়ত্রী জপিবারও অবসর পান না। কেহ সকালে উঠিয়া মুখ না ধুইয়াই চা ও বিলাতী বিস্কুটের শ্রাদ্ধ করিতেছেন, কেহ ষ্টোভে হংসডিম্ব সিদ্ধ করিতে দিয়া সম্মুখে মদের বোতল রাখিয়া ভাঙ্গা গলায় তানা নানা সাধিতেছেন, কেহ বা পরম যোগীর ন্যায় উর্দ্ধে চাহিয়া অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ খুঁজিতেছেন। অন্য সমাজের কথা বলিব না, ব্রাহ্মণ-সমাজে চার্ব্বাকমুনির শিষ্যের সংখ্যা এখন শতকরা অনেক।

বিলেতফেরতাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিলে সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় যাঁহাদের উদরান্ন জীর্ণ হয় না, বড়ই দুঃখের বিষয়, সমাজের এই গুপ্ত অথচ প্রকাশ্য চিত্রসমূহ কি তাঁহাদের চর্ম্মচক্ষুর গোচরে আসে না? সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়াইব না, ভাল কথা, কিন্তু যে উচ্ছৃঙ্খলতা আছে, তাহা দূর না করিলে সমাজসংস্কার যে একেবারেই অসম্ভব।

* গুরুগিরির প্রতি এই কটাক্ষপাত আমাদের সম্মত নহে। আমরা কোন ক্রমেই বর্ত্তমানকালের তথা কথিত গুরুতা-ব্যবসায়ীদিগের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ নহি। সমাজ যেমন মাল চায়, সেইরূপ মালই দেশে আমদানী হইয়া থাকে। প্রকৃত গুরু প্রস্তুতের ভার সমাজ যে দিন ছাড়িয়াছে, সেই দিন হইতে গুরুদিগেরও অধঃপতন ঘটিয়াছে। ইহাতে গুরুর দোষ নাই, দোষ সমাজের। লেখকও একথা একপ্রকার স্বীকার করিয়াছেন। ত্যাজ্য গুরু ও সদ্‌গুরুর কথা শাস্ত্রে আছে। শিক্ষা গুরু ও দীক্ষা গুরুর ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। আবার অধিকার ও অনধিকারের কথাও শাস্ত্রে আছে। সেই সবগুলাও একবার দেখা উচিত।

বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের তথা কথিত গুরুদিগের মধ্যেও হিন্দুয়ানীর যে বিশেষত্ব আছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বস্তু। তাঁহারা ধর্ম্মের আড়ম্বর করিয়া যেভাবে আছেন তাহাও শিষ্যদিগের লক্ষ্য করা উচিত। অবশ্য কলুষিত চরিত্র গুরুর কথা স্বতন্ত্র। গুরুর নিকট যাঁহারা কেবল ত্যাগের আশা করেন, তাঁহারা সেই ত্যাগের বিনিময়ে বায়ু ভক্ষণের উপদেশ দিতে করে নিবৃত্ত হইবেন? আমরা গালাগালির পক্ষপাতী নহি, কাজের পক্ষপাতী। ব্রাঃ সং।

(৩) আতিথ্য এ যুগে দিল্লিকা লাড্ডু! অতিথি সর্ব্ব দেবময়, ছেলেবেলায় পুস্তকে পড়িয়াছি; এখন দেখিতে পাই, সেকালের সর্ব্বদেবময় অতিথি একালে পথের খেঁকি কুকুরের ন্যায় অনধিকারপ্রবেশের জন্য গৃহস্থ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। মিষ্টবাক্য, বসিবার জন্য কুশাসন এবং পানের জন্য শীতল জল—ইহা দিয়াও অতিথিকে তৃপ্ত করিবে, ইহাই যে আমাদের আদর্শ, সেই সমাজে এ যুগের শিক্ষিত বাবুরা ক্ষুধার্ত্ত অতিথি দেখিলেই রাগে জ্বলিয়া উঠেন। "কুচ মিলেগা নেহি"—রূপ মিষ্টবাক্য শুনিয়াই কুশাসন পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া অতিথিকে ফিরিতে হয়। শীতল জল আর আবশ্যক হয় না। কোন কোন বাবুর বাড়ীতে শীতল জলের পরিবর্ত্তে নিয়মিত ভাবে ঠাণ্ডা বরফের আমদানি হইতে দেখা যায়। কিন্তু ঠাণ্ডা বরফও বাবুর মেজাজ ঠাণ্ডা করিতে পারে না, কারণ তৎপূর্ব্বেই কোন্ দেশীয় কোন্ জাতীয়—কে জানে স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য—ভৃত্যের উপর গরম চা তৈয়ারীর আদেশ হইয়া থাকে!

আমাদের সমাজের ত্রুটির কথা আর কত বলিব?

ইতঃপূর্ব্বে ব্রাহ্মণসম্মিলনীর আরও তিনটি অধিবেশন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সভার পরিচালক-বর্গের চেষ্টায় এই তিন বৎসর পল্লীতে পল্লীতে বহুশাখা সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু শাখাসমিতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি?

সমাজসংস্কার করিতে হইলে, পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলিতেছি···গোড়ার গলদ দূর করিতে হইবে, উপসর্গের চিকিৎসায় কোনই ফল ফলিবে না, মূলব্যাধির সুচিকিৎসা চাই। নতুবা যুগধর্ম্মের দোহাই দিয়া কালের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই ভাল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি ব্রাহ্মণ-সমাজের অবনতির কারণ ও বর্ত্তমান অবস্থা যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। এখন কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের গোড়ার গলদ দূর হইয়া সমাজ শক্তির দুর্ব্বলতা নষ্ট হইবে, ব্রাহ্মণসম্মিলনী তাহা স্থির করুন।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতিথি-সেবা।

অতিথিসেবা, সুসভ্য ভারতের একটি অত্যুৎকৃষ্ট অনুষ্ঠান। অজ্ঞতা ও পাশ্চাত্য ভাবের অনুচিকীর্ষা নিবন্ধন অনেকেই এই সদনুষ্ঠানে ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন। এজন্য ইহার উপকারিতা সমূহ মধ্যে (১) পঞ্চসূনাকৃত পাপ মুক্তির উপায়, (২) পুণ্যহানি নিবারণ, (৩) ঋণ শোধ, (৪) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, (৫) সাধুসঙ্গ, (৬) ভগবন্নাম শ্রবণ, (৭) সামাজিক প্রয়োজনীয়তা, (৮) জাতীয়তা রক্ষা, (৯) ভগবদুদ্দেশ্যে দান, (১০) অর্থ সঞ্চয়ের উপায়,

এই দশ প্রকার উপকারিতা এবং প্রতিকূল সমালোচনা মধ্যে (১) অপাত্রে দান, (২) আলস্যের প্রশ্রয়, (৩) দুরবস্থা, (৪) অতিথির সময় অসময় জ্ঞান না থাকা, (৫) সংখ্যা বৃদ্ধি, এই পাঁচ প্রকার প্রতিকূল সমালোচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।

(১) পঞ্চসূনাকৃত পাপ-মুক্তির উপায়। গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইলে, কণ্ডনী, (ঢেঁকি) পেষণী, (জাঁতা) চুল্লী, (উনন, আখা) উদকুম্ভী (জলের কলসী) এবং মার্জ্জনী, (খ্যাংরা ঝাঁট, ঝাড়ু) এই পাঁচটি দ্রব্যের একান্ত আবশ্যক! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে, এই পাঁচটি দ্রব্য না থাকিলে, গৃহস্থাশ্রমে থাকা যায় না। এই পঞ্চদ্রব্য দ্বারা গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে, প্রতিদিন পিপীলিকা, কীট, মক্ষিকা প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্রপ্রাণী নিহত হয়, এজন্য ইহাদিগকে পঞ্চবধ্য স্থান বা "পঞ্চসূনা" বলে এবং এইরূপে জীব নিধন জন্য যে পাপের সঞ্চার হয় তাহাকে "পঞ্চসূনা"কৃত পাপ বলে। "পঞ্চসূনা"কৃত পাপ দূর করিতে হইলে, দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ, এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। অতিথিসেবা—শেষোক্ত এই নৃযজ্ঞ বা মনুষ্য-যজ্ঞেরই অন্তর্গত। ইহাদ্বারা গৃহস্থ, পঞ্চসূনাকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এজন্য সকল গৃহস্থেরই অতিথিসেবা করা কর্ত্তব্য।

(২) পুণ্যহানি নিবারণ।—সকাম ভক্তদিগের অনুষ্ঠান পুণ্যার্জ্জন; এবং আকাঙ্ক্ষা স্বর্গলাভ। যদিও পুণ্যক্ষীণ হইলে, সকাম ভক্তদিগকে পুনরায় জন্ম-মরণের অধীন হইতে ও বারম্বার যাতায়াত করিতে হয়, ইত্যাদিরূপ সকাম ভক্তের হেয়ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি এই সংসারে, নিষ্কাম ভক্ত অপেক্ষা সকাম ভক্তের সংখ্যাই অধিক। যে সমস্ত কদাচার অনুষ্ঠিত হইলে, সঞ্চিত পুণ্য শূন্য হইয়া, পাপ-সংক্রামিত হয়, তন্মধ্যে অতিথি-সেবা পরাঙ্মুখতা অন্যতম। শাস্ত্রে আছে—

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥"

অর্থাৎ অতিথি যদি বিফল মনোরথ হইয়া, কাহারও গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তবে তিনি গৃহস্বামীকে নিজের পাপ প্রদান করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে গৃহস্বামীর পুণ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অতিথিরূপে যখন শমীক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন, তখন দেখিলেন যে, ঋষিপ্রবর যোগের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া ভগবানের পীযূষধারা পান করিতেছেন, তিনি আর মরজগতে নাই। মহারাজ পরীক্ষিৎ বুঝিলেন যে, ঋষি ধ্যানমগ্ন না থাকিলে, নিশ্চয়ই অতিথি-সৎকার করিতেন। সৎকৃত না হইয়া, ঋষির আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ঋষির কষ্টার্জ্জিত পুণ্যরাশি গ্রহণ করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে নিজের পাপরাশি দিয়া আসিতে হয়। কিন্তু এরূপ নীচ জনোচিত আচার অবলম্বন করা, মহারাজার পক্ষে অসম্ভব। কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে, ঋষির পুণ্যরাশি নষ্ট না হয়, ন্যায়পরায়ণ রাজা তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন যে, এ অবস্থায়

পাপসঞ্চয় করিতে না পারিলে, আর কিছুতেই ঋষির পুণ্য রক্ষা করা যায় না। তখন মহারাজ বাধ্য হইয়া, ঋষির গলদেশে মৃতসর্প প্রদান করিয়া, পাপসঞ্চয় করেন এবং তাঁহার সেই পাপের প্রতিফল-স্বরূপ, ঋষিপুত্র শৃঙ্গী, মহারাজকে এই অভিশাপ দেন যে, সপ্তাহ মধ্যে তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিবে। এস্থলে গৃহস্থ শমীক-ঋষির পুণ্যরাশি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, অতিথি মহারাজ পরীক্ষিৎ, স্বয়ং পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেও সঙ্কুচিত হন নাই। পক্ষান্তরে গৃহস্থ মহারাজ অম্বরীষ বৎসরাবধি স্বয়ং অনশনে থাকিয়াও, অতিথি দুর্ব্বাসার সৎকার করিয়া, সুদর্শনচক্রের আক্রমণ, তপা পাপ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন। মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় অতিথি এবং অম্বরীষ মহারাজার ন্যায় গৃহস্থ, হিন্দুজাতির এবং আর্য্যজাতির আদর্শ। এজন্য অতিথি-সেবায় যাহাতে ব্যভিচার না হয়, তৎপ্রতি অতিথি ও গৃহস্থ উভয়েরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

(৩) ঋণশোধ।—অতিথিসেবা দ্বারা আমরা মনুষ্য-ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকি। এই ভবসংসারে, সর্ব্বত্রই চুক্তিমূলক সম্বন্ধ, বিনিময় সংযুক্ত সম্বন্ধ, দেওয়া ও লওয়া সম্বন্ধ (give and take) দৃষ্ট হয়। আমি অন্যকে যাহা দিয়া থাকি, তৎপরিবর্ত্তে অন্যের নিকট কিছু কিছু গ্রহণ করি। কিন্তু এই "দেওয়া ও লওয়া" সম্বন্ধ ব্যতীত, কেবল 'দেওয়া' ও কেবল 'লওয়া' সম্বন্ধের উদাহরণ এই সংসারে বিরল নহে। কেবল 'দেওয়া' সম্বন্ধের উদাহরণ স্বরূপে বৃক্ষ, পুষ্করিণী, বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। এই সমস্ত ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্য করিলে, তাহার বিনিময়ে পরলোকে স্বর্গলাভাদি ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহকালে, নিজের আত্মপ্রসাদ ভিন্ন, প্রতিষ্ঠাতার অন্য কোনও লাভ হয় না। কেবল "লওয়া" সম্বন্ধের উদাহরণ-স্বরূপ,—অন্যের পুষ্করিণীতে স্নান, জলগ্রহণ, অন্যের রোপিত বৃক্ষমূলে বসিয়া ছায়া উপভোগ ও শ্রান্তি দূরীকরণ, অন্যের নির্ম্মিত রাস্তায় গমনাগমন ও অন্যের ধর্ম্মশালা বা হাঁসপাতালে অবস্থান ইত্যাদি উল্লেখ-যোগ্য। এই লওয়া সম্বন্ধের অনুষ্ঠাতৃগণ, সদনুষ্ঠান সমূহের প্রতিষ্ঠাতা যে কে অনেক স্থলে হয় ত তাহা জানিতে পারেন না, এবং জানিতে পারিলেও অনেক স্থলে এই কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করেন না বা প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিলেও, প্রতিষ্ঠাতা প্রত্যুপকার গ্রহণে সম্মত হন না। এই "লওয়া" সম্বন্ধের পরিচালন অর্থাৎ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অন্যের প্রতিষ্ঠিত সদনুষ্ঠান হইতে উপকার গ্রহণ করিলে, সেই গৃহীত উপকার আমাদের ঋণস্বরূপ গণ্য হয় এবং ইহাই আমাদের মনুষ্য-ঋণ। উপকারী ব্যক্তির নিকট ঋণ পরিশোধ করাই প্রকৃত ঋণ-পরিশোধ, কিন্তু যখন তাহা অসম্ভব, তখন তাহার অনুকল্পরূপে সেই উপকারী ব্যক্তির সমজাতি অন্য মনুষ্যের সেবা দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অতিথি সেবার প্রবর্ত্তন। এই নিমিত্ত অতিথিসেবা দ্বারা আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে; অতিথির উপকার করি না বা অতিথিদিগকে আমাদের নিকট ঋণী করি না, বরং আমরাই অতিথিসেবা দ্বারা মনুষ্য-ঋণ হইতে উদ্ধার হ'য়া থাকি। সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থেরই অতিথিসেবা করা কর্ত্তব্য।

(৪) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।—অতিথিসেবা, মানব সমূহকে তাহাদের পরোপকার বৃত্তি পরিচালনের সুযোগ দিয়া থাকে। মানুষে নিজের হিতের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য নিজের আত্মপ্রসাদলাভ জন্য বা নিজের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুশীলন জন্য, পরের উপকার করিতে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত হয়। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়" অর্থাৎ দরিদ্রকে অন্নদান কর। "আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব" অর্থাৎ মেঘ যেরূপ বর্ষণ জন্য সমুদ্র হইতে জল উত্তোলন করে, সাধুগণ তদ্রূপ দানের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এ সংসারে সুখের পরিমাণ অতি অল্প এবং তাহাও "ভোগে" পাওয়া যায় না, "ত্যাগে" পাওয়া যায়। অতিথিসেবা দ্বারা, দানের ও ত্যাগের অভ্যাস হয়, ত্যাগশিক্ষা হয় এবং এই সংসার ত্যাগজনিত কষ্টের লাঘব হয়। যদি দরিদ্র আমার দ্বারে নিজ ইচ্ছায় উপস্থিত না হন, তবে কিরূপে আমাদের ত্যাগশিক্ষা হইবে? দরিদ্র আমার দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমাকে পুণ্য কার্য্য করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। দরিদ্রের ইহাতে উপকার হয় হউক, আমার তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমাকে ইহাই দেখিতে হইবে যে, তিনি আমার দ্বারে উপস্থিত হওয়ায় আমি পুণ্যকার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং তাহারা এরূপ সুযোগ দিয়াছে বলিয়া দরিদ্রের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাহাদের উপকার করিয়াছি বলিয়া দরিদ্রব্যক্তিগণ আমাদের নিকট আদৌ কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য নহেন। সুতরাং ধর্ম্ম ও পুণ্যকার্য্যের সুযোগ দেয় বলিয়া অতিথির নিকট আমাদেরই কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য।

(৫) অতিথি সেবায় মতি থাকিলে সাধুসঙ্গ অনিবার্য্য। ইহাদ্বারা কেহ এরূপ মনে না করেন যে, সমস্ত অতিথিই সচ্চরিত্র ও সাধু। আমার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা প্রকৃত সাধু ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু—তাঁহাদের যখন মাধুকরী [ভিক্ষা] বৃত্তিদ্বারা জীবনধারণ করা ব্যতীত, গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য উপায় নাই, তখন তাহাদিগকে গৃহস্থের দ্বারে আসিতেই হইবে। সুতরাং সহস্র তথাকথিত অতিথির মধ্যে অন্ততঃ একজনও প্রকৃত সাধু থাকিবার সম্ভাবনা। সাধুসঙ্গই অজ্ঞাতসারে গৃহস্থের চরিত্র উন্নত করে, তাঁহার শ্রেয় ও প্রেয় দেখাইয়া দেয় এবং তাহাকে ভগবন্মুখী করে। এজন্য সাধুসঙ্গলোভেও অতিথিসেবা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(৬) ভগন্নাম শ্রবণ।—ভগবান ও ভগবানের নাম এক এবং অভেদ। "যেই নাম, সেই কৃষ্ণ।" নামশ্রবণ, নবধা ভক্তির মধ্যে প্রথম ও প্রধান। "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।" তন্মধ্যে, জপরূপ-যজ্ঞই স্বয়ং ভগবান স্বরূপ। যত প্রকার দান আছে, তন্মধ্যে নামদানই শ্রেষ্ঠ দান। যাঁহারা নাম দান করেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহাদিগকে "ভূরিদা" অর্থাৎ অপর্য্যাপ্ত দাতা বলিয়াছেন। এই কলিকালে, জীবের নাম ভিন্ন গতি নাই। তাই হিন্দুগণ রুদ্রাক্ষ, তুলসী, পদ্মবীজ ও স্ফটিক প্রভৃতির জপমালা সাহায্যে, মুসলমান ভ্রাতৃগণ "তসবি"মালা সাহায্যে, খ্রীষ্টান ভ্রাতৃগণ "রোজারী" (Rosary) মালা সাহায্যে এবং বৌদ্ধেরা জপচক্র prayer wheel সাহায্যে প্রতিদিন ভগবানের নাম জপ করিয়া থাকেন। অতিথিগণ, "হরিবোল," "হরে কৃষ্ণ"-

"লায়ই লাহা ইল্লোল্লাহ" [ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়] ইত্যাদি ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়া গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হন। ইহাতে অতর্কিত সময়েও, আমাদের ভগবন্নাম শ্রবণ করা হয়, বাড়ীতে সাধু-সজ্জনের পদধুলি পড়ে, তাহার গুণে, গৃহস্থের সকল অশান্তি, সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায়। একমুষ্টি ভিক্ষা দিলে, যদি তৎপরিবর্ত্তে এরূপ মহৎ উপকার লাভ করা যায়, তবে তাহাতে বিমুখ হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

(৭) সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ।—দীন, দুঃখী, অতিথি, ভিক্ষুক সমাজের অত্যজ্য অঙ্গ। ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদন জন্য অন্যদেশে, দরিদ্র আইন (Poor law) আছে, আশ্রম আছে। আমাদের দেশে, দীন দুঃখীদের জন্য তদ্রূপ কোনও ব্যবস্থা নাই। যদি অন্যরূপে তাহাদের ভরণপোষণের উপায় না করিয়া অতিথিসেবা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে হয় দীন-দুঃখিগণ, অন্নাভাবে কালকবলে পতিত হইবে, না হয়, দস্যু-তস্করাদির জঘন্য বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। এইরূপে, দুষ্টলোকের প্রাদুর্ভাব ও সামাজিক শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নিবারণের উপযোগী বলিয়াও অতিথি-সেবা প্রথায় সকলেরই তৎপর থাকা উচিত।

(৮) জাতীয়তা রক্ষা । – অতিথিগণ আমাদের জাতীয়তা রক্ষা করিতেছে। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে অতিথিদিগের যেরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ ও হাবভাব ছিল। এখনও ঠিক তাহাই বর্ত্তমান আছে। অতিথি ব্যতীত অন্যের পোষাক পরিচ্ছদ এই পাঁচশত বৎসরে এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে সাবেক ও হাল যে এক তাহা আর বোধ হয় না। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালীর ও বর্ত্তমান বাঙ্গালীর পোষাক-পরিচ্ছদ অনেক ভিন্ন। ফকির, বৈরাগী বা অন্য অতিথি যাঁহারা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আমাদের জাতীয়তার প্রকৃত নিদর্শন অটুট রাখিয়াছেন। তাঁহারা যে আমাদের প্রকৃত হিতার্থী তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এজন্য অতিথি-সেবা পরায়ণ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

(৯) ভগবদুদ্দেশ্যে দান । – আমার সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, অন্য মনুষ্যের সহিত ভগবানের ঠিক সেই সম্বন্ধ। আমি যেমন ভগবানের নিজজন, অন্য মনুষ্যও সেইরূপ ভগবানের নিজজন। "জগৎ ছাড়া নহি, মুই ছার।" আমি জগৎ ছাড়া নহি এবং কেহই জগৎ ছাড়া নহে। যাহা অন্য মনুষ্যকে দান করা যায়, তাহা ভগবানের নিজজনকেই দান করা হয়, ভগবানের উদ্দেশ্যেই দান করা হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও জড়ব্যক্তি বিশেষকে দান করা হয় না। মহম্মদীয় শাস্ত্র অনুসারে আয়ের শতকরা ২॥০ টাকা হিসাবে "জাকাত" অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ্যে দান করিবার প্রথা আছে। হিন্দুদিগের মুষ্টিভিক্ষা অপরিহার্য্য-রূপে বিহিত হইয়াছে। এজন্য সকল গৃহস্থেরই অতিথিসেবা করা কর্ত্তব্য।

(১০) অর্থসঞ্চয়ের উপায় ।—এই ভবসংসারে আমরা দুই দিনের জন্য উলঙ্গ ও মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং উলঙ্গ ও মুষ্টিমুক্ত অবস্থায় এখান হইতে প্রস্থান করিব। তুলসীদাস বলিয়াছেন যে—

"তুলসী, যব, জগ্‌মে আওয়ে, জগ হ'সে ত্বোম রোয়।
এসা কাম করকে চলো, ত্বোম হসো জগ রোয়॥"

অর্থাৎ হে তুলসী, তুমি যখন প্রসূত হইয়াছিলে তখন পুত্র ভূমিষ্ট হইল বলিয়া সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়াছিল কিন্তু তুমি মায়াপিশাচীর বন্ধনে আবদ্ধ হইলে বলিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়াছিলে। এক্ষণে এই মায়াময় সংসারে থাকিয়া এরূপ পরোপকার-মূলক সৎকার্য্য এবং পথের সম্বল বা পারের কড়ির সংগ্রহ করিয়া যাও, যাহাতে তুমি আনন্দে হাঁসিতে হাঁসিতে মরিতে পার, এবং যাহাতে লোকে তোমার অভাব অনুভব করিয়া শোকপ্রকাশ করিতে পারে।

এই পথের সম্বল এবং মজুত করিবার প্রবৃত্তি বশতঃই সেবা ধর্ম্মের উৎপত্তি। হাঁসপাতাল, অনাথাশ্রম, পান্থশালা, দেবালয়, ছত্র, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি এই সেবা ধর্ম্মেরই জলন্ত দৃষ্টান্ত। মিঃ তাতা, মিঃ টিঃ পালিত ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষপ্রমুখ মহাত্মগণ শিক্ষাগার স্থাপন করিয়া এই সেবা ধর্ম্মেরই পরিপুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এবং দরিদ্র ভারতবাসিগণ, অতিথি-সেবা দ্বারা এই সেবাধর্ম্মেরই ক্ষীণরেখাকে অদ্যাপি জীবন্ত রাখিয়াছেন। খ্রীষ্টানগণ, মুষ্টিভিক্ষার পক্ষপাতী না হইলেও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত "দরিদ্র আশ্রম" (Alms house) এই অতিথি-সেবারই প্রকার ভেদ মাত্র।

কথিত আছে, প্রসিদ্ধ সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রজাগণের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার জন্য, গুপ্তভাবে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন। ঐরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা তিনি একটি দরিদ্র কৃষকের সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, "তুমি যাহা উপার্জ্জন কর তাহা কি ভাবে ব্যয় করিয়া থাক।" কৃষক উত্তর দেন যে, "আমার উপার্জ্জন চারিভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করি, একভাগ দ্বারা ঋণ দান করি, এক ভাগ জলে নিক্ষেপ করি এবং অবশিষ্ট একভাগ মজুত করি।" সম্রাটের নিকট ইহা প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হওয়ায়, কৃষক তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে "আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা জীবিত আছেন। তাঁহাদের সেবায় যে $\frac{1}{8}$ অংশ ব্যয় করি, তাহাই আমার ঋণ পরিশোধ শিশু পুত্রকন্যার ভরণ-পোষণে যে $\frac{1}{8}$ অংশ ব্যয় করি, তাহাই আমার ঋণ দান, নিজের ও পত্নীর ভরণ-পোষণে যে $\frac{1}{8}$ অংশ ব্যয় করি, তাহাই আমার জলে নিক্ষেপ এবং যাহা পরার্থে ব্যয় করি তাহাই আমার মজুত।" আমরা যাহা অতিথি-সেবায় ব্যয় করিয়া থাকি তাহাও পরার্থে ব্যয় করা হয়, এজন্য তাহাও আমাদের মজুত থাকে, এজন্য সকলেরই অতিথি-সেবা করা কর্ত্তব্য।

প্রতিকূল সমালোচনা।

১। অপাত্রে দান। ভগবান বলিয়াছেন যে, দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে, তীর্থস্থানে ও সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্য দিবসে, প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ ষড়ঙ্গবিদ্‌ বেদপারগ

ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে এইরূপ দানের পাত্র এক্ষণে দুর্লভ।

গ্রহীতা প্রত্যুপকার করিতে পারে, এই ভরসায় বা স্বর্গাদি ফল-কামনায়, অত্যন্ত অনিচ্ছা বা কষ্টের সহিত যে দান করা যায়, তাহাই রাজস. দান। এরূপ রাজস দানের পাত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়।

তীর্থস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে, সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যসময় ব্যতীত অন্য সময়ে, মূর্খ ও তস্কর প্রভৃতিকে যে দান কয়া যায় তাহাই তামসিক দান। আর পুণ্যসময়ে ও তীর্থস্থানে যদি গ্রহীতাকে প্রিয়বচন না বলিয়া ও পাদপ্রক্ষালনাদি না করাইয়া বা অবজ্ঞা করিয়া যে দান করা যায় তাহাও তামস দান। তামসিক দানের প্রথমাংশে যে গ্রহীতার উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাকেই শাস্ত্রে অপাত্র বলে। অপাত্র শব্দের ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন যে—মূর্খ তস্করাদি। তাহা হইলে, যদি গ্রহীতা মূর্খ না হয় এবং যদি সে তস্কর না হয়, তবে সে কদাচ অপাত্র হইতে পারে না। আবার স্মৃতিশাস্ত্রে মূর্খ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে—"মূর্খস্তু গায়ত্রী-রহিতস্তু"—অর্থাৎ যিনি গায়ত্রী রহিত তিনিই মূর্খ। এইরূপে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, যে সমস্ত অতিথি আমাদের দ্বারে এক্ষণে উপস্থিত হন, তাহারা বা তাঁহাদের অধিকাংশ শাস্ত্র অনুসারে অপাত্র নহেন। রাজস দানের সম্বন্ধে "অপাত্রের কোনও কথাই নাই। আরও চিন্তার বিষয় এই যে, কে সৎপাত্র কে অসৎপাত্র এই বিচার করিতে হইলে ঠগ বাছিতে গ্রাম উজাড় হইবে। এমন কি যিনি এইরূপ বিচার করিতে বসিবেন, তিনি নিজেই হয় ত অপাত্র সংজ্ঞার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়িবেন। অনেক শিক্ষিত মহোদয়, উপার্জ্জন-ক্ষম ব্যক্তিকে "অপাত্র" মনে করেন। কিন্তু শাস্ত্র তাহা সমর্থন করে না। সময় বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে, উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিও সৎপাত্র ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। পাশ্চাত্য-শিক্ষার অন্ধ অনুচিকীর্ষা বশতঃই কতিপয় শিক্ষিত মহোদয় এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে কতিপয় বিকৃত-মস্তিষ্ক পণ্ডিতমহাশয়, "অপাত্র" শব্দের অভিনব ব্যাখ্যা দি।, হিতকর এই সদনুষ্ঠানের প্রতি লোকের বিরাগ উৎপাদন করিতেছেন এবং নিজেরা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছেন। যাহা হউক সকল দিক বিবেচনা করিয়া, পাত্রাপাত্র বিচার সাপক্ষে অতিথি-সেবা একেবারে বন্ধ করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

২। আলস্যের প্রশ্রয়। অনেকে মনে করেন যে, অতিথি-সেবা দ্বারা আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইঁহাদের যুক্তি তর্কের ধুয়ো (burden) এই যে "Man must earn his bread by the sweat of his brow." অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পরিশ্রম দ্বারা তাহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিবে। যখন পরিশ্রম দ্বারা লোকে, নিজ গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জন করিতে সক্ষম, তখন কেন সে অন্যের গলগ্রহ হইবে? এরূপ করিলে সমাজ-দ্রোহিতা হয় ইত্যাদি। এরূপ যুক্তিবাদীরা চিন্তা করিয়া

দেখেন না যে তাঁহারা নিজে অন্যরূপে আলস্যের প্রশ্রয় দেন কি না? যখন গৃহিণীর পাকের ও অন্য কার্য্যের সাহায্য জন্য, পাচক ও দাসদাসী নিযুক্ত করা হয়, তখন কি গৃহিণীকে আলস্যপরায়ণা করিবার সাহায্য করা হয় না? যখন নবপুত্রবধূটিকে স্নেহবশতঃ, গৃহকার্য্য করিতে নিষেধ করা হয়, তখন কি আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? নিজের আত্মীয়-স্বজন উপার্জ্জন না করিলেও, যখন তাঁহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে হয়, তখন কি তদ্দ্বারা আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? এরূপ স্থলে হয় ত বলিবেন যে নিজের ধন তো,—“দানায় চ ভুক্তয়ে”—দান করিবার জন্য এবং ভোগ করিবার জন্য। বৃদ্ধবয়সে দন্তের শৈথিল্য জন্মিয়াছে, নারিকেল চর্ব্বণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি, কিন্তু নিজের পুত্র যদি ভক্ষণ করে, তবে তাহা দেখিতেও সুখ হয়। পুত্রাদি আমাদের নিজের অংশ ও স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং পুত্রাদির এককথা এবং অতিথির সম্বন্ধে অন্য কথা। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কথা সম্পূর্ণ এক না হইলেও প্রায় একই কথা। পুত্রাদির প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ-প্রবণতা বশতঃ, তাহাদের আলস্যকে, আমরা আলস্য বলিয়া গণ্য করিতে চাই না, কিন্তু অতিথির প্রতি আমাদের আদৌ ভালবাসা বা প্রেম নাই বলিয়া, তাহাদের আলস্য, আমাদের নজরে পড়ে এবং তাহা আমাদের সহ্য হয় না। স্ত্রীপুত্রাদির ভালবাসা প্রসারিত করিয়া, যখন তাহা আমরা স্বজন ব্যতীত অন্যের প্রতি প্রদর্শন করিতে পারিব, যখন আমাদের স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে পরার্থপরতার উদ্ভব হইবে, তখনই আমরা প্রকৃত মানুষ হইব, তখনই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে,—“Human life is Some thing, much more than eating, drinking, begetting children and accumulating money.” অর্থাৎ পান, ভোজন সন্তানোৎপাদন এবং অর্থসঞ্চয়ই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। স্ত্রীপুত্রাদির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং তাহাদের আলস্যের প্রশ্রয় দিবার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা অকাতরে অপব্যয় করিতেছি। আর অতিথিকে একমুষ্টি ভিক্ষা দিবার বা একবেলা দুটী অন্ন দিবার বিরুদ্ধে নানা কল্পিত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া কাতরতা প্রদর্শন করিতেছি।

আর এককথা আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া যদি মুষ্টিভিক্ষা বা একবেলা অন্নদানে আমরা বিরত হই, তাহা হইলে সর্ব্ববাদী-সম্মত সাধুসঙ্গরূপ উৎকৃষ্ট স্বার্থলাভে বঞ্চিত হইব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সাধুগণ জীবন ধারণের জন্য গৃহীর দ্বারস্থ হইয়া থাকেন। সমাজ হইতে অতিথিসেবা বিতাড়িত হইলে সাধুগণ কি জন্য গৃহীর দ্বারে উপস্থিত হইবেন। ঘোর অরণ্যে যাইবারও যদি পথ থাকে তবে কাষ্ঠ আহরণের জন্য সকল কাঠুরীয়াই সে অরণ্যে আপনা হইতেই যাইয়া থাকে, পথ না থাকিলে কেহই যায় না। যদি গৃহস্থ-অরণ্যে উপস্থিত হইবার জন্য অতিথি সেবারূপ পথ থাকে, তবে একদিন না একদিন জঠর-ধুনীর কাষ্ঠ যোগাইতে সাধু-কাঠুরীয়া উপস্থিত হইবেনই হইবেন। তাই মানবকুল হিতার্থী সমাজতত্ত্বদর্শী ঋষিকুল সমাজে অতিথিসেবা বিধান করিয়া মলিনসত্ত্ব গৃহিসমাজের পরমবস্তু সাধুসঙ্গ লাভের পথ

প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন এটীও একবার ভাবা উচিত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সকলই উপার্জ্জন করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিবে ইহা কদাচ সম্ভবপর নয়। মানুষের কথা দূরে থাকুক এমন কি তৃণগুল্মের মধ্যেও এমন কতকগুলি পরগাছা আছে তাহারা অন্য বৃক্ষের রস গ্রহণ করিয়া সজীব থাকে। আইন-কানুন বা বিধিব্যবস্থা করিয়া এই সংসার হইতে আপনাকে কখনই বিতাড়িত করা যায় না—কর্ম্মভীরু ও অলস লোক সংসারে চিরকাল আছে ও থাকিবে। পরিবারস্থ কর্ম্মভীরু ও অলস ব্যক্তিগণকে সকলেই স্বাভাবিক স্নেহ ও ভালবাসা বশতঃ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। পরিবারের বাহিরে যে সকল কর্ম্মভীরু ও অলস ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা কোথায় যাইবেন? তাঁহাদের উপায় কি? কর্ম্মভীরু ও অলস ব্যক্তির ঈদৃশ জীবনধারণ দেখিয়া তাহাদের সংসর্গে কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি ক্রমশঃ অলস হইয়া পড়িবেন তাহা কদাচ সম্ভব নয়। সুতরাং ইহা দ্বারা আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না বরং সংসারে যে সমস্ত অলস ও কর্ম্মভীরু লোক আছেন, তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের একটি উপায় করা হয়, এজন্য সকলেরই অতিথিসেবা-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য।

৩। দুরবস্থা। অনেকে মনে করেন যে, দুরবস্থা অতিথিসেবা পরাঙ্মুখতার কারণ; কিন্তু বাস্তবিক ইহা ঠিক নহে। পাশ্চাত্য-শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের হিন্দুমুসলমানের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অর্থ আর এক্ষণে অনর্থের মূল নাই, ভোগাসক্তি অতি মাত্রায় বৃদ্ধি হইয়াছে। গৃহস্থের সংসার করা যে কেবল সেবার জন্য, কেবল উচ্ছিষ্টভক্ষণের জন্য, কেবল ত্যাগের জন্য, লোকে ক্রমশঃ তাহা বিস্মৃত হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষিত লোকের সংসর্গে সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপে, এদেশবাসী সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে এই ভাব, প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মের আদেশ, কর্ত্তব্যের প্রেরণাকে উপেক্ষা করিয়া অর্থকে, অত্যধিক, এমন্ কি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞান করাতেই সামান্য একমুষ্টি ভিক্ষা দিতেও আমরা কুণ্ঠিত হইতেছি! বাল্যকালে দেখিয়াছি যে গৃহস্থ পত্নীর হস্তে অপরিহার্য্যরূপে, লৌহমাত্র আভরণ ছিল, তিনিও সাহাস্যবদনে অতিথিসেবা করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে যিনি আপাদমস্তক অলঙ্কারে ভূষিত তিনিও অতিথি-সেবা-পরাঙ্মুখ। ফলতঃ দরিদ্রতা বা হীনাবস্থা, অতিথিসেবা পরাঙ্মুখতার কারণ নহে; প্রবৃত্তি নাই বলিয়া, কর্ত্তব্য-জ্ঞান নাই বলিয়া, আদর্শ, বিকৃত হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে আমরা অতিথিসেবা করি না; এবং নিজের এবম্বিধ গর্হিত কার্য্যের সমর্থন জন্য নানারূপ অসার ও কল্পিত যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া থাকি।

৪। অতিথির সময় অসময় জ্ঞান। অনেকে মনে করেন যে, সময় অসময় বিবেচনা না করিয়া, গৃহস্থের কার্য্যের সময় অতিথিগণ দ্বারস্থ হয় বলিয়া তাহাতে বিরক্তি জন্মে এবং এজন্য তাঁহারা অতিথি সেবা করিতে পারেন না। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণ কি সময় বুঝিয়া আমাদের অর্থের স্বচ্ছলতা বুঝিয়া, দ্রব্যাদি প্রার্থনা করে? কোনও দ্রব্য লইবার ইচ্ছা হইবামাত্র, তজ্জন্য তাহারা ঝোঁক ধরে। মা, অফিসের অন্নপাক করিতেছেন, যথা-সময়ে অন্ন

প্রস্তুত না হইলে, পিতৃদেব যথা-সময়ে কর্ম্মে যোগদান করিতে পারিবেন না; হয় ত; কার্য্য হইতে অপসৃত হইতে পারেন, কিন্তু শিশুপুত্র তাহা বুঝিতেছে না, সে মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদিয়া আকুল। মা, তখন দৌড়িয়া আসিয়া শিশু-পুত্রকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে মহানসের কার্য্য সম্পন্ন করেন। মা, তো, শিশু পুত্রের প্রতি বিরক্ত, বা দুধ খাওয়াইবার সময় নয় বলিয়া দুগ্ধ পান করাইতে বিরত, হন না! ইহার কারণ প্রেম ও ভালবাসা। যখন কাহারও প্রতি প্রেম থাকে বা ভালবাসা থাকে বা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান থাকে, তখন তাহাতে কেহ বিরক্ত হন না, বা সেই কার্য্য করিতে ক্রটি করেন না। অতিথি সেবা যে গৃহস্থের প্রতীব কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহার জ্ঞান না থাকাতেই অতিথি আগমনে লোকে বিরক্ত হইয়া থাকেন এবং অতিথির সময় অসময় জ্ঞান নাই ইত্যাদিরূপ বলিয়া নিজের বিজ্ঞতা খ্যাপনের চেষ্টা করেন। গৃহস্থালীর সহস্র কার্য্যের মধ্যে অতিথি বিদায় করিতে হইবে, ইহা অবশ্য করণীয় কার্য্য এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইলে, অতিথি-সৎকারে আর বিরক্তি বোধ করিবেন না।

৫। সংখ্যা বৃদ্ধি। অনেকে মনে করেন—অতিথির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। উকীল মোক্তার, ডাক্তার, হাকিম প্রভৃতি মহোদয়গণের মধ্যে অনেকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা ঐহিক সুখের চরম সীমায় উপনীত হইতেছেন দেখিয়া অর্থোপার্জ্জনের লুব্ধ-আশ্বাস হৃদয়ে রাখিয়া, অনেকেই উকীল মোক্তার প্রভৃতি হইতেছেন সত্য, কিন্তু ভিক্ষুকের পদে তদ্রূপ কোনও প্রলোভন নাই, সুতরাং ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াও সম্ভব নহে। বরং খাদ্যদ্রব্যের গড় দর, ও কুলী-মজুরদিগের পারিশ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায়, কৃষিজীবির অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া অতিথির সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্মে ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভিক্ষুক ও রবাহুতের আমদানী হইত, এক্ষণে তাহার কিছুই হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ যাজ্ঞা-বৃত্তি অতি লঘু বৃত্তি। "লঘুত্বমূণং হি চার্থিতৈব।" সকল ব্যবসায়ের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তিই নিকৃষ্ট বৃত্তি। "ভিক্ষয়া নৈব চ নৈব চ।" অধিকন্তু ভিক্ষার জন্য অন্যের দ্বারে উপস্থিত হইবার সময়, পাছে তাহাকে কেহ তিরস্কার করে দুর ছাই বলে, সেজন্য আতঙ্কে তাহার গতি মন্দ হইয়া যায়, গলার স্বর ক্ষীণ হইয়া পড়ে গাত্রকম্প ও শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়। এক কথায় মরণের সময় সে সমস্ত লক্ষণ সমুদিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া কদাচ সম্ভবপর হইতেই পারে না। যদি এই সকল শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া, কোনও ভিক্ষার্থী, আমাদের ভারতমাতার কোন দীন সন্তান, আমাদের কোনও ভ্রাতৃগণ তোমাদের দ্বারে উপস্থিত হন, তখন তাহার সৎকার করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? যখন গৃহস্থাশ্রমে আছি, তখন আমার একটু আশ্রয় স্থান আছে, বসিবার উপযোগী একটু মৃত্তিকা আছে, পানীয় জল আছে এবং সর্ব্বোপরি মিষ্টবাক্য আছে, যদি আমার অন্য কিছু দিবার সাধ্য নাও থাকে, তথাপি

অতিথি গৃহে সমাগত হইলে এই সমস্ত পদার্থ দ্বারা তাঁহার সৎকার করিয়া তাঁহাকে মিষ্ট বাক্যে বিদায় দিলে আমাদের উভয় কুল বজায় থাকিতে পারে। এ জন্য অতিথি সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রসম্মত অতিথি আজকাল দুর্ল্লভ। অতিথি এবং ভিক্ষুক আজকাল প্রায় এক পর্য্যায়ভুক্ত। আজকাল শাস্ত্রসম্মত অতিথি যেরূপ দুর্ল্লভ, শাস্ত্রসম্মত গৃহস্থও সেইরূপ দুর্ল্লভ। গৃহস্থ হইয়া অতিথির নিন্দা এবং অতিথি হইয়া গৃহস্থের নিন্দা করিলেই সমাজ-সংস্কার হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে—

"প্রভু কহে—ভাল কৈল, ছাড়িয়া সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥"

চৈতন্যচরিতামৃত—৬ষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীলশ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান সময়ে,কিছুকাল "সিংহদ্বারে" দণ্ডায়মান থাকিয়া ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিংহদ্বারে ভিক্ষা করিলে মনে হয় যে, "এই ব্যক্তি আসিতেছেন ইনি ভিক্ষা দিবেন। ইনি দিলেন না। আচ্ছা এই আর এক ব্যক্তি আসিতে-ছেন, ইনি দিবেন। আচ্ছা ইনিও দিলেন না। বেশ অন্য ব্যক্তি আসিবেন, তিনিই দিবেন ইত্যাদি।" এইরূপ বেশ্যার আচার পরিহার করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য এজন্য রঘুনাথ দাস—

"ছত্রে যাই যথালাভ উদর-ভরণ।
মনঃকথা কহি, শুনে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥"

সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ছত্রে গিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একস্থানে ২ তিথি অর্থাৎ দুই দিন কোনও অতিথি থাকিতে পারিবে না, অতিথি আগামী দিনের জন্য কিছুমাত্র সংগ্রহ রাখিতে পারিবে না ইত্যাদি কঠিন নিয়ম অবশ্যই প্রতিপাল্য। কিন্তু গৃহস্থ যদি তাঁহার কর্ত্তব্য প্রতিপালন না করেন, তবে অতিথিকেও তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হইতে হইবে। এক্ষণে অতিথিসেবার সাম্যাবস্থার ধ্বংস হইয়াছে, যাহাতে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তজ্জন্য সকলেরই যত্নপরায়ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামতারণ মুখোপাধ্যায়, বি-এল।

শ্যাম-বিরহে।

আজ কেনরে বৃন্দাবনে ওঠে না আর বংশীধ্বনি!
আজ কেনরে চন্দ্রাবলী মলিন হলো বিষাদ গণি!
আজ কেনরে নন্দরাজা মত্ত যেন পাগল পারা,
আজ কেন তাঁর গণ্ডদেশে ঝরছে শত অশ্রু ধারা।
আজ কেনরে ধড়া চূড়া লুট্‌ছে গৃহ-আঙন পরে,
আজ কেনরে যশোমতী মূর্চ্ছা গেল সে সব হেরে।
আজ কেনরে রাখাল শিশু বাজায় না তার মোহন বেণু!
আজ কেনরে গোষ্ঠ পরে চরে না আর বৎস ধেনু!
আজ কেনরে সাঁজের বেলা হয়নি ব্রজে প্রদীপ জ্বালা!
আজ কেনরে যমুনাতে নাহি যায় আর আভীর বালা!
আজ কেনরে গোপীর ঘরে যায় না চুরি মাখন ছানা!
আজ কেনরে ব্রজের গোপাল দ্বারে দ্বারে দেয় না হানা!
আজ কেনরে নূপুর বাজন ওঠে না আর কুঞ্জমাঝে!
আজ কেনরে নীপের শাখে ঝুলন দোলা নাহিক রাজে!
আজ কেনরে শুক শারিকা স্তব্ধ বসি তমাল শিরে!
আজ কেনরে মত্ত ভ্রমর ফুলের পানে চায় না ফিরে;

শ্যাম কি গেছে গোকুল ছেড়ে,
আসবে না আর ফিরে!
তাই কিরে হায় ব্রজবাসী
ভাসছে শোকের নীরে!!

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, এম, আর, এস।

অর্চ্চনা।

(গল্প)

(১)

একখানি তালপাতার কুঁড়ে-ঘরে মাটীর মেজের উপর ছিন্নশয্যায় শুইয়া একটী স্ত্রীলোক গোঁয়াইতেছিল। সম্মুখে পুত্র বসিয়া বসিয়া আকুল চক্ষে সেই দৃশ্য দেখিতেছিল—আর কাঁদিতে ছিল। পুত্রের নাম চারুচন্দ্র।

ক্ষণৈক পরে সেই স্ত্রীলোকটী একটু যেন সুস্থ হইয়া সম্মুখস্থ পুত্রের পানে চাহিয়া বলিল,—"আমি আর বাঁচ্‌ব না বাবা! অনেক আরাধনা করে তোমায় পেয়েছিলাম, তোমাকে একটী কাজের ভার দিয়ে যাব।"

চারু চোখে কাপড় দিয়া অশ্রু মুছিয়া বলিল—"যেও না মা! আর কিছুদিন থাক! আমি তা' হলে বাঁচ্‌ব না।"

জননী হাঁসিয়া বলিলেন—"থাকা না থাকা কি আমার হাত বাবা! আমাকে এ যাত্রা দেখ্‌ছি যেতেই হবে। মর্‌বার সময় তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল না, জীবনে তাঁকে সুখী কর্‌তে পার্‌লাম না, একটু সেবা কর্‌তে পার্‌লাম না—তুমি কিন্তু বাবা, তাঁকে ভুল না।"

বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে চারু বলিল—"কেন মা! তিনি থাক্‌তেও আমাদের এ দুর্দ্দশা! তোমার এ অবস্থা! একবারও ত দেখ্‌তে এলেন না?"

জননী বিষণ্ণা হইয়া বলিলেন,—"আমার ভাগ্য আর তোরও ভাগ্য বটে, জন্মান্তরে যে আমরা পাপ করেছিলাম, তাহার ফলে আজ আমি স্বামী-সেবা কর্‌তে পেলাম না, তুইও পিতৃসেবা কর্‌তে পেলি না। কিন্তু বাবা! আমি মলে আমার সেবার ভারটা তুই হাতে তুলে নিয়ে—তাঁর সেবা কর্‌বি! কখনও অবহেলা করিস্‌নে।"

চারু কাঁদিয়া বলিল—"মরবার কথা বল না মা! তুমি বাঁচ্‌বে তোমাদের সেবাটা আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবে মা!"

জননী পুত্রের মাথায় ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্তখানি রাখিয়া বলিলেন—"দুঃখ করিস্‌ না চারু! তুই বল্‌—আমার কথাটা রাখ্‌বি, আমি তা' হলে সুখে মরতে পার্‌ব। জননীর শেষ কথাটা রাখ্!"

চারু ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—"আচ্ছা তাই হবে মা! তুমি কিন্তু থাক মা!"

পার্শ্বের দরজা ঠেলিয়া একটী সুন্দরী রমণী সেখানে প্রবেশ করিলেন। রমণীর রূপের জ্যোতিতে সেই কুঁড়েঘরও যেন আলোকিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সেই রমণী রোগিণীর শিয়রে বসিয়া তাহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইলেন। চারু বিস্মিত-চক্ষে সেই দিকে কেবল চাহিয়া রহিলমাত্র।

চারুর মাতা পুত্রের শেষ কথা কয়টীর মধ্যে কি যেন একটু আনন্দের আভাস পাইয়াছিলেন। তাই তিনি চোখ বুজিয়া সেই ভাবটা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন অন্তিম আহ্বানের ভিতর সুখের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল। রমণী-স্পর্শে সাড়া ফিরিয়া

পাইয়া জননী অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভগবতীর মত অপরূপ রূপ দর্শনে দুঃখিনীর নেত্রে পলক ছিল না।

সেই নবীনা তখন হাসিয়া বলিলেন—"চিন্‌তে পাচ্ছ না দিদি! আমি চারুর কাছে তোমার অসুখ শুনে ছুটে এসেছি! চারু তোমারও যেমন ছেলে, আমারও তেমনি ছেলে!"

দুঃখিনীর চিত্তের মধ্যে এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত রকমের ঠেকিতেছিল। তিনি সমস্ত ব্যাপারটা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেছিলেন না। জমিদার-গৃহিণী চুণিবাবুর স্ত্রী মায়াদেবী আজ তাঁহার শিয়রে আসিয়া আশ্বাসের উল্লাসের বাণীটা ঘোষণা করিবেন—ইহা গরীবের ঘরে বিশ্বাসের কথা কি?

চারু অশ্রুপূর্ণ নয়নে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—"ইনিই মা! সেই দেবী! আমাদের আর ভাবনা নেই।"

দুঃখিনী আনন্দের আতিশয্যে উঠিয়া বলিলেন—"দিদি! দিদি! আমার চারু আজ—" দুঃখিনীর কথা শেষ হইল না। মূর্চ্ছিতা হইয়া মায়াদেবীর কোলে পড়িয়া গেলেন।

(২)

মুখুয্যে পাড়ায় চারুচন্দ্রের বাস। চারু বিনোদপুরের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। চারুর পিতা আছে, বিমাতা ও বৈমাতৃক ভ্রাতা ভগিনীও আছে। কুলীনের সন্তান বলিয়া—নবীন মুখুয্যে প্রথমা পত্নী থাকিতেও আরও একটা বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা দরিদ্রের কন্যা, এইজন্য সপত্নী ও স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া—দশজনের সাহায্যে সেই গ্রামের প্রান্তে একটী কুটীরে বাস করিতেন। স্বামী-সহবাস তাঁহার কপালে বড় ঘটে নাই, অবশ্য সেজন্য তিনি নিজের অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়া প্রত্যহই অনুদ্দেশ্য স্বামীর পূজা করিতেন। শুধু স্বামীর স্মৃতিটুকু লইয়া আর তেত্রিশকোটী দেবতার নিকট স্বামীর কল্যাণকামনা করিয়া সেই ক্ষীণ জীবনকেও সতেজ করিতে চেষ্টা করিতেন। অনেক দেবতার নিকট মানত করিয়া তিনি চারুকে পাইয়াছিলেন, পাইয়াও কিন্তু দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারিলেন না; চারুকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। থাকিল কেবল স্মৃতি! এই স্মৃতিটুকুই চারুর সম্বল।

সেদিন চুণিবাবু সকালে চারুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। চারু বিনীত বেশে নম্রভাবে আসিয়া নমস্কার করিল। এবং সাকাঙ্ক্ষ নয়নে চুণিবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

চুণিবাবু বলিলেন,—"চারু! শুন্‌লাম—তোমার পিতা নাকি তোমায় ভালবাসেন না?"

চারু বিস্মিত হইয়া বলিল,—"আজ্ঞে কই—বল্‌তে পারি না!"

চুণিবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন,—"শুনেছি—তুমি পিতার কাছে চাকরের ন্যায় থাক, তোমার পিতা ও বিমাতা ঘরে থাক্‌তে দেন না! এসব কি স্নেহের পরিচয়?"

চারু কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

চুণিবাবু আদর করিয়া বলিলেন—"তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে?"

চারু কৃতজ্ঞ-নয়নে বলিল—"না।"

চুণিবাবু দুঃখিত চিত্তে বলিলেন—"তোমার কি এই অত্যাচার সহ্য করা উচিত? পিতা যখন নিজ কর্ত্তব্য করলেন না, তখন তুমি কেন নিজের জীবনটাকে অবসাদের মধ্যে রেখে আপনার ক্ষতি কর?"

চারু ব্যথিত হইয়া বলিল—"আমি কিছু অবসাদ বুঝতে পারি না, আমার এখানে থাকা হবে না। আমি বাবার কাছেই থাকব।"

চুণিবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—"চল তোমার পিতার নিকট যাই, দেখি এর কিছু প্রতিকার করতে পারি কি না।"

চারু ভগ্নস্বরে বলিল,—"আপনি আমার সম্বন্ধে বাবার নিকট কিছু বলবেন না। তাঁহার একটু অসন্তোষেও আমার মায়ের নিকট অপরাধী হ'তে হবে।" চারু—শূন্যদৃষ্টে পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

চুণিবাবু অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটা হতাশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া চারুর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

পার্শ্ব হইতে কে চিৎকার করিয়া ডাকিল—"হতভাগা! কাজকর্ম্ম নেই, এখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে?

"যাই বাবা! বলিয়া চারু পিতার সমীপে ধীরপদে উপস্থিত হইল।

নবীনচন্দ্র চারুর কাণটা ধরিয়া একপাক ঘুরাইয়া বলিলেন—"তোর জন্য কি আমাদের সমস্ত কাজ বন্ধ করতে হবে নাকি? দেখ্‌গে যা, বাড়ীতে এখনও গরু-বাছুর খেতে পায় নি! হতভাগা তোকে খুঁজে বেড়াবার জন্যও কি একজন লোক রাখতে হবে না কি? পাজি! নচ্ছার! পাষণ্ড!!"

চারু ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে দৌড়াইল। তাহার কাণের বেদনার কথাটা পর্যন্ত তাহার মনে ছিল না।

সম্মুখের দ্বিতল প্রকোষ্ঠের খড়খড়ির অন্তরালে একখানা স্নেহভরা করুণ মুখ এই দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু মুছিতেছিল। সে মুখখানি মায়াদেবীর।

(৩)

মাঘ মাস, শ্রীপঞ্চমী আগত প্রায়। বসন্ত সমাগমে যেন প্রকৃতি দেবী নব সাজে সজ্জিত হইয়াছেন। শীত ঋতুর প্রভাব ম্লান হইয়া জড়তা, অবসাদ দূরীভূত হইয়াছে। নূতন জীবনের বাণী যেন জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বিঘোষিত হইতেছে। তোমরা জাগ! জাগ! সরস্বতী জননী আসিতেছেন, তোমরা সকলে নূতন জীবনের জন্য প্রস্তুত হও, আশা উল্লাস নিয়ে মায়ের আরাধনার সঙ্গে নূতন শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত হও!

এমনি একদিনে মায়াদেবী ডাকিলেন—"চারু!"

চারু একখানা ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনে কি দেখিতে ছিল, সে মায়াদেবীর

আহ্বান শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিল—"কি মা!" সদ্যঃস্নাতা আলুলায়িতকুন্তলা পট্টবস্ত্রপরিধানা মায়াদেবীকে তখন দেবীর মতই দেখাইতেছিল।

তিনি বলিলেন—"সরস্বতী পূজা ত এলো বাছা! পূজার যোগাড় ত কর্‌তে হয়।"

"পূজার যোগাড়! আচ্ছা মা! আমিই সব করে দেব! কিন্তু মা! আমি ত থাক্‌তে পার্‌ব না!"

মায়াদেবী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কেন?"

চারু হেঁট মুখে বলিল—"আমাদের বাড়ীতে বরাবর পূজা হয়! ছেলেবেলায় এই পূজার দিনে বাবার পায়ের ধূলা নিয়ে মা আমার হাতে খড়ি দিয়েছিলেন, সেই দিন থেকে প্রতি বছরই বাবার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর্‌তে হয়।"

"মায়াদেবী ব্যথিত হইয়া বলিলেন—"তোমার ত বাছা সে বাড়ীতে যেতে বারণ আছে। তবে তুমি কেমন করে যাবে?"

চুণিবাবু একদিন চারুর পিতা নবীন বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আসিয়া ছিলেন। চারুর প্রতি তাহার পিতার অযথা ব্যবহারটা তাহার সহ্য হয় নাই, এইজন্য এই বিবাদ। তাহার ফলে চারু গৃহ-তাড়িত হইয়া চুণিবাবুর আশ্রয়ই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আজ শ্রীপঞ্চমীর পূজার সংবাদে সেই পুরাতন কাহিনীগুলা চারুর প্রাণের মধ্যে একটা ভাবের তরঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিল। সে সব ভুলিয়া পিতার সেই শুভ স্বস্তিবাণীর মধুর মন্দ্র রবটাই শুনিতে পাইতেছিল; কিন্তু সেই স্বস্তিবাণী যে তাহার প্রাণের মধ্যে আর অমৃত বর্ষণ করিবে না, এটা তাহার মনেও ছিল না, আজ মায়াদেবীর কথায় তাহার প্রাণ খাঁ খাঁ করিয়া উঠিল—জগৎটা শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সে তখন সেখানে বসিয়া পড়িয়া বিষাদমাখা চোখ দুইটা মায়াদেবীর দিকে তুলিয়া ধরিল। মায়াদেবী আর কিছু বলিলেন না, কি একটা ভাবিয়া স্বামীর কাছে চলিয়া গেলেন।

প্রবোধ আসিয়া চারুর হাতখানা ধরিয়া টানিয়া বলিল—"চল না দাদা! আমাদের ঠাকুর গড়া দেখ্‌তে যাই!" প্রবোধ চুণিবাবুর ছেলে।

চারু পরক্ষণেই প্রফুল্ল হইয়া বলিল—"চল ভাই!"

প্রবোধ বলিল—"তুমি অত বিষণ্ণ হয়ে থাক কেন দাদা!"

চারু কাষ্ঠ হাঁসি হাঁসিয়া বলিল—"বিষণ্ণ কেন যে হই, তুমি কেমন করে বুঝ্‌বে ভাই! আমার একটা স্নেহের রাজত্ব ছিল, আমার একটা কল্যাণের—আশীর্ব্বাদের দেবতা ছিল; কপালদোষে সেই দেবতার চরণ ছায়া ছেড়ে আসতে হয়েছে! শুধু তাই নয় ভাই! আমার মায়ের অন্তিম আদেশও বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে।" অশ্রুভরে চারুর কপোলদ্বয় সিক্ত হইয়া উঠিল!

প্রবোধ চারুর সেই প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া বড় ব্যথিত হইয়া পড়িল।

(৪)

সেদিন সন্ধ্যা করিতে বসিয়াই—নবীনচন্দ্র রূক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আমি যদি ত্রিসন্ধ্যা নিয়মিত ক'রে থাকি—তবে তার কখনও ভাল হবে না, গ্রামের জমীদার হ'য়ে ব্রাহ্মণকে গালাগালি! পাষণ্ড! বেল্লিক!"

সম্মুখে ছাতাপড়া সিংহাসনের উপর চন্দনের লেপনে স্থূলাকার শালগ্রাম শিলায় বিশ্বরূপী নারায়ণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। চারিদিক্ অপরিস্কৃত—অপরিচ্ছিন্ন। দেওয়ালের গায়ে কতকগুলা ঝুল, শালগ্রামের সিংহাসনেও ঝুল,—পূজা পাত্রও ততোঽধিক অপরিস্কৃত। নারায়ণদেব যেন নবীনচন্দ্রের সেই ক্ষুদ্র ঘরে আসিয়া বিশ্বের জঞ্জালগুলির মায়াও ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

নবীনচন্দ্রের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী ফুলকুমারী এক ছটাক ছাতাপড়া আলোচাল জলে ভিজাইয়া—একখানা ক্ষুদ্র পিত্তলের পাত্রে ভাগ করিয়া নৈবেদ্য করিতে করিতে বলিল—"শুধু চুণিলালবাবুকে দোষ দিলে চল্‌বে কেন? তোমার সেই গোবরগণেশ হতচ্ছাড়া ছেলেটার ঠ্যাকার দেখ্‌ছ?"

"দূর করে দাও, তার আর মুখও দেখ্‌বো না।" নবীনচন্দ্রের সন্ধ্যাহ্নিক দ্রুত চলিতেছিল। পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"জ্যেঠা মহাশয়! আছেন কি!"

বড় মিষ্ট স্বর! নবীনচন্দ্র তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন—একটী সুন্দর সুকুমার কিশোর বয়সের বালক চাকরের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া সেই বালক আবার বলিয়া উঠিল—

"আপনি বুঝি জ্যেঠা মহাশয়! মা বলেছেন—আপনিই ত জ্যেঠা মহাশয়, না?" বালক মধুর হাসিয়া নবীনচন্দ্রের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থাপন করিল।

নবীনচন্দ্রের সন্ধ্যাহ্নিক-পূত প্রাণটায় কেমন যেন একটা গোলমাল বাধিয়া গেল। যে শুষ্ক আচারের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রাণটা কেবল কর্কশ কঠোর হইয়া উঠিতেছিল—আজ প্রবোধ-চন্দ্রের এই আহ্বানে সেখানে যেন একটা স্নেহের ফল্গুপ্রবাহ বহিয়া গেল। তিনি স্নেহভরে ডাকিলেন—

"তোমার নাম কি বাবা!"

প্রবোধচন্দ্র বড় গলা করিয়া হাসিয়া বলিল—"আপনি আমার নাম জানেন না—জ্যেঠা-মহাশয়! আমি প্রবোধ! আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত চুণিলাল চট্টোপাধ্যায়—আমার মার নাম—"

"থাক্ বাবা, আর বল্‌তে হবে না!" নবীনচন্দ্র বিষণ্ণ চক্ষে একবার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

প্রবোধ সরিয়া আসিয়া নবীনচন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উন্মুখ হইয়া বলিল—"জ্যেঠামহাশয়! আমাদের বাড়ীতে আপনাদের সরস্বতী-পূজার নিমন্ত্রণ, মা বিশেষ করে যেতে বলে দিয়েছে! চারুদাদা সেখানে রয়েছে, আপনাকে দেখ্‌বার জন্য সে কত কাঁদে!

"চুপ! চুপ! আমি কাল—তুমি এখন যাও বুঝ্‌লে?"

"যেও যেও জ্যেঠামহাশয়! তা না হলে বাবা রাগ করবে, মা রাগ কর্‌বে—মা সরস্বতীও রাগ করবেন।" প্রবোধ স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া চলিয়া গেল।

নবীনচন্দ্র একদৃষ্টে সেই বালকের পানে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রাণ যেন ছুটিয়া কোথায় চলিয়া যাইতে চাহিতেছিল। সেখানে যেন কত বাধা, কত বিপত্তি।

পিছন হইতে ফুলকুমারী কর্কশকণ্ঠে ডাকিল—"বলি পূজা কর্‌বে না! বেলা যে গেল! তোমার জন্য কি আমাদেরও পেটে চড়া পড়্‌বে নাকি?"

নবীনচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—"এই যে—আচ্ছা আমি পূজোটা খুব শীঘ্র সেরে নিচ্ছি!" নবীনচন্দ্র তাড়াতাড়ি আসিয়া পূজায় বসিলেন। সেদিন কিন্তু তাঁহার পূজাটা শীঘ্র না হইয়া বড় বিলম্বেই সমাধা হইল।

(৫)

সে দিন সন্ধ্যার সময়ে চারু প্রবোধকে সঙ্গে লইয়া মায়াদেবীর ক্রোড়ের ধারে উপবেশন করিয়া নক্ষত্রগুলার শুভ্র কিরণে অতিস্নাত হইতেছিল। কাল বাসন্তী পঞ্চমী, পূজার আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত, সকলেই নিশ্চিন্ত।

ক্ষণেক পরে চারু উচ্ছ্বাস-ভরে বলিল—"বল্‌ দেখি প্রবোধ! ওটা কি?"

প্রবোধ। "কোন্‌টা দাদা?"

চারু। "ঐ যে আকাশের গায় একটা বড় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আমাদিগের দিকে চেয়ে রয়েছে! ওটা কি বল্‌ দিকি?"

প্রবোধ। "ওটা একটা নক্ষত্র দাদা!"

চারু। "তা' নয়রে প্রবোধ! ওর মধ্যে আমার মা বসে আমায় দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে দেখ্‌ছেন। যেন মা আমাকে বল্‌ছেন—দেখিস্‌ চারু! আমি তোর বাপকে ছেড়ে এসেছি! তাঁর যেন কষ্ট না হয়! আমি তাঁর কোনদিন সেবা কর্‌তে পারি নি—তুই যেন তাঁকে কোনদিন ভুলিস্‌ নে। তিনিই তোর স্বর্গ, তিনিই তোর ইহপরকালের সব!" কথা বলিতে বলিতে চারু মনে কিসের একটা কম্পন অনুভব করিল, চক্ষের জলও বুঝি সেই কম্পনের বেগ অনুভব করিয়াছিল, তাই গড়াইয়া আসিয়া তাহার গণ্ডের উপর স্বচ্ছ মুক্তা পংক্তি উপহার দিল।

মায়াদেবী বিস্মিত হইয়া বাষ্প-রুদ্ধ-কণ্ঠে ডাকিলেন—"চারু!"

চারু ভয়ানক লজ্জিত হইয়া পড়িল—মায়াদেবীর দিকে চাহিতে পারিল না।

মায়াদেবী স্নেহভরে বলিলেন—"হ্যাঁরে চারু! তোর কি এখানে বড় কষ্ট হচ্ছে?"

"কষ্ট আর কি মা? বাবাকে ছেড়ে এসেছি তাই!" চারু মাথা নীচু করিয়া কথাগুলি বলিল।

মায়াদেবীর মনে একটা আত্মগ্লানি আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি চারুর অন্তঃকরণটার ভিতর এমন করিয়া কোনদিন তলাইয়া বুঝেন নাই। ছিঃ ছিঃ! এই বালককে পিতার দুঃখময়

ক্রোড় হইতে সরাইয়া আনিয়া কি অন্যায় কার্য্যই না করা হইয়াছে। সন্তানের কাছে পিতা চিরকালই উপাস্য, তিনি হাজার কেন মন্দই হউন না। তিনি আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

ক্ষণৈকপরে চুণিবাবু আসিয়া চারুর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন,—"বাবাজী! তোমার বাবাকে আজ খুব শুনিয়ে দিয়েছি!"

চারু চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল—"শুনিয়ে দিয়াছেন?"

"হাঁ, তুমি কিছু ভেব না, আমি থাক্‌তে তোমার কেশস্পর্শও কেউ কর্‌তে পার্‌বে না?"

চারুর চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—সে অতিকষ্টে সে ভাব সামলাইয়া বলিল—"আমি আজই বাড়ী যাব! বাবা তাড়িয়ে দিলেও আমি কোন রকমে সেখানেই থাক্‌ব।"

চুণিবাবু অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রবোধ ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া চারুর কোলের উপর বসিয়া পড়িয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিল—"তা' হবে না দাদা! কাল পূজা, কাল তোমাকে থাক্‌তেই হবে।"

চারু প্রবোধকে আদর করিয়া বলিল—"না ভাই! আজ আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে—আমি বাবাকে একবার না দেখে মা সরস্বতীকে অঞ্জলি দিতে পারব না।"

প্রবোধ ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া চুণিবাবুর কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবা! তা' হ'লে পূজা হ'বে না বল্‌ছি, দাদা না থাক্‌লে হ'তেই পারে না।"

চুণিবাবু সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—"তাই হবে, চারুর সত্যিকার পূজাটার আগে যোগাড় করে দি। তারপর মাটীর ঠাকুরের ব্যবস্থা করা যাবে।" চুণিবাবু সেই রাত্রেই অন্তর্হিত হইলেন।

(৬)

শনিবার শ্রীপঞ্চমী তিথি, মণ্ডপ আলোকরা প্রতিমার পূজার আয়োজন হইয়াছে। সাত্ত্বিক পুরোহিত ঠাকুর পূজায় বসিয়াছেন। থরে থরে কুন্দ, পলাশ প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পশ্রেণী পুষ্পপাত্রে সজ্জিত রহিয়াছে। ধূপ ধূনা গুগ্‌গুল প্রভৃতির গন্ধে চারিদিক আমোদিত। মায়াদেবী আজ "অন্নপূর্ণা" মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন। মা মা রবে চারিদিক্ মুখরিত। একটা আনন্দোচ্ছ্বাস-মিশ্রিত কলকণ্ঠের অভিব্যক্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

পূজা শেষ হইয়াছে। পুরোহিত মহাশয় অঞ্জলি দেওয়ার জন্য ব্যস্ত। পাড়ার একপাল ছেলেরা পুরোহিত ঠাকুরকে ঘিরিয়া ফুল লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সেই শিশুদিগের কলকণ্ঠনিঃসৃত উল্লাসধ্বনির মধুর উচ্ছ্বাসে মাতৃপ্রতিমাও যেন সজাগ হইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

চারু কিন্তু সেখানে ছিল না। মৃণ্ময়ী প্রতিমার ভিতরে সে কি একটা ভাব খুঁজিয়া না পাইয়া—একটা ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া কি করিতেছিল।

মায়াদেবী তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া না পাইয়া ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইতেছিল—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

মায়াদেবীর চক্ষে জল আসিয়াছিল। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বালকের এই একের মধ্যে সর্ব্বদেবতার পূজা প্রত্যক্ষ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিলেন।

ক্ষণপরেই গৃহ দ্বার খুলিয়া গেল। চারু বাহিরে আসিয়া মায়াদেবীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বড় লজ্জিত হইয়া পড়িল, বলিল—"চল মা! এইবার অঞ্জলি দিয়ে আসিগে।"

মায়াদেবী বলিলেন—"চল বাবা!"

তখন পুরোহিত মহাশয় বলিতেছিলেন—

"ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।"

তখন পূর্ণ মনে পূর্ণ উচ্ছ্বাসে চারু ও প্রবোধ বলিল—

"ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥"

মধুর দৃশ্য! সেই মধুর ভাব আর সেই মন্ত্রের মধুর গাম্ভীর্য্য যেন কত মনের মালিন্য ধুইয়া মুছিয়া দিয়া গেল। চারু ও প্রবোধ মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিল।

কে যেন ডাকিল—"চারু!"

চারু মস্তক তুলিয়া দেখিল—তাহার পিতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্নেহস্বরে ডাকিতেছেন। সে তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ সেই পিতৃচরণে লুঠাইয়া দিল।

প্রবোধ পার্শ্ব হইতে চেঁচাইয়া বলিল—"জ্যেঠামহাশয়! জ্যেঠামহাশয়!"

পশ্চাতে চুণিবাবু—নবীনচন্দ্রের পায়ে ধরিয়া নিজের অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছিলেন।

শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ।

আবাহন।

এসহে আমার চির প্রিয়তম জীবনের চিরসাথী,
এস উর্ব্বরি মরু ঊষর হৃদয়, ভেদিয়া তামস রাতি;
এস সত্য সূর্য্যরূপে হইয়া প্রকাশ আজিগো আমার সকাশে,
এস সুখের হাসিতে ভাসিতে ভাসিতে অধীর আকুল বাতাসে
এস বসন্ত বিপিনে পিক-কুহুতানে মানস মুগ্ধ মোহিয়া,
এস বাঁশরীর তানে শ্রীমতীর সনে উজান যমুনা বাহিয়া।

এস তপ্ত তপনে দীপ্ত গগনে বরণের রাগে রাঙিয়া,
এস জননীর মত খুলিয়া হৃদয় সন্তান মুখ চাহিয়া।
এস সুখ সঞ্চারী প্রেম-প্রবাহে শুষ্ক জীবন মঞ্জরি',
এস হৃদয়-কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে বাসনার বাসে গুঞ্জরি',
এস প্রাণের মদিরা অধরে মাখিয়া লগন বক্ষ বিসারি,'
এস সব আভরণ দূরে ফেলে শুধু অনুরাগে কায় আবরি।
এস দুঃখ-দৈন্য যত করিয়া দলিত, বিপুল পুলক আলোকে,
এস আবেগ উৎসে ভাসায়ে ধরণী মাতায়ে দ্যুলোক ভূলোকে।
এস জীবনের চির যতনের ধন, মরণের চিরশান্তি,
এস মানবের চির চরম লক্ষ্য, ঘুচায়ে সকল ভ্রান্তি।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যরত্ন, বি,এ।

ব্রাহ্মণ-জাতির বর্ত্তমান অবস্থা।

বরেণ্য ব্রাহ্মণগণ! আজ আপনাদের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে। নিবেদনটী এই,—আপনারা একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনারা কি ছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ দশায় উপনীত হইয়াছেন। পূর্ব্বাপর অবস্থা পরিবর্ত্তনের হেতু কি? সুদূর অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায়, একদিন এই ব্রাহ্মণজাতি জগতের অর্চ্চনীয় ছিলেন, এই অমিততেজাঃ, সরল অথচ মেধাবী, জ্ঞানবীর ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বরপ্রদত্ত-সহজশক্তিবলে মনুষ্য-সমাজ সুন্দররূপে পরিচালন করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা অনাদি-সিদ্ধ সনাতন অপৌরুষেয় বেদের গূঢ় রহস্য সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কার করত প্রাণিনিচয়ের ইষ্টপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টপরিহারের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। যাঁহারা শব্দ, স্পর্শাদি বিষয় উপভোগ পরিত্যাগ করত অবিষয় ব্রহ্মরসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত ও কৃতকৃত্য হইয়াছেন। এবং সেই মধুর রস জগদ্বাসীকে বিতরণ করিয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যুরূপ ষড়ূর্ম্মিমালা পরিবৃত ভীষণ-সংসার পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হইবার পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবিধ জলজন্তু সঙ্কুল অকূল সমুদ্র গুরুভাব ধারণ এবং প্রতিনিয়ত বর্দ্ধমান অভ্রংলিহ গিরিবরের স্থির স্তিমিতভাবে অবস্থিতি যাঁহাদের তপঃপ্রভাব ও অলৌকিক মহিমা বুঝাইয়া দিতেছেন। লোকজননী শ্রুতি সমুচ্চকণ্ঠে যাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। এবং সেই বেদোক্ত সত্যকে সুদৃঢ় করিবার জন্য ভগবান্ নারায়ণ নরকলেবর ধারণ করিয়া যাঁহাদের নিকট শিষ্যত্ব

অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই আদিম সভ্যতার প্রবর্ত্তক, ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, লোকপূজ্য ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ কেন এবম্বিধ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন! তাহা কি আপনারা বলিয়া দিতে পারেন?

এই অবস্থান্তরের কারণনির্ণয় করিবার জন্য কত শত মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ চেষ্টা করিতেছেন. এবং তাহার কারণ ও জনসমাজে প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু নবভাবে প্রদীপ্ত; আধুনিক শিক্ষিতব্যক্তিগণ তাঁহাদের সেই কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না, অপিচ, তাহার অযৌক্তিকতা ও অলীকতা প্রতিপাদন করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেছেন না।

আমাদের মনে হয়, এই অবস্থান্তরের কারণ, শাস্ত্র-নিয়ম-লঙ্ঘন। বেদাদিশাস্ত্রের উপদেশ এবং সদাচারের অননুষ্ঠানে কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ এত দুর্ব্বল ও নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন। যতদিন তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান করিতেন; ক্ষমা, দয়া, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণরাশির আধার ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের অণুমাত্রও লঘুতা দৃষ্ট হয় নাই।

এই বরেণ্য ব্রাহ্মণ-জাতির এইরূপ অধঃপতনের নানা কারণ বিদ্যমান থাকিলেও ভোগে অত্যধিকপরিমাণে আসক্তি এবং ত্যাগশীলতার অভাবই ইহার প্রধান কারণ। সংযম যাহাদের চিরসহচর ছিল, আজ সেই ব্রাহ্মণগণ বিষম বিষয় সেবায় মত্ত হইয়া অকালে কালের কবলে নিপতিত হইতেছেন। পতঙ্গগণ যেমন অগ্নির রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে পতিত হয়, এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করে। সেইরূপ আধুনিক ব্রাহ্মণগণ বিষয়-মোহে উন্মত্ত হইয়া তাহাতে আসক্ত হন এবং তাহার সেবা করিতে করিতে পরমার্থ বিস্মৃত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হন। সাধারণ লোক বিষয়ের সেবা করিয়া সুখলাভ করিতেছে, আমিও সেইরূপ অনুকরণ করিব, এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ নিজের অবনতির পন্থা প্রশস্ত করিতেছেন। প্রাণি-মাত্রই ভগবৎসৃষ্ট, সুতরাং মানব যে, ভগবানের সৃষ্ট জীব, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ মানব-জাতির মধ্যে এক একটী বর্ণকে এক একটী কার্য্য সাধনের উদ্দেশে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ যে কিজন্য ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ভগবান্ মনু তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—

"ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥" ১।৯৯

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র পৃথিবীর সমস্ত লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন, ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণীর প্রভু এবং ধর্ম্মকোষের রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে।

ভগবান্ এক একটী কার্য্যের ভার এক একটী বর্ণের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে যেটী ভগবৎ প্রাপ্তির সাধন, যাহা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, যাহা হইতে জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, যাহা মানব-জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহার ভার ব্রাহ্মণেরই উপর রক্ষিত হইয়াছে। যদি ব্রাহ্মণগণ ভগবদ্দত্ত ধর্ম্মকোষের রক্ষক হইয়া সেই ধর্ম্ম-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ কোথায়?

যাঁহার ত্যাগশীলতা নাই, যিনি ইন্দ্রিয়ের দাস, সে ব্রাহ্মণ কখনও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে সমর্থ হ'ন না। নিত্য, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, উপাসনা প্রভৃতির মধ্যে ত্যাগ একান্ত আবশ্যক। ত্যাগ ও ভোগ এ দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। ত্যাগকে অবলম্বন করিলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভোগকে অবশ্য বর্জ্জন করিতে হইবে। ভোগাসক্ত পুরুষের হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ উপ্ত হইতে পারে না। তজ্জন্য মনু বলিয়াছেন—

"অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।" ২।১৩

যাঁহারা অর্থকামনায় আসক্ত নহেন, তাঁহাদের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ বিহিত হয়।

এই দুর্ব্বিপাক অর্থকামনাই মনুষ্যকে সন্মার্গ হইতে বিচ্যুত করে। যাঁহার অভাব আছে, তিনি ত অর্থচিন্তা করিবেনই, কিন্তু যাঁহার অভাব নাই, তিনিও সঞ্চয়ের আশায় সেই অর্থ কামনা-পিশাচীকে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা করিয়া রাখিয়াছেন। এই অর্থবাসনাই ভোগের পথ প্রশস্ত এবং ত্যাগের দিক সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয়। বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ ব্রাহ্মণ বিরল, যাঁহারা ত্যাগের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতঃ ভোগকে আয়ত্ত করিতে পারেন, বিলাস বাসনাকে বর্জ্জন করিয়া সংযমকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন। যখন সনাতন আর্য্য-সমাজ এবম্বিধ ব্রাহ্মণ লাভ করিবে, তখন তাহার দৈন্য ঘুচিয়া যাইবে, আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ।

শুদ্ধিতত্ত্বে—গুরুশিষ্য সংবাদ।

শিষ্য—গুরুদেব! অসপিণ্ড আচার্য্যের মরণে অঘবৃদ্ধিমদাশৌচ হয় না; কেন না তাদৃশ আচার্য্যের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ এবং পাঁচদিন মহাহবিষ্য। সুতরাং অল্প অশৌচ বলিয়া অঘবৃদ্ধি মদাশৌচ হইল না, বেশ বুঝিলাম। কিন্তু সপিণ্ড আচার্য্যের মরণে পূর্ণাশৌচ এবং অশৌচের পরও দুদিন যাবৎ মহাহবিষ্য করিতে হয়। অতএব সপিণ্ড আচার্য্যের মরণে কেন অঘবৃদ্ধি-মদাশৌচ হয় না?

গুরু—বৎস! একটু প্রণিধান করিলে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইত না। যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যতদূর শক্তি বিশদ করিতেছি। আচার্য্যের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ এবং পাঁচদিন পর্য্যন্ত মহাহবিষ্য করিতে হয়। তিনি সপিণ্ডই হউন, আর অসপিণ্ডই হউন মহা-হবিষ্যে কোন ভেদ নাই। তবে বেশীর ভাগ তিনি সপিণ্ড বলিয়া তাঁহার মরণে সম্পূর্ণ অশৌচ হয়, তাহা সপিণ্ড আচার্য্য বলিয়া নয়, কেবল সপিণ্ড বলিয়া। তাদৃশ ব্যক্তির মরণে আচার্য্যত্ব নিবন্ধন ত্রিরাত্র অশৌচ, সপিণ্ডত্ব জনিত সম্পূর্ণ অশৌচের অন্তর্গত থাকে।

অর্থাৎ ঐ দুই অশৌচ হরিহররূপে অপৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু পাঁচদিন বই ১২দিন ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাহবিষ্য করিতে হয় না। বর্দ্ধিত দিনদ্বয় যাবৎ মহাহবিষ্য যদি সম্পূর্ণ অশৌচের অঙ্গ হইত, তাহা হইলে অঘবৃদ্ধি মদাশৌচ বলিতে পারিতে; কিন্তু ও যে আচার্য্য-মরণ-নিবন্ধন ত্রিরাত্র অশৌচের অঙ্গ। সুতরাং পিতা বা মাতার মরণের ন্যায় সপিণ্ড আচার্য্যের মরণে অঘবৃদ্ধি-মদাশৌচ হয় না এবং একবৎসর যাবৎ দেহাশৌচ হয় না। কাজেই পিতৃ-মাতৃ মরণাশৌচের ন্যায় সপিণ্ডান্তরের অশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধপাত বশতঃ অশৌচের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। সপিণ্ড অথচ আচার্য্য একজন, কিন্তু দিনপঞ্চকব্যাপক মহাহবিষ্যযুক্ত ত্রিরাত্র অশৌচ ও সম্পূর্ণাশৌচ—এই দুই প্রকার অশৌচ তন্মরণে হইয়া থাকে। যেমন কন্যা হইলে মার প্রসব-নিবন্ধন একমাস অশৌচের মধ্যে সপিণ্ড জননাশৌচ তাহার অন্তর্গত থাকে। অধীনতাবশতঃ সে স্বাধীনভাবে কোন বিষয়ে নিয়ন্তা হয় না। গুরু অশৌচই স্বাধীন। লঘু অশৌচ তদধীন। ইহাই মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের মত। কিন্তু দেবী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মত—১০ দিন অশৌচ, এবং ১২ দিন অক্ষার লবণ ভোজন। সুতরাং সপিণ্ডাচার্য্য মরণ অঘবৃদ্ধি-মদাশৌচ হয়; কাজেই অন্য সপিণ্ডাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে :পড়িলে পূর্ব্বাশৌচ এবং পরার্দ্ধে পড়িলে পরাশৌচ যায়, এ মত দুর্ব্বল।

শিষ্য—প্রভো! এ কথা বেশ বুঝিলাম কিন্তু আর একটী সংশয় উপস্থিত।—সপিণ্ডদত্তক পুত্র মরণে সর্ব্বথা সম্পূর্ণ অশৌচ হওয়া উচিত; কেন না দত্তক পুত্র নিবন্ধন ত্রিরাত্র অশৌচ, সপিণ্ডতা নিবন্ধ দশরাত্র অশৌচের অন্তর্গত হওয়া যুক্তিযুক্ত। এখানেও দত্তকত্ব ও সপিণ্ডত্ব—এই দুইটী কারণ উপস্থিত। সপিণ্ডাচার্য্যমরণে এইরূপ যুক্তিপ্রদর্শন করিলেন। অতএব ইহার সমাধা কি?

গুরু—বৎস! দত্তকপুত্রের ত্রিরাত্র অশৌচ বাচনিক। দত্তকপুত্রের সপিণ্ডতাবশতঃ সম্পূর্ণ অশৌচ হয় না। একমাত্র ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। দত্তক সপিণ্ডই হউক, আর অসপিণ্ডই হউক, সর্ব্বথা ত্রিরাত্রাশৌচ হয়। ইহাই ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের অভিমত। তাব "মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ"। কেহ যে দত্তক সপিণ্ড-মরণে সম্পূর্ণ অশৌচ বলেন না, এমন না। এইখানে বলিয়া রাখি—কন্যার সপিণ্ডতার ন্যায় দত্তকের সাপিণ্ড্য ত্রৈপুরুষিক, সপ্তমপুরুষব্যাপক নয়। ত্রৈপুরুষিক সাপিণ্ড্য বাচনিক। বাচনিক বিষয়ে বচন ছাড়া দৃষ্টপরিকল্পনা করা নিবন্ধকারদিগের অভিমত নয়; সুতরাং ত্রৈপুরুষিক সাপিণ্ড্য স্থলেও সকুল্যাদি দশম পুরুষাদি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে। অন্য কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। সুতরাং তাদৃশ স্থলে দশমপুরুষ পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ এবং সমানোদকাদি পর্য্যন্ত পক্ষিণী প্রভৃতি। কিন্তু মহেশপুরের কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি সরস্বতী মহাশয় বিষমশিষ্টতাভয়ে সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সকুল্য এবং তত্তুলনায় সমানোদকাদি প্রসার করিয়া দিতেন। ফলতঃ সে মতও তত প্রসিদ্ধ নয়, কেন না যেখানে বচন সেইখানেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য—আচ্ছা, স্ত্রী পুত্রের সহিতও কি দত্তকের ত্রিরাত্র অশৌচ হয়?

গুরু—না—দত্তকত্ব-নিবন্ধন যাহাদের সহিত সম্বন্ধ, তাহাদেরই ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। যাহাদের সহিত ভার্য্যা-ভর্ত্তৃত্ব বা জন্যজনকত্ব সম্বন্ধ, তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ অশৌচ হয়। অর্থাৎ পিত্রাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষের ও তৎসন্ততির সহিত দত্তকত্ব-সম্বন্ধ-নিবন্ধন ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। এবং পত্নী-পুত্রাদির সহিত সপিণ্ডতাবশতঃ সম্পূর্ণ অশৌচ হয়।

"নাসৌ মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নং।" ইহাতেও যে মতভেদ নাই, এমন নয়। তবে সে মত নিবন্ধকারগণের বড় অনুমোদিত নয়। জটিল বিষয়ে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক।

শিষ্য—পূর্ব্বে বলিয়াছেন—পিতৃগৃহে দুহিতার সন্তান হইলে মাতামহের ত্রিরাত্র অশৌচ এবং সপিণ্ডাদির সম্পূর্ণাদি অশৌচ হয়। কিন্তু ঐ সন্তান দ্বিতীয়দিনে মরিলে সপিণ্ডের সদ্যঃশৌচ হয়। অর্থাৎ সপিণ্ডের অশৌচ থাকে না। কিন্তু মাতামহাদির অশৌচ থাকে। সেইদিন মাতামহের ও সপিণ্ডবর্গের সকুল্যাদি জন্মিলে মাতামহের পূর্ব্বাশৌচে সকুল্যাদি অশৌচ যায়, কিন্তু যাহার সহিত ঘনিষ্ট অশৌচ সম্বন্ধ, সেই সপিণ্ডের সকুল্যাদি মরণজনন-নিবন্ধন পৃথক্ অশৌচ হয়, ইহা কেমন লাগে।

গুরু—উহা পূজ্যপাদ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় কেমন কেমন লাগে বলিয়া ওরূপ স্থলে বিষম-শিষ্টতা ভয়ে মাতামহাদিরও তথায় সদ্যঃশৌচ হয়, বলিতেন। সুতরাং উভয়ই স্ব স্ব সকুল্যাদির জনন মরণনিবন্ধন পৃথক্ অশৌচভাগী হয়।

শিষ্য—সপিণ্ডমরণের অশৌচমধ্যে দশমমাসে গর্ভবিপত্তি হইলে কিরূপ অশৌচ হয়?

গুরু—কথিত স্থলে মাতারও পূর্ব্ব অশৌচে শুদ্ধি হয়। গর্ভবিপত্তিতে মাতার অঙ্গ অস্পৃশ্য হয় না।

শিষ্য—যেখানে একদিনে প্রথমে সপিণ্ডের মরণ হয়, পরে পিতৃমরণ হয় এবং দশমদিনে মাতৃবিয়োগ হয়, তথায় কিরূপ অশৌচের ব্যবস্থা?

গুরু—অশৌচপাতের প্রথম দিনে সপিণ্ডদ্বয়ের মরণে সম্পূর্ণ অশৌচ ও যাবৎ অশৌচ অঙ্গ অস্পৃশ্য হয়। সপিণ্ডদ্বয়ের মরণজনিত অস্পৃশ্যতাযুক্ত অশৌচ অঘবৃদ্ধি মদাশৌচতুল্য হয়। পিতা ও পুত্র পরস্পর সপিণ্ড। পিতৃমরণাশৌচ মহাহবিষ্যনিবন্ধন অঘবৃদ্ধিমদাশৌচ হইলেও সপিণ্ডাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে পাতহেতু উহার অঘবৃদ্ধিমত্ত্বাধীন গৌরব বচনবলে অস্বীকৃত হইয়াছে। তাই পিতৃ মরণাশৌচ সপিণ্ডাশৌচের অধীন হয়, এবং উভয় অশৌচমিলনে যাবদশৌচ সপিণ্ডবর্গ অস্পৃশ্য হয়। দশমদিনে মাতৃমরণ হইলে অঘবৃদ্ধিমদাশৌচ হয়। ঐ অশৌচ সপিণ্ডাশৌচের পরার্দ্ধপাতী হওয়ায় স্বাবধি সম্পূর্ণাশৌচ হইতে পারিত, কিন্তু পূর্ব্বাশৌচ-দ্বয়ে যাবদ্ অশৌচ অঙ্গ অস্পৃশ্য হওয়ায় তুল্য অশৌচ হইয়াছে। তুল্য অশৌচান্তর দশমদিনে হইলে দু'দিন মাত্র বাড়ে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির যথাক্রমে ১২ দিন, ১৪ দিন, ১৭ দিন ও ৩২ দিন অশৌচ হয়। পূর্ব্বাশৌচই দিনদ্বয় বৃদ্ধির সহিত থাকিয়া যায়। কথিতস্থলে প্রথমে মৃত সপিণ্ডের পুত্রের ও স্ত্রীর সম্পূর্ণ অশৌচ হয়। দ্বিতীয় তৃতীয় মৃতব্যক্তির পুত্র দিনদ্বয়

বর্দ্ধিত সম্পূর্ণাশৌচের ভাগী হয়। তথায় মহাহবিষ্য ও তাহার উপর আরও ছদিন বাড়িয়া যায়। অন্য সপিণ্ডবর্গের ১০দিন মাত্র অশৌচ হয়।

শিষ্য—শূদ্রার প্রসবাশৌচের মধ্যে ভর্ত্তৃমরণ বা সপিণ্ড মরণ হইলে কিরূপ অশৌচ হয়?

গুরু—শূদ্রার প্রসবাশৌচ একমাস এবং ত্রয়োদশ দিন অঙ্গ অস্পৃশ্য হয়। ভর্ত্তৃমরণে একমাস অশৌচ এবং ৩২ দিন অক্ষার লবণ ভোজন। ত্রয়োদশদিন অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হইতে ৩২ দিন মহাহবিষ্যের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব ভর্ত্তৃ-মরণাশৌচে শূদ্রার প্রসবাশৌচ যায়। কিন্তু অন্য সপিণ্ডের মরণ পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক প্রসব দিনাবধি একমাস অশৌচ হয়। প্রসবে অঙ্গ অস্পৃশ্য বহুদিন থাকে বলিয়া গুরুত্ব হওয়ায় প্রসবাশৌচে মরণাশৌচ যায়। সপিণ্ড মরণে ৩ দিনমাত্র অঙ্গ অস্পৃশ্য হয়।

শিষ্য—সপিণ্ড মরণের দশম দিনে অপর সপিণ্ড মরিলে ব্রাহ্মণের দ্বাদশদিন অশৌচ হয়। সেই বর্দ্ধিত দিনদ্বয়ের মধ্যে অথবা দশমদিনে পিতার বা মাতার অথবা ভর্ত্তার মরণে অর্থাৎ মহাগুরু নিপাতে কিরূপ অশৌচ হয়?

গুরু—বর্দ্ধিত দিনদ্বয়ের মধ্যে মহাগুরুনিপাতে দ্বাদশাহব্যাপক গুরু সপিণ্ডাশৌচে মহাগুরু-নিপাতাশৌচ যায়। সকল গুরুত্ব অপেক্ষায় কালের গুরুত্বের গৌরব বেশী, অতএব কালের গুরুত্বই প্রথমে লক্ষ্য করিতে হয়। কিন্তু দশমদিনে সপিণ্ডমরণের পরই সেই দিন মহাগুরু-নিপাত হইলে অশৌচ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। যোগ্যতা স্বীকার করিয়া কেহ বলেন্—প্রথম অশৌচ দ্বাদশ দিন ব্যাপক স্বীকার করাই উচিত, তাহা হইলে প্রথমাশৌচের ত্রয়োদশদিনে মহাগুরুর শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। কিন্তু দেবী তর্কালঙ্কার মহাশয়রা যোগ্যতা স্বীকার করেন না। স্বাবধি একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিতে বলেন। অশৌচ সংগ্রহকারক মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়েরও এই মত বলিয়া বোধ হয়। ক্ষুদ্র অশৌচ যখন বৃহৎ হয়, তখন তাহার ভোগে গুরুত্ব হইয়া থাকে, যোগ্যতা-স্বীকার করিলে অনেক স্থলে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। স্মার্ত্তের পাঠস্বরসে এইরূপ বলা যাইতে পারে, কেন না দ্বাদশদিনে পিত্রাদির মরণ বলেন কেন? অন্যথা সপিণ্ডান্তর মরণের পর সেই দশম একাদশ বা দ্বাদশদিনে মৃতপিতৃক প্রথম সপিণ্ডাশৌচের ত্রয়োদশদিনে শ্রাদ্ধ করিবে—লিখিতেন। তবে একাদশ বা দ্বাদশদিনে মহাগুরু পাত হইলে দীর্ঘকালীন প্রথম সপিণ্ডাশৌচে মহাগুরুমরণাশৌচ যায়। অতএব প্রথমাশৌচের পরার্দ্ধে ও দ্বিতীয়াশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে (দ্বিতীয়াশৌচের দিনে) মহাগুরু মরণে অঘবৃদ্ধিমদাশৌচ হয়। কথিত স্থলে প্রথম মৃতপিতৃকের স্বাবধি সম্পূর্ণাশৌচ হয়। দ্বিতীয় মৃত পিতৃকেরও স্বাবধি সম্পূর্ণ অশৌচ হয়। তৃতীয় মৃতপিতৃকের কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি।

শিষ্য।—ভর্ত্তৃমরণাশৌচের দশমদিনে রজস্বলাশৌচ হইলে কবে স্ত্রী ভর্ত্তৃশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে?

গুরু।—উক্তস্থলে স্ত্রী রজস্বলাশৌচের পঞ্চমদিনে ভর্ত্তৃশ্রাদ্ধ করিবে। দশমদিনে পূরক দিতে পারিবে। মতান্তরে শ্রাদ্ধদিনে পূরকপিণ্ড দিয়া করিতে হইবে। উক্ত স্থলে শ্রাদ্ধের জন্য কৃষ্ণপক্ষ একাদশী বা অমাবস্যার প্রতীক্ষা করিতে হয় না।

শিষ্য।—মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তখন সূর্য্য উদিত কি অনুদিত সংশয় স্থল অর্থাৎ তখন বার প্রবৃত্ত হইতেও পারে নাও হইতে পারে—এইরূপ সংশয় হইলে কিরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে?

গুরু।—গর্ভাবস্থায় মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—ইহা ঠিক। তবে সেই মরণ জনন আজ কি কাল, তাহা অঠিক। ওরূপস্থলে দর্শনাবধি অশৌচের অবধারণ স্মার্ত্তের অভিমত। "মৃতজাতে তু মরণস্য স্বল্পাশৌচনিমিত্তকত্বাৎ" স্মার্ত্তের লেখার স্বরসে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কেন না ঐ মৃতজাত শিশু গর্ভাবস্থায় তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্বদিনেও মরিতে পারে। কবে মরিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। তাহার মরণাশৌচ চলিয়াও যাইতে পারে। তাই যদি হয়, তাহার মরণ স্বল্পাশৌচেরও নিমিত্ত হয় না। এ অবস্থায় স্মার্ত্ত যখন লিখিয়াছেন—'তাহার মরণ স্বল্প অশৌচের নিমিত্ত।' তখন বুঝিতে হইবে সংশয়স্থলে দর্শনাবধি মরণ, জনন ঠিক করিতে হয়। আবার যদি মৃতজাত কি জাতমৃত—সংশয় হয়, তাহা হইলেও যেরূপ দেখা যায় সেইরূপ ঠিক করা উচিত অর্থাৎ যখন দেখিতেছি মরিয়াছে, তখন মৃতজাত অবধারণ করাই নিবন্ধকারদিগের অভিমত।

অনেক দিন হইতে অশৌচ সঙ্করের উপদেশ দিয়া আসিতেছি। এক বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় বক্তার ও শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনায় আর এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিব না ভাবিতেছি। তবে খণ্ডাশৌচের সাঙ্কর্য্য বিষয়ে ২।১ কথা বলিয়া অন্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিব ভাবিতেছি। তুমিও আমার অভিমত বিষয়ে প্রশ্ন করিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

পঞ্জিকা-সংস্কার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বম্বে মহাসভার নির্ণয় সাতটির মধ্যে প্রথম তিনটির একটু আলোচনা আবশ্যক করে, অপর চারিটির সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা বা সন্দেহ উপস্থিত হইবার কারণ নাই। সে তিনটি পরস্পর নিত্যসম্বন্ধে বদ্ধ, তজ্জন্য তাহারা একত্র আলোচ্য। সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ষমান গ্রহণ করাতে এই আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সৌরপুস্তকের বর্ষমান ৩৬৫।১৫।৩১।৩১।২৪; এই বর্ষ চাক্ষুষ, নাক্ষত্র বর্ষ হইতে সামান্য বিভিন্ন।

সভা, চাক্ষুষ বিশুদ্ধ বর্ষমান না লইয়া সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত মান কেন লইলেন সে বিষয় সাধারণের অবগতির আবশ্যক। যে সময়ে সভা আহুত হয় অর্থাৎ ১৩১১ সালে ভারতবর্ষের

নানা স্থানে, উত্তর ভারতের সর্ব্বত্রই সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ষমান প্রচলিত ছিল। জ্যোতিঃশাস্ত্র-সম্মত পরিশুদ্ধি সভার উদ্দেশ্য হইলেও প্রচলিত বিষয় যতদূর রক্ষা করা যায়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য ছিল। পণ্ডিতমণ্ডলী দেখিলেন যে,—প্রচলিত বর্ষমান বজায় রাখিয়া যথাস্থানে তজ্জনিত আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিলে বৈজ্ঞানিক অশুদ্ধিও হয় না। অথচ মাস, তারিখ লইয়া কোন গোলযোগ ঘটে না। এমন সময় বর্ষমান বজায় রাখাই তাঁহার যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু এ বর্ষমান ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তন করিবার বিরোধে কোন আদেশ রাখিলেন না। অর্থাৎ এক্ষণে সূর্য্য-সিদ্ধান্তের বৎসর লওয়া হউক পরে বিধেয় বিবেচিত হইলে পরিবর্ত্তন করা হইবে—সভার গূঢ় মন্তব্য এই। এই সকল কথা লেখকের কল্পনা-সম্ভূত নহে, ঐতিহাসিক সত্য। লেখক এই সভায় নিমন্ত্রিত অন্যতম সদস্য ছিলেন। সভায় যে পন্থা যথার্থ অনুসরণ করা হইয়াছিল, তাহাই যথাযথ বিবৃত হইল।

সামান্য অশুদ্ধ বর্ষমান বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে। যেমন ঘড়িতে সামান্য ভ্রম থাকিলেও, সেই ভ্রমের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকিলে সময় নিরূপণ অনায়াস-সাধ্য, সেইরূপ বর্ষমাণের ভ্রান্তির পরিমাণের অবগতি থাকিলে জ্যোতিষিক তত্ত্ব অভ্রান্ত হয়। বিষয়টির গুরুত্ব স্মরণ করিয়া আমরা কেবলমাত্র উপমা দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা জ্যোতিষ চর্চ্চা করেন নাই, তাঁহাদের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে এই উপমা হয় ত প্রযোজ্য নহে। সেইজন্য এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্ব্বিদের মত প্রদর্শন করা আবশ্যক। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বস্তু কোন মতেই অনুমোদন করিবেন না, একথা অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস। সেইজন্য জ্যোতিষশাস্ত্র মন্থনশীল পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিউকম্ (Newcomb) সাহেবের মত প্রকাশ করা এস্থলে অনুপযুক্ত হইবে না।

বর্ষমাণ লইয়া ইউরোপেও এক সময় বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, একথা অল্পাধিক সকলেরই অবগতি আছে। রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ বীর যুলিয়স্ সিজার (Julius Caesar) সায়ন বর্ষমাণ বজায় করিবার উপায় উদ্ভাবনার্থ সোসিজিনিস্ (Sosigenis) নামক জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে নিযুক্ত করেন। ইনি, তিনটি ৩৬৫ দিনের বৎসরের পর একটি ৩৬৬ দিনের বৎসর নিরূপণ করিয়া দেন। ইহাতেও বর্ষমাণ একেবারে সূক্ষ্ম হইল না, ভ্রান্তি চলিতে ও পুঞ্জীকৃত হইতে লাগিল। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মাধ্যক্ষ (Pope) গ্রেগরী (Gregory) বর্ষমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম করিলেন ও পুঞ্জীকৃত ভ্রান্তির আংশিক শোধনার্থে দশটি দিন পরিত্যাগ করিয়া সে বৎসর ৪ঠা অক্টোবরের পরদিন ১৫ই স্থির করিয়া দিলেন। ইউরোপের সর্ব্বত্র কিন্তু সেই সংশোধন সেই সময়ে গ্রাহ্য হইল না; রুষিয়ায় আজিও গ্রাহ্য হয় নাই। কিন্তু যে সকল দেশে অশুদ্ধ বর্ষমাণ চলিতে লাগিল তাহাদের জ্যোতিষ কলঙ্কিত হইল না; অদ্যকার রুষিয়ার জ্যোতিষ ও বেধশালা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত।

একশত সত্তর বৎসর পরে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে রাজমন্ত্রী চেষ্টার ফীলও ইংলণ্ডে বিশুদ্ধ বর্ষমান প্রচলন করিলেন ও পুঞ্জীকৃত ভ্রান্তির মধ্যে এগারো দিন পরিত্যক্ত হইল। ২রা

সেপ্টেম্বরের পর ১৪ই সেপ্টেম্বর ধরা হইল। এই পরিবর্ত্তন সহজে হয় নাই ; কুলি মজুর শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের যথার্থ এগারো দিনের বেতন ক্ষতি হইতেছে মনে করিয়া সশস্ত্র মন্ত্রনাভবনের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমাদের এগারো দিন ফিরিয়া দেওয়া হউক্ বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ছিল। তবে, ইতর সাধারণ লোকের কথা আমাদের বিবেচ্য নহে। আমাদের চিন্তা করিবার প্রথম বিষয় এই যে যুলিয়স্ (Julius) সিজারের (Cæsar) সময় হইতে পুঞ্জীকৃত চৌদ্দ দিন ভ্রমের মধ্যে এগারো দিন সংশোধিত হইল, বাকী তিন দিন রহিয়া গেল, কিন্তু তজ্জন্য ইংলণ্ডীয় জ্যোতিষ অশুদ্ধ নহে, সম্পূর্ণ দৃক্‌সিদ্ধ ; আবার, রুষিয়ায় চৌদ্দ দিনই রহিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাতেও রুষিয়ার বেধালয়গুলি অপদার্থ নহে। চিন্তার দ্বিতীয় বিষয় নিউকম্ (Newcomb) সাহেবের সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত মন্তব্য। তিনি বলেন "The change of calendar met with much popular opposition, and it may hereafter be conceded that in this instance the common sense of the people was more nearly right than the wisdom of the learned. (সাধারণ লোকে, এই তারিখে পরিবর্ত্তনে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ সকলেই কালে স্বীকার করিবেন যে এক্ষেত্রে জনসাধারণের সহজ বুদ্ধি বিদ্বৎ সমাজের জ্ঞানাপেক্ষা অধিকতর বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছিল।)

অতঃপর 'ভ্রান্ত বর্ষমান লইলেও জ্যোতিষ বিজ্ঞান সম্মত থাকিতে পারে একথা পাঠক বিশ্বাস করিতে দ্বিধা করিবেন না, আমাদের দেশের একটি কিম্বদন্তীর বৈজ্ঞানিকতা বুঝিতে পারিবেন। কথিত হয় যে সূর্য্যগ্রহে বীজ-সংস্কার করিলে নির্ব্বংশ হয়, অর্থাৎ করিতে নাই। সূর্য্যে বীজ-সংস্কার না দেওয়া আর ভ্রান্ত বর্ষমান গ্রহণ করা একই কথা। সুতরাং এই কিম্বদন্তীর অর্থ 'অশুদ্ধ বর্ষমান গ্রহণ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে'। সম্প্রতি নিউকম্ সাহেব যাহা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছেন,—ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যাহা কার্য্যত করিয়াছেন, সেই সত্য ভারতে কিম্বদন্তী আকারে বিদ্যমান।

সূর্য্য-সিদ্ধান্তের বর্ষমাণ লইলে চাক্ষুষ অয়নাংশ প্রচলিত (১৩২৩) সালে ২২।৩৩ না হইয়া পারে না। সেইজন্য বম্বে সভা ২২ হইতে ২৩শের মধ্যে অয়নাংশ লইতে আদেশ দিয়াছেন। এইরূপ অয়নাংশ গ্রহণ বম্বে-সভার অতিরিক্ত অনেক পণ্ডিতের মত। কাশীর ৺বাপুদেব শাস্ত্রী C. I. E. * প্রণীত পঞ্জিকানুসারে বর্ত্তমান অয়নাংশ ২২।৩৩। ইউরোপখ্যাত উড়িষ্যার জ্যোতির্ব্বিদ্ চন্দ্রশেখর সামন্তের গণনানুসারে সাম্প্রত অয়নাংশ ২২'৪৩। বিলাতের জ্যোতিষ-সভার অন্যতম সভ্য, রায় বাহাদুর যোগেশবাবুর † "জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" নামক পুস্তকে লিখিত আছে—আজ ১৮১৯ শকে প্রত্যাক্ষায়নাংশ প্রায় ২২।১৪। সূর্য্য-সিদ্ধান্তের দৃষ্টিমূলক উপদেশ বচন—"প্রাক্ চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে অন্তরাংশৈঃ" অনুসারে

* ইনি কাশীর কুইন্স কলেজের সংস্কৃত বিভাগের গণিত-শাস্ত্রাধ্যাপক ছিলেন।

† Professor of Science Kutak College.

অয়নাংশ এক্ষণে ২২।৩৩। ভাস্করাচার্য্যের অয়নাংশ নিরূপণের নিয়ম সৌরপুস্তকের উপদেশের সহিত অভিন্ন। তিনি বলেন—"যস্মিন্ দিনে সম্যক্ প্রাচ্যাং রবিরুদিতো দৃষ্টস্তৎ বিষুবদ্দিনম্। তস্মিন্ দিনে গণিতেন স্ফুটো রবিঃ কার্য্যঃ। তস্য রবের্মেষাদেশ্চ যদন্তরং তেঽয়নাংশা জ্ঞেয়াঃ"। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট অয়নাংশ তাঁহার সময় ১০৭২ শকে একাদশ অংশ ছিল; "যদা কিলৈকাদশ অয়নাংশাস্তদা গোলসন্ধিঃ।" এবং এইরূপে নির্দ্দিষ্ট অয়নাংশ অদ্য ২২।৩৩। "যদা যেঽংশা নিপুণৈরুপলভ্যন্তে তদা স এব ক্রান্তিপাতঃ" সুতরাং এক্ষণে ২২।৩৩ই অয়নাংশ।

উপরোক্ত প্রকারে বর্ষে বর্ষে অয়নাংশ নিরূপণ করিলে অয়নগতি ৫৮ বিকলার সন্নিহিত হয় বলিয়া বম্বে সভা সেইরূপ গতি গ্রহণে আদেশ করিলেন। এতদ্ভিন্ন গ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণের ফলে এই গতির ব্যতিক্রম হয় বলিয়া স্থির করিলেন, বেধস্থলে বৈগুণ্য উপলব্ধি হইলে বেধোপলব্ধ বীজ-সংস্কার করিয়া লইতে হইবে।

ফলে দাঁড়াইল এই যে সূর্য্য-সিদ্ধান্তোক্ত বর্ষমান লইয়া প্রতি বৎসরের আদিতে সায়ন সূর্য্য-নিরূপণ করিতে হইবে। বর্ষান্তক্ষণের সূর্য্যের সায়নস্ফুটকে অয়নাংশ বলিয়া লইতে হইবে ও সূর্য্য আকাশে যে বিন্দুতে উপস্থিত তাহাকে আদিবিন্দু * বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ নিরূপণের পর সমস্ত বিষয়ই চাক্ষুষ গণনায় স্থিরীকৃত হইবে।

সামান্য চিন্তা করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে সৌর পুস্তক হইতে বর্ষমান লওয়া হইলেও পঞ্জিকার অন্তর্ভূত যাবতীয় সামগ্রীই দৃক্‌সিদ্ধ হইল। কেন না বর্ষ শেষ হইলেই জ্যোতির্ব্বিদ্ গগনে সূর্য্য কোথায় তাহা দেখিলেন, সূর্য্য যেখানে তাহাকে আদিবিন্দু বলিলেন, চাক্ষুষ ক্রান্তি-পাতস্থান হইতে সেই চাক্ষুষ আদিবিন্দুর অন্তরকে অয়নাংশ বলিলেন।

বম্বেসভা-নির্ণীত অবশিষ্ট বিষয়গুলি যে দৃক্‌সিদ্ধ তাহা সহজেই বোধগম্য হয়, বুঝাইবার চেষ্টা অনাবশ্যক। আমাদের প্রধান কথা এই যে পঞ্জিকা-সংস্কার বৈধ বা অবৈধ তাহা নিরূপণ করিতে হইলে যদৃচ্ছা প্রকাশিত মত গ্রহণ না করিয়া বিশেষ বিশেষ পুস্তকের ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মত সংগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত। আমি না জানিয়া না বুঝিয়া যাহা তাহা বলিয়া ফেলিলে সে কথা সাধারণের গ্রাহ্য হওয়া উচিত নহে। আমারো মনে রাখা উচিত "there are more things in heaven and earth than are dreamt of in (your) philosophy"; "লোভাৎ প্রাংশুলভ্যে ফলে উদ্বাহুঃ" হওয়া আমার পক্ষে একান্ত গর্হিত। এইরূপ মনোভাবেই আমরা ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় সূর্য্যসিদ্ধান্তান্তর্গত বিষয় সমূহ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলাম, নিবেদন † পুস্তিকায় ভাস্করাচার্য্যের দৃক্‌সিদ্ধ্যাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করিয়া ছিলাম, এবং আজি বম্বে নগরে সম্মিলিত ভারতের আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ-মণ্ডলীর মত প্রকাশ করিলাম। ভারতীয় ও ইউরোপীয় জ্যোতিষের পুস্তক অল্পসংখ্যক নহে; যোগেশবাবু দীক্ষিত মহাশয়

---

* এই আদিবিন্দু পূর্ব্বাভিমুখে ঈষৎ গতিশীল।

† যে কেহ পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এই পুস্তক তাঁহার ঠিকানায় পাঠান হয়।

প্রভৃতি অদ্বিতীয় মেধাসম্পন্ন কৃতবিদ্য লেখকগণ স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়াছেন; উড়িষ্যার চন্দ্রশেখর সামন্ত নিজ বোধোপলব্ধ ফল লিপিবদ্ধ করিয়া পাশ্চাত্য জগতে যশোলাভ করিয়াছেন। ইহাঁদের মতামত অনুসন্ধান না করিয়া, প্রগল্‌ভতা নিবন্ধন অকুতোভয় হৃদয়, অজ্ঞতানিবন্ধন শাস্ত্রার্থবিপর্য্যয়কারী পণ্ডিতাভিমানীকে মুহূর্ত্তের জন্য ইঙ্গিতেও নেতৃস্থান অধিকার করিতে দিলে সত্যালোপে প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। যাঁহারা আজীবন আলোচনার ফলে খ্যাত পুস্তক রচনা, জ্যোতিষিক আবিষ্কারাদি অখণ্ডনীয় প্রমাণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহাদেরই মত অনুসন্ধেয়। আজি এই প্রগল্‌ভতাপ্রমুখ উৎশৃঙ্খলতান্ধকারের দিনে ব্রাহ্মণ-সভায় সদস্যদিগের ও জনসাধারণের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই যে তাঁহারা দিক্‌চিহ্ন (landmarks) দেখিয়া বুদ্ধিচালনা ও জ্ঞানসংগ্রহ করুন, গন্ধর্ব্বপুরী অভিমুখে যেন অগ্রসর না হন।

লিখিতমিদং কেনচিদ্—

জ্যোতিঃশাস্ত্রপঞ্চাননোপাধিকেন।

সংবাদ।

শক্তিপুর শাখা-ব্রাহ্মণ-সভা।

স্থান—মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবেল্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

কে, সি, এস, আই মহোদয়ের কাছারীবাটী।

সভার স্থায়ী সদস্যগণের নাম,—

ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক—শ্রীযুক্ত তারাপদ স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বেদান্তভূষণ।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুশীলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ ঘটক, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ভূপতি-ভূষণ দোবে, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাইকিঙ্কর অধিকারী।

কোষাধ্যক্ষ—অঘোরচন্দ্র চৌধুরী।

সহকারী কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত মাখনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ চৌধুরী।

১। শক্তিপুর, ২। বাজারসাহ, ৩। মতা, ৪। গৌরীপুর এই চারি গ্রাম লইয়া এই শাখা-সভা গত ৯ই আষাঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রামপাড়া নলহাটী শাখা সভা।

সভার স্থায়ী সদস্যগণের নাম,—

ধর্ম্মব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বিদ্যারত্ন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ শাস্ত্রী, এম, এ, শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ভবতোষ মুখোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

সহকারী—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য।

হিঃ পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সহকারী—শ্রীযুক্ত কালীপদ সন্যাল।

বেলডাঙ্গা শাখা ব্রাহ্মণসভা।

স্থায়ী সদস্যগণের নাম,—

বেলডাঙ্গা, মাড্ডা, দেলো, বেগুণবাড়ী, নপুকুরিয়া, আন্তিরণ, এই ছয়গ্রাম লইয়া প্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ ন্যায়তর্কতীর্থশিরোমণি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (হাজরা)।

সহকারী—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (হাজরা) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী—প্রমথভূষণ ভাদুড়ী। L. C. M S. Doctor

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

সহকারী—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বন্দোপাধ্যায়, (হাজরা), শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, (হাজরা)।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী—যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশেষ সদস্য—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্রীবল্লভ অধিকারী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সুকৃতিভূষণ সান্যাল, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত বামাচরণ সান্যাল।

হিতৈষীসদস্য—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায়, শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। চতুর্থবর্ষের ব্রাহ্মণ-সমাজের বর্ষারম্ভ ১৩১২ সালের আশ্বিন মাস হইতে হইয়াছে। এবৎসর হইতে আমরা ইহার উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নবান হইয়াছি। দারুণ যুদ্ধ উপলক্ষে কাগজ ভীষণ দুর্ম্মূল্য হইলেও সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি। এ সময়ে যে সমস্ত গ্রাহকবর্গ এ বৎসরের পত্রিকাগ্রহণে অনিচ্ছুক তাঁহারা যেন অবিলম্বে সংবাদ জ্ঞাপন করেন। কারণ অসময়ে ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজের অনর্থক ক্ষতি করিয়া কাহারও লাভ নাই। বলা বাহুল্য আমরা প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু করিয়া ভিঃ পিঃ করিয়া থাকি যাঁহাদের টাকা দিতে যেরূপ সুবিধা তাহা জানাইলে আমরা সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

২। এবার হইতে ভিঃ পিঃ প্রেরণের বিশেষ সুবিধা করা হইয়াছে। গ্রাহকবর্গের নিকট অন্ততঃ ভিঃ পিঃ করিবার দশদিন পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইবে। এবং তাঁহাদের যদি কোনরূপ আপত্তি থাকে বা বক্তব্য থাকে। তাহা হইলে তদনুরূপ ব্যবস্থা হইবে। টাকা পাইলে প্রত্যেককেই রসিদ দেওয়াও হইবে।

৩। এই সমস্ত বন্দোবস্তের জন্য এবার হইতে ভিঃ পিঃ খরচা সাধারণতঃ ৶০ আনা করিয়া ধার্য্য করা হইল। এবার হইতে ভিঃ পিতে পত্রিকা লইতে হইলে ২৶০ দিতে হইবে। মণি অর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইলে অনর্থক /০ আনা কাহাকেও দিতে হইবে না। আমরাও অনর্থক ঝঞ্ঝাট হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি।

পোষাক বিক্রেতা।

৺প্যারিলাল দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

১১৯ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

সিমলা, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, ঢাকা, মাদ্রাজী তাঁতের ও নানা দেশীয় মিলের সকল রকম ধোয়া ও কোরা কাপড় এবং গরদ, গরিদ, বাপ্তা, চেলি, নানা দেশীয় ছিট কাপড় এবং শাল, আলোয়ান, শাড়ি, বোম্বাই সাড়ি প্রভৃতি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ছোট, বড়, কাটা ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসীগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠাইলে ভিঃ পিতে সকল দ্রব্য পাঠান হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

একদর সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী। এককথা।

নানা দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নূতন নূতন ছাট কাটের সার্ট, কোট, পেণ্ট, লমে চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সায়া সামিজ, সলুকা, ফ্রক, করনেসন্ জ্যাকেট, সলমার কাজ করা জ্যাকেট, টুপি, কোট, পার্শী ও বোম্বাই সাড়ী, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, সার্জের চাদর, কম্ফটার, আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, অর্ডার দিলে আবশ্যক মত সাপ্লাই করা হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়া থাকি ছোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।

১৩।১৪ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী। একলথা।

নানা দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নূতন নূতন ছাট কাটের সার্ট, কোট, পেণ্ট, লেস চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সায়া সামিজ, সলুকা, ফ্রক, করনেসন্ জ্যাকেট, সলমার কাজ করা জ্যাকেট, টুপি, কোট, পার্সী ও বোম্বাই সাড়ী, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, সার্জের চাদর, কম্ফাটার, আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, অর্ডার দিলে আবশ্যক মত সাপ্লাই করা হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়া থাকি।

ছোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।

১৩।২৪ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীসত্যচরণ দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী।

নানা দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নূতন নূতন ছাট কাটের সার্ট, কোট, পেণ্ট, লেস চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সামিজ, সায়া, সলুকা' ফ্রক, করনেসন্ জ্যাকেট, সলমার কাজ করা জ্যাকেট' টুপি, কোট, পার্শী সাড়ি এবং বোম্বাই সাড়ি সিল্ক ও গরদ, চাদর, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল সার্জের চাদর আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে অর্ডার দিলে আবশ্যক মত সাপ্লাই করা হয় এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়া থাকি।

ছোট বড় ও পছন্দ না হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

মফঃস্বলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।

২০।২৫ নং হ্যারিসন রোড, মনোহর দাসের ষ্ট্রীট মোড়, বড়বাজার কলিকাতা।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২২ সালের আশ্বিন হইতে ইহার চতুর্থ বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউননা কেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা একটু কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—মূল্যাদি ব্রাহ্মণ সভার কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ১০৩নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

শ্রীপঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ।

৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে
ব্রাহ্মণসমাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৯নং রামতনু বসুর লেনস্থ জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No. C—675.

৪র্থ বর্ষ। { ১৮৩৮ শক, ১৩২৩ সাল, ভাদ্র। } ১২শ সংখ্যা।

এস!

(১)

এস আজি দয়াময়! বিপদবারণ—

হৃদাকাশে হও পরকাশ!

পরাণ বুঝাতে নারি, করে আলোড়ন

লালসার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস!

(২)

শূন্য এ হৃদয়পুরী শাসনবিহীন,

তুমি আসি বিরাজ হেথায়,

এ সংসারে দয়াময় আমি বড় দীন

বাম যেন হ'য়ো না আমায়।

(৩)

হৃদয়-সাগরে ওঠে প্রবল তুফান—

ডুবু ডুবু জীবন-তরণী,

এস আজি এ দুর্দ্দিনে করুণানিধান!

নহে প্রভু ডুবিব এখনি!

(৪)

অন্ধকারে দিশেহারা বিপন্ন একাকী
লক্ষ্যহীন কোথা ভেসে যাই,
এস নাথ রক্ষা কর সকাতরে ডাকি,
তুমি বিনে আর কেহ নাই!

(৫)

সুপথ হারায়ে ফেলে চলেছি কুপথে,—
নেত্র ঢাকা মোহ-আবরণে,
কৃপা করি হৃষীকেশ বস চিত্ত-রথে
সংযত করহ রিপুগণে!

(৬)

তলাইয়া যাই বুঝি ঘূর্ণীপাকে পড়ি,
কর মোরে করহ উদ্ধার!
এস প্রভু সকাতরে ডাকি কর যুড়ি
নহে রবে কলঙ্ক তোমার!

(৭)

কে আর ডাকিবে তবে দয়াময় বলে
যদি নাহি তার' ভবার্ণবে!
পাপী তাপী জনে সখা, দয়াহীন হ'লে
কুখ্যাতি রহিবে তব ভবে!

(৮)

জীবন সঙ্কটে আজ ডাকি হে দয়াল
হৃৎপদ্মে হও পরকাশ!
মুছে দাও কামনার কুহেলিকা-জাল
জ্ঞানজ্যোতিঃ হউক বিকাশ!

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চণ্ডী-রহস্য।

দেবীদূত-সংবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেবগণ নগশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে সমবেত হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে, বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে মহামায়ার স্তব করিতেছেন; এদিকে জগন্মাতার স্নান বেলা উপস্থিত, ব্রহ্মলোকে স্বয়ংপ্রজাপতি, নিজ কমণ্ডলু-স্থিত জাহ্নবীজল দ্বারা জগৎ প্রসূতির অভিষেক কার্য্য সম্পাদনে ব্যগ্র।

ভক্তগণের করুণ ক্রন্দনে জননী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি ব্রহ্মকল্পিত জাহ্নবী জল উপেক্ষা করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের কোনও স্বচ্ছনির্ঝরিণীর সলিলে স্নান করিবার ছলে আগমন করিলেন।

সেই রমণীরূপিণী মহামায়া, স্তুতিপরায়ণ দেবমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনারা এক্ষণে কাহার স্তব করেন?" তৎপর এই রমণীর শরীর হইতে এক ভুবনমোহিনী দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া দেবগণের উত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই বলিতে লাগিলেন,—ইহারা দেবতা, শুম্ভ নিশুম্ভ নামক দৈত্য-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ইহারা মিলিতকণ্ঠে আমারই স্তব করিতেছে।

দেবীমূর্ত্তি নির্গত হইলে পর সেই রমণী দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন, তিনি তখন কালিকা নামে প্রথিতা হইলেন।

যিনি ইতিপূর্ব্বে কালিকার শরীর-কোষ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহার নাম হইল কৌষিকী। এই কাণ্ড দেখিয়াই দেবগণ আশ্বস্ত হইলেন। কৌষিকী মনোহররূপ ধারণ পূর্ব্বক হিমালয় আলোকিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

দৈবগত্যা শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ডমুণ্ড নামক অসুরদ্বয় হিমালয় পর্ব্বতে আসিয়াছিল, তাহারা এই অলোকসামান্য রূপশালিনী অনুপম রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দৈত্যপতি শুম্ভাসুরের নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল।

মহারাজ! অতি মনোহরা এক রমণী সম্প্রতি হিমালয় পর্ব্বতে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার লাবণ্যে দিগ্বলয় উদ্ভাসিত হইতেছে। এই ত্রিভুবনে কেহ কখনও এইরূপ রূপবতী রমণী অবলোকন করে নাই। আপনি ইহার পরিচয় গ্রহণ করুন।

মহারাজ! যদি গ্রহণে ইতস্ততঃ থাকে—তথাপি এমন রমণীমূর্ত্তি একবার দেখিয়া আসুন,—চক্ষুঃ সার্থক হইবে। প্রভো! ত্রিলোকী মধ্যে হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি যে সকল শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে, সেই সমুদয়ইত অধুনা আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে। আপনি ইন্দ্র হইতে গজরত্ন ঐরাবত, পারিজাত বৃক্ষ এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব আনয়ন করিয়াছেন। প্রজাপতি

ব্রহ্মার হংসসমন্বিত সুপ্রসিদ্ধ বিমান এক্ষণে আপনার গৃহপ্রাঙ্গণে অবস্থান করিতেছে। আপনি কুবের হইতে মহাপদ্ম নামক নিধি আনিয়াছেন। সমুদ্র স্বয়ংই আপনাকে অম্লান পঙ্কজমালা উপঢৌকন দিয়াছেন। বরুণের সেই সুবর্ণ প্রসবকারী ছত্র এক্ষণে আপনার রাজপ্রাসাদে শোভা পাইতেছে। অধিক কি মৃত্যুর উৎক্রান্তিদায়িনী শক্তিটীও আপনি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভ বরুণের পাশটী আনিয়াছেন। সমুদ্র-জাত সমস্ত রত্নই আপনাদের গৃহে অবস্থান করিতেছে। মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন—ত্রৈলোক্যে যে সকল রত্ন আছে, সমস্তই আপনাদের অধীন, তবে আর এই স্ত্রীরত্নটী কেন লইবেন না?

চণ্ডমুণ্ডের বাক্যে অতিমাত্র উৎসাহিত হইয়া শুম্ভাসুর দেবীর নিকট, সুগ্রীবকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাকে বলিয়া দিলেন; দেখ সুগ্রীব! তুমি সেই নিতম্বিনীর নিকট গমন করিয়া আমার কথা এরূপভাবে বলিবে, যাহাতে তিনি প্রণয়বশে আমার নিকট উপস্থিত হন, এই কার্য্য তোমার অবিলম্বেই সম্পাদন করিতে হইবে।

যে স্থানে রমণী অবস্থান করিতেছেন,—সুগ্রীব হিমালয়ের সেই সুশোভন শৃঙ্গে গমন করিয়া হাস্যমুখে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন—সুচতুর সুগ্রীব তাহাকে দেখিয়াই দেবকন্যা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন,—তজ্জন্যই পরিচয় গ্রহণের পূর্ব্বেই দেবী বলিয়া সম্বোধন করেন। অথবা রাজাদের প্রধান মহিষীকেও দেবী বলা হইয়া থাকে। কাজেই প্রস্তাব জ্ঞাপনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে দৈত্যরাজের ভাবী প্রধানা মহিষী বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়া বলিতেছেন,—দেবি! দৈত্যপতি শুম্ভ ত্রৈলোক্যের একমাত্র অধীশ্বর, আমি তাঁহার দূত, তাঁহারই আদেশে আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি হয় ত শুম্ভাসুরের প্রকৃত পরিচয় জানেন না, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব সকলই তাঁহার আজ্ঞাধীন, তিনি বাহুবলে সমস্ত দেব-সমাজ জয় করিয়া অমরাবতীর রাজপ্রাসাদে স্বকীয় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন।

সুগ্রীব ইঙ্গিতে বুঝাইতেছেন, হয় ত আমার প্রার্থনা শুনিয়া আপনি মনে মনে ভাবিতে পারেন,—"আমি দেবকন্যা, অসুরকে পতিত্বে বরণ করিব ইহাতে দেব-সমাজের কলঙ্ক ঘটিবে। পিতামাতা কেহই এই ব্যাপারে অনুমোদন করিবেন না, সুতরাং মনের অনুরাগ থাকিলেও এ কার্য্য করা উচিত নহে;" কিন্তু তাহা ভাবিতে হইবে না, আপনি স্বয়ং শুম্ভ-সমীপে উপস্থিত হইলে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না, আপনি স্বেচ্ছায় না আসিলেও, মহারাজের আদেশমাত্র আপনার পিতামাতা আপনাকে লইয়া তাহারই পাদমূলে উপনীত হইবেন।

দূত কহিলেন,—দৈত্যপতি শুম্ভ যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন,—"এই অখিল ত্রৈলোক্য আমার অধীন, দেবগণ আমার বশীভূত; আমি ইন্দ্রাদি দেবগণের যজ্ঞভাগ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করি। ত্রৈলোক্যের সমস্ত রত্ন আমার অধীনে। আমি ইন্দ্রের ঐরাবত কাড়িয়া আনিয়াছি। ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনে উত্থিত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরত্ন দেবরাজ স্বয়ং

প্রণতিপূর্ব্বক আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, সর্প যাহার যে রত্ন আছে, সকলই আমাকে দিয়াছেন। তুমিও কন্যারত্ন, অতএব তোমার ইচ্ছামত আমি বা আমার অনুজ নিশুম্ভ দুইজনের একজনকে বরণ কর, এখন জগতে আমরাই রত্নভুক্। ভাবিয়া দেখ! আমাদের অর্দ্ধাঙ্গহারিণী হইলে অতুলনীয় পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে। এই সকল সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া আমার প্রণয়িনী হও।”

দৈত্যপতির আদেশ শুনিয়া জগদম্বা—মনে মনে একটু হাসিতে লাগিলেন, যিনি দুজ্ঞেয়া যিনি অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালিনী, যিনি সমস্ত মঙ্গলের একমাত্র প্রসূতি, তাঁহার নিকট কীটাণুকীট অসুরের এইরূপ সগর্ব্ব উক্তি? হাস্যের হেতু নহে কি?

দেবী কহিলেন—

"সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ॥”

তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক, কিছুই মিথ্যা নহে,—শুম্ভাসুর ত্রৈলোক্যের অধিপতি এবং নিশুম্ভও যে তাহাই। জগদম্বা উপহাস করিয়া বলিতেছেন বটে, কিন্তু অসুরবুদ্ধি প্রথমতঃ এইরূপই গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত কথা অন্যরূপ।

(অত্র ত্বয়া কিঞ্চিৎ সত্যং নোক্তং)—এস্থলে তুমি কিছুই সত্য বল নাই। এই ত্রৈলোক্যের অধিপতি শুম্ভ এবং নিশুম্ভও যে তাদৃশ;—(ইতি যৎ ত্বয়া উক্তং তন্ মিথ্যা) এই যাহা তুমি বলিতেছ তাহা মিথ্যা। আমি জগৎ সৃজন করি, পালনও করি আমি, এবং সংহার ব্যাপারও আমা হইতেই সম্পন্ন হয়, আর অধিপতি হইলেন তোমার শুম্ভ নিশুম্ভ? আমি ত্রৈলোক্যময়ী, আমাকে জয় করিতে না পারিলে শুম্ভ ত্রৈলোক্যপতি হইবে কিরূপে?

"কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথং?
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা।
যোমাং জয়তি সংগ্রামে যোমে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

কিন্তু এই বিবাহ বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কিরূপে মিথ্যা করিব? শ্রবণ কর, আমি বুদ্ধির অল্পতাপ্রযুক্ত পুর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যিনি সংগ্রামে আমাকে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার দর্প চূর্ণ করিবেন,—অথবা ত্রিলোকমধ্যে যিনি আমার প্রতিবল, তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন।

"তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্লাতু মে লঘু॥”

অতএব মহাসুর শুম্ভ বা নিশুম্ভ এখানে আসুন,—বিলম্বে প্রয়োজন কি? আমাকে জয় করিয়া শীঘ্র আমার পাণিগ্রহণ করুন। মহামায়ার এই সকল উক্তির সারগ্রহণে অসুরবুদ্ধি এখনও অশক্ত।

জগদম্বা যে বলিতেছেন,—আমি অল্পবুদ্ধিত্বহেতু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই অল্পবুদ্ধিতা শব্দের অর্থ কি? বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব, (অল্প ক্ষুদ্র) হইয়াছে যাহা হইতে, এইরূপ সমাস করিলেই অল্পবুদ্ধি শব্দের অর্থ হইবে—মূল প্রকৃতি বা পরমাত্মা,—বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষ হইতে ছোট, প্রকৃতি পুরুষেরই বিভুত্ব; মহত্তত্ত্ব (ছোট) প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। আর জগন্মাতা ব্রহ্মময়ীর অনালোচিত প্রাচীন প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ—বেদবাক্যঃ—বেদ আলোচনাপূর্ব্বক রচিত হয় নাই। হিরণ্যগর্ভের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে বেদ উৎপন্ন। সুতরাং বেদবাণীই তাঁহার প্রতিজ্ঞা—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বাং॥"

কঠ-মণ্ডূকোপনিষৎ।

বাক্যের বলে এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, মেধা পাণ্ডিত্য কিছুই আত্মলাভের কারণ নহে। তবে যে সাধক এই আত্মাতে মনঃপ্রাণ সমর্পন পূর্ব্বক একমাত্র তাহাকেই পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই আত্মা নিজস্বরূপ দর্শন করাইয়া থাকেন।

সুতরাং শুম্ভাসুরের স্বর্গবিজয় ধনরত্নাদির আহরণ প্রভৃতি সেই ব্রহ্মরূপিণী জগদম্বার কৃপালাভের হেতু নহে।

তাহাতেই জগদম্বা শ্রুতিকথিত প্রতিজ্ঞার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

যিনি আমাকে জয় করিতে সমর্থ অর্থাৎ যিনি আমা হইতে অধিক বলী, যিনি প্রতিবল অর্থাৎ সমবলী, এবং যিনি আমার গর্ব্ব নষ্ট করিবেন "আমার হস্তে সংগ্রামে কাহারও নিস্তার নাই" এই আমার গর্ব্ব আছে, যিনি হীন-বল হইয়াও সমরে আমার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন, তিনিও আমার দর্প নষ্ট করেন, তাঁহাকেও আমি অগত্যা ভর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

অতএব শুম্ভ বা নিশুম্ভ আসিয়া আমাকে জয় করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন। ইহাদ্বারা বুঝা গেল,—পাণিগ্রহণ সংস্কার সবর্ণেই হইয়া থাকে, অসবর্ণে হয় না আমার পাণিগ্রহণ করিতে হইলে, আমার সবর্ণ হইতে হইবে, আমি যেমন অল্পবুদ্ধি বা বিভুপদার্থ, আমার পাণিগ্রাহককে ও বিভু হইতে হইবে। কোনও অবিভু পরিচ্ছিন্নকে আমি ভর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না শুম্ভ বা নিশুম্ভ আসুন, আমার সহিত যুদ্ধ করুন, যুদ্ধে নিহত হইলে মৃত্যুকালে আমার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া শিবরূপতা প্রাপ্ত হইবেন, তবেই সে আমার পাণিগ্রহণের অধিকার পাইবে। যুদ্ধে আসিলে আর বিলম্ব ঘটিবে না, শীঘ্র এই পাণিপাদ-বিহীনার পাণিগ্রহণের য়োগ্যতা হইয়া যাইবে!

দেবীর এই অহঙ্কার-গর্ভ, বিনয়-পেশল বচন শ্রবণ করিয়া দূত বলিল ;—তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এত গর্ব্ব ভাল নয়। বল দেখি! শুম্ভ-নিশুম্ভের সম্মুখীন হইতে পারে, ত্রৈলোক্যমধ্যে কি এমন কোনও পুরুষ আছে? দৈত্যেশ্বরের কথা দূরে থাকুক, অন্যান্য সাধারণ দৈত্যের সাক্ষাতে রণস্থলে সকল দেবতা মিলিত হইয়াও দাঁড়াইতে পারেন না। আর তুমি স্ত্রী, তাহার উপর একাকিনী নিঃসহায়া তুমি কি না শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিবে? আমি এখনও সসম্মানে বলিতেছি,—যাও, শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে স্বেচ্ছায় যাও, কেশাকর্ষণে হত-গৌরবা হইও না।

দেবি বলিলেন,—হাঁ ঠিককথা শুম্ভ বলবান্ পুরুষ আর নিশুম্ভ বীর্য্যশালী, কি করি—পূর্ব্বে আলোচনা না করিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। দূত! যাও তুমি, দৈত্যেশ্বরের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিও, তিনি যাহা উচিত বিবেচনা করেন—তাহাই করুন।

প্রণিধান সহকারে দূত ও দেবীর উক্তি প্রত্যুক্তি গুলির আলোচনা করিলে অতি সুন্দর ও সুসঙ্গত অর্থই প্রকাশ পায়; কেননা; দূত বলিতেছেন;—

"অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রুহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥

হে দেবি! ক্রীড়নশীলে! তুমি জগতের সৃজন-পালন ও সংহরণ ক্রমে কি অপূর্ব্ব ক্রীড়াই করিতেছ। "মমাগ্রতঃ—মৈবং ব্রুহি।" আমার সাক্ষাতে এইরূপ বলিও না অর্থাৎ—তুমি যে বলিতেছ; শুম্ভ নিশুম্ভ আসিয়া আমাকে জয় করিয়া শীঘ্র আমার পাণিগ্রহন করুন, একথা বলা অন্ততঃ আমার নিকট উচিত নহে। কেননা আমি অধুনা তোমারই করুণায় তোমার তত্ত্ব অনেকই জানিতে পারিয়াছি। "অবলিপ্তা অসি" বাস্তবিকই তুমি গর্ব্বিতা। কেন এই কীটাণুকীট শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট শক্তিহীনতা প্রকাশ করিবে?

শুম্ভ-নিশুম্ভের সাক্ষাতে দাঁড়াইতে পারে ত্রৈলোক্যমধ্যে এমন পুরুষ নাই সত্য; কিন্তু তুমি যে অসামান্যা রমণী, তুমি তাহার সাক্ষাৎ যাইবে না কেন?

"অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্ব্বদেবা ন বৈ যুধি।
সম্মুখে তিষ্ঠন্তি," ততঃ কিং?—

সমস্ত দেবতা মিলিত হইয়াও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈত্যের যুদ্ধে সম্মুখে দাড়াইতে পারেন না। তাহাতে কি হয়? "দেবি! পুনস্ত্বং একাকী স্ত্রী" হে দেবি! তুমি যে অদ্বিতীয়া রমণী তোমার তাহাতে ভয় কি?

"ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবা তস্থু র্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং—"

ইন্দ্রাদি দেবগণ সমরে যে শুম্ভাদি অসুরের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হন না,—

"ষতত্ত্বং স্ত্রী, অতঃ কথং তেষাং সম্মুখং ন প্রয়াস্যসি?"

ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাদের সাক্ষাৎ দাঁড়াইতে পারেন না, কারণ তাঁহারা পুরুষ, তুমি যে স্ত্রী, সুতরাং কেন তাহাদের সম্মুখে যুদ্ধার্থ অগ্রগামিনী হইবে না? *

দূত তাহার পর বলিতেছেন—

"সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা, পার্শ্বং শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ।
কেশকর্ষণ-নির্ধূত-গৌরবা মা গমিষ্যসি॥"

ইহার অর্থও অতি বিচিত্র। "সাত্বং গচ্ছ ইতি ময়া উক্তা এব নতু গন্তমনুরুদ্ধা।" সেই তুমি শুম্ভ-নিশুম্ভের গৃহে যাও, ইহা বলিতেছি মাত্র, অর্থাৎ আমার প্রতি রাজার যে আদশ ছিল, তাহা পালন করিলাম। কিন্তু অনুরোধ করি না, তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নহে। কেন না, : "কেশাকর্ষণ নির্ধূত গৌরবা ত্বং মা গমিষ্যসি" ক—শব্দে প্রজাপতি অ—শব্দে বিষ্ণু আর ঈশ শব্দে শিব বুঝায়, সেই কেশ, বা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—নির্ধূতগৌরব হইয়াছেন যৎ কর্ত্তৃক, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতা আকর্ষণ বা শরীরগ্রহণ হেতুক তোমা কর্ত্তৃক গৌরবহীন হইয়াছেন। তুমিই তাঁহাদের প্রসূতিশরীরদাত্রী, অন্যত্র তাঁহারা গৌরবান্বিত থাকিলেও তোমার নিকট তাঁহাদের গৌরব কোথায়? মায়ের নিকট কি সন্তানের গৌরব থাকিতে পারে? অতএব, "শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ পার্শ্বং মা গমিষ্যসি।" শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট যাইও না! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জন্মদাত্রী, এই ক্ষুদ্র শুম্ভ-নিশুম্ভকে ভজনা করিবে? তাহা কখনই সঙ্গত নহে।

জন্মান্তরীয় পুণ্যবলে ব্রহ্মস্বরূপিণী মহামায়ার সন্দর্শন লাভ করিয়া ক্রমশঃ দৈত্যদূতের তত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি অর্থবোধক বাক্যজাল বিস্তার ক্রমে একদিকে রাজাদেশ পালন এবং অপর দিকে জগদম্বার তাৎকালিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। মহামায়ার উত্তরও সেইরূপ দ্ব্যর্থবোধক বচন প্রসঙ্গে নিষ্পাদিত, তাই তিনি বলিতেছেন,—

* শুম্ভ-নিশুম্ভ তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মা হইতে বর পাইয়াছিল—"ত্রৈলোক্যের কোনও পুরুষ তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে না কোনও অযোনিজা কন্যার হস্তে কামাভিভূত অবস্থায় তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।" এই জন্যই দূত কেবল পুরুষেরা তাঁহাদের সাক্ষাৎ দাঁড়াইতে পারে না, বলিতেছেন—

শিবপুরাণ সংহিতায়াং—

দৈত্যৌ শুম্ভ-নিশুম্ভাখ্যৌ ভ্রাতরৌ সম্বভূবতুঃ।
যাচিতং তপসা তাভ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥
অবধ্যত্বং জগত্যস্মিন্ পুরুষৈরখিলৈরপি।
অযোনিজা তু যা কন্যা স্বাঙ্গকোষসমুদ্ভবা॥
অজাতপুংস্পর্শরতিরবিলঙ্ঘ্যপরাক্রমা।
তস্যা বধ্যাবুভৌ সংখ্যে তস্যাং কামাভিভূতয়ে।
ইতি চাভ্যর্থিতো ব্রহ্মা তাভ্যাং প্রাহ তথাস্ত্বিতি॥

"এবমেতৎ বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি বীর্য্যবান্।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা॥"

"এবমেতৎ করোমি" হাঁ, ইহা এইরূপই করিব। অর্থাৎ তুমি যেরূপ পরামর্শ দিতেছ, তাহাই করিব, শুম্ভনিশুম্ভের নিকট যাইব না। "প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা" যেহেতু আমার অনালোচিত প্রাচীন প্রতিজ্ঞাও এইরূপ,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বলহীন এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না, ইহা প্রতিজ্ঞা।

"শুম্ভো বলী কিং, নিশুম্ভশ্চাপি বীর্য্যবান্ কিং
যতো মাং কাময়তে ?"

শুম্ভ কি বলী ? আর নিশুম্ভও কি বীর্য্যবান্ ? যেহেতু—আমাকে কামনা করে ?

বল যাহার থাকে, সেই বলী হয়, শুম্ভাসুর যে তুচ্ছ বলের অভিমান করিতেছে, সেই বলটীও কি তাহার নিজস্ব ? আমিই তাহাকে বল দিয়াছি, অজ্ঞান বশতঃ আমার বলই তাহার নিজের বলিয়া অভিমান করিতেছে।

ঋগ্বেদে অম্ভৃণ ঋষির ব্রহ্মবিদুষী বাঙ্‌নাম্নী কন্যার মুখে আমি স্বয়ংই এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছি,—

"ময়া সোহন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি যঃ শৃণোত্যুক্তং।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি,
শ্রুধি শ্রুত ! শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥"

এই যে লোকে ভোজন, দর্শন, শ্রবণ, এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিষ্পাদন করিতেছে, তাহা আমারই সাহায্যে করিতেছে,—কিন্তু আমাকে এই ভাবে না জানিয়া ক্ষীণ হইতেছে।

আমি পূর্ব্বে একবার পবন, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতির বলমোহ অতি নিপুণভাবে দূরীকৃত করিয়াছিলাম। অগ্নি একগাছি ক্ষুদ্র তৃণ নিজ শক্তিতে দাহ করিতে পারিলেন না। বলদৃপ্ত পবন এই তৃণগাছি স্পন্দিত করিতে সমর্থ হইলেন না। * এক্ষণেও শুম্ভ-নিশুম্ভের বল দর্প দূর করিব, আমার নিকট কেহই দর্প করিয়া নিস্তার পায় না, সকলের দর্প আমি চূর্ণ করিয়া দিই। অতএব যাও দূত ! "আমার উক্ত" অর্থাৎ "এই বল যে তাহার নহে আমার" ইত্যাদি সেই অসুরেন্দ্রকে অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্নকে জানাও, তিনি যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করুন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

---

* কেনোপনিষদ্ দ্রষ্টব্য।

গো পালন।*

"নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

গো-জাতির পালন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। গো হিন্দুদিগের পরম দেবতা। গবার্চ্চন, গোরক্ষণ মানবগণের অতিশয় যত্নের সহিত কর্ত্তব্য। গোজাতি পবিত্রকারী; গো-পদরজঃ স্পর্শ করিলে পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

গো-সকল প্রাণিমাত্রেরই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, এবং মঙ্গলদায়ক। ঋষিগণ বলিয়াছেন,—"লোকেষু মঙ্গলাম্বষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ" ইত্যাদি। গো ব্যতিরেকে আমাদের অন্ন সংস্থান হয় না, দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন যজ্ঞাদিরও সম্ভাবনা নাই। গো সকল অগ্নি হোত্রাদি যজ্ঞের প্রযোজক এবং স্বর্গের সোপান স্বরূপ। এই জন্যই ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"গাবঃ পবিত্রং পরমং গাবো মঙ্গলমুত্তমং,
গাবঃ স্বর্গস্য সোপানং গাবো ধন্যাঃ সনাতনাঃ।"

গো-জাতির অভাব ঘটিলে হিন্দুদিগের কোন বৈধ কার্য্যই হইতে পারে না, যেহেতু গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও গোচর্ম্ম পাপনাশন ও লৌকিক বহু কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে।

গোঘাতী মানব আদ্র গোচর্ম্মদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পঞ্চগব্য পানাদিদ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"কৃতাবাপো বসেদ্ গোষ্ঠে চর্ম্মনা তেন সংবৃতঃ,
চতুর্থকালমশ্নীয়াদক্ষার লবণং মিতং।
গো মূত্রেন চরেৎ স্নানং দ্বৌ মাসৌ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ,
পঞ্চগব্যেন গোঘাতী মাসৈকেন বিশুদ্ধ্যতি॥"

ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে, - গো আমাদের পরমারাধ্য দেবতা। মহাগুরু নিপাত হইলে অক্ষার লবণ ভোজন করিতে হয়, তাহাও গব্য-দুগ্ধ ঘৃত ব্যতিরেকে হইতে পারে না। হে সভ্যমহোদয়গণ! গবীয় মূত্রাদি যে আমাদের সৎকর্ম্মের সাধন, তাহা নিম্নে সবিশেষ লিখিতেছি।

ভগবতীর অর্চ্চনা করিতে হইলে প্রথমতঃই পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইতে হয়, এবং নারায়ণের অভিষেক কার্য্য পঞ্চগব্যদ্বারা বিহিত হইয়াছে। হীন বর্ণকে স্পর্শ করিলে অস্পৃশ্যা ব্রাহ্মণ-রমণীর ত্রিরাত্র উপবাসের পর পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবার বিধান আছে।

কূপাদির জল দূষণীয় হইলে পঞ্চগব্যের দ্বারা শোধনের ব্যবস্থা আছে। অতএব হে ভ্রাতৃগণ! গোসম্বন্ধীয় মল, মূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এই পাঁচ ও চর্ম্ম—পরম পবিত্র এবং ঐহিক পারত্রিক

---

* মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে পঠিত।

সুখ-সাধন, তাহাতে কোনরূপ সংশয় নাই। বিরাট ভবনে সহদেবকে রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—তোমার কি কি বিদ্যা আছে? সহদেব বলিয়াছিলেন,—গোচিকিৎসা জানি; আমার অধীনে যে সমস্ত গাভী থাকিবে, তাহারা বহু দুগ্ধবতী হইবে এবং সুস্থিরা হইবে; বৃষভ সকল হৃষ্ট-পুষ্টকলেবর থাকিবে ও শান্তপ্রকৃতি হইবে, এবং এইরূপ বৃষভ আমি চিনি যাহার মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যার সন্তান হয়। ইহাই বিরাটপর্ব্বে লিখিত আছে। (বৃষভানভিজানামি রাজন্ পূজিতলক্ষণান্। যেষাং মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে) এতদ্দ্বারা জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বকালে গোচিকিৎসা রাজপুত্র সকলেও জানিত।

হে ধার্ম্মিকসকল! গোজাতি দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপন্ন করিতে হয়, ঐ শস্য দেব, মানব, পশু, পক্ষী সকলেরই সুখসেব্য হইতেছে। জন্মিবামাত্র আমরা গো-দুগ্ধ পান করিয়া থাকি, সুতরাং গো আমাদের মাতৃস্থানীয়। গোময়দ্বারা আমরা গৃহ-প্রাঙ্গণাদি স্থান শুদ্ধ করিয়া থাকি; যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, শ্রাদ্ধাদির ভূমি আমরা গোময় দ্বারা লেপন করিয়া থাকি; কোন কার্য্যই গোময় বিনা হইতে পারে না; এমন কি গোমূত্র পান করিলে অনেক রোগ নিবৃত্তি হইয়া যায়। গোময়াদি পঞ্চদ্রব্য মিশ্রিত হইলে যে, কি অপূর্ব্ব গুণ ধারণ করে, তাহা রসায়ণবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন। দধি ও ঘৃত মধুর সহিত মিলিত হইয়া মধুপর্ক নামে দেবতার পরম প্রিয়বস্তু হইয়া থাকে। দুর্গন্ধনাশক যত প্রকার দ্রব্য আছে, তন্মধ্যে গোময় প্রধান। অল্প ব্যয়ে দুর্গন্ধ নাশ করিতে গোময়ই আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঘৃত আমাদের পরমহিতকারী, বেদে লিখিত আছে—"আয়ুর্ব্বৈঘৃতং" ঘৃত ভোজনে পরমায়ু বৃদ্ধি পায়, এবং তেজ, সাহস, বল বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে পৃথিবীতে বিশেষরূপে পরিচিত করে। ঘৃত বিনা আমাদের ভোজনরূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে না। প্রথমতঃই "প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি বলিয়া জঠরাগ্নিতে পঞ্চ আহুতি দিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বাহে সায়ংকালে ঘৃত ভোজনের ব্যবস্থা আছে, সুতরাং ঘৃত পাপবিনাশী। অতএব ঋষিগণ বলিয়াছেন,—"তস্মাৎ তেজোময়ং ব্রহ্ম ঘৃতে তচ্চ ব্যবস্থিতং। তেজোময়মিদং দ্রব্যং মহাপাতক নাশনং।"

হে স্বধর্ম্মানুরাগি-বিজ্ঞগণ! সুতরাং গো আমাদের পরমারাধ্য পিতামাতার ন্যায় জানিতে হইবে। প্রত্যহ গোগ্রাস দানের বিধান আছে। হে ঋষিকল্প দ্বিজপণ্ডিতগণ! গো প্রাণিমাত্রের হিতকারী, পবিত্র ও পুণ্যস্বরূপ, জীবমাত্রের জননী। গো-গ্রাস প্রদানকালে যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহা এই—"ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ। প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবঃ ত্রৈলোক্য-মাতরঃ।"

হে ধার্ম্মিকপ্রবর দেশহিতৈষিগণ! ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে গোজাতি বিশেষ সমাদৃত হওয়া উচিত। যেহেতু ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতং।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি॥"

এই বচন দ্বারা ব্রাহ্মণের সহিত গোজাতির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে বুঝা যায়। যাহা হউক গোজাতি যে প্রাণিমাত্রের প্রিয় তাগতে আর কোন সন্দেহ নাই। জননী যেমন নিজে ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সন্তানের উপকার করে, গোজাতিও সেইরূপ নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এমন কি নিজের সন্তানকে দুগ্ধ না দিয়া পরকে পোষণ করিয়া থাকে। বৃক্ষসকল যেমন নিজর ফল, পুষ্প, পত্র, শাখা, প্রশাখা, ত্বক্ ও রস দ্বারা অন্যের উপকার করিয়া থাকে, এমন কি নিজে মরিয়াও ভস্ম হইয়া পরের উপকার সাধন করে; হে সাধুগণ! এই সাধু-চরিত্র বৃক্ষাদির ন্যায় গোজাতিও মলমূত্র প্রক্ষেপ করিয়া এবং অস্থি, চর্ম্ম, মজ্জা মাংস ইত্যাদি দ্বারাও ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। শাস্ত্র দুগ্ধকে অমৃত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, একমাত্র দুগ্ধপান করিয়া মানবগণ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়, দুগ্ধে বহুপ্রকার সদ্‌গুণ সকল বিদ্যমান আছে। অনেকদিন অতীত হইল আমি যখন নবদ্বীপে পড়িতেছিলাম, ঐ সময় ইংলণ্ড হইতে সংস্কৃত-শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, এরূপ একজন সাহেব কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপে টোল দেখিতে আসিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে সাহেব মনোমোহন বাবুকে বলিয়াছিলেন—"ঋষিগণ হবিষ্যান্নের যে বিধান করিয়াছেন, তাহা অতীব উত্তম। মৎস্য, মাংস খাদ্য বস্তুমাত্রে যত গুণ আছে, সকলই দুগ্ধে বর্ত্তমান। বিশেষ এই যে মৎস্য মাংসাহারী ব্যক্তিগণ যেরূপ উদ্ধতস্বভাব হয়; দুগ্ধ, দধি, ঘৃতপায়ী ব্যক্তি তেমন হয় না। তাহারা শিষ্ট, শান্ত স্বত্বগুণাবলম্বী হয়।" হায়! এমন উপকারী গোজাতির উপর আমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা অতিশয় লজ্জা ও দুঃখের কারণ সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে আছে—সন্ধ্যাকালে গোশালায় ধূমপ্রদান করিয়া মশকাদি নিবারণ করিবে এবং কুশ ও কাশদ্বারা বন্ধন করিতে হইবে। তাহাতে হঠাৎ বিপদ উপস্থিত হইলে বন্ধন ছেদ করিয়া যাইতে পারে, ইহাদ্বারা গোজাতির প্রতি আমাদের যে স্নেহ অপর্য্যাপ্ত ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সুতরাং গোজাতি অবশ্য আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ পাইবার অধিকারী। দেখুন—বিশেষ সাহায্য পাইবার ইচ্ছায় পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, দুষ্টজন কর্ত্তৃক ধর্ম্ম তাড়িত হইয়া ত্রিপাদহীন শুক্লবর্ণ এক পদে দণ্ডায়মান বৃষরূপ ধারণ করিয়া মহারাজা পরীক্ষিতের নয়নগোচর হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীও দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক আহত হইয়া সেইরূপ সহায়তা পাইবার লালসায় গোরূপ ধারণ করিয়া রাজার শরণাগত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, গোজাতি সকলেরই কৃতজ্ঞতার এবং স্নেহের পাত্র। হে ধার্ম্মিকগণ! সেই গোজাতির জন্য আমাদের আহারের সুব্যবস্থা করা নিতান্ত সঙ্গত। দেশে প্রাদেশ পরিমাণ জমিও পতিত নাই, জমিদার ও তালুকদারগণ অর্থপ্রাপ্তি লালসায় ঝিল, বিল প্রভৃতি যত অব্যবহার্য্য স্থান ছিল, যাহাতে গোজাতি স্বেচ্ছায় বিচরণ করিয়া স্বীয় উদর পরিপূর্ণ করিত, আজ সেই সকল স্থান ও প্রজাপত্তন করিয়া গোগ্রাসের অত্যন্ত অভাব জন্মাইয়াছেন। এইজন্যই আমাদের দেশে

গোজাতির উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি হইতেছে। যে গাভী পূর্ব্বে দুই তিন সের দুগ্ধ দিতেছিল, আজ সেরূপ গাভী অর্দ্ধসের কি এক সের দুগ্ধমাত্র দিয়া থাকে, তাহার প্রধান কারণ খাদ্যের অভাব। কেবল যে ঘাসের অভাব ঘটিয়াছে, এমন নয়, পানীয় জলেরও অভাব ঘটিয়াছে। দেখা যায়—পূর্ব্বকালে জনশূন্য মাঠের মধ্যে পুষ্করিণী ছিল, তাহার একমাত্র কারণ ধার্ম্মিক সদয়-হৃদয় মানবগণ গো, পশু, পক্ষী, পথিকজনের জন্য এইরূপ পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন জনশূন্য স্থানে পুষ্করিণী হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। আমাদের দেশে মেঘনা ও পদ্মানদীর পাড়ে যে সমস্ত গো দেখা যায়, ইহারা সকলই হৃষ্টপুষ্ট অধিক দুগ্ধবতী; অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়—উত্তম পানীয় জল, বায়ু ও খাদ্যবস্তুই তাহার প্রধান কারণ। হায়! কি দুঃখের বিষয় কেবল গোজাতির যে জলাভাব ঘটিয়াছে এমন নয়, প্রাচীন গ্রাম, নগর অন্বেষণ করিলে দেখা যায় - পূর্ব্ব খনিত পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত গ্রামের লোক জলাভাবে হায় হায় করিতেছে; ঐ কদর্য্য জল সকল পান করিয়া ওলাওঠা ও ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বহু গ্রাম, নগর জনশূন্য প্রায় হইয়াছে।

অতএব আমি অদ্য সহৃদয় দয়ালু জমিদার, তালুকদার, ধনী সকলের নিকটই সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি সকলে মিলিত হইয়া পরামর্শ পূর্ব্বক প্রত্যেক গ্রামে গোচারণ জন্য কিছু জমি আপনারা রাখিয়া দিবেন এবং কোন স্থানে পুষ্করিণী খনন ও কোথাও বা পঙ্কোদ্ধার করিয়া দেশবাসী দরিদ্র ও গো জাতিকে রক্ষা করুন। গো জাতির চিকিৎসার জন্য হিন্দুর সেই লুপ্ত উন্নত গোচিকিৎসা গ্রন্থের উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। এক সময়ে যে সকল গ্রন্থের অধ্যয়নের ফলে বিরাট রাজের নিকট সহদেব তথাকথিত পরিচয় দানে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদিও আমাদের অধঃপতনের ফলে উহা এখন অনেকটা আকাশকুসুম সদৃশ হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস ব্রাহ্মণ সমাজের ঐকান্তিক চেষ্টায় এখনও তাহার উদ্ধার হইতে পারে, ঐ সকল গ্রন্থের পঠন পাঠন জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করা নিতান্ত সঙ্গত। এই ভারতবর্ষে নানা কারণে গো-জাতির অবনতি ঘটিয়াছে।

(১) চর্ম্মকারগণ চর্ম্মালাভে বহু গোর বিনাশ সাধন করিতেছে।

(২) কু অভিপ্রায়ে দুগ্ধপায়ী বৎস সকলকে বিনষ্ট করিতেছে; এবং উপযুক্ত বৃষের অভাবে বলিষ্ঠ বৎস উৎপন্ন হইতেছে না। ইত্যাদি কারণ দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে বিজ্ঞতম সভ্যগণ! অর্থ যে অস্থায়ী তাহা সকলেই জানেন, বিশেষতঃ দেহের সঙ্গেই অর্থের সম্বন্ধ, দেহ অস্থায়ী ও ক্ষণ ভঙ্গুর, দেহনাশে যে অর্থের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। এমন কি বহু স্থানে দেখা যায়—বহু কষ্টের স্বোপার্জ্জিত ধন উপার্জ্জককে বিপদে ফেলিয়া অন্যের নিকটে চলিয়া যায়। হায়! কি দুঃখের বিষয় তাহা প্রমাণ করিতে হইলে অন্যত্র কোথাও যাইতে হইবে না, বর্ত্তমানে অখণ্ড ভূখণ্ডের অধিপতি কুবের তুল্য ধনবান রাজন্যবর্গই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। আপনারা সকলই বিজ্ঞ বহুদর্শী ও পণ্ডিত, আপনাদিগকে উপদেশ করিতেছি না, কেবল স্মরণার্থ এই প্রস্তাবনা করিলাম। ইতি—

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ।

কীর্ত্তিমালিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিষধরাজনন্দিনী কীর্ত্তিমালিনী কুমার ভদ্রায়ুকে সিংহসমীপে গমন করিতে দেখিয়াই তাঁহাকে স্বপ্নদৃষ্টবীর মনে করিয়া ঐকান্তিক মনে ইষ্টদেবতার শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধুনা সেই পুরুষকেই সিংহমস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে দর্শন করিয়া যারপরনাই আনন্দ লাভ করিলেন এবং শনৈঃ শনৈঃ ধীর মরাল গমনে, ভদ্রায়ুসন্নিধানে উপনীত হইয়া কুমারী-জনসুলভ লজ্জাসঙ্কোচ-সত্বেও মনঃ প্রসাদহেতু প্রসন্নদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কুমার ভদ্রায়ুর কণ্ঠে মূর্ত্তিমান অনুরাগের ন্যায়, স্বয়ম্বরমালা অর্পণ করিলেন। কুমারীসুলভ ব্রীড়াবশতঃ প্রাক্‌সঞ্জাত অনুরাগপ্রভা ব্যক্ত না হইলেও কুঞ্চিতকুন্তলা কুমারীর পূর্ব্বরাগ রোমাঞ্চছলে তদীয় দেহবল্লরী ভেদ করিয়াই যেন বিকশিত হইতে লাগিল। কুমার ভদ্রায়ুও বিশাল বক্ষঃস্থলে আলম্বিত মঙ্গলময়ী মালা ধারণ করিয়াই মনে করিলেন—কমনীয়কান্তি নিষধরাজকুমারী কীর্ত্তিমালিনী যেন তাঁহার কণ্ঠে বাহুলতা অর্পণ করিয়াছেন।

স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত পুরবাসি-বর্গ রাজনন্দিনী কীর্ত্তিমালিনীকে ভদ্রায়ুসঙ্গতা দর্শনে প্রীতিসহকারে উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—যেন মেঘনির্মুক্ত কৌমুদী শশাঙ্কসহ মিলিত অথবা বাসন্তীনবকিশলয়যুক্ত সহকারে নবপল্লবযুক্ত মালতীলতা জড়িতা হইয়া শোভা পাইতেছে।

অনন্তর দেব, দ্বিজ, গুরুজনে প্রণত বরকন্যা মঙ্গলবাদ্যপুরঃসর অন্তঃপুরে নীত হইলে, নিষধরাজ চন্দ্রাঙ্গদ বিহিত পূজোপকরণে বিনীতভাবে সৎকার করিলেও মহীপালবর্গ রাজা চন্দ্রাঙ্গদের প্রতি বাহ্যতঃ প্রসন্ন হইয়া, শুষ্কহাস্য পরিহাস পূর্ব্বক, পূজোপকরণাদি বরবধূর উপঢৌকনচ্ছলে প্রত্যর্পণ করিয়া, আন্তরিক বিদ্বেষভাব গোপন করিয়া, প্রাবৃট্‌কালীন নক্রসমাকুল বেগবান নদের ন্যায় বেগে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর নিষধরাজ মুনিঋষি প্রমুখ বিপ্রগণকে বিহিত উপকরণে সৎকার পূর্ব্বক, সুলক্ষণা পয়স্বিনী গাভী ও প্রভূত দ্রবিণদানে সন্তোষিত করিলেন। সমাগত নাগরিক ও জানপদ দর্শকমণ্ডলীকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিয়া, নানাবিধ উপহারও প্রদান করিলেন এবং স্বয়ম্বর উপলক্ষে যে সমস্ত দীনদুঃখী প্রভৃতি আসিয়াছিল, তাহাদিগকে আশাতিরিক্ত দান করিয়া সন্তোষিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে সকল শ্রেণীর লোকেই পরমতৃপ্ত হইয়া বরবধূর কুশল প্রার্থনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

কুমার ভদ্রায়ু কীর্ত্তিমালিনী সহ অন্তঃপুরচত্বরে সমানীত হইলে, রাজ্ঞী-সীমন্তিনী পুরাঙ্গনাগণ পরিবৃত হইয়া, মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক, কন্যা-জামাতাকে স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। রাজ্ঞী-সীমন্তিনী দুহিতার বিবাহে অসম্মতি শ্রবণাবধি, অনাবৃষ্টিনিবন্ধন প্রখর সূর্য্যকিরণে প্রতপ্ত হইলে লতিকা যেরূপ শুষ্ক হইতে থাকে, তদ্রূপ মনস্তাপানলে শুষ্ক হইতেছিলেন। আজ দেবানুগ্রহবর্ষণে, পুনরায় প্রফুল্লিত হইয়া, আনন্দসাগরে নিমগ্না হইলেন। বর-কন্যা দর্শনে পৌরাঙ্গনাগণ প্রফুল্লমনে নানাবিধ আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্তঃপুরবাসী ভৃত্যগণ ভদ্রায়ুর বীরবেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া, শুভ্র দুকুল পরিধান করাইয়া, তাঁহার ক্লমাপনোদন করিল। দাসীগণও কীর্ত্তিমালিনীর বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া, রঙ্গআমোদে আমোদিত করিতে লাগিল।

রাজ্ঞী-সীমন্তিনী নানাবিধ চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যদ্রব্য দ্বারা জামাতাকে ভোজন করাইলেন, ভোজনান্তে কুমার বিশ্রাম পূর্ব্বক ও পুরাঙ্গনাগণ সহ নানাবিধ হাস্যপরিহাসে সুখী হইয়া, কালযাপন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাগমন করিলে, যথানিয়মে সন্ধ্যোপাসনাদি সমাধা করিলেন। পৌরাঙ্গনাগণ বরকন্যা লইয়া, বিবাহ-পূর্ব্ব-নিশা-কর্ত্তব্য স্ত্রীআচারাদি সম্পাদন করিয়া আনন্দে মগ্ন হইল। যথাকালে নৈশ ভোজন সমাপন করিয়া, কুমার দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় শয়ান হইয়া, সুনিদ্রায় রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রাতুষে অন্তঃপুরচারিণী কলকণ্ঠী কিশোরবয়স্কা বন্দিনীর দল তাললয়সংযুক্ত সময়োপযোগী স্তুতিগান পূর্ব্বক কুমারের নিদ্রাভঙ্গ করিল।

নবম স্তবক।

নিষধরাজপুরী বৈবাহিক উৎসব কোলাহলে পরিপূর্ণ। নিষধরাজ চন্দ্রাঙ্গদ কন্যা-সম্প্রদান নিমিত্ত মাঙ্গলিক আভ্যুদয়িক ক্রিয়াদি সমাপন করিলেন। অন্তঃপুরমধ্যে রমণীগণ নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যাপৃত। যথাসময়ে বরকন্যার স্নানাদি সমাধা হইলে, ভৃত্যগণ ও প্রসাধকগণ কুমার ভদ্রায়ুকে বৈবাহিক বেশভূষায় সুসজ্জিত করিল। দাসীগণ ও প্রসাধিকা-গণ কীর্ত্তিমালিনীর কেশবিন্যাসপূর্ব্বক নানাবিধ প্রসাধনদ্রব্যে ভূষিত করিতে লাগিল। এইরূপে নানাবিধ উৎসব কার্য্যে দিবা অবসান হইলে দিনমণি পশ্চিমগগনে অস্তাচলচূড়াবলম্বন নিমিত্ত বৃক্ষপর্ব্বতের অন্তরালে গমন করিলেন। প্রাচীদিক সমুজ্জল করিয়া নক্ষত্র শোভিত হইয়া শশাঙ্কদেব উদিত হইলেন। এরূপ সময় দশার্ণরাজ বজ্রবাহু নিষধরাজপুরে উপনীত হইলেন। রাজা চন্দ্রাঙ্গদ মন্ত্রিগণসহ অগ্রসর হইয়া, ভাবী বৈবাহিক রাজা বজ্রবাহুকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক পুরপ্রবেশ করাইয়া, সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। তদনন্তর পরস্পর পরস্পরকে মঙ্গল প্রশ্নাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। বিশ্রামান্তে রাজা বজ্রবাহু বস্ত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা নিমিত্ত উপাসনা গৃহে গমন করিলেন।

এদিকে সন্ধ্যা অতীত হইলে বৈবাহিক সভা আরম্ভ হইল। কুমার ভদ্রায়ু অপূর্ব্ব বেশ-ভূষণে ভূষিত হইয়া, কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া, বরসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সমরূপবয়ঃসম্পন্ন গন্ধর্ব্বকুমার সদৃশ বালকচতুষ্টয় চামর ব্যজন করিতে লাগিল। সভারূঢ় ব্যক্তিগণ সভায় কুমারের বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইতে লাগিল; সভার একপার্শ্বে মহর্ষি,ঋষি,মুনি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট, অন্যপার্শ্বে রাজকুমার-গণ,রাজপার্ষদগণ সামন্ত ও করদরাজগণ উপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন; এমত সময় রাজা চন্দ্রাঙ্গদ দশার্ণরাজ বজ্রবাহু সমভিব্যাহারে সভা প্রবেশ করিলেন। এ

যাবৎকাল রাজা বজ্রবাহু জানিতে পারেন নাই যে, রাজা চন্দ্রাঙ্গদের কন্যার বিবাহ কাহার সহিত সম্পাদিত হইবে। সুতরাং তিনি সভাপ্রবেশ মাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজা চন্দ্রাঙ্গদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বন্ধো! আপনার এই জামাতাই আমার প্রাণদাতা বীর। ইনিই আমার স্ত্রী, পুত্র ও রাজ্য দুরাত্মা মগধেশ্বরের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তোমার এই জামাতা মহাবল-পরাক্রমশালী। ইহাঁর বীরত্ব অলৌকিক॥ ইনি সামান্য মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া যে অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কদাচ মনুষ্যকুলে সম্ভব হয় না। হে বন্ধো! দুঃখের বিষয়, আমি এযাবৎ ইহাঁর কোন পরিচয়ই প্রাপ্ত হই নাই। ইনি কোন বংশ উজ্জ্বল করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তত্ত্বতঃ তাহা জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছি। রাজা বজ্রবাহুর বাক্যাবসানে রাজা চন্দ্রাঙ্গদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন হে বন্ধো! হে রাজন! আমি আমার জামাতার পরিচয় যতদূর জানি, তাহাই বলিতেছি। অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। দশার্ণ নামে এক রাজ্য আছে। ঐ রাজ্যের রাজার দুইটী রাজ্ঞী। পট্টমহিষীর নাম সুনীতি। ঐ পট্টমহিষী সুনীতি গর্ভবতী হইলে, তাঁহার সপত্নী গর্ভসহ তাঁহাকে বিনাশ জন্য, বিষ প্রয়োগ করেন। দৈবযোগে ঐ বিষে তাঁহার প্রাণ বা গর্ভ নষ্ট হয় না। পরে তাঁহার একটী পুত্র হয়। বিষপ্রয়োগ ফলে, রাজ্ঞী ও তাঁহার কুমার দুরারোগ্য পীড়ায় পীড়িত হয়েন। রাজা অনেক চিকিৎসা করাইলেও পীড়া আরোগ্য হয় না। তাঁহাদের পীড়া অনারোগ্য ও সংক্রামক মনে করিয়া রাজা ভ্রান্ত হইয়া সপুত্রা রাজ্ঞীকে বনে নির্ব্বাসন করেন। রাজ্ঞী ও তাঁহার পুত্রকে কোন মহাত্মা আশ্রয় প্রদান করিয়া প্রতিপালন করেন। সেই নির্ব্বাসিত কুমারই আমার দুহিতার স্বয়ম্বরপণবিজয়ী বীর। অন্যান্য সবিস্তার বিবরণ পরে জ্ঞাত হইবেন। দশার্ণরাজ এই সংবাদ শ্রবণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন। এই সময় কুমার ভদ্রায়ু অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বজ্রবাহু ব্রীড়ানন্দমিশ্র গদ্গদ স্বরে পরমপুলকিত হইয়া পুত্রকে অভিনন্দনপূর্ব্বক বরাসনে উপবেশন করাইলেন এবং স্বয়ং চন্দ্রাঙ্গদ কর্ত্তৃক উপযুক্ত আসনে উপবেশিত হইলেন।

অনন্তর বৈবাহিক শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে, কুমার ভদ্রায়ু অন্তঃপুর চত্বরে সমানীত হইয়া বিচিত্র রত্নময় পীঠাসনে উপবেশন করিলেন। নিষধরাজ বৈবাহিক ও অন্যান্য সুহৃদ্বর্গকে যথোপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন। এই সময় তদীয় গুরুদেব মহাযোগী ঋষভদেবকে যথোপযুক্ত ভাবে আবাহন করিয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা পূজা করিয়া, কন্যা সম্প্রদানের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। গুরুদেবের অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজা সভাস্থিত বিপ্রবর্গ ও গুরুজনদিগের অনুমতিক্রমে কন্যা সম্প্রদানোপযোগী আসনে উপবেশন করিয়া, আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিলেন এবং কুমার ভদ্রায়ুকে রত্নালঙ্কারসহ রমণীয় দুকূলযুগল দ্বারা বরণ করিয়া, জামাতাকে বিষ্ণুজ্ঞানে মধুপর্ক সমন্বিত অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। তদনন্তর অভিনব ইন্দু-কিরণ যেরূপ ফেণরাজি বিরাজিত মহোদধিকে

বেলা-সমীপে লইয়া যায়, তদ্রূপ শুদ্ধান্তাধিকৃত বিনীত শুভ্রবেশধারী ভৃত্যগণ নবদুকূল পরিহিত কুমারকে কীর্ত্তিমালিনী-সন্নিধানে লইয়া গেল। তথায় শুভদৃষ্টিকালে বধূ ও বরের পরস্পর সতৃষ্ণ দৃষ্টি একবার অপাঙ্গদেশে প্রতিসারিত অমনি ঈষদ্দর্শনমাত্র প্রতিনিবর্ত্তিত হওয়াতে যেন একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় ব্রীড়াতনা অনুভব করিল। তদনন্তর বরবধূ যথানিয়মে আসনে আসীন হইলে স্বাধ্যায় নিরত রাজপুরোহিত বিহিত যোজকাগ্নিতে যথাবিধানে আহুতি প্রদানান্তর ঐ অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া বর ও বধূর হস্ত চিরবন্ধনরূপ কুশবন্ধনে সংবদ্ধ করিয়া দিলেন। কুমার ভদ্রায়ুর অস্ত্রধারণকঠিন করতলে বধূ কীর্ত্তিমালিনীর কোমল করপল্লব কুশবদ্ধ হওয়ায় সহকার শাখার উপরে সন্নিহিত অশোক লতিকার প্রবালগুচ্ছ পতিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। পুরোহিত সন্তুষ্ট হইয়া কুশগ্রন্থি সাময়িক মোচন করিলে, দম্পতী উদগতশিখাশালী হুতাশনের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সুমেরুশৈল সমন্তাৎ পরিবেষ্টমান পরস্পর সংলগ্ন দিনযামিনীর শোভা হরণ করিলেন। পরে ইন্দিবরনয়না নববধূ কীর্ত্তিমালিনী ব্রীড়ানম্রবদনে অনলে লাজাঞ্জলি নিঃক্ষেপ করিলে, হুতাশন হইতে ঘৃত, শমীপল্লব এবং লাজগন্ধযুক্ত পবিত্র সুগন্ধ ধূম উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিল।

অনন্তর যোগিবর ঋষভদেব, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণবর্গ দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিলে, রাজা ও বজ্রবাহু সচন্দনাক্ষত বর্ষণে উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন বরবধূ গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ ও গুরুজন-চরণে প্রণাম করিয়া পুরন্ধ্রীবর্গবেষ্টিত হইয়া বাসরগৃহে সমানীত হইলেন।

এইরূপে শুভোদ্বাহ কার্য্য সম্পাদিত হইলে মহাযোগী ঋষভদেব আসন পরিত্যাগ করিয়া, বহির্গমন করিলেন। রাজা চন্দ্রাঙ্গদ বৈবাহিকের হস্তগ্রহণ করিয়া, বৈশ্যপতি পদ্মাকর ও সুনয়সহ মহাযোগীর অনুগমন করিলেন। যোগীবর নির্দ্দিষ্ট আবাসে উপস্থিত হইয়া হৈমসিংহাসনে উপবেশন করিলে, উঁহারাও উপযুক্ত আসনে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর যোগিবর রাজা বজ্রবাহুকে সম্বোধনপূর্ব্বক মহিষী সুনীতি ও কুমার ভদ্রায়ুর নির্ব্বাসন হইতে উদ্বাহ পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে বর্ণনা করিলেন। রাজা বজ্রবাহু অধোবদনে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বৎপরোনাস্তি লজ্জিত অনুতপ্ত হইয়াও আনন্দ-সাগরে সন্তরণ করিলেন এবং যোগী-রাজের চরণে পতিত হইয়া অনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যোগী-রাজ তাঁহাকে হস্তধারণ করিয়া উত্থাপিত করিয়া, আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিলেন ; হে রাজন! গতানুশোচনা নিষ্প্রয়োজন, সকলই বিধাতার নিয়তি অনুসারে এবং প্রত্যেকের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুসারে সংঘটিত হইয়াছে। মহামতি পদ্মাকরও যে অলৌকিক মহত্ব প্রদর্শন করিয়া মহিষী সুনীতিকে মাতৃবৎ সস্নেহ ভক্তিসহকারে প্রতিপালন এবং কুমার ভদ্রায়ুকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন পূর্ব্বক রাজকুমারোচিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, ইহাও সকলেরই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে হইয়াছে। আমি আশাকরি ও আশীর্ব্বাদ করি, আপনি অতঃপর স্ত্রী-পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সুখে রাজ্যপালন করিয়া, অন্তে পরম পদ প্রাপ্ত হউন।

নিষধরাজ্য ও নিষধ রাজ চন্দ্রাঙ্গদের সহিত বৈশ্যপতি পদ্মাকরের যে চিরন্তন আত্মীয়তা আছে, অধুনা সেই আত্মীয়তা দৃঢ়ীকৃত হইল, পরন্তু আপনার সহিতই পদ্মাকরের অচ্ছেদ্য বান্ধবতা জন্মিল। ইহাঁর পুত্র সুনয় ভদ্রায়ুর হৃদয়বন্ধু ও সেনাপতি। সম্প্রতি সুনয় দশার্ণরাজের সেনাপতি ও মন্ত্রী পদ লাভের সর্ব্বথা উপযুক্ত। যোগী রাজের বাক্যাবসানে রাজা বজ্রবাহু ভক্তিগদগদ স্বরে—বলিলেন ভগবন্! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। মহাত্মা পদ্মাকরের নিকট, আমি কেন, দশার্ণরাজ্যই এরূপ কৃতজ্ঞতা সূত্রে আবদ্ধ যে, ঐ কৃতজ্ঞতার শতাংশ পরিশোধও অসম্ভব।

অতঃপর সকলেই নৈশভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া বিশ্রাম করিলেন। পরদিন বৈশ্যপতি পদ্মাকর, রাজা চন্দ্রাঙ্গদ ও রাজা বজ্রবাহুর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন যে রাজা বজ্রবাহু পুত্র ও পুত্রবধূসহ বৈশ্যরাজভবনে পদার্পণ করিয়া মহিষী সুনীতির সহিত মিলিত হইয়া, দশার্ণ রাজ্যে গমন করিলে তিনি কৃতার্থ হয়েন। বৈশ্যপতির এই যুক্তিসঙ্গত প্রার্থনায় কেহই অমত প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের অনুমতি পাইয়া, পদ্মাকর অগ্রসর হইয়া স্বরাজ্যে গমন করিলেন। সুনয় তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে যাত্রা করিবেন এরূপ ব্যবস্থা হইল।

বৈশ্যপতি ত্বরান্বিত হইয়া যথাকালে স্বপুরে উপনীত হইয়া, মহিষী সুনীতির নিকট কুমারের পণবিজয়, রাজা বজ্রবাহুর আগমন ও শুভ পরিণয় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিলেন। মহিষী সুনীতি ও বৈশ্যরাজপত্নী মনোরমা হর্ষোৎফুল্ল গদগদ চিত্তে মহোৎসব পুর্ব্বক চন্দ্রশেখরের পূজা ও বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করিলেন। পদ্মাকরও কুমার ও বধূর শুভাগমন জন্য দীন দরিদ্রদিগকে ভোজ্য বস্ত্র ও অর্থদান করিলেন। অচিরকাল মধ্যে স্বীয় পুরী ধ্বজপতাকা ও মাল্যদ্বারা সুশোভিত করিলেন এবং নানাবিধ বাদ্যোদ্যম আরম্ভ করাইলেন। বৈশ্যপুরী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইতে লাগিল।

নিষধ রাজপুরে রাজা চন্দ্রাঙ্গদ বৈবাহিক, জামাতা ও বন্ধুবান্ধব মিলিত হইয়া মহোৎসাহে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাধা করিলেন। কন্যাজামাতাকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক শুভ-লগ্নে শুভক্ষণে অশ্রুপূর্ণনয়নে যথানিয়মে শুভ যাত্রা করাইয়া, বৈবাহিক ও কন্যা জামাতাকে বিদায় প্রদান করিলেন। বৈশ্যরাজতনয় রাজা বজ্রবাহু ও বরবধূ লইয়া সায়ংকালে হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সৈন্য পুরোবর্ত্তী করিয়া মহোৎসাহে স্বনগরে উপস্থিত হইলেন। বৈশ্যপতি পদ্মাকর ও বাদ্যোদ্যম পুরঃসর অগ্রগামী হইয়া, নগর প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। সকলে আগমন করিলে মহোৎসাহে ও মহোৎসব সহকারে চন্দ্রশেখর মন্দির নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। তথায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজা বজ্রবাহু পুত্র পুত্রবধূ সহ বৈশ্যকুলদেব চন্দ্রশেখরকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক পুনরায় রথারোহণে বৈশ্যপুরে উপনীত হইলেন। নানাবিধ আলোক মালা, ধ্বজপতাকায় সুশোভিত হইয়া বৈশ্যপুরী দ্বিতীয় ইন্দ্রপুরীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। মহিষী সুনীতি ও মনোরমা সখী পরিবৃতা হইয়া দ্বারদেশে সমাগত হইয়া পুত্র ও বধূ লইয়া মাঙ্-

লিক লাজাদি বর্ষণ পূর্ব্বক পুরপ্রবেশ করাইলেন। পুত্র ও বধূকে লইয়া, আচার অনুযায়ী মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া সুনীতি পরমানন্দিত হইলেন। বৈশ্যরাজ পদ্মাকর রাজা বভ্রবাহুকে যথোপযুক্ত সমাদর ও অভ্যর্থনা পূর্ব্বক পুরমধ্যে লইয়া স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন এবং উপযুক্ত উপঢৌকন ও পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা তাঁহার সমুচিত সংকার করিলেন।

যথাকালে মহিষী সুনীতির সহিত রাজা বভ্রবাহুর সাক্ষাৎ হইল। রাজা ব্রীড়ানম্রবদনে অথচ পরমাহ্লাদে মহিষীর নিকট স্বীয় দুষ্কৃতি জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। পতিপরায়ণা মহিষী সুনীতি পতিকৃত অন্যায় ব্যবহার যেন বিস্মৃত হইয়াই তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, উভয়ের মিলন হইল, আনন্দ কোলাহলে বৈশ্যরাজপুরী পরিপূর্ণ হইল। যথাসময়ে সকলে নৈশ ভোজন সমাধা করিয়া বিশ্রাম করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে রাজা বভ্রবাহু স্বরাজ্যে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেও পদ্মাকর ও তদীয়পত্নী মনোরমার আগ্রহাতিশয্যে সে দিবসও বৈশ্যপুরে আনন্দোৎসবে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন রজনী প্রভাতা হইলে, রাজা বভ্রবাহু, বৈশ্যপতি পদ্মাকরকে বিনয় সম্ভাষণে কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপনে আপ্যায়িত করিয়া, পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গমনের প্রাক্কালে রাজ্ঞী সুমতী বৈশ্যপত্নী মনোরমার হস্তধারণ করিয়া যেরূপভাবে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। মনোরমাও সুনীতীর অনুসরণে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহার বিচ্ছেদ যাতনায় ব্যথিত হইয়া নীরবাশ্রু মোচন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। রাজা বভ্রবাহু পদ্মাকরকে অনুরোধ করিয়া তদীয় পুত্র সুনয়কে ভদ্রায়ুর অনুজের ন্যায় স্নেহ সহকারে সমভিব্যারে লইয়াছিলেন। পদ্মাকর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত গমন করিয়া দুঃখিতমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

রাজা বভ্রবাহু বৈশ্য নগর হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বদিনই স্বরাজ্যে দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথাকালে প্রধান মন্ত্রী মাঙ্গলিক পুষ্প-পল্লব-মাল্যে ও ধ্বজপতাকায় রাজপুরী সুসজ্জিত করিলেন এবং ফুল ফল পল্লব যুক্ত পূর্ণ কলসদ্বয় সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। নগরের প্রধান নাগরিকগণকে রাজ্যের ত্রাণকর্ত্তা কুমারের জননী ও পত্নী সহ শুভাগমন বিজ্ঞাপন করিয়া নানাবিধ বাদ্যোদ্যমসহ শুভযাত্রা করিয়া রাজা, রাজপুত্র ও নির্ব্বাসিত রাজমহিষীর অভ্যর্থনা জন্য অগ্রসর হইলেন। নগরের প্রধান অপ্রধান প্রায় সমস্ত নাগরিক শুভা-যাত্রার অনুসরণ করিলেন। যথাকালে রাজা বভ্রবাহু মহিষী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে নগরোপকণ্ঠে উপস্থিত হইতে না হইতে মন্ত্রী, অমাত্য ও নাগরিকগণ শুভাযাত্রাসহ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র আনন্দোল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া, তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে তূর্য্যনিনাদ মিশ্রিত শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। রাজা বভ্রবাহু মহিষী ও বিজয়ী মহাবীর পুত্র ও পুত্রবধূসহ অভিনন্দিত হইয়া আনন্দ কোলাহলে উল্লাসিত হইয়া ধীর গমনে পুর প্রবেশ করিলেন। নাগরিকগণ নির্ব্বাসিত সুনীতিতনয়ই তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা দেবকুমার সদৃশ মহাবীর ভদ্রায়ু, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া আনন্দ সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল। নগর

মধ্যে চতুর্দ্দিকে কুমার ভদ্রায়ুর অভিনন্দন স্বরূপ মহোৎসব ও মাঙ্গলিক কার্য্য আরম্ভ হইল। সমাগত দীনদুঃখী দিগকে অন্ন ও বস্ত্র বিতরিত হইতে লাগিল।

পুরাঙ্গনাগণ মহোৎসাহে নির্ব্বাসিতা মহিষী সুনীতী ও তদীয় নবপুত্রবধূকে নানাবিধ মঙ্গলাচরণ পুরঃসর পুরঃ প্রবেশ করাইলেন। পৌরাঙ্গনাগণের আনন্দের সীমা রহিল না, সকলেই মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

কুমার ভদ্রায়ু পুর প্রবেশ করিয়াই বিমাতা কলাবতীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"মাতঃ! আমি যে এরূপ দৈববল প্রাপ্ত হইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি সে আপনারই অনুগ্রহবলে" এইরূপে নানাবিধ বিনীত মধুরালাপে বিমাতার লজ্জাপনোদন করিলেন, অনন্তর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, রাজ্যের মন্ত্রী, অমাত্য ও নাগরিকগণকে মধুর বচনে আপ্যায়িত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে পিতার নিকটে অনুরোধ করিয়া কারাবদ্ধ সানুচর মগধরাজকে কারাবিমুক্ত করিয়া, প্রতিদ্বন্দী নৃপতিযোগ্য বিবিধ উপচারে তাঁহার পূজাও সৎকার করিয়া, পিতার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপন করাইলেন। মহাবীর মগধেশ্বর কুমারের বীরত্বের অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

রাজা বজ্রবাহু নির্ব্বাসিতা মহিষী, পুত্র ও পুত্রবধূসহ মহানন্দে কিছুদিন রাজ্য পালন করিয়া কিয়ৎকালান্তে পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং মুক্তিমার্গপ্রাপ্তি-পথাবলম্বন করিলেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

জন্মাষ্টমী।

(১)

এই কি সে জনম অষ্টমী!
ভূ-ভার হরণ তরে, মানব মূরতি ধরে,
দ্বাপর যুগের শেষে গোলকের স্বামী—
কর্ম্মক্ষেত্র ভারত দুর্দ্দিনে,
এসেছিলে ধর্ম্মের রক্ষণে!
রোহিণীর শশধরে, রজনীর দ্বি-প্রহরে,
ভাদ্র কৃষ্ণা অষ্টমীর-বরষা সময়—
মথুরার কারাগারে, ঘন ঘোর অন্ধকারে,
ভক্ত দেব দম্পতীর হইলে তনয়।
এই কি সে জনম অষ্টমী!

আশ্রয়ী বৈষ্ণবী মায়া, ধরিয়া দ্বি-ভুজ কায়া,
করিলেন পদার্পণে ধন্য এই ভূমি।

(২)

এ অষ্টমী নিশি দরশনে,
কত ইতিহাস স্মৃতি, চঞ্চল করিছে মতি;
জাগে কত মধুমাখা ব্যথা দীন প্রাণে।
দম্পতীর কাতর আহ্বানে,
পুত্ররূপে এলে যবে ত্রাণে;
সে জন্ম অষ্টমী নিশি, ভারত গৌরব রাশি
বহিয়া গরবে যেন উদিছে এ দিনে!
সে কোন্ অতীত কথা, তবু আছে হৃদে গাঁথা
বর্ত্তমান সম যেন নেহারি নয়নে,—
এ অষ্টমী নিশি দরশনে,
সে মধুর হরিলীলা, বাল্য ও কৈশর খেলা
গোকুলে ও বৃন্দাবনে রাখালের সনে!

(৩)

বর্ত্তমান সম এ নয়নে,
বাৎসল্য সে যশোদার, ভূ-তলে তুলনা তার
মিলে নাই, মিলিবেনা, এ নর জীবনে!
যে অপূর্ব্ব সখ্যের সাধনে,
সিদ্ধ হলো রাখাল পরাণে,
মাধুর্য্যের মহাভাবে, শক্তিরূপা গোপী সবে,
যে মহান্ আত্মত্যাগ করিল ভুবনে
ভাষায় প্রকাশ যার হয়নিকো একবার
সাক্ষাৎ নিরখি' যেন সে সব এক্ষণে
বর্ত্তমান সম এ নয়নে।
ক্ষণে ভুলি আপনারে, বিষাদে নয়ন ঝরে
একটী না সরে কথা এ পোড়া বয়ানে
বর্ত্তমান সম হেরি এ দীন নয়নে।

(৪)

এই কি সে জনম অষ্টমী!
পেয়ে যে অষ্টমী নিশি, ত্রিদিবের গর্ব্বরাশি

হয়ে ছিল এক দিন এই মাতৃ ভূমি।
এই কি সে জনম অষ্টমী!
এই কি সে তব কর্ম্ম ভূমি!
দমিয়ে দুষ্টের দল, বাড়াতে ধর্ম্মের বল,
ধরণী উদ্ধার তরে এসেছিলে স্বামী!
তব লীলা খেলা স্থান, এখনও বর্ত্তমান
আছে; শুধু অদর্শন হইয়াছ তুমি,
এই কি সে জনম অষ্টমী!
এই কি যমুনা সেই, সেই বৃন্দাবন এই,
বলে দাও এই কি নাথ জনম অষ্টমী!

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার বার্ষিক অধিবেশনে

সভাপতির অভিভাষণ।

মহনীয় ভূদেবগণ!

আজ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার দশম বার্ষিক উৎসব। আপনারা আমাকে সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন। এই কারণে আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে আপনাদের ধন্যবাদ করিতেছি। এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ পদের গৌরব রক্ষা করিতে হইলে যে সমস্ত সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক; আমার তাহার কিছুই নাই, ইহা ভাবিয়া এই গৌরবের আসনে উপবেশন করিতে আমি কুণ্ঠা অনুভব করিতেছি। আপনাদের আদেশ প্রতিপালন না করিলে দোষ হইবার সম্ভাবনা, অতএব সেই দোষ পরিহারার্থই আমি অযোগ্য হইয়াও এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। আমি জানি ভূদেবগণের কৃপায় কিছুই অসম্ভব নহে। "যদ্‌ব্রাহ্মণাস্তুষ্টতমা বদন্তি, তদ্দেবতা কর্ম্মভিরাচরন্তিঃ। তুষ্টেষু তুষ্টাঃ সততং ভবন্তি, প্রত্যক্ষদেবেষু পরোক্ষ দেবাঃ।" এখন প্রার্থনা—আমার যে সমস্ত ত্রুটি হইবে আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার উদ্দেশ্য কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ জাতির পবিত্রতা রক্ষা করিয়া উন্নতিসাধনই এই সভার উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ জাতির পবিত্রতা বুঝিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ জাতির স্বরূপ কি ও এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন, তাহা দেখিতে হয়। প্রজাপতি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাভিমানী অগ্নির সৃষ্টি করেন, তাহা হইতে দেবক্ষত্রিয় ইন্দ্রপ্রভৃতিরও পরে দেববৈশ্য অষ্টাবসু প্রভৃতি এবং দেবশূদ্র পূষা প্রভৃতির সৃষ্টি করেন। পরে তাহাদের নিয়ামক ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন।

যথা বৃহদারণ্যকে—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকং সন্নব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্য্যন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইত্যাদি ইত্যুক্ত্বা কিয়দ্দূরে সনৈব ব্যভবৎ তৎচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্মস্তস্মাৎ পরং নাস্তীতি ॥"

মনু বলিলেন—"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্ত্রয়োবর্ণাদ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিশ্চ শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু। আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে।

যাজ্ঞবল্ক্য—"সবর্ণেভ্য সর্ব্বাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ। অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ।" দেবলঃ—"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ সংস্কৃতো ব্রাহ্মণোভবেৎ। এবং ক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা জ্ঞেয়াঃ স্বেভ্যঃ স্বযোনিজাঃ।"

মনু—"অধ্যাপনং অধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা। দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ। ত্রয়োধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ংপ্রতি। অধ্যাপনং যজনশ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ। বৈশ্যংপ্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তিতা ইতি স্থিতিঃ। ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্ম্মান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ।"

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশ ইত্যাদি" গীতা। এই সমুদয় শ্রুতি স্মৃতি পর্য্যালোচনা করিলে পাওয়া যায় যে কর্ম্মবিশেষে অধিকার বিশেষ-নিবন্ধন জাতিবিশেষ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল মনুষ্যের সমানাকৃতি-নিবন্ধন যেমন মনুষ্যত্বজাতির অভিব্যক্তি হয়, ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি সেরূপ আকৃতি-নিবন্ধন নহে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবশতঃ ব্রাহ্মণদম্পতী হইতে জন্ম হইলে ব্রাহ্মণজাতি হয়। এইরূপ ক্ষত্রিয়াদিদম্পতী হইতে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়াদি জাতি হয়। এখন ব্রাহ্মণের লক্ষণ হইতেছে,—"যাজনাদিষট্‌কর্ম্মশালিত্বযোগ্যত্বং" অর্থাৎ যে ব্যক্তিতে যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মের যোগ্যতা আছে, সেই ব্রাহ্মণ। যোগ্যতা না বলিলে যাহারা যাজনাদি করেন না, তাঁহারা গৌণ ব্রাহ্মণ হন না, ব্রাহ্মণমাত্রেরই উক্ত যোগ্যতা শাস্ত্রে স্বীকৃত আছে।

"অথবা সন্ততিবিশেষপ্রভবত্বং ব্রাহ্মণত্বং।" সেই সন্ততিপ্রভব ব্যক্তি কত তাহা গণনা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, লোকপ্রসিদ্ধি দ্বারাই তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন কাশ্যপের সন্তান কাশ্যপ, ভরদ্বাজের সন্তান ভারদ্বাজ প্রভৃতি। ইহা হইল গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির দ্বারা সন্ততির পরিচয়।

আধুনিক পরিচয় হইতেছে—ফুলিয়া বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, খড়দহ যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান, চান্দ্রই লম্বোদরের সন্তান ইত্যাদি। ইহা গেল রাঢ়িশ্রেণীর পরিচয়। বারেন্দ্র এবং বৈদিক শ্রেণীরও এই প্রকার সন্ততিবিশেষের পরিচয়ের দ্বারাই ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগের বিষয় হইয়া থাকে।

যথাহ প্রভাকরমতানুযায়িনঃ—"অনাদৌ সংসারে জন্যজনকভাবেন ব্যবস্থিতাঃ কাশ্চিৎ পুরুষ-সন্ততয়ঃ সন্তি, তাসামন্যোন্যাব্যতিকরজাতাঃ স্ত্রীপুংসব্যক্তয়ো ব্রাহ্মণশব্দবাচ্যাঃ। অনিন্দং প্রথমতয়া চ সন্ততেঃ সর্ব্বেষাং তৎসন্ততিপতিতত্বাৎ সিদ্ধা ব্রাহ্মণশব্দবাচ্যতা।"

এখন সিদ্ধান্ত হইল যে সন্ততিবিশেষপ্রভব ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার কর্ম্মবিশেষে অধিকার। ব্রাহ্মণাদি জন্মলাভের পর ব্রাহ্মণত্বের অভিব্যক্তির জন্য অনেক সংস্কারের বিধান আছে। সেই সংস্কার শ্রৌত ও স্মার্ত্তভেদে দ্বিবিধ, প্রকারান্তরে ব্রহ্ম ও দৈবভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্ম সংস্কারদ্বারা ব্রাহ্মণ ঋষি তুল্যতা ও দৈবসংস্কার দ্বারা দেবতুল্যতা লাভ করিতে পারেন।

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নাশন, চূড়া, উপনয়ন বেদব্রত, সমাবর্ত্তন, বিবাহ এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদি ব্রাহ্মসংস্কার। সপ্তপাকযজ্ঞ, সপ্তহবির্যজ্ঞ, সপ্ত সোমযজ্ঞ,—দৈবসংস্কার। এই প্রকারে চত্বারিংশৎ সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ—দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মাঙ্গল্য, অকার্পণ্য, অস্পৃহারূপ অষ্টগুণবিশিষ্ট হইলে ব্রহ্মসদৃশ হইতে পারেন। যথা গৌতমঃ—"গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম্মান্নপ্রাশনচৌড়োপনয়নং চত্বারি বেদব্রতানি, স্নানং সহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃ পঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠানং দেবপিতৃমনুষ্যভূতব্রহ্মণামেতেষাং চাষ্টকাপার্ব্বণশ্রাদ্ধ শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণী চৈত্র্যাশ্বযুজীতিসপ্তপাকযজ্ঞসংস্থা, অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্রং দর্শপৌর্ণমাস বগ্রহায়ণং চাতুর্ম্মাস্যনিরূঢ়পশুবন্ধসৌত্রামণীতিসপ্তহবির্যজ্ঞসংস্থা, অগ্নিষ্টোমোত্যগ্নিষ্টোমে উকথঃ ষোড়শি বাজপেয়োহতি-রাত্রোহপ্তোর্যাম ইতি সপ্ত সোমসংস্থা ইত্যেতে চত্বারিংশৎ সংস্কারা ইতি—

ইহার মধ্যে গর্ভাধানাদি চূড়ান্ত সংস্কারদ্বারা পিতৃবীজ ও মাতৃগর্ভসমুদ্ভূত মলিনতা রক্ষা হয়। উপনয়ন সংস্কারদ্বারা বেদাধ্যয়নে ও ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হয়। এই সংস্কার যাহার নাই, সে বেদার্থ ধারণে সমর্থ নহে। আর যাহার যোগ্যতা থাকিতেও সংস্কার হয় না, সে ব্রাত্য, সর্ব্ব ধর্ম্মানধিকারী।

উপনয়নের পর বেদাধ্যয়নকালে বেদব্রত সমুদয় ও ব্রহ্মচর্য্যে নিয়ম পালন করিতে হয়। সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়নে অসমর্থ হইলেও বেদব্রতপালন করা যাইতে পারে। সামবেদী কৌথুমিশাখিদের সাতটি বেদব্রত বিহিত আছে। অন্য বেদীরও অন্য শাখায় চারিটি বেদব্রত আছে। সাবিত্রী ব্রত বা উপনয়ন ব্রত সকল শাখাতেই বিহিত আছে। এই ব্রত অত্যন্তাশক্তেরও কর্ত্তব্য। এই ব্রতে ৩ দিন অক্ষার লবণ ভোজন করিতে হয়। এই ব্রতাচরণকালে গায়ত্রীর অধ্যয়ন করিতে হয় এজন্য ইহার নামান্তর সহপ্রবচনীয় ব্রত। শৌচ, আচার, সন্ধ্যোপাসনা, প্রভৃতিও এই ব্রতকালে অভ্যাস করিতে হয়।

এই ব্রতের পূর্ণকাল কৌথুমীদের পক্ষে আট বর্ষ ও অশক্ত পক্ষে ৮ মাস তাহার অশক্তিতে ৮ দিন, অশক্তিতে ৩ দিন। এই ত্রিদিন কল্প সকল শাখাতেই বিহিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অত্যন্তাশক্তের পক্ষে বিহিত যে ত্রিদিন কল্প তাহাও এক্ষণে পালিত হয় না। উপনয়ন দিনেই সমাবর্ত্তন করিয়া ব্রতের শেষ করিয়া দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ্যের স্ফূর্ত্তি অনায়াসসাধ্য নহে। কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ্যের স্ফূর্ত্তি হইবে না।

উপনয়নব্রতের পর ক্রমে গোদান, ব্রাতিক, আদিত্য, মহানাম্নী, জ্যৈষ্ঠসামিক ও উপনিষদ্‌ব্রত করিতে হয়। এই সমুদয় ব্রতের পালন করিতে হইলে ষোলবৎসর সময় আবশ্যক। অশক্ত

পক্ষে বর্ষস্থানে মাস বা দিন গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই প্রকার অষ্টবর্ষে উপনয়ন হইলে যোলবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করিলে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়। তৎপরে যথাশাস্ত্র সমাবর্ত্তন করিয়া স্নাতক বা গৃহস্থ হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যের অভিব্যক্তি সম্ভাবনা। নতুবা স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ মাত্রেই ব্রাহ্মণ্যের আশা করা যায় না। অতএব ব্রাহ্মণের উন্নতি কামনা করিতে হইলে যাহাতে পুনর্ব্বার যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক এবং দেশ কাল বিবেচনায় কুবিবাহ নিবারণ, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম করণ, বেদ ও বেদমূলক ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্রাহ্মণের সম্মাননাই ব্রাহ্মণের উন্নতির কারণ বলিয়া মনে হয়। কুবিবাহ প্রভৃতি যে কুলের পতনের প্রতি কারণ, তাহা ভগবান মনুও বলিয়াছেন, যথা—

"কুবিবাহৈঃ, ক্রিয়ালোপৈ র্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি, ব্রাহ্মণানাদরেণ চ॥" ইতি—

আজকাল পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রভাবেও আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তাচারের অপকর্ষ হইতেছে, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্যও ক্রমশঃ হইতেছে, এজন্য ব্রাহ্মণসন্তানগণের পাশ্চাত্যশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তাচরণের অভ্যাসের ব্যবস্থাও আবশ্যক হইতেছে।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষগণ, যাঁহারা ব্রাহ্মণ-সভার হিতার্থ অনবরত পরিশ্রম ও অর্থ সাহায্য করিতেছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি। পরিশেষে ভূদেবগণ যাঁহারা সভায় উপস্থিত হইয়া ইহার কার্য্যে সাহয্য করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। ইতি

শ্রীশশিভূষণ শিরোমণি।

কাঙ্গালের নিবেদন।

কয়েক বৎসর হইতে বড় বড় সহরে "ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর" অধিবেশন হইতেছে। তাহাতে বঙ্গদেশের বড়লোক, বহু শিক্ষিত ব্যক্তি, বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণ-রক্ষার ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতি এবং সনাতন ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু এই সম্মিলনীর বিশেষ খবর পল্লীগ্রামে যে ভাবে একটুকু আধটুক্ পৌঁছছিতেছে তাহাতে আশার স্থলে নৈরাশ্যের সঞ্চারই হইতেছে। ভূদেব ব্রাহ্মণ জাতির কিসে উন্নতি হয়, কি প্রকারে পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব অবস্থা, পূর্ব্বশক্তি লাভ হয় তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে প্রত্যেকেরই স্বাধীনমত ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে মনে করিয়া

এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লেখক সমাজ চূড়ামণি কর্ণধার মহাশয়গণের নিকট কয়েকটী প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছে। আশা করি সমাজনেতৃগণ কাঙ্গালের কথাগুলি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

সত্য বটে, ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে বহু পরিমাণে এমন আচারভ্রষ্ট, কর্ত্তব্যধর্ম্মে উদাসীন, সুশিক্ষায় কাঙ্গাল অভাবের তাড়নে কুশিক্ষার প্রভাবে কু আদর্শে আর উপযুক্ত শাসন অভাবে দয়ার পাত্র—স্থান বিশেষে ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যাত্রা থিয়েটারে এখন ব্রাহ্মণ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া সং পর্য্যন্ত বাহির হইতেছে!! ইহার চেয়ে অধঃপতন আর মানুষের হইতে পারে না। আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা কেন হইল, ইহার জন্য দায়ী কে, আগে ইহা ঠিক না পাইলে প্রতীকার চেষ্টা ফলপ্রদ হইবে না, কেবল মুখে উপদেশ দিলে রোগের উপশম হইবে না, রোগ ঠিক করিয়া উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে সহজেই সুফল পাওয়া যাইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উৎকট বিলাসিতায় তথাকথিত সভ্যতার হীন অনুকরণে দেশের সমাজের মেরুদণ্ড স্থানীয় রাজা, মহারাজা, জমিদার প্রভৃতির মধ্যে অধিকাংশই গা ভাসাইয়া দিয়া স্বদেশ স্বগ্রাম ছাড়িয়া বর্ত্তমানে সহরবাসী হইয়াছেন! গ্রামের সঙ্গে স্বদেশের সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই টাকার সম্বন্ধ ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধ নাই! বর্ত্তমানে রাজা আমাদের অন্যধর্ম্মাবলম্বী, রাজা আমাদের ধন প্রাণের রক্ষক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম ও সমাজের রক্ষক নহেন। ধর্ম্ম ও সমাজ আচার ও জাতিগত। সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচার রক্ষার ভার দেশের মেরুদণ্ড স্থানীয় বড়লোকদের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহারা সুখ সুবিধার জন্য শান্তিতে থাকিবার আশায় দেশ সমাজ ছাড়িয়া সহরবাসী হইয়াছেন। সময় সময় ইঁহারা কিম্বা ইঁহাদের আশ্রয়ে পুষ্ট—প্রতিপালিত লোক মফঃস্বলে অর্থাৎ দেশে গেলে ইঁহাদের নিকট যে আদর্শ পাওয়া যায় তাহা গ্রামবাসিদের পক্ষে আরও মারাত্মক হইয়া পড়ে। সহর মাত্রেই বিলাসের, পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে ভরপূর—সুতরাং বর্ত্তমান কালের সহরে বাবুরা যখন গ্রামে পৌঁছিলেন, তখন তাহাদের চটকে গ্রামবাসীদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়—বিলাসের, কুশিক্ষার বীজ, আদর্শ ইঁহাদের ভিতর দিয়াই পল্লীগ্রামে সঞ্চারিত হইয়া থাকে—ইঁহাদের চটক, হাব ভাব দেখিয়া গ্রামের নিরীহ লোক মুগ্ধ ও প্রতারিত হয়—অনুকরণ প্রিয় সমাজ ও জাতি ইত্যাকার অনুকরণ করিতে গিয়া আচার ভ্রষ্ট হয়, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়। স্বেচ্ছাচার, পশ্বাচার, এই ভাবে সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; সুতরাং সমাজ না ভাঙ্গিবে কেন?

পূর্ব্বকালে দেশের ধনশালী ক্ষমতাশালী লোকেরা দেশের সমাজের নেতা ছিলেন—কোথাও অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচার হইলে ইঁহারা দেশে থাকিয়া অপক্ষপাত বিচারের বিনা অর্থে দুষ্টের দমন করিতেন। অপরাধীকে আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া দেশের বিপ্লব দমন করিতেন—ইঁহাদের ভয়ে কেহ সহজে আচারভ্রষ্ট, অত্যাচারী, ব্যভিচারী হইতে সাহসী হইত না। ইঁহারা দুষ্টের দমন করিতেন, শিষ্টের পোষণ করিতেন। ইঁহাদের হাতে

শাসন ও পোষণ দুই ছিল, কাজেই দেশের কেহ সহজে আচারভ্রষ্ট, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট, স্বেচ্ছাচারী, ব্যভিচারী হইতে পারিত না।

ইদানীং সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার যুগে কেহ জাতিভ্রষ্ট পর্য্যন্ত হইলে, অখাদ্য ভক্ষণ করিলে—অগম্যা-গমন করিলেও দেশের বড়লোকদের মধ্যে অধিকাংশ তাহা দেখিয়া জানিয়াও শাসন করিতে পারেন না !! কারণ বলা অপেক্ষা অনুমানই ভাল। "অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না"—এতাধিক কিছু না বলাই ভাল! কোন গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-সন্তান, মদ্যপান করিত—বেশ্যাগমন করিত—গ্রামের লোকের উপর নানা প্রকারে পাশবিক অত্যাচার করিত; নিরীহ গ্রামবাসী সেই গ্রামের জমিদারের ভয়ে (উক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান জমিদারের ম্যানেজার !!!) নীরবে নিরুপায় হইয়া অত্যাচার সহ্য করিত। অবশেষে কোন সৎসাহসী এই বিষয় অভিযোগ উ স্থিত ক লে রাজদ্বারে উক্ত ম্যানেজার বাবুই নির্দ্দোষ সাব্যস্তে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। যিনি অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারই নির্য্যাতন হইল! জমিদারের ভয়ে এবং ম্যানেজারের অনুগ্রহ লাভের জন্য বহু ভদ্রবেশধারী মানব-সন্তান রাজদ্বারে গিয়া হলপ করিয়া অম্লান-বদনে বেশ্যাগামী মাতালটাকে সাধু বানাইয়া দিল !!! ইহাতে সমাজ কি শিক্ষা পাইল, বলা নিষ্প্রয়োজন। দেশের বড় লোকেরা যদি সমবেত ভাবে ইহার জন্য উক্ত মাতাল ম্যানেজারের জমিদারকে চাপিয়া ধরিতেন--তবে পাপিষ্ঠের উপযুক্ত শাস্তি হইত—দেশের শান্তি হইত—সাধারণে শিক্ষা পাইত। ইহা কল্পিত ঘটনা নহে, বেশী-দিনেরও নহে। প্রয়োজন হইলে আমরা বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিব।

যে ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া জাতিহীনা কুলটার হাতে অন্ন পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া সমাজে আদরণীয় হয়—উচ্চস্থানে থাকে—যে অখাদ্য ভক্ষণ করিলেও কোন দায়ে ঠেকে না—সেই স্থানে কেহ আসিয়া যদি বলেন—"তোমরা সকলে নিষ্ঠাবান হও—জাতি ধর্ম্ম রক্ষা কর"—তবে তাহা কি প্রহসনের মত হয় না? যে জাতির মধ্যে এই প্রকারের বহুলোক আছে—অথচ তজ্জন্য তাহাদিগকে কোন দায়ে ঠেকিতে হয় না—দেশের বড় লোকেরা যেই স্থানে এই প্রকারের লোককেই খাতির যত্ন করেন—সেই জাতির সেই সমাজের আশা কোথায়? ভূদেব ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অখাদ্য খাইব—অকথ্য পাপ করিব—জাতি বিচার করিব না—অথচ আমার কাজের জন্য কাহাকেও কৈফিয়ত দিতে হইবে না—কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিবে না—বরং আমার অনুগ্রহের জন্য—আমারই দলে লোক আসিবে - আমার প্রশংসায় দেশ মাতাইবে। এমন পাপ করিয়াও আমি সমাজের উচ্চস্থানে থাকিব—সেই অবস্থায় কেবল মুখের উপদেশে কি কাজ হইবে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

ব্রাহ্মণ-সমাজে "গুরু"-"পুরোহিত" এই দুই শ্রেণীর লোককে পূর্ব্বকালে বড়লোকেরা পালন করিতেন। শিক্ষা-দীক্ষায় চরিত্রে তাঁহাদের বালকদিগকে তাঁহাদের নিজ পদের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিতেন, নতুবা তাঁহারা সমাজে নিন্দিত হইতেন—ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হইতেন না, উদর পালন অসাধ্য হইত। তাঁহাদের উপর দেশের বড়লোকদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। কাজেই;

তাঁহারা বাধ্য হইয়া আচার ও ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলিতেন—সুশিক্ষা লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ইদানীং এই গুরু-পুরোহিত দুই শ্রেণীরই বিষম দুর্দ্দশা হইয়াছে,যাঁহারা ইঁহাদের রক্ষক ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে বর্ত্তমানে অনেকের পরিচয় পর্য্যন্ত নাই!—ইঁহারা কি করিতেছে—কি ভাবে শিক্ষিত হইতেছে, আচার ধর্ম্ম কি ভাবে রক্ষা করিতেছে, কি উপায়ে উদর পালন করিতেছে, ইহার খবর এখন প্রায়ই বড় বড় শিষ্য ও যজমানেরা লওয়ার সময় পান না। কেহ বিপদে পড়িয়া অতি কষ্ট করিয়া অর্থব্যয় করিয়া দেখা করিবার জন্য উপস্থিত হইলে "সময় নাই—দেখা হইবে না" ইত্যাকার আদেশ পাইয়া ফিরিয়া আসে। কেহ কেহ ১০।১৫ ২০।২৫ দিন পর্য্যন্ত দ্বারে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকে, তবুও শিষ্য যজমানের দয়া হয় না। গুরু পুরোহিতগণ খাইল কি উপবাসী রহিল, চোর হইল কি ডাকাত হইল, ষণ্ডাগুণ্ডা হইল, তাহার খবর অনেকেই এখন নেন না—শাসনও নাই, পোষণও নাই, দেখা-সাক্ষাৎও স্বপ্নের মত। সুতরাং বাক্যে ইঁহাদিগকে ঋষি তপস্বী বানাইবার চেষ্টা করা একটা প্রহসন বলিয়াই মনে হয়। চট্টগ্রামের জনৈক জমিদারের গুরুদেব ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় নিরুপায় হইয়া শিষ্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শিষ্যের ইংরেজী শিক্ষার মাষ্টারবাবুর সুপারিশ সহিত কিছু সাহায্যপ্রার্থী হইলে, মাষ্টারবাবু অন্ততঃ গুরুঠাকুরকে ২৴ মণ চাউলের মূল্য দিতে অনুরোধ করিলেও গুণধর ধনী শিষ্যের দয়া গুরুর প্রতি হইল না! অথচ এই শিষ্যপ্রবর বৎসর বৎসর কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া হাজার হাজার টাকা কত প্রকারে ব্যয় করেন। যে সমাজে শিষ্য যজমানের এইভাব, সেই সমাজের গুরু পুরোহিত শ্রেণীকে কেবল কথায় "ব্রাহ্মণ" প্রস্তুত করা বর্ত্তমান যুগে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষার জন্য বহু সহস্র ব্রাহ্মণ-সন্তান বাস করেন। লেখক বহু ছাত্র নিবাসে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, তথায় "জাতি" বলিয়া কোন ভেদজ্ঞান নাই—আর যজ্ঞোপবীত বলিয়া সূতার কোন মূল্য নাই, সকলেই সমান। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, শূদ্র প্রভৃতি একত্র পানাহার করে, যাহার যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে চলে। আচার ও ধর্ম্ম বলিয়া যে কোন জিনিস আছে, ইহা ইঁহাদের নিকট যেন জানাই নাই। এই সমুদয় বালক পরিণত বয়সে যখন সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন ইঁহাদের নিকট আমরা কি আশা করিতে পারি, তাহা না বলাই ভাল।

প্রকৃতপক্ষে যদি ব্রাহ্মণ রক্ষা করা, আচার ও ধর্ম্মরক্ষা করা, তাঁহাদের প্রাণের কথা হয়, তবে আমাদিগকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। দেশের বড় বড় রাজা মহারাজগণকে সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতে হইবে। দেশের শাসন পোষণের ভার পূর্ব্বের মত গ্রহণ করিতে হইবে। আগে তাঁহারা আচার ও ধর্ম্ম রক্ষার আদর্শ দেখাইবেন, তবেত দেশ সমাজ তাঁহাদের কথা শুনিবে, কাজও হইবে। আমার মতে মোটামুটী নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে পারিলে আবার ধর্ম্মরক্ষা হইবে, সনাতন ধর্ম্মও কলঙ্কমুক্ত হইবে।

(১) বিনা প্রয়োজনে যে সমুদয় বড় লোক সহরবাসী হইয়াছেন, তাহারা স্বীয় গ্রামে গিয়া বসুন। নিজে আচারনিষ্ঠ হউন, কর্ত্তব্য পরায়ণ হউন।

(২) কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে বিশুদ্ধতার ব্রাহ্মণবোর্ডিং স্থাপিত হউক। তথাতে আচার ও ধর্ম্ম রক্ষার—কর্ত্তব্য কার্য্য করার বন্দোবস্ত হউক।

(৩) বড় বড় রেল ষ্টীমারে, ষ্টীমার ষ্টেশনে, জিলার উপর ব্রাহ্মণদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস স্থান, আহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হউক।

(৪) সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ আদর্শস্থানীয় হউন, আচারনিষ্ট ব্রাহ্মণের জন্য, পণ্ডিতের জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হউক।

(৫) ভারতের তীর্থ ক্ষেত্রের সংগৃহীত আয় হইতে অন্ততঃ ½ অংশ ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য গ্রহণের চেষ্টা হউক। হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য তিন বৎসরে কোটী টাকা সংগৃহীত হইতে পারিল, তেমন ভাবে চেষ্টা করিলে ভারতের তীর্থ ক্ষেত্র হইতেও অন্ততঃ বৎসর ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য সংগৃহীত হইতে পারিবে। অর্থ সংগ্রহের এই প্রশস্ত উপায়।

উপসংহারে ইহাও নিবেদন যে, ব্রাহ্মণ সম্মিলনী কেবল বড় বড় সহরে না করিয়া গণ্ডগ্রামেও করা প্রয়োজন। অবশ্য গণ্ডগ্রামে রাজপ্রাসাদ রাজভোগ মিলিবে না, দানবীর মহারাজের পাদ্যার্ঘ্যও পাওয়া যাইবে না, গরীবের শাকান্নে কাজ হইবে কিন্তু ভাল। আশাকরি ভূদেব ব্রাহ্মণজাতি অপ্রিয় কথায় এই কাঙ্গালের উপর অভিশাপ দেবেন না।

শ্রীহরকিশোর দেবশর্ম্মা।

নিষ্কাম-কর্ম্ম।

মনুষ্যাদি জীব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অংশ, এবং তদ্ধেতু তাহারা নিজেও সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্ম, অগ্নি—মনুষ্য স্ফুলিঙ্গ। এই স্ফুলিঙ্গকে অগ্নির পূর্ণত্বে বিকশিত করিতে হইলে, অপৌরুষেয় বেদ, বেদানুমোদিত স্মৃতি, পুরাণ এবং তদুক্ত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা, ভগবৎ পূজা, সেবা ও উপাসনাদি কার্য্যে ও আচার ধর্ম্মে নিরত রাখা চাই। ইহা ব্যতীত পূর্ণত্বে বিকাশোপ-যোগী আর কোন কার্য্য মানুষের নাই। মানুষ ঐ ভগবৎ অংশের বলে ভগবৎ-তুষ্টিসাধনকার্য্য, ভগবৎ-সেবাপর কার্য্য, নিজ কার্য্য জানিয়া এবং নিত্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে, এই উদ্দেশ্যে পরম পিতা পরমেশ্বর নিজশক্তিকণা হইতে মনুষ্য এবং অপর প্রাণি-সমূহ—খেচর, ভূচর প্রভৃতি যাবতীয় জীব সৃষ্টি করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে ধরাধামে পাঠাইয়াছেন।

জীব এই শক্তিকণার বলে নিজ জীবনরক্ষার, সমাজের শৃঙ্খলাবিধান ও পরস্পর পরস্পরের কল্যাণসংসাধনের উপযোগী কার্য্যাদি এবং ভগবানের প্রিয়কার্য্যাদি—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-কার্য্যাদির সাহায্য যতটুকু হইতে পারে—তাহা নিত্য সাধন করিবে, ভগবৎপূজা সেবা, পরিচর্য্যা সাধনদ্বারা ভগবানের নির্দ্দিষ্টপথে গতিবিধি করিয়া ভগবৎদর্শন লাভ করিবে,—ইহাই পরমপিতা পরমেশ্বরের বিহিত বিধান।

এই বিহিত বিধানের পুষ্টার্থেই ঐ ভগবৎ অংশকণা (ভগবৎ বীজ) ক্রমে দিগন্তব্যাপী প্রকাণ্ড মহীরূহে পরিণত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, এবং অবশেষে ভগবদনন্তশক্তি সাগরে মিশিয়া যাইবে ; ভগবান তাহারও বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভগবৎ বিধানে পরিচালিত হইয়া মানুষ (পরমপিতার শ্রেষ্ঠপুত্র) ভগবৎশক্তি, ভগবৎজ্ঞানলাভের জন্য সংসার ক্ষেত্রের গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে—পিতার দর্শন লাভ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত, উৎসাহিত ও উদ্যত। এই চেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম ও অধ্যবসায় সাহচর্য্যে, ভগবৎঐশ্বর্য্য, জ্ঞানশক্তি লাভ করিয়া ভগবানের—সাযুজ্যলাভ করিবে। ইহাই মানুষের আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা—দুরাকাঙ্ক্ষা নহে।

পিতার সম্পদে, পিতার ঐশ্বর্য্যে, পিতার শক্তিতে,—পুত্রের অধিকার। ভগবানের প্রধান-পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠজীব (মনুষ্যগণ) পিতার ধনসম্পদ প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষায় সদা আগ্রহান্বিত লালায়িত না হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষ এই স্বাভাবিক নিয়মের—অনুশাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া আপনগন্তব্য পথের অনুসন্ধানে ও নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত থাকিবে। কিন্তু এই কার্য্যের শৈশব অবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তি তাড়িত হইয়া কার্য্য করে। মানুষের প্রবৃত্তি তমঃ, রজ ও সত্ত্ব এই গুণত্রয় সমুদ্ভূত। গুণবিশেষের প্রাবল্যে প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়। মানুষ এই গুণত্রয় দ্বারা অভিভূত। কার্য্যের প্রথম উদ্যমে গুণত্রয়ের করায়ত্ত থাকিয়া মানুষ কার্য্য করে। মানুষ অনুদ্যম ও অনুৎসাহে কার্য্যে বিরত হইতে পায় না। গুণত্রয়ের তীব্রতাড়নায় মানুষকে সর্ব্বদাই কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতে হয়। কর্ম্মব্যতীত মানুষ বাঁচিয়া থাকিতেই পারে না। এই জন্য ভগবান বলিতেছেন—

> "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ সর্ব্ব কর্ম্ম প্রকৃতিজৈগুণৈঃ॥"
>
> গীতা।

মানুষ কর্ম্মারম্ভে প্রবৃত্তি তাড়িত হইয়া স্বার্থসুখাভিপ্রায়ে কর্ম্ম করে। পরার্থ সুখে তখন তাহার জ্ঞানই থাকে না। জীবের জন্য, ভগবৎতুষ্টির জন্য, ভগবৎ সেবার জন্য কার্য্য করিতে হয়, এ জ্ঞান তখন তাহার আদৌ থাকে না। আপনার সুখ সন্তোষ, আপনার কল্যাণ কামনা আপনার স্বার্থ তখন মানুষকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, উৎসাহিত করে ও উদ্দীপিত করে। অধিকাংশ নরনারী এই নব উদ্যমে, কর্ম্মের প্রারম্ভে, কর্ম্মের শৈশবে, ভোগ লালসার সুখাস্বাদনে লালায়িত হয়।

আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, তখন তাহাদের ভোগ সুখেরই আকাঙ্ক্ষা,—অধিক

হইতে অধিকতর, প্রবল হইতে প্রবলতর ভাব উদ্দীপিত করে। অনায়াসে তখন তাহারা পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিত ভোগ্য পদার্থ উপভোগ করে এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য তদুপযোগী পান ভোজন করে। যতই ভোগ্যবস্তুকে তাহারা চাপিয়া, জড়াইয়া, আঁকড়াইয়া ধরে, ততই ভোগবাসনা বৃদ্ধি পায়, তৃপ্তি হওয়া দূরের কথা,—অতৃপ্তি শতগুণ বাড়িতে থাকে। আকাঙ্ক্ষা ঘৃতাহৃত অগ্নির ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। অধিকাংশ নরনারী এই অবস্থায় উপনীত হয় বলিয়া তাহাদের উদ্ধারার্থ ভূতভাবন ভগবান্ প্রবৃত্তি ধর্ম্মের মধ্যদিয়া ভগবানের পথে অগ্রসর হইবার পথে তাহাদের প্রবৃত্ত্যনুরূপ ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্তি জনক পথ প্রদর্শন করিয়া শাস্ত্রবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। তথাপি তাহারা ভোগ-সাধনে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া নিবৃত্তিমার্গে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিতে পারে না। তাহারা শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিতে যাইয়া অবিধির নিকট আত্মসমর্পণ করে, ধর্ম্মকে বাঁচাইতে যাইয়া অধর্ম্মের সৃষ্টি করে, ভাল করিতে যাইয়া মন্দ করে। মানবের এই সমস্যা দেখিয়া ভগবান্ মনু বলিয়াছেন —

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

ভগবান্ মনুর বাক্যে মানুষের তখন কতকটা চৈতন্য ও জ্ঞানোদয় হয়। মানুষ বুঝিতে পারে, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর যাবতীয় বস্তুর উপভোগেও তৃপ্তি নাই, বরং দুরাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। তখন তাহারা ভোগ্য বস্তুর অন্তরালে যাইবার ইচ্ছা করে। এবং সকল কার্য্যে একটু করিয়া সংযম অভ্যাস করে। তাহারা তখন কামনা, বিষয় বাসনা প্রভৃতি ছাড়িতে চাহে, কিন্তু উহারা তাহাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। উহারা বাহিরে আসিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া মনের ভিতর পূর্ব্বভাবে বলবতী হইতে থাকে। তখন নৈরাশ্য ও ক্ষোভে ঐ সকল নরনারীর চিত্ত ব্যথিত হয়, এবং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তৎপ্রতিকার ও তৎপ্রতিবিধানের উপায় করে লালায়িত হয়, ইহাদের এইরূপ সমস্যা ঘটিলে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ন কর্ম্মনামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

গীতা ৩।৪

পুনর্ব্বার কর্ম্ম কর, কর্ম্মত্যাগে সিদ্ধিলাভ নাই। এই অবস্থাতেই মানবের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। মানুষ তখন ভগবৎবচনে উৎসাহিত হইয়া নবোদ্যমে পুনর্ব্বার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ তখন আহারে, বিহারে, সংযম অভ্যাস করে, অনাচারে কদাচারে কুৎসিত পানভোজনে অনাস্থা প্রকাশ করে, প্রবৃত্তির অন্তরাল হইয়া নিবৃত্তির দিকে ফিরিবার চেষ্টা করে। তখন নিজের সুখ সন্তোষের লক্ষ্যে আর আবদ্ধ থাকিতে চাহে না, তখন তাহারা সমগ্র জগতের কল্যাণ, কুশলের উদ্যোগ, উদ্যমে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে আপন ছাড়িয়া পরের কার্য্যে ব্যস্ত হয়। এই অবস্থায় তাহাদের কৃত কার্য্যে ফলাকাঙ্ক্ষা

সূক্ষ্মভাবে আচ্ছন্ন থাকে * ফলাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত না হইলে জীবের কল্যাণ নাই, মুক্তি নাই, আত্মদর্শন ঘটে না।

এই অবস্থাতে ভগবান বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥"

গীতা ২। ৪৭

কর্ম্মে মানবের অধিকার; কিন্তু ফলে অধিকার নাই। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। তখন ইহাদের জ্ঞানোদয় হয়। তখন স্বার্থ পরার্থ উভয় ছাড়িয়া ইঁহারা ভগবদর্থে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন্। এই অবস্থায় ভগবান বলিয়াছেন।

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥"

ইহারা এই ভগবৎ বাক্য মনে রাখিয়া অনাসক্ত ও যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করেন। এইভাবে বেদবিধির অনুমোদিত শাস্ত্র নির্দিষ্ট কার্য্য করিতে করিতে জ্ঞান ভক্তি উদিত হয়। এইস্থলে এইখানে কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞান ও ভক্তিকাণ্ড আসিয়া মিলিত হয়। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, প্রয়াগের যুক্তবেণীতে সম্মিলিত হইয়া যেমন মহাতীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তদ্রূপ ঐ তিনকাণ্ডের ত্রিধারার একত্র সমন্বয়ে মানবের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। তখন তাহাদের আহারে, বিহারে সংযম দৃঢ়ীকৃত হয়। কদাচার বা কুৎসিত ভোগ্য বস্তু তাহাদের মন হইতে বিলুপ্ত হয়। অবিদ্যা বিজৃম্ভিত সমস্ত কামনা ও বাসনা বিলীন হইতে থাকে। নিজ অস্তিত্ব লোপ পাইয়া উহা ভগবানের সহিত মিলিত হইবার বলবতী চেষ্টা পায়। সাধক তখন পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিত ভোগ্যপদার্থ এবং বিকারের হেতুপদার্থ উপভোগে তৃপ্তিলাভ করিয়া এপথ, অপথ ভাবিয়া পরিহার করেন, নিবৃত্তি মার্গে প্রত্যাগমন করেন, এবং আচার ধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভিতর দিয়া ভগবানের নিকটস্থ হইতে চাহেন।

এক দল মনীষীরা শাস্ত্র ব্যাখ্যার বলিয়া থাকেন এই যে প্রবৃত্তির মধ্যদিয়া ভগবৎ সাধনা, হয় অর্থাৎ তাঁহাদের মতে উপভোগের—প্রলোভনের ও বিকারের বস্তু সম্মুখে রাখিয়া তাহা হইতে আপনাকে অব্যাহত, নির্লিপ্ত ও অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করিয়া পরমানন্দে ভগবৎ সাধনা করা। সাধনার পদ্ধতি এ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, এই অধিকারে ঐ ভাবের সাধনা মহান্ হইতে মহত্তর হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধনার পদ্ধতি অনুসারে প্রবৃত্তির আপাত মধুর সুখ সাগরের অতলস্পর্শে ডুবিয়া যাইয়া প্রবৃত্তিপরিপোষক যাবতীয় কুৎসিত আহার, বিহার,—এই উচ্চ অধিকারীর পক্ষে কোনক্রমেই সাধনার পরিপোষক হইতে পারে না। কারণ বহুজন্মকৃত কর্ম্মফল থাকিলেও সাধকের ঐ উচ্চাধিকার লাভ করিতে বার্দ্ধক্য আসিয়া

* নরনারী তাহার সুখ্যাতি করে, প্রশংসা করে, সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি হয়, ইহা তিনি চাহেন।

উপস্থিত হয়। কেননা উচ্চাধিকারি সাধকেরই ত আকাঙ্ক্ষিত সাধনার অধিকার তাদৃশ শাস্ত্র ব্যাখ্যাকর বলিয়া থাকেন। এই বার্দ্ধক অবস্থায় বৃদ্ধসাধক কি পাকা গুটি কাঁচাইয়া ফিরে গণ্ডূষ করিয়া প্রবৃত্তি-সাগরের অতলস্পর্শে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইবেন, ইহাই কি শাস্ত্রীয় সমাধান? সাধক যে উচ্চ অধিকারে উন্নীত হইয়া, পাপের প্রলোভনে এবং বিকারের হেতুতে বেষ্টিত থাকিয়া পাপজয় করিতে পারিবেন, এবং

"বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে।
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥"

এরূপ প্রাচীন সংবাদ থাকিলেও বিকারের হেতুর মধ্যে থাকিয়া তাঁহার চিত্তবিকার হইবে না ইহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভের দৌরাত্ম্যে অস্থির, তাহাতে আবার এইরূপ প্রলোভন উত্তেজনা নিকটে আসিতে দিলে আর রক্ষা কোথায়? মহাপুরুষ শাক্যসিংহকে অতি উচ্চ অধিকারে থাকিয়াও কত কঠোর তপস্যার মধ্যে পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। পরমযোগী, যোগীশ্বর দেবদেব মহাদেবের পর্য্যন্ত সমাধির মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। মানুষ যে অধিকারই লাভ করুন, ভূতভাবন ভূতেশ্বরের কণাংশেরও তুল্য হইতে পারেন না। জানি না, মানুষ তবে কি করিয়া পাপের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া পাপজয় করিবেন, পাপকে বিনাশ করিয়া অক্ষত দেহে, অক্ষত মনে, পাপের দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিবেন, প্রলোভনকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিয়া, তাহাকে জয় করিবেন, কুহকের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল গলায় পরিয়া, পায়ে জড়াইয়া, অঙ্গুলির আঘাতে তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন? পাপকে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহকে ইন্ধন দিলে আর রক্ষার উপায় থাকে না। মানুষের এই শোচনীয় দশা দেখিয়া, ভক্তির আদর্শপুরুষ ভগবানের প্রধান ভক্ত, মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—"স্ত্রীধন-নাস্তিক-চরিত্রং ন শ্রবণীয়ং।"

ইহাতেও মানবের, সাধকের চৈতন্যোদয় হইতেছে না দেখিয়া মহর্ষিগণ শিষ্যবৃন্দ লইয়া দেবতাগণের নিকট যেন ইঁহাদেরই মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করিয়াছেন।

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম ভদ্রং পশ্যেম অক্ষিভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥" (শ্রুতি)

হে দেবগণ আমরা যেন কর্ণে সর্ব্বদা ভদ্র শব্দই শ্রবণ করি, চক্ষে সর্ব্বদা ভদ্রবস্তুই দর্শন করি, স্থির অঙ্গবিশিষ্ট শরীর দ্বারা তোমাদের স্তব করিয়া যেন দেবতাদিগের উপযুক্ত আয়ু প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ অভদ্র, স্ত্রীলোকের রূপযৌবন, হাবভাব প্রভৃতির বর্ণন শ্রবণ এবং চরিত্রহীনা স্ত্রীগণের দর্শন, কুৎসিত বর্ণনাদি শ্রবণ কিছুই কর্ণ ও চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত না হইলে, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য জন্মিবে না। তাহা হইলে জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিব। জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিলে অঙ্গ স্থির হইবে। সুতরাং ইন্দ্রিয় জয়ের ফলস্বরূপ দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘায়ুলাভ করিতে পারিব। স্ত্রীসঙ্গ, সুরাপান, ভগবৎ সাধনা পথের কণ্টক—এ কণ্টক, নিঃশেষিত করিতে না পারিলে—আহার, বিহার সংযম দৃঢ়ীকৃত করিতে—অনাচার কদাচার হইতে আপনাকে

বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রবিধান শিরোধার্য্য করিয়া পথ দেখিয়া পা ফেলিতে না পারিলে—সাধনার পথে অগ্রসর হইবার আশা আকাশ কুসুমবৎ অলীক ও অসম্ভব। উচ্চাধিকারে প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিত ভোগ্যবস্তু উপভোগে প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না। ঐ অবস্থাতে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া—অনাচার এবং কদাচারের মধ্য দিয়া এবং কাঁচিয়া গণ্ডূষ করিয়া ভগবৎ-সাধনার পথে অগ্রসর হইবার শাস্ত্রীয় সমাধান, কোনক্রমেই সমীচীন নহে। উচ্চাধিকারী সাধক বাহিরের কার্য্য পরিহার করিয়া ভিতরের কার্য্য লইয়া তন্ময় থাকেন। তখন তিনি বাহিরের পূজা, সেবা, পরিচর্য্যা, যাগযজ্ঞ তপাদি সকল কার্য্য ছাড়িয়া, ভিতরের পূজা, সেবা, পরিচর্য্যা, যাগ, যজ্ঞ তপাদি (অন্তর যাগ যজ্ঞ) লইয়া স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম লইয়া সাধারণ কাণ্ড ছাড়িয়া, অসাধারণ অধ্যাত্মকাণ্ড লইয়া, স্থূলভাবে পঞ্চমকার সাধন ছাড়িয়া, সূক্ষ্মভাবে পঞ্চমকার সাধনায় প্রবৃত্ত, বিভোর তন্ময় থাকেন, ইহাই শাস্ত্রীয় সমাধান।

সাধক তখন প্রকৃতির উপর আধিপত্য, প্রকৃতিকে করায়ত্ত করিয়া কার্য্যের সহিত নিজ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন রাখিয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করিতে থাকেন। তখন তিনি দেখেন, তাঁহার প্রভূত ধনসম্পদ প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নহে। ভগবান তাঁহার দেহ মন আশ্রয় করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তখন তিনি শান্তিপ্রাপ্ত হন।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥" [গীতা।২।৭১]

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান ও ভক্তিলাভ হইতে পারে না। কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল ত্যাগীরই প্রকৃত কর্ম্ম করা হয়। জীবের মঙ্গলার্থে বিষয় ভোগ করিলেও মানুষ বিষয়ভোগী নহেন। মানুষের এই অধিকার হইলে তখন তিনি শমগুণের সাধনা করিবেন। শমগুণ সাধিত হইলে ভগবৎ চিন্তাতে মনকে ধরিয়া রাখিলে, উহা তাহাতেই স্থির হইয়া থাকিবে। শমসাধনার সঙ্গে সঙ্গে দম সাধনা করিতে হইবে। মনের সংযম শম, আর দেহের সংযম দম। দমসাধনার প্রভাবে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মানবের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সকল আজ্ঞা পালন করিবে। ইহার পর উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমবধান সাধনা করিতে হইবে। সমবধানের তুল্য সাধনা আর নাই। ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণের নাম সমবধান। সমবধানের সাধনায় সাধক ভগবানে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দেন। সাধক তখন আত্মানন্দে বিভোর। ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগী কর্ম্মবীর যাবতীয় কর্ম্ম করিয়াও করেন না। তিনি আহার করিয়াও অনাহারী, বিহার করিয়াও ব্রহ্মচারী। সাধক এই অবস্থায় আত্মধ্যানে ডুবিয়া যান এবং স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হন। তিনি প্রকৃত যাহা তাহাই হইয়া যান্। তখন তিনি জীবন্মুক্ত। তাঁহার আমিত্ব দেহের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, ব্রহ্মাণ্ডময় প্রসারিত হয়। তখন তিনি বুঝেন-সবই আমি। আমি আমারই পূজা করি, ধ্যান করি, তপস্যা যাগযজ্ঞ করি, আমি আমাকেই ভালবাসি। ইহার নাম মোক্ষ, আত্ম-

দর্শন, নির্ব্বাণ, ভগবৎপ্রাপ্তি। সাধক এই অবস্থায় শান্ত্যাদিগুণযুক্ত হইয়া ভগবানে আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করেন এবং পরম জ্যোতিঃস্বরূপ অদ্বৈতব্রহ্মরূপ সম্পন্ন হন। এই সাধক তখন হৃদয়স্থ বুদ্ধি দ্বারা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনপূর্ব্বক ভগবৎ সাক্ষাৎ করিতে পারেন বলিয়াই তিনি অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হয়েন। সাধক তখন যোগিজন সুলভ শাশ্বতব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহাকেও আশ্রয় করেন না। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রসদৃশ শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া, অতীত, অনাগত তিরোহিত করিয়া দূরস্থ বিষয় সকল বিদিত হন। চিত্ত, পঞ্চবায়ু, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহের শুদ্ধিলাভ করেন। পরমব্রহ্মে আত্মা লীন করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করেন। সাধকের আত্মজ্ঞান স্ফূরণ হয়। সেই মহান্ হইতে মহত্তর—অনন্ত পুরুষকে "আমিই তিনি" এইভাবে দর্শন হয়।

নিষ্কাম কর্ম্মেরই এই প্রভাব। কিন্তু অনেকে বলেন এই কলি প্রাবল্যের ঘোর দুর্দ্দিনে নিষ্কাম কর্ম্ম সংসাধনের উপায় নাই। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। স্বার্থত্যাগে ও পরার্থে অনুরাগ রাখিয়া সমাজের মঙ্গল বিধানার্থ আত্মত্যাগসম্পন্ন হইয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রণোদনে চিত্তশুদ্ধির অভিপ্রায়ে ভগবৎপ্রীতিসাধনোদ্দেশে যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। বৈদিক কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদি এবং প্রতিকোপাসনা ভগবদর্থে অনুষ্ঠিত হইলে সংসার নিবৃত্তির হেতু এইজন্য উহা শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম কর্ম্ম। দৃষ্টাদৃষ্ট কামনা রহিত ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাসপূর্ব্বক যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় তাহা সংসার নিবৃত্তির হেতু এইজন্য উহাও নিষ্কাম কর্ম্ম। বৈদিকী অগ্নিষ্টোমাদি এবং সংস্কারাদি কার্য্য, পূজা, জপ, যজ্ঞ, হোম, শ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যা আহ্নিকাদি কার্য্য অতিথি অভ্যাগত এবং দীনদরিদ্রে দান ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি কার্য্য, ন্যায় নীতি এবং কর্ত্তব্যের অনুমোদিত ও চিত্তশুদ্ধির হেতু বলিয়া ঐ সকল কর্ম্মও নিষ্কাম কর্ম্ম। ধন, ঐশ্বর্য্য, গর্ব্ব, অভিমান, অহঙ্কার যে সমস্ত কর্ম্ম প্রতিবিম্বিত না হয়, কেবলমাত্র অপৌরুষেয় বেদানুমোদিত বলিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে চিত্তশুদ্ধির মাত্র অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রভৃতি অনিত্য বস্তুর কামনাই কামনা। ঐরূপ কামনাদি ত্যাগ করিয়া কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ন্যায় নীতি এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত হইতে পারিলেই তাহা নিষ্কাম কর্ম্মমধ্যে গণ্য। শাস্ত্রবিধি আছে বলিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে সমস্ত কর্ম্মাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও নিষ্কাম কর্ম্ম। কর্ত্তব্য বুদ্ধির অনুরোধে পিতামাতার সেবাদি কার্য্য এবং তাঁহাদিগের তুষ্টিজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাও নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া পরিগণ্য। সাত্ত্বিকভাবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। রাজসিকভাবে ভোগ সুখাদির কামনায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মই সকাম কর্ম্ম। আর তামসিক ভাবে যাহাতে সমাজের অকল্যাণের ভাব, সমাজের বিশৃঙ্খলা উৎপাদনের ভাব কামাদি ভোগসুখ ও কুৎসিত পান-আহারের স্পৃহা প্রভৃতির ভাব, তাহাই কুৎসিত ও ঘৃণিত সকাম কর্ম্ম।

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমি একা।

আমি একা! অসংখ্য জীব সমাকুল স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই জগতে আমি একা! এই আপাত সুখকর সংসারে বহু আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়াও আমি একা! আমি পিতামাতার সন্তান, ভ্রাতার সহোদর, পুত্রকন্যার জনক, স্ত্রীর পতি, ভৃত্যের প্রভু, প্রজামণ্ডলীর ভূস্বামী; তথাপি আমি একা! ইহাদের কাহারও সহিত কি আমার কোন সম্বন্ধ নাই! তবে সদ্যোজাত শিশুর সুন্দর সহাস্য মুখ দেখিয়া ক্রোড়ে লইতে ইচ্ছা হয় কেন? আত্মীয় বান্ধবের বিয়োগে অরুন্তুদ শোকে প্রাণ আকুল করে কেন? সম্পত্তির অপচয়ে ছুটিয়া রাজদ্বারে যাই কেন? আমার যদি কিছুই নয়—যদি আমি একা, তবে শত্রুর আচরণে ক্রোধের উদ্রেক কেন? অন্যের ভাল দেখিয়া অন্তঃকরণে ঈর্ষানলের উদ্বোধন কেন, বন্ধুর সখ্যতায় এত আনন্দ কেন, স্ত্রীর আত্মহারা প্রেমে চিত্ত বিভোর কেন, আত্মজের ভক্তিতে প্রাণ স্নেহার্দ্র কেন, :পিতামাতার আদরে হৃদয় শ্রদ্ধাবনত কেন? আমার সঙ্গে যদি কাহারও সম্বন্ধ না থাকে, তবে কাহার শ্রান্তি অপনোদনের জন্য কর্মকোলাহলমুখরিত দিবসের পর শান্তিময়ী রজনীতে স্বপ্নহীন সুষুপ্তির অবতারণা, কাহার চিত্ত বিনোদনের জন্য অমানিশার মসীমলিন অন্ধকারের পর পূর্ণচন্দ্রের আমল ধবল জ্যোৎস্না ধারায় জগৎ পরিপ্লাবিত, কাহাকে গন্ধামোদিত করিবার জন্য উপবনে সৌরভবাসিত সুন্দর কুসুম সমূহের বিকাশ, কাহার নয়নরঞ্জনের নিমিত্ত আকাশ গাত্র এমন সুনীল, কাহার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নদনদীচয় সুশীতল বারিপূর্ণ, কাহার রসনাতৃপ্তির জন্য বৃক্ষরাজি সুপক্ক ফলভারাবনত, কাহার দেহজ্বালা জুড়াইবার নিমিত্ত হিমশীতল মলয়ানিলের প্রবাহ, কাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ক্ষেত্র সমুদয় শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ? এ সব কি জীবের জন্য নয়? জীব জগতে আমি কি দশজনের একজন নয়? তবে আমি একা কেন?

আমি একা! মাতৃগর্ভ হইতে একক ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, আবার শেষের সেই দিনে—যেদিন মরণের দুন্দুভি বাজিয়া ভবের হাট ভাঙ্গিবার ঘোষণা করিবে, সেদিন আত্মীয় বান্ধবময় সাধের সংসার—এই সাজান বাগান ত্যাগ করিয়া একাকীই শ্মশানের চিতাশয্যায় শয়ন করিতে হইবে। জগতে একা আসিয়াছি, একাই যাইতে হইবে। কেহ সঙ্গে আসে নাই—সেই মহাযাত্রা পথে কেহ সঙ্গীও হইবে না। তবে কি জনকজননী, দারাপত্য, প্রভু-ভৃত্য, শত্রু-মিত্র কেহ আমার নয়? তবে তাহাদের জন্য জন্মিয়াই জীবনের পথে এ মরণ-যাত্রা কেন?

কিন্তু আমি একা নহি। যদি আমি একা হইতাম, তাহা হইলে একবার জন্মিয়া সংসারের অনিত্য সুখ-দুঃখের তাড়না, জঠর যন্ত্রণা এবং মরণ-বিভীষিকার ভয়ে আর জন্মগ্রহণ করিতে চাহিতাম না। গৃহদগ্ধগাভী রক্তিম মেঘ দর্শনে অগ্নিশঙ্কায় ঊর্দ্ধ পুচ্ছ হইয়া ছুটিয়া পলায়ন করে। শাস্ত্র বলিতেছেন,—এ সব মায়া। এই মায়ার মোহিনী শক্তিতে জীবের পূর্ব্বস্মৃতি

লুপ্ত। এই মায়াই অলক্ষ্যে সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিয়া আমাকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিতেছে এবং কৃত কর্ম্মের সংস্কার জন্ম হইতে জন্মান্তরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে। এই মায়ার আবরণ গায়ে জড়াইয়াই একা আমি বহুরূপে প্রতীয়মান হইতেছি। এই মায়াই আমাকে কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও পতি, কাহারও প্রভু, কাহারও ভৃত্য, কাহারও শত্রু, কাহারও মিত্ররূপে নানা সাজে এই ভব রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় করাইতেছে। মায়াই আমাকে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। নতুবা—"যাতাযাতের পথে, কার বা সাথী কে, শুধু পথিকে পথিকে পথের আলাপন।"

জাগতিক পদার্থনিচয়ের সহিত যদি আমার কোন সম্বন্ধ না থাকে —যদি শুধু পথের পরিচয়ই হয়, তাহা হইলে স্বরূপতঃ আমি কে? বেদান্ত বলিতেছেন,—"সোঽহং"—তাঁহার অংশরূপে আমি তিনি। কেন না —আমি, এমন কি চরাচর জগৎ 'তাঁহা' হইতে জাত—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (বেদান্ত)। সেই 'তিনি'—সেই জগৎস্রষ্টা শ্রুতির মতে রস বলিয়া ব্যাখাত হইয়াছেন,—"রসো বৈ সঃ"। তিনি পূর্ণ রস, পূর্ণানন্দ বা পূর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর; "তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ" (রামানুজ), জীব তদংশ। 'তিনি' ও 'আমি' পরস্পর অংশাংশী সম্বন্ধে আবদ্ধ! তিনি ত মায়াতীত মুক্তপুরুষ; আমি তাঁহার অংশ হইয়া মায়ার আসক্তিতে কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইলাম কেন? নির্গুণব্রহ্ম যখন সিসৃক্ষু হইলেন, সৃজন পালন লয়ের জন্য তখন তিনি শরীরধারীর মত কাম, ক্রোধ, ভয় সকলই গ্রহণ করিলেন। শ্রুতির বাক্যে তাহাই কথিত হইয়াছে,—"সর্ব্বান্ পাপান্ ঔবৎ, ভয়রতিসংযোগশ্রবণাচ্চ"। মায়ার বশীভূত—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধীন আমি। সেই মায়ামুক্ত নির্ব্বিকার পুরুষকে কিরূপে বুঝিব—কিরূপে ধারণা করিব এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধের দাবিই বা কেমন করিয়া করিব? সৃষ্ট্যাদি মায়িক কার্য্যে যখন তিনি সৃজন, পালন, লয়ে তৎপর, তখন তিনি আমারই মত মায়া পরিচালিত। শাস্ত্রে কথিত আছে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের জন্য তিনি স্বমায়াকে আশ্রয় করিলেন। মায়ার আশ্রয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর মূর্ত্তিতে তিনিও আমারই মত বহুরূপী সাজিয়া বসিলেন। যে যেমন ভাবের ভাবুক, তাহার নিকট তিনি তদ্রূপই প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। আমি মায়ামুক্ত হইয়া নিঃসঙ্গ বা একক হইলে আমার নিকট তিনিও সাংখ্যোক্ত—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ"রূপে প্রতিভাত হইবেন। মায়িক জীবের জন্যই "ব্রহ্মণো রূপকল্পনাঃ (যমদগ্নি-সংহিতা)। মায়া পরবশ আমি যেমন বহুরূপে পরিচিত, সেইরূপ তাঁহাকেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরাদি নানাবিধ রূপে দেখিয়া থাকি। নতুবা তিনি নির্ব্বিকল্প, এক এবং অদ্বিতীয়; আমি তাঁহার অংশ, সুতরাং আমিও তাই।

স্বরূপতঃ আমি কে, তাহা বুঝিবার অন্তরায় মায়া। মায়ার আবরণ উন্মোচন করিতে পারিলেই আমি তখন স্বরূপে প্রকাশ পাইব। মায়ামুক্ত 'আমি'র এই স্বারূপ্য লাভই সাংখ্যের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, বেদান্তের মোক্ষ, বৌদ্ধের নির্ব্বাণ এবং তান্ত্রিকের কৈবল্য বা জীবের শিবত্বে পরিণতি। তখন মা আমার বরাভয় কর প্রসারণ করিয়া জীবরূপী

শিবের বক্ষে আসিয়া দাঁড়ান। কত লক্ষ জন্মের জনন মরণের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া ঘরের ছেলে তখন ঘরে যাইয়া আপনার মাকে মা বলিয়া প্রাণ শীতল করে।

উল্লিখিত অবস্থাই বৈষ্ণব-শাস্ত্রে শান্ত রতিভাব বলিয়া কথিত হইয়াছে। শান্ত ভক্ত তখন ভগবানকে দাস্য-সখ্য বাৎসল্য মধুরভাবে পাইতে অভিলাষী হয়। তখন 'আমি' আর কাহারও নহি। পিতা মাতার সন্তান, ভ্রাতার সহোদর, আত্মজের জনক, পত্নীর স্বামী, প্রভুর ভৃত্য,—তখন আমি কাহারও কেহ নহি। 'আমি' তাঁহার—"তত্ত্বমসি"—তাঁহার তুমি। এইস্থানে তৎপদ অব্যয়, তস্য পদের ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ করিয়া নিষ্পন্ন।

মায়িক জগতের মায়ার সম্বন্ধ পরিহার করিয়া 'আমি'র প্রকৃত একত্ব সম্পাদন, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, মুক্তি, নির্ব্বাণপ্রাপ্তি বা কৈবল্য লাভই জীবের সাধ্য। সেই এক এবং অদ্বিতীয় পরমপুরুষকে লাভ করিবার হেতুভূত এক বা কেবল হইবার জন্য কত জন্ম ধরিয়া জীব ছুটিয়া মরিতেছে। 'আমি'র একত্ব সম্পাদন বা কৈবল্য লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা খুঁজিয়া না পাইয়া পথহারা পথিকের মত জীব ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার একই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে,—অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে। সেই পথভ্রান্ত পথিকদিগের দিঙ্‌নির্ণয় জন্যই ধর্ম্মাকাশের ধ্রুবনক্ষত্র দ্বাপরের অন্তাযুগে পুণ্যময় ভারতে উদিত হইয়াছিলেন। সেই ধ্রুবতারা—শ্রীকৃষ্ণভক্ত সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া জগতের জীবকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুরত্যয়া আমার এক মায়া আছে; যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারাই ঐ দুস্তরা মায়া হইতে পরিত্রাণ পায়।

তিনিই জগদের শরণ্য, তিনিই একমাত্র আশ্রয়,- তিনিই অদ্বিতীয় ধর্ম্ম (ধ্রিয়তে অনেন) তাঁহার শরণ লইতে হইলে জাগতিক সমুদয় আশ্রয়—সকল প্রকার অবলম্বন—সমস্ত গুণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভগবান স্বয়ংই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে দাঁড়াইয়া মোহনবেণুর মধুরস্বরে জগৎ মুগ্ধ করিয়া এই তত্ত্বময়ী গাথাই গান করিয়াছিলেন ঃ—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥"

কৃপাসিদ্ধা ব্রজগোপীগণই এ গানের মর্ম্ম সম্যক্ অবধারণকরিতে পারিয়াছিল। তাই তাঁহারা এই বহুরূপীর সাজ—কাহারও স্ত্রী, কাহারও মাতা, কাহারও কন্যা—এই মায়িক সম্বন্ধ পরিহার করিয়া সেই জগদতীত জগন্নাথকে পতিরূপে পাইবার জন্য মহামায়ার চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধিশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"

ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলেই সকল সম্বন্ধ মিটিয়া যায়; 'আমি'ও তখন কেবল হইয়া স্বরূপে প্রকাশ পাই। জগতের জীব যে যাহার কর্ম্ম লইয়া যাতায়াত করিতেছে, কেহ কোন বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা রাখে না। তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন বা জাগতিক আশ্রয়াবলম্বন —রজ্জুতে সর্পভ্রম মাত্র। অতএব এই সীমাশূন্য অনন্ত জগতে আমি একা।

শ্রীমনোমোহন মজুমদার।

হিন্দু বিধবা।

হিন্দু বিধবা সংযম ও ধৈর্য্যশীলতার জীবন্ত প্রতিমা, ধর্ম্ম-প্রাণতার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। হিন্দু বিধবার ন্যায় অপার্থিব পবিত্র প্রতিমা কোন দেশে, কোন সমাজে কখনও বিকাশ পায় নাই। সংসারে এক মাত্র হিন্দু বিধবাই হিন্দু বিধবার উপমা স্থল। অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রলোভনময় সংসারে দুষ্পরিহার্য্য ভোগ তৃষ্ণা তুচ্ছ করিয়া কঠোর মুনিব্রতাবলম্বনে প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণকে বিমথন পূর্ব্বক প্রবৃত্তি পরায়ণ চিত্তবৃত্তি সমূহকে নিবৃত্তিমুখ ও সংযত রাখিবার এমন অপার্থিব এমন মধুর দৃষ্টান্ত সংসারে আর কোথাও খুজিয়া পাওয়া যায় না। ফলতঃ হিন্দু গৃহের নিষ্ঠাবতী বিধবা ভূচারিণী দেবতা। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা হিন্দু বিধবা পবিত্রতার পরমাশ্রয়, অশান্তিময় জগতে শান্তির নিভৃত নিকেতন। চিদ্গত দুর্দ্দম্য আবেগে কুণ্ঠিত না হইয়া জাগতিক সর্ব্ববিধ ভোগাবঞ্চিত থাকিয়া, সংসারিক বহুবিধ বিঘ্নবিপত্তির ঘাত প্রতিঘাতে পরিক্লান্তা হইয়াও ঐহিক প্রলোভন বৈরাগ্যের বাসনা পবিত্র স্বর্গীয় আদর্শ হিন্দু বিধবা ব্যতীত আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় বৈষয়িক বুদ্ধি যেমন পরিমার্জ্জিত হয়, জ্ঞানের বিকাশ তেমন হয় না। এ নিমিত্ত আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু-সন্তানগণ বৈষয়িক বুদ্ধি প্রাখর্য্যকেই জ্ঞানস্থানীয় করিয়া জ্ঞান ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-সমাজ ও হিন্দুশাস্ত্রের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত। কিন্তু জ্ঞান ও বৈষয়িক বুদ্ধির অধিকার অনেক স্থলেই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। এ নিমিত্ত তাঁহারা হিন্দুসমাজে থাকিয়াও হিন্দুসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান নহেন। হিন্দুসমাজের অনেকগুলি বিধান তাঁহাদিগের নিকট কঠোর অলৌকিক ও কুসংস্কার মূলক বলিয়া বোধ হওয়ায় আচার ব্যবহার আহার বিহারাদি অনেক বিষয়ে তাঁহারা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যের যুক্তি, কর্ম্মফল অতিক্রম করিতে পারে না, তজ্জন্য শারীরিক মানসিক ও বৈষয়িক বহুপ্রকার অপচয় ও অনর্থ পরিস্ফুট হইয়া উঠিলেও তাঁহারা উহার কারণান্তর নির্দ্দেশ পূর্ব্বক হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁহাদিগের অশ্রদ্ধা ও বিরুদ্ধাচরণ নির্দ্দোষ মনে করেন। এ নিমিত্ত হিন্দু

বিধবা বিশুদ্ধির পরমাশ্রয়, ও হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া গৌরবাত্মক হইলেও তাহাদিগকে বৈষয়িক সুখে বঞ্চিত করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা উহা দূষ্য জ্ঞানে সামাজিক তাদৃশ ব্যবস্থার প্রতি নানা প্রকার দোষারূপ করেন। কিন্তু যে জ্ঞানভিত্তির উপর হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে কখনই এরূপ কল্যাণকর বিধান দূষ্য মনে করিতে পারিতেন না।

সামাজিক নিয়ম সর্ব্বত্রই সমাজের কল্যাণ-বর্দ্ধক। দেশকালপাত্র ভেদে নিয়ম করিতে হয় বলিয়া সকল সমাজ এক নিয়মে পরিচালিত হইতে পারে না। এক সমাজে যে নিয়ম সুপ্রযোজ্য সমাজান্তরে তাহা অপ্রযোজ্য—অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভাবে দীক্ষিত হিন্দু সন্তানগণ পাশ্চাত্য রীতির পক্ষপাতী হইয়া হিন্দুসমাজকেও তদনুবর্ত্তী করিতে প্রয়াসী হন; কিন্তু দেশকালপাত্র বিচারে হিন্দুসমাজের পক্ষে তাহা যে বিরুদ্ধ ও অকল্যাণকর তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সমাজ বিষয়নিষ্ঠ। বৈষয়িক উৎকর্ষ সে সমাজের চরম লক্ষ্য। তাহার নীতি প্রকৃতি আচার ব্যবহার সকলই তদুদ্দেশ্য সধনার্থে ব্যবস্থিত। ধর্ম্ম হিন্দুসমাজের ভিত্তি। মুক্তি তাহার চরম লক্ষ্য। জীব যাহাতে মায়াময় সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পূর্ণ শান্তিময় ভগবানে মিশিতে পারে, হিন্দুসমাজের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, আহার, বিহার, অনুষ্ঠানাদি সমস্তরই ব্যবস্থা সেই এক মাত্র ভগবৎকেন্দ্রাভিমুখ। বৈষয়িক চেষ্টা বহির্ম্মুখ, আধ্যাত্মিক চেষ্টা অন্তর্ম্মুখ।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

বিষয় নিষ্ঠ পাশ্চাত্য বুদ্ধিতে যাহা সুসংগত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, জ্ঞান-নিষ্ঠ হিন্দুসমাজ তাহা তুচ্ছ মনে করেন। আবার জ্ঞান-নিষ্ঠ হিন্দুসমাজ যাহা পরমোপাদেয় বোধ করেন, পাশ্চাত্য বুদ্ধির বিচারে তাহা অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন। এ নিমিত্ত হিন্দুসমাজের চক্ষে বিধবাদিগের ঐহিক দুঃখ হেয় এবং পারত্রিক কল্যাণ বিধায়ক ব্রহ্মচর্য্য তাহাদিগের পক্ষে সুব্যবস্থেয়, পাশ্চাত্য শিক্ষামার্জ্জিত বুদ্ধি বিষয়-নিষ্ঠ হিন্দু-সন্তানগণের বিচারে ব্রহ্মচর্য্য হেয় এবং হিন্দু মহিলাগণের চির বৈধব্য মর্ম্মান্তিক কষ্ট প্রদ। কাজেই শিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণ বিধবা-দিগের সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজের ব্যবস্থা নিন্দিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। যিনি যে সমাজের লোক তাঁহার বুদ্ধি ও রুচি প্রবৃত্তি সেই সমাজের অনুযায়ী হওয়া উচিত। যাঁহারা সমাজান্তরের মত পোষণ করেন, তাঁহারা আত্ম-সমাজের কণ্টক। তাঁহারা নিজেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না, সমাজের উন্নতিরও অন্তরায়ীভূত হইয়া সর্ব্বস্থানে অবসাদ সংঘটন করেন। আত্ম সমাজের প্রতি যাঁহাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তাঁহারা সমাজের যথার্থ দোষ বুঝিতে পারিলে তাহার সংশোধনে সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমশঃ।

শ্রীমাধবচন্দ্র সান্যাল।

বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভার দশম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী।

শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা এ বৎসর একাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। অদ্য সভার দশম বার্ষিক উৎসব দিবসে কার্য্যকরী সমিতি সভার অধিষ্ঠাতা সেই শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্য-দেবকে সর্ব্বাগ্রে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছেন এবং সমস্ত সদস্যবর্গের ও অনুগ্রাহক মহোদয়গণের উৎসাহ ও অনুকম্পা প্রার্থনা করিতেছেন।

এই দিবসে এই সভার বিগত দশ বৎসরের ইতিহাস সংক্ষিপ্তরূপে বিবৃত করা কার্য্যকরী সমিতির একটী কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কলিকাতা নগরীতে ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে অন্যান্য জাতিভুক্ত ব্যক্তিদিগের নিজ নিজ সমাজের উন্নতিকল্পে নানা সভার স্থাপন হওয়াতে এবং তদুপলক্ষে সমাজমধ্যে কোন কোন স্থলে সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে ব্রাহ্মণ সভার আবির্ভাব প্রথমতঃ অনেকের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণ সভা প্রতিহিংসা বা জিগীষামূলক। এইরূপ ধারণা সেই সময়ের অবস্থামতে কতকটা স্বাভাবিক ছিল বলিয়া এবং কোন কোন স্থলে প্রকৃতই ঐরূপ সমালোচনা হইতেছে দেখিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা প্রথম হইতেই নিজ উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কারভাবে সমাজসমক্ষে প্রচারিত করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল সমাজের কিছু কিছু সামাজিক শাসন এবং প্রকাশ্য অসামাজিক ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণের বিরুদ্ধ সমালোচনা মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হওয়াতে, পক্ষান্তরে শিথিল সমাজের গঠন কার্য্য প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মণ-সভার পক্ষে সহজ সাধ্য না হওয়াতে, এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা অনেকটা অবসরও এ পর্য্যন্ত পাইয়া আসিতে-ছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় প্রকৃত সত্য বহুদিন লোক-চক্ষুর দৃষ্টির বাহিরে থাকে নাই। ক্রমেই যেমন ব্রাহ্মণ-সভা সমাজহিতকর কোন কোন কার্য্যে ব্রতী হইবার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতেছেন তেমনই লোকের শুভদৃষ্টি ব্রাহ্মণ-সভার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, এবং তৎসহ সভার কার্য্যক্ষেত্রেও শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সামাজিক ব্রাহ্মণগণ এই সভার সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। মধ্যযুগে শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত নব্যশিক্ষিতগণ পাশ্চাত্য সভ্যতালভ্য নানারূপ ভোগ সুখের মোহেই মুগ্ধ থাকিয়া ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; যাহা কিছু পাশ্চাত্য, তাহাই তাঁহাদের আদর্শ ও অনুকরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং যাহা কিছু দেশীয় তাহাই প্রাচীন বর্ব্বরতামূলক বলিয়া গণ্য হইয়া সমাজে হতাদর হইতেছিল। নব্যশিক্ষিতগণের মধ্যে কিছু কিছু অর্থ প্রাচুর্য্য হওয়াতে তাঁহারাই সাধারণের মধ্যে গণ্যমান্য হইতেছিলেন এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহার, চালচলনই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া উঠিতেছিল। যাঁহারা সমাজমধ্যে প্রাচীন ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ও প্রাচীন বিদ্যারক্ষার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন—তাঁহারা ক্রমে উক্তরূপ নব্যশিক্ষার

ও পাশ্চাত্য সভ্যতাতৃপ্ত সমাজে অনাদৃত হইয়া এবং ভোগবিলাস ভাবপূর্ণ সমাজে আবশ্যক মত বাহ্যিক আড়ম্বর রক্ষায় অসমর্থ হইয়া এবং ক্রমে দরিদ্রতাক্লিষ্ট হইয়া নিজ দলমধ্যে প্রাচীন বিশ্বাসমূহেরও সম্যক্ সমালোচনা বা প্রগাঢ়তা রক্ষায় সমর্থ হইতেছিলেন না। পক্ষান্তরে নানা প্রতিকূল অবস্থার বিপাকে পড়িয়া সর্ব্বত্র আত্মমর্য্যাদা রক্ষায়ও সমর্থ হইতে ছিলেন না এবং ক্রমে আপনাদিগকে নিতান্ত নিরাশ্রয় ও অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া অনেক স্থলে কালস্রোতেই গা ঢালিয়া দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষা বহুদিন নব্যশিক্ষিতদিগের নব্য-আবিষ্কৃত অভাব সমূহের পূরণে সমর্থ হয় নাই, এদিকে বহুকাল এবং বহুপুরুষপরম্পরায় আর্য্যসন্তান মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পবিত্র সনাতন ভাবসমূহও বিপথগত হিন্দুর অন্তঃকরণ হইতেও সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ লাভ করে নাই। সুতরাং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিলাসভাবমুগ্ধ সমাজেও এই অল্প সময়ের মধ্যে বহু শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোক দেখা যাইতেছে, যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাই অবিমিশ্র সুখভোগ বিধানে সম বলিয়া যে ধারণা হইতেছিল, তাহা একেবারেই সত্য নহে, বরং উহার অনুসন্ধানে যাইয়া লোক সুখলাভ না করিয়া শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্য ও শান্তিই হারাইয়া বসে। এদিকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, প্রাচীন বর্ণাশ্রম বিধিমতে সমাজের পরিচালনে এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষার বিধানেই সমাজের প্রকৃত স্বাস্থ্য ও শান্তি রক্ষার অধিকতর সুবিধা হইয়া থাকে। ইউরোপের যুদ্ধ দুইবৎসর যাবৎ সমস্ত পৃথিবীরই চক্ষু ফুটাইয়া দিতেছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ভীষণতা বিষয়ে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনেই আর বিশেষ সন্দেহ থাকিতে দিতেছে না।

এদিকে ব্রাহ্মণসভা দেখিতে পাইয়াছেন যে, যদিচ নব্য শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল প্রধান প্রধান নগরীসমূহে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রভাব উন্মূলিত প্রায় লক্ষিত হইয়া থাকে, তথাপি গ্রামসমূহে এখনও বর্ণাশ্রম সমাজই প্রতিভাশালী এবং সুপ্রণালীতে সমাজ-প্রবিষ্ট দোষ সমূহের সংস্কার হইলে অতি সহজেই সমস্ত সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা লাভ হইতে পারে। এই বিবেচনায় ব্রাহ্মণ-সভা কয়েক বৎসর যাবৎ গ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজ সমূহকে জাগ্রত করিবার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন জিলাতে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন আহ্বানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানে শাখা ব্রাহ্মণ-সভা সমূহ স্থাপন করিতেছেন। এইরূপ চেষ্টার শুভফল ইতিপূর্ব্বেই অতি স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া গিয়াছে। বহু সদ্‌ব্রাহ্মণ এখন এই সভার সহিত বা গ্রামের ও মফঃস্বল সহরের ব্রাহ্মণ-সভা সমূহের সহিত সংসৃষ্ট হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। পূর্ব্বে মফঃস্বলের সামাজিকগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহোদয়গণ নিজদিগকে নিরাশ্রয় ও দুর্ব্বল মনে করিয়া সমাজে আচরিত দুষ্ক্রিয়া সমূহের প্রতিবাদে বা শাসনে অনেকেই সাহসী হইতেন না। সদ্‌ব্রাহ্মণগণ মনের ক্ষোভ মনেই বিলীন করিতেন এবং অনেক স্থলে বা সমাজে পৃথক্ হইয়া থাকা অসম্ভব মনে করিয়া দুষ্ক্রিয়াম্বিতদিগের দলভুক্ত হইয়াও পড়িতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু বিগত চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে মফঃস্বল সমাজে

আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। তৎপূর্ব্বসময়ে প্রবীণ ও প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত-বর্গও যে সকল অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদে সাহসী বা সমর্থ হইতেন না; বিগত পাঁচ বৎসরের মফঃস্বলের সামাজিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সুদূর মফঃস্বলের সামান্য একজন দরিদ্র পুরোহিত ব্রাহ্মণও সেই সমস্ত অন্যায় কার্য্য হইতে স্বয়ং বিরত থাকিয়া নিজ সমাজকেও সেই কার্য্যে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করিতেছেন এবং যে স্থলে স্বয়ং উহাতে সমর্থ হইতেছে না, সেই স্থলে ব্রাহ্মণ সভার সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহোদয়গণ মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবস্থাদি দ্বারা বা অগ্রাহ্য দান দির গ্রহণ দ্বারা বিখ্যাত হইতে পারেন নাই, এরূপ পণ্ডিতগণ মধ্যে এখন প্রায় কেহই আর নূতনভাবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা চিরন্তন সদাচারবিরুদ্ধ কোন কার্য্যে যোগদানে প্রায়শঃ সাহসী বা ইচ্ছুকও হইতেছেন না। অনেকস্থলে বা ক্ষীণশক্তি পণ্ডিতমহোদয়গণ এবং পুরোহিত-মহোদয়গণও অসৎ কার্য্যের বিরুদ্ধে অসীম সৎসাহস প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবস্থার পোষকতা দোষে দুর্নামগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও অনেকেই কোন প্রকারে নিজ সম্মান বা অভিমান বজায় রাখিয়া পূর্ব্ব দুষ্কৃতির দুর্ণাম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিশুদ্ধ সমাজে মিশিয়া যাইতে পারেন কি না তদ্বিষয়ে নানাপ্রকারে যত্নের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে সকল পণ্ডিত, ও সামাজিকগণ কোন কোন স্থলে পূর্ব্বে না বুঝিয়া শাস্ত্র ও সমাজবিরুদ্ধ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক অনেক স্থলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বা নিজ দোষ স্বীকার করিয়া ক্রমশঃ বিশুদ্ধ সমাজভুক্ত হইয়া পড়িতেছেন বা তজ্জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিত পুরোহিত ও সামাজিকগণ যত সহজে ও যত সংখ্যায় সমাজ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের পোষকতা করিতেন এখন আর সমাজে তত সহজে বা তত সংখ্যায় অনেক স্থলেই তাহা হইতেছে না। সর্ব্বত্রই সুদূর মফঃস্বলেও সমাজ বিশুদ্ধি, শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য একটা উৎসাহ যেন লোকের মনে প্রবেশ করিয়াছে এবং পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও পণ্ডিতবর্গের মনে যে নিরাশার ও দুর্ব্বলতার ভাব লক্ষিত হইত, তাহা এখন আর প্রায় কুত্রাপি নাই। সমাজে এই পরিবর্ত্তন যে অত্যন্ত আশাপ্রদ ও শুভকর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং একথাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ব্রাহ্মণসভা-সমূহের ও ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন সমূহের চেষ্টা নিবন্ধনই সমাজে উক্তরূপ পরিবর্ত্তন অধিকরূপে সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে। যদি একথা আংশিকরূপে স্বীকার করিতে হয়, তবেই বলিতে হইবে ব্রাহ্মণ-সভার উদ্দেশ্য অতি সৎ এবং তাহার চেষ্টাও সুপথেই পরিচালিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলও বিশেষ শীঘ্রই অতি অভাবনীয়রূপে শুভজনক হইয়াছে।

অনেকে হয় ত বলিবেন অসৎকর্ম্ম দমনের দিকে কতক চেষ্টা হইয়া থাকিলেও সদনুষ্ঠানের দিকে বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির দিকে বিশেষ কি চেষ্টা এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-সভা বা মহাসম্মিলন করিয়াছেন? ইহার উত্তর এই যে, সমাজ যখন অধঃপতিত হয় তখন প্রত্যেক সমাজহিতৈষীর প্রথম

কর্ত্তব্য এই যে, সমাজের অধিকতর অধঃপতনের পথে বাধা উৎপাদন করা। তাহা না করিয়া উন্নতির দিকে যাওয়া অনেকাংশেই অর্থশূন্য হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণসভা সমাজে প্রবিষ্ট বা প্রবেশোন্মুখ নূতন দোষ সমূহের নিবারণে প্রথম চেষ্টা করিয়া ঠিক কার্য্যই করিয়াছেন। সেই চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফলে সামাজিকের মনে যে আশা উদ্যম ও সৎসাহস উৎপাদন করা হইয়াছে, ইহাই ব্রাহ্মণসভার প্রথম সদনুষ্ঠানের প্রথম শুভফল মনে করা যাইতে পারে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ যে ক্রমে একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উঠিবার ভাব নানাপ্রকারে প্রকাশ করিতেছেন, ইহা ব্রাহ্মণসভার চেষ্টার দ্বিতীয় ফল। একজাতীয় বহু কার্য্যানুষ্ঠানেই লোকদিগকে একসূত্রে আবদ্ধ করে, মহাসম্মিলন এবং ব্রাহ্মণসভাসমূহ যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে সামাজিক দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে এই উদ্দেশ্য বিশেষরূপে সিদ্ধ হইবার আশা জন্মিতেছে। তৎপর নানাস্থানে যে সকল চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইতেছে, শাখা ব্রাহ্মণসভা স্থাপিত হইতেছে, যোগ্য প্রচারকদিগকে বৎসর ব্যাপিয়া মফঃস্বলে রাখার ব্যবস্থা হইতেছে, "ব্রাহ্মণ-সমাজ" কাগজ প্রতিমাসে প্রকাশ দ্বারা লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে, পঞ্জিকাসংস্কাররূপ মহৎ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজে ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপের আশঙ্কা নিবারণ করার চেষ্টা হইতেছে, প্রতি বৎসর এক একবার এক জিলার সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজকে একত্র আহ্বান করিয়া সমগ্র পদস্থ সমাজিক সমক্ষে বিশেষ গুরুতর প্রশ্ন সমূহের বিশেষ সমালোচনার দ্বারা সমাজের কর্ত্তব্যের স্থিরীকরণ হইতেছে এবং তাহার ফলে ইতিপূর্ব্বেই বিভিন্ন জিলাতে ব্রাহ্মণ সন্তান মধ্যে সন্ধ্যা আহ্নিক রীতিমত অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তির বিশেষ উন্মেষ দেখা যাইতেছে এবং পণপ্রথার জঘন্যতার বিশেষ হ্রাস অনেক স্থলে দেখা যাইতেছে, কোথাও বিনা পণেই কুলীন মধ্যেও বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে এবং বারেন্দ্র সমাজে পঠী সংস্করণরূপ অতি কঠিন সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং রাঢ়ীয় সমাজেও মেল বন্ধনের দূষিত রীতির পরিবর্ত্তনে বিবাহ কার্য্য অনেক স্থলে অনুষ্ঠিত হইতেছে এ সমস্তের একত্র বিবেচনা করিতে গেলে কোন্ ব্যক্তি সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্বন্ধে এবং ব্রাহ্মণসভার চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে বিশেষ আশ্বস্ত না হইতে পারেন? সমাজের এমন কোন চেষ্টার কথাই কেহ বলিতে পারিবেন না, যে চেষ্টার ফল এত অল্প সময়ে এত সুস্পষ্ট ও বহু বিস্তৃতরূপে সমাজে প্রতীয়মান হইয়াছে।

কিন্তু এরূপ হইলেও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেমন ব্রাহ্মণসভার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে, তেমনই সভার দায়িত্বও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। মৃতসমাজ কালস্রোতের সহিত ভাসিয়া যায়, তাহার ফলাফলের জন্য কোনও ব্যক্তি বা সমাজবিশেষের তেমন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু সমাজ যখন জীবিত হয়, তখন তাহার গতি সুপরিচালিত করিতে না পারিলে তাহাতে যেমন পরিচালকরূপে কার্য্যকারীদিগের দায়িত্ব উপস্থিত হয়, তেমন সমাজ বিপথগামী হইলে তাহাতে সমাজের বহু অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে। এখন ব্রাহ্মণ সমাজে যখন পুনরায় জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে তখন যাহাতে ব্রাহ্মণসভা সমাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া সমাজকে প্রকৃত ধর্ম্মপথে, প্রকৃত উন্নতির মার্গে লইয়া যাইতে পারেন,

তদ্বিষয়েই ব্রাহ্মণসভার সদস্য মহোদয়দিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শ্রী৺ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণসভা যে ভাবে পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে ভরসা করা যায় এবং আমরা সকলে সানুনয়ে শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনিই সভার সদস্য মহোদয়দিগের বুদ্ধি সুপরিচালিত করিয়া তাঁহার সনাতনধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা ভারতকর্ম্মভূমিকে সর্ব্বতোভাবে জগতের আদর্শ স্থানে উন্নতী করিবেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণসভার কার্য্যাদির অলোচনা করা যাইতেছে।

বিগত মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনে ১৩টী নির্দ্ধারণ ঘোষিত হয়, সেই ত্রয়োদশটী নির্দ্ধারণ পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যে কয়টী ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন হইয়াছে, এই নির্দ্ধারণ গুলির অধিকাংশই তাহাতে আলোচিত ও স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন ও ব্রাহ্মণসভা সম্পূর্ণ একবস্তু না হইলেও উভয়েই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ হিসাবে ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনের নির্দ্ধারণের সমালোচনা করিতে হইলে ব্রাহ্মণসভাকেও একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়, এজন্য তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণসভার কার্য্যাদির সমালোচনা করা যাইতেছে।

১। ব্রাহ্মণসভার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার নিমিত্ত, এবং ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনীর কার্য্যক্ষেত্র সুগম করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার অধীনতায় এ পর্য্যন্ত বহু শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে। ১৩১৯ সালে ১৬টী শাখাসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৩২১ সালে ১২টি শাখাসভা, ১৩২১ সাল হইতে ১৩২২ সালের গত বার্ষিকসভা পর্য্যন্ত ২২টী শাখাসভা এবং বার্ষিক সভার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ১৬টী শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে। মোট ৬৬টী শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নে শাখা-সভা সমূহের নামোল্লেখ করা হইল। ফরিদপুর জেলাস্থ বাজিতপুর, সামন্তসার, প্রাণপুর, কাওলীবেড়া, ভুলারডাঙ্গা, প্যারপুর, পাঁচ্চর, উমেদপুর, আধারমাণিক, কালামৃধা, ননীক্ষীর, আমগ্রাম, মহেন্দ্রদী, কবিরাজপুর, সাধুহাটী, দত্তপাড়া, গোঁসাইরহাট প্রভৃতি গ্রামসমূহে এবং খুলনা জিলাস্থ খুলনা সদর, লখপুর, মাগুরা প্রভৃতি গ্রামসমূহে, এবং মেদনীপুরস্থ তমলুক, জুনাটিয়া, টাবাখালি, কাখুরীয়াবাড়ী প্রভৃতি গ্রামে এবং বগুড়া জিলাস্থ রায়কালীগ্রামে এবং ঢাকাজিলাস্থ পাটগ্রাম, চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি গ্রামসমূহে, বর্দ্ধমানজিলাস্থ মীরহাট গ্রামে এবং মুর্শিদাবাদজিলাস্থ কান্দিসহরে, ডুমকা জেলার তাড়রা গ্রামে, ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া সদরে; শ্রীহট্টের মহাসহস্র গ্রামে শাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলায় কল্যাণপুর, বাউগ্রাম, পাঁচথুপী, রাজহাট, পীলসীমা, ইন্দ্রাণী, মাড়গ্রাম, এড়োয়ালী, জজান, কাগ্রাম, মাখলতোর, সালু, মালীহাটী, আলুগ্রাম, আমলাই, দত্তবরুটীয়া, সাহোড়া, রামনগর, মাজীয়াড়া; বীরভূম জেলায়—পলকা নওপাড়া, তুরীগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এবং বর্দ্ধমান মৌগ্রাম গ্রামে শাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে।' যশোহর "লক্ষ্মীপাশা কালীবাড়ী" শাখা সভা প্রতিষ্ঠা এ বৎসরের ঘটনা। বীরভূম জেলায় বড়শাল শাখা-সভা, খরুণশাখা-সভা, সেখুড় উদয়পুর শাখা-সভা, সন্ধ্যাজোল শাখা-সভা, মুর্শিদাবাদের সাটুই কুমারপুর শাখা-সভা,

শক্তিপুর শাখা-সভা, রামপাড়া নলহাটী শাখা-সভা, বেলডাঙ্গা শাখা-সভা টেঙ্গা বৈদ্যপুর শাখা-সভা, মন্থলা শাখা ব্রাহ্মণ-সভা, নূতনগঞ্জ শশুই শাখা-সভা প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। সেই সেই শাখা-সভার পরিচালকগণ ব্রাহ্মণ-সভার উদ্দেশ্য সমূহ প্রচার করিবার জন্য নিজেদের আয়ত্তাধীনে যোগ্যতানুসারে কোথায় বা একটী কোথাও বা একাধিক গ্রাম সমূহ লইয়া সামাজিক সংস্রব রাখিয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ দান করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার ফলে বহু ব্রাহ্মণপরিবারেরই যাহাতে শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান চলে এবং প্রত্যেক উপনীত ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ যাহাতে সন্ধ্যোপাসনা করেন তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এপর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, বহুস্থলেই ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ বিশুদ্ধভাবে যাহাতে ক্রিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এবং বিশুদ্ধভাবে যাহাতে সন্ধ্যোপাসনা করিবার সুবিধা হয়, এজন্য বিশুদ্ধ পুঁথি পুস্তক, এবং বিশুদ্ধ পুরোহিত প্রভৃতির সংগ্রহ কল্পে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণসভাও তাঁহাদের অভাব পূরণ কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

২। ব্রাহ্মণগণের কুলপরিচয় রক্ষাকল্পে বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভা হইতে যথোচিত ব্যবস্থা হইতেছে। ব্রাহ্মণসভার অধীনতায় নানাপ্রকারে কতকগুলি কর্ম্মচারী রাখিয়া নানাগ্রাম হইতে কুলপরিচয় সংগ্রহ করা হইতেছে। এক একটা থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণাধ্যুষিত পল্লীসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া কর্ম্মচারিগণ নিকটবর্ত্তী ৫।৭।১০।১৫ গ্রাম লইয়া এক একটী কেন্দ্র সংস্থাপন পূর্ব্বক এবং প্রত্যেক কেন্দ্রেই এক একটী শাখা-সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক সেই সভার সদস্যগণের উপর ভার দিয়া অনেক স্থানেই কুলপরিচয় সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এইভাবে কার্য্যের একটা সুবিধা এই যে তদ্দেশবাসিগণের সাহায্যেই কুলপরিচয় সংগ্রহ হয়, এবং সেই পরিচয়পত্রের বিশুদ্ধিরও অনেকটা ঠিক পাওয়া যায়। এইভাবে কার্য্য করিয়া এবারে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী মহাকুমার অধীন খড়গ্রাম, বড়ঞা, ভরতপুর, কান্দী ও গোকর্ণ থানার অধীনস্থ গ্রাম সমূহের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণের কুলপরিচয় সংগ্রহ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এছাড়া ও অন্য উপায়েও বহুগ্রামের কুলপরিচয় সংগ্রহ হইয়াছে। এবং ইহার কার্য্য বিস্তৃতিকল্পে ব্রাহ্মণ-সভা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়া ব্রাহ্মণসভার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন।

৩। মহাসম্মিলনের তৃতীয় নির্দ্ধারণের অনুষ্ঠানকল্পে ইহাই ঠিক করা হইয়াছে যে, প্রতিবর্ষে যে যে জেলাতে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন হইবে, সেই সেই জেলাতে এক একটী করিয়া আদর্শ চতুষ্পাঠী স্থাপন করা হইবে। সেই সেই আদর্শ চতুষ্পাঠীর ভার তদ্দেশবাসী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা গঠিত কমিটির উপর অর্পিত হইবে। কলিকাতাতে যে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন হয়, তদুপলক্ষে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার অধীনে একটী আদর্শ চতুষ্পাঠী স্থাপন করা হইয়াছে। বীরভূমেও মহাসম্মিলন উপলক্ষে চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য একটী সমিতি গঠন করা হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসরের কার্য্য বিবরণীতেও এই সমিতির ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সমিতির কার্য্য

যদ্যপি এখনও শেষ হয় নাই, তথাপি এই কার্য্য উপলক্ষে হেতমপুর, কুণ্ডলা প্রভৃতি গ্রামে পূর্ব্বেই আদর্শ চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছে। এ বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলায়ও মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর চতুষ্পাঠী স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এইভাবে দেশে যত চতুষ্পাঠী প্রভৃতি স্থাপিত হইবে, তাহাতে ব্রাহ্মণ-বিদ্যার্থিগণের শাস্ত্র বিধিমত অধ্যয়নের সুবিধা হইবে, এবং বিশুদ্ধ অধ্যাপক প্রতিপালনের সঙ্গে দেশে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে।

৪। আচারবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের কথঞ্চিৎ রক্ষার সুবিধার জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী মহাশয় তাঁহার মাতার নামে ১৫০০০ হাজার টাকার একটী দলিল সম্পাদন করিয়া দিতেছেন। সেই টাকার সুদে যতদূর সম্ভব "বিশ্বেশ্বরীবৃত্তির" কার্য্য পরিচালন হইবে। এই বৃত্তি উপলক্ষে সমস্ত বাঙ্গালা হইতে অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের আবেদন আসিয়াছে, এবং তদুপলক্ষে একটী বাছাই করিয়া অধ্যাপকগণের তালিকাও প্রস্তুত করা হইয়াছে। ট্রষ্টিগণ যত সত্বর সম্ভব সেই কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন। যদ্যপি এই আয়োজন অতি নগণ্য, তথাপি আশা করা যায় ক্রমেই বঙ্গের সমস্তই ধনিগণই এই পন্থার অনুসরণ করিবেন।

৫। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মেল বন্ধনের অপকারিতা সম্বন্ধে সামাজিকগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনাদিতে যে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যদ্যপি সামাজিকগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া রাঢ়ীয় সমাজের পক্ষ হইতে পুস্তকাদি প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং বারেন্দ্র-সমাজের কুলীনগণের কলিকাতা, রঙ্গপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে করণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তথাপি এ বৎসর এই কলিকাতা মোকামে বারেন্দ্র-সমাজের বহু বিখ্যাত কুলীনগণের মতানুসারে বিরাট্ বিশাল করণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই করণে বিভিন্ন সমাজের শতাধিক কুলীন ব্রাহ্মণগণ যোগদান করিয়া স্ব সমাজে শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ বিবাহের যে একটা প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, অতঃপর বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন প্রকার পটী বন্ধনের বিভীষিকা থাকিবে না।

৬। বিগত বর্ষে দেবীর বোধন ও বিসর্জ্জন উপলক্ষে প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহে সময় নিরূপণ লইয়া মতদ্বৈধ হওয়ায় সামাজিকগণ প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার নিকট আবেদন করেন। তদুপলক্ষে ১৩২২ সালের ৫ই ভাদ্র রবিবার বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভাগৃহে কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, প্রধান প্রধান পঞ্জিকাসমূহের জ্যোতির্ব্বিদগণ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদগণকে আহ্বান করিয়া প্রকৃত সময় নির্ণয়ের জন্য ভার দেওয়া হউক, এবং ব্যবস্থা বিষয়ে যে মতদ্বৈধ আছে, তাহার সমাধান জন্য বাঙ্গালার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আহ্বান করা হউক। এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে ১৩২২ সালের ১০ই ও ১১ই ভাদ্র দুই দিবস ব্রাহ্মণ-সভা গৃহে কার্য্যকরী সমিতির বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে বঙ্গের প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহের গণক মহোদয়গণ এবং প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত অধ্যাপকগণ উপস্থিত হন। সেই অধিবেশনে প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহের গণক মহোদয়েরা

একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের গণনা ভ্রম প্রমাদ শূন্য নহে। সুতরাং স্থির হইল। যে প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহের সংস্কার কল্পে ব্রাহ্মণসভার উদ্যোগী হওয়া সঙ্গত। তদনুসারে বিগত ১৩২২ সালের আশ্বিনমাসের ২২শে তারিখে আর একটী কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হয়। তাহাতে ব্রাহ্মণ-সভার তত্ত্বাবধানে "পঞ্জিকা সমিতি" গঠিত হয়। পঞ্জিকাসংস্কার সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার ১৩২২ সালের ২২শে আশ্বিন ও ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়ের নেতৃত্বে যে কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনদ্বয়ে যে সমস্ত নির্দ্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটী নির্দ্ধারণ নিম্নে লিখিত হইল।

১। যেহেতু সভা বিবেচনা করেন যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান উপযোগী পঞ্জিকাসম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহের শেষ মীমাংসা জন্য ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ মহোদয়গণের এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের একটী সভা আহ্বান কর্ত্তব্য। অতএব নিম্নলিখিত পণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদ মহোদয়গণকে এই সভা সম্বন্ধীয় সমস্ত অনুষ্ঠান জন্য মনোনীত করা গেল। তাঁহারা প্রথমতঃ অর্থসংগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ সভার বিবেচ্য প্রশ্নসমূহের অবধারণ, তৃতীয়তঃ, ভারতের বিভিন্ন দেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক মতাবলম্বী প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নাম সংগ্রহ করণ, চতুর্থতঃ এই সমস্ত জ্যোতিষীদিগের নিকটে উত্তর প্রার্থনা করিয়া প্রশ্ন প্রেরণ, পঞ্চমতঃ শেষ সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করিবেন।

সেই সমিতিতেই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক মনোনীত হন।

পঞ্জিকা-সমিতির মনোনীত সদস্যগণ—

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার। ২। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন। ৩। মহামহোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ। ৪। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ বিদ্যারত্ন। ৫। শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় ঝা। ৬। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ জ্যোতিরত্ন। ৭। শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধি। ৮। শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ। ৯। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। ১০। শ্রীযুক্ত আশুতোষ শিরোরত্ন।

১১। মাননীয় স্যার—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি। ১২। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী এম-এ। আলিপুর। ১৩। শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম, এ। ১৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম, এ।

১৫। রায় সাহেব—শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন রক্ষিত এম-এ। ১৬। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায়।

দেশের যোগ্যব্যক্তিগণকে সদস্য মনোনীত করিবার ভার সম্পাদকের উপর অর্পিত থাকায় পরে আরও অনেক বিচক্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ও জ্যোতির্ব্বিদগণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাঁহাদের নাম এস্থলে উল্লিখিত হইল না। এই সমিতির উদ্যোগে ১৩২২ সালের ১৬ই পৌষ তারিখে মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদ সিংহ বাহাদুরের নেতৃত্বে যে নির্দ্ধারণ হয় এবং তদুপলক্ষে যে পণ্ডিতগণ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহার নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। অসতি ধর্ম্মশাস্ত্রবিরোধে দৃগগণিতৈক্যসাধনমস্মাকং সম্মতম্ ।

২। দৃগগণিতৈক্যং সায়ন-গণনা চ শব্দদ্বয়ং নৈকার্থবোধকং।

৩। যন্ত্রবেধবিধিনা দৃগগণিতৈক্যসাধনমস্মাকং সর্ব্বেষাং সম্মতম্ ।

জ্যোতির্ব্বিদাং—

শ্রীচন্দ্রনারায়ণ বিদ্যারত্নানাং শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতিজ্যোতিস্তীর্থানাং শ্রীউপাধ্যায় ঝা জ্যোতিষাচার্য্যানাং শ্রীআশুতোষ মিত্র (unconditional) শ্রীধীরানন্দ কাব্যনিধীনাং শ্রীব্রজমোহন রক্ষিত (unconditional) শ্রীরাজকুমার সেন শ্রীকৃষ্ণকুমার বিদ্যাসাগরাণাং শ্রীজগদ্দুর্ল্লভ জ্যোতিঃশেখর দেবশর্ম্মণাং শ্রীহরিচরণ দেবশর্ম্মণাং ।

স্মার্ত্তাণাং —

শ্রীপ্রমথনাথ তর্ক-ভূষণ শর্ম্মণাং শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ শর্ম্মণাং শ্রীআশুতোষ শিরোরত্ন শর্ম্মণাং শ্রীকৃষ্ণকুমার দেবশর্ম্ম বিদ্যাসাগরাণাং শ্রীজগদ্দুর্ল্লভ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণাং শ্রীচন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কারাণাং শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থাণাং শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণানাং শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রিণাং ।

এ ছাড়া বঙ্গের লব্ধ প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ও জ্যোতির্ব্বিদ এই সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করিয়া নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন ।

এইরূপে পঞ্জিকা-সমিতির কার্য্য চলিতে লাগিল। সমস্ত বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত সংগ্রহ জন্য ৮টী প্রশ্ন করিয়া সকলের নিকট প্রেরিত হইল—

সবিনয়-নিবেদন,

মহাশয়, প্রচলিত পঞ্জিকায় তিথ্যাদির ও গ্রহসংস্থাপনের পরস্পর মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহার উপর সন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। এই অবস্থায় দৃগগণিতৈক্য করিয়া পঞ্জিকা করিলে উক্ত সন্দেহ দূর হইতে পারে, এইরূপ অনেকের মত। তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার্য্য হয় যথা —

১। দৃগ্‌গণিতানুসারে গণিত পঞ্জিকায় ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত কিরূপ বিরোধের সম্ভাবনা ?

২। 'বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়' এই মতটী কোন আর্য গ্রন্থোক্ত কি না ?

৩। বর্ত্তমান সময়ে দৃক্‌সিদ্ধ গণনানুসারে তিথ্যাদির 'সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয়' হয়, সেই অনুসারে পঞ্জিকা গণিত হইলে ভবিষ্যতে তিথ্যাদির এতদপেক্ষাও বৃদ্ধি হ্রাসের সম্ভাবনা আছে কি না ?

৪। পাশ্চাত্য-প্রণালী ব্যতিরেকে আর্য উপায়ে দৃক্‌সিদ্ধ গণনা হইতে পারে কি না ?

৫। নিরয়ণ রাশিনক্ষত্র গণনার জন্য রাশিচক্রের কোন্ বিন্দু আদি বিন্দুস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে ? অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে কি পরিমাণ অয়নাংশ গ্রহণ করা শাস্ত্র-সম্মত ?

৬। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে আবশ্যক সংস্কার পূর্ব্বক গণনা করিলে গ্রহণাদির সময় নিরূপিত হইতে পারে কি না ? না হইলে কি প্রণালীতে তাহার নিরূপণ করিতে হইবে ? এই বিষয়ে প্রমাণ কি ?

৭। আমাদের ধর্ম্মকার্য্যের উপযুক্ত কাল-নিরূপণ সমস্তই দৃগ্‌গণিতৈক্যের বিষয়ীভূত কি না? সমস্ত বিষয়ীভূত না হইলে কোন্ কোন্ গণনায় দৃগ্‌গণিতৈক্যের আবশ্যকতা এবং তাহার প্রমাণ কি? এবং সেই দৃগ্‌গণিতৈক্য কোন্ তানুসারে কর্ত্তব্য?

৮। "বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়" এই নিয়মটি সময়বিশেষের জন্য কিনা? সময় বিশেষের জন্য হইলে কোন্ সময়ের জন্য?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আসিয়াছে, শতাধিক পণ্ডিত বিশেষজ্ঞগণ ইহার উত্তর দিয়াছেন, এবং ইহা ভিন্ন বহু পণ্ডিতমণ্ডলী ব্রাহ্মণসভার উপর নির্ভর করিয়াছেন। এই সমস্ত উত্তর পত্রগুলি বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষিত হইতেছে। এবং ইহার ফলাফল শীঘ্রই জন সমাজে প্রকাশিত হইবে এবং শেষ মীমাংসাজন্য পঞ্জিকাসমিতি শীঘ্রই একটী মহাসভার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই পঞ্জিকা সমিতির কার্য্যের সুবিধার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেষ্টায় নেপাল হইতে ১৫০০ শতবৎসরেরও অধিক পুরাতন চন্দ্রেশ্বর ভাষ্য সহ বঙ্গাক্ষরে লিখিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ আনীত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সাধারণত একটী বিশিষ্টতা দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত সূর্য্য-সিদ্ধান্ত অপেক্ষা ইহার একটী অধ্যায় অধিক। এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যবস্থা হইতেছে।

প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহের সংস্কার দুরূহ কার্য্য। সুতরাং সময় সাপেক্ষ। ধীর স্থিরভাবে কার্য্যের উন্নতি হয় সে দিকে পঞ্জিকা-সমিতির সবিশেষ লক্ষ্য আছে।

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের ১১শ নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত করার জন্য একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা আবশ্যকমত সদস্য সংখ্যা পরিবর্দ্ধনও করিতে পারিবেন। মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এই সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ ও বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভার পক্ষে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীধাম ব্রাহ্মণসভার পক্ষে শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর ব্রাহ্মণ সভার পক্ষে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এবং রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়গণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের নিয়মাদি প্রণয়নের ভার ও এই সমিতির হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

১৩২২ সালে বঙ্গীয় সভার ১৫ পঞ্চদশটী কার্য্যকারী সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। এবং ইহা ভিন্ন দুইটী অধিবেশনে নিয়মিত সদস্যগণ উপস্থিত না হওয়ার কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছিল। এই সমস্ত কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধানভাবে আলোচ্য ছিল।

১। দেবীর বোধন ও বিসর্জ্জন উপলক্ষে পঞ্জিকা সংস্কার ব্যবস্থা।

২। বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান।

৩। ব্রাহ্মণসভার পরীক্ষা।

৪। বেদবিদ্যালয়

৫। ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকা।

৬। মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন।

৭। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত দান!

৮। চতুষ্পাঠী স্থাপন।

১। পঞ্জিকা-সংস্কার ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

২। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৩২২ সালে ব্রাহ্মণ-সভার নবম বার্ষিক উৎসব হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বিক্রমপুর নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গুরুনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার কার্য্যকরী সমিতির আংশিক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়। এবং যথারীতি সমস্ত বৎসরের কার্য্যাবলীর সমালোচনা হয়, এবং পূর্ব্ব, পূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয় মঞ্জুর করান হয়। ১৩২২ সালের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণের নাম ও পারিষদ্ সভ্যের নাম পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া এ বার প্রকাশিত হইল না।

বাঙ্গালী বাবু।*

আমাদের কি আদর্শ তাহা আমরা জানি, কিন্তু আমাদিগের বংশধরগণ কি হইয়াছে ও
হইতেছে তাহার একটা চিত্র গ্রহণ করুণ। সুধীগণ! আমার সানুনয় অনুরোধ
কি উপায় অবলম্বন করিলে এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে
সর্ব্বাগ্রে তাহারই চিন্তা করুণ, নচেৎ সমস্তই বৃথা হইবে।

বল দেখি ধরামাঝে কারা সেই জাতি,
পর অনুগত হয়ে রহে দিবা রাতি।
পর ভাষে সুপণ্ডিত আপন ভাষায়,
বন্ধুজনে সম্ভাষণে মনে লাজ পায়।
পিতৃপিতামহগণে মূর্খ মনে করে,
আপন ব্যবসা ত্যজি অন্যে হিংসা করে।
বক্তৃতায় বাক্যবীর কার্য্যে কিছু নয়,
জেনে শুনে কার্য্য করে জ্ঞানহীন প্রায়।
পরভাষে বেদপাঠ, রমণীর দাস,
সুধা ত্যজি সিন্ধুপানে সদাই উল্লাস।
পিতা মাতা গুরুজনে না ভাবে আপন,
শ্যালক শ্যালিকা বড় আদরের ধন।
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান তর্কে করে দিগ্বিজয়,
একাকী সেবলী বটে, দলে বলক্ষয়।
স্বধর্ম্মে বিশ্বাসহীন সে কথা না ভাবে,
বল দেখি হেন জাতি খুজে কোথা পাবে?
কাচের বাসন কেনে রত্ন বিনিময়ে,
অধরে না ধরে হাসি ভ্রাতৃ পরাজয়ে।
ছিল বটে, গেছে সব তবু জাঁক্ করে,
যথার্থ যা আছে তার চতুর্গুণ ধরে।
আলয়ে নিয়ত দেখ ছুঁচোর কীর্ত্তন,
বাহিরে বিহরে যবে কোঁচার পত্তন।
লম্বা-টেরি আহামরি শিরে শোভা পায়,
কোটরে বসেছে আঁখি অন্নের চিন্তায়।

* বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

বাঙ্গালী সাহেব কিম্বা হিন্দু কি খ্রীষ্টান,
দৃষ্টিমাত্র কার সাধ্য করে অনুমান।
শিরে টিকি শোভে কেহ পেণ্টুলান পরা,
কার বা চুরুট হাতে গালে পান ভরা।
ঘড়ি ছড়ি পরচুলা বেশ ভূষা করে,
আপনার বেশ ত্যজি পরবেশ পরে।
নিজের বিজ্ঞান ভাষা যা কিছু দেশের-
সকলি ঘৃণায় হেরে আদরে পরের।
দেশ-অনুরাগী বলি সদা মুখে হাঁকে,
অনুরাগী একটুকু পাবে নাক তাকে।
স্বজাতি উন্নতি পথে সদা অন্তরায়,
এমন জাতিরে দেখে ধাঁধা লেগে যায়।
মন দিয়া শুন বলি এ জাতি কাহারা,
ভারতের বঙ্গদেশে বাস করে তারা।
হিন্দুজাতি নামে ইথে আছে পরিচিত,
"বাঙ্গালীবাবুর" নাম সর্ব্বত্র বিদিত।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাহিত্যভূষণ।

সামাজিক-প্রসঙ্গ।

(ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত)

যতই অধঃপতন হউক না কেন, এখনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত—চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য-মহাশয়গণই—প্রাচীন হিন্দু-সমাজের শেষ স্মৃতি চিহ্ন, ভট্টাচার্য্যমহাশয়গণের মধ্যে অনেকেরই কোন কোন বিষয়ে অসংযম লক্ষিত হইলেও পান-ভোজনে সংযম এখনও তাঁহাদের সম্পূর্ণ আছে। ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও—পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইলেও হোটেলের অন্নভোজন বা সোডা লেমনেড্ পান তাঁহারা করেন না। সন্ধ্যাহ্নিক সকলেই করিয়া থাকেন। এই সংযমের অভ্যাস - পুরুষানুক্রমে যাঁহারা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কোন একটা বিষয়ে পদস্খলন দেখিলেই—সর্ব্বথা সংযম বিহীন হিন্দু-সমাজের প্রাচীন পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ বহির্ভূত একদল কালাপাহাড়, সমগ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে। ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। যে সকল আচার ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ-সন্তান বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিন্দা করিয়া থাকে,—"মলভাণ্ড" পর্য্যন্ত বলিতে সঙ্কুচিত হয় না। তাঁহাদিগের বৃদ্ধ প্রপিতামহ বা অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেন না তখনকার "সস্তাগণ্ডার" দিনে আপনাদের পৈতৃক বৃত্তি ও শিক্ষাত্যাগ করিয়া তাঁহারাই নিজ পুত্রদিগকে পার্শি বা ইংরাজি শিখিতে দিয়াছিলেন। তাহার ফলেই বর্ত্তমান কালাপাহাড় দলের উদ্ভব। যে ব্রাহ্মণ-সন্তানের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন না, সে ত ব্রাহ্মণ-সন্তানই নয়—তাহার কথা আর কি বলিব,—এই কালা-পাহাড় দলের বৃদ্ধ বা অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ তখনকার সেই অর্থলোভী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত—এখনকার নিত্যদুর্ভিক্ষে অনশনক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অপেক্ষা যে অধিকতর নিন্দার্হ—তাহা কালাপাহাড়-

দিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তখনকার সেই "মনভাণ্ডে" যাহাদিগের জন্ম—তাঁহারা এখনকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে গালাগালি দিতে সঙ্কুচিত হয় না এমনই মূর্খতা।

শূদ্রেরাও নিসঙ্কোচে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে, এই নিন্দার ফলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অনেকেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হইতেছেন। সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঋষি নহেন, এবং বংশপরম্পরা গত আচারের অভিমান সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রক্ষার মূল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দরিদ্র হইলেও সাধারণের নিকট সম্মান পাইতেন। সাংসারিক জীবনে ইহা একটী কম লোভনীয় নহে, এক্ষণে সেই সম্মানের পরিবর্ত্তে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যদি তাহাদিগকে সাধারণের নিকট নিন্দাবাদ সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে কয়জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কেবল সদাচারের অভিমানে, অথবা ধর্ম্মবুদ্ধিতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন যাহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে অপমান না করে, তাঁহাদিগের আরাধ্য দেবতা ধনিপুরুষগণের মনস্তুষ্টিরজন্য কখন কখন কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অসংযত হইতে দেখা যায়,—কেহ অব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ধনিপুরুষ অব্যবহার্য্য হইলেও কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার দানাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের এই মাত্র অপরাধ। আর সেই আরাধ্য দেবতার প্রসাদভোগী সর্ব্বথা অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হিন্দু-সন্তান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিন্দা করিয়া থাকে। সমাজের জনসাধারণও সেই দিকে কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিন্দাতেই আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় আমরা সমগ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিকট কাতর ভাবে নিবেদন করিতেছি—আপনারা আপনাদিগের পদ, আপনাদিগের মর্য্যাদা রক্ষায় যত্নশীল হউন, দুরাচারগণের সংস্রব পরিহারে যত্নবান্ হউন। দেখিতেছেন ত আপনারা অর্থের অভাবে বা লোভে শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহাদিগের মনস্তোষণে ব্যাপৃত তাহাদের গৃহপালিত কুক্কুর—কেবল আপনাদিগকে নহে, আপনাদিগের সম্প্রদায়স্থ নিরীহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকেও দংশন করিতেছে।

ভণ্ডতা।

অনেকে বলেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বড়ই ভণ্ড; কিন্তু তুলনা করিলে বর্ত্তমান তথাকথিত শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ভণ্ডতা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ভণ্ড নহেন। যাঁহারা সন্ধ্যাহ্নিকের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত, যথেষ্ট পান ভোজন করিতে যাহারা সতত অভ্যস্ত, যাহাদিগের যথাবিধি গায়ত্রী উপদেশ হইয়াছে বলিয়াও বোধ হয় না। গলায় সূতা ঝুলাইয়া তাহারাও ব্রাহ্মণ ভোজন হিসাবে আপনার নিমন্ত্রণের দাবী করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে ইহা কি কম ভণ্ডতা।

যে শূদ্র ব্রাহ্মণ নিন্দা করে আপনাকে সদাচারী বা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত করিতে ব্যস্ত, তাহার সেই ব্যস্ততা ভণ্ডতার নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহার পর এখনকার শিক্ষিত সমাজে মুখে এক এবং অন্তরে আর, এভাবের পরিচয় ত সর্ব্বদাই পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদেরই সংসর্গে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সমাজে ভণ্ডতা প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের

ভণ্ডতা সরলতাপূর্ণ, এখনও তাহা ধরা পড়ে, অন্যের ভণ্ডতা চাতুরী পূর্ণ এবং অপ্রতিবিধেয়, পরিশেষে দেশপূজ্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আমরা উদ্বুদ্ধ করিতেছি, অন্যের দোষ যতই প্রবল হউক, আপনাদিগের এই কলঙ্ককালিমা অপনোদনে সযত্ন দৃষ্টি নিপতিত হউক।

"দেশাত্মবোধ"।

"দেশাত্মবোধ" বলিয়া একটা কথা সংবাদপত্র মহলে এখন চলিতেছে। গতানুগতিক ভাবে আমরাও কখন কখন তাহা ব্যবহার করিয়াছি। কথাটার ভিতর যে রহস্য আছে, তাহা কাহাকেও বলি নাই, এবার তাহাই বলিতেছি। এক নিরীহ ব্রাহ্মণ, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্বেষী কোন দুর্দ্দান্ত দারোগার বিষদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া অসহ্য উৎপীড়ন ভোগ করিয়াছিল। তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের নিকটে বিচারে তিনি সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করিলেন। বিচারের সময় দেখিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব কোন উৎপীড়ন করেন নাই, তিনি জানিলেন উৎপীড়ন করিবার ক্ষমতা দারগারই আছে; অতএব ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব অপেক্ষা দারোগাই বড়। অব্যাহতি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব! তুমি দারোগা হও। বর্ত্তমান হিন্দু-সন্তানের পক্ষে দেশাত্মবোধও ঠিক সেইরূপ। হিন্দুশাস্ত্র সর্ব্বাত্ম দর্শনের উপদেষ্টা। হিন্দু-সন্তান সর্ব্বাত্মদর্শী হইবার জন্য অনেক দিন লালায়িত ছিল। এখন হিন্দু-সমাজের অবনতির দিনে তাহার মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশে অনভিজ্ঞ একদল তথাকথিত দেশহিতৈষী সর্ব্বাত্মদর্শী হিন্দু-সন্তানকে দেশাত্মবোধ শিখাইতেছে। ইহা কি রহস্য নহে?

কলির প্রভাব।

মহারাজ পরীক্ষিত রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, মূর্ত্তিমান্ কলি বৃষরূপী ধর্ম্মকে তাড়না করিতেছে। সাক্ষাৎ ভগবানের অনুগৃহীত মহারাজ দুরাত্মা কলিকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইতে কলি ভীত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইল। এবং তাঁহার আদেশ পালনে সম্মত হইল। কলির প্রার্থনানুসারে তাহার থাকিবার যে কয়টী স্থান নির্দ্দেশ করিলেন, তন্মধ্যে সুবর্ণ অন্যতম,—সুবর্ণের আতিশয্যে কলির প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই কারণেই রাজা পরীক্ষিত কলির প্রভাবে অভিভূত হইয়া মৌনব্রতাবলম্বী শমীকমুনির গলদেশে মৃত সর্প ঝুলাইয়া দিয়া ছিলেন। কলিযুগের কলির প্রভাব এমনই অপরিহার্য্য। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ভক্তিবিনোদ মহাশয় আবাল্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচার পূত ব্রাহ্মণ তিনি ধর্ম্মকার্য্যের জন্য জ্ঞাত অজ্ঞাতভাবে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ-জাতির অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উন্নতি বিধানার্থ 'নায়ক' সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই সত্বাধিকার সুবর্ণপ্রভাবেই হইয়াছে। সুতরাং কলির প্রভাব ইহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেহ কখনও যাহা মনে করে নাই, রাঢ়ীয়-শ্রেণী কুলীন-সন্তান হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকৃত 'নায়কে' রাঢ়ীয় শ্রেণীগণকে অসবর্ণ বিবাহের ফল বলিয়া ঘোষিত করা হইতেছে। ভরাবিবাহের কথা, পূর্ব্ব দেশে একটী

দোষের মধ্যে গণনীয় হইলেও সেই বিবাহের সমর্থন হরিনারায়ণ বাবুর কাগজে হইতেছে। যে শ্রোত্রীয় বা বংশজের ঘরে ভরা বিবাহের দোষ আছে, তাহারা সমাজে হেয় হইলেও তাহার উল্লেখ হরিনারায়ণ বাবুর কাগজে একেবারেই নাই। অহং "জাতির সহিত কাল্পনিক বিবাহের কথা তাঁহার কাগজে ঘোষিত হইয়াছে। শৈব বিবাহে গৃহীতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পিতার সবর্ণ না হইলেও ধনাধিকারী এবং পিণ্ডাধিকারী না হইলেও, কেবল কল্পনা বলে শৈব বিবাহের ধারা সমাজে প্রচলিত বলিয়া হরিনারায়ণ বাবুর কাগজে ঘোষিত হইতেছে। ফলে সমস্তই মিথ্যা কথা। চক্রসাধক তান্ত্রিক চক্রনায়িকার জন্য শৈব বিবাহ করিতেন। তাহার সাধনমার্গে যে গুঢ় উদ্দেশ্য তাহা বিবৃত করিবার স্থান ইহা নহে। কিন্তু সাধকের বৈগুণ্যে সেই স্ত্রীর গর্ভ সঙ্ঘটিত হইলেও সেই গর্ভজাত সন্তান পিতার সবর্ণ বলিয়া গৃহীত হইত না এবং গ্রহণের বিপক্ষে শাস্ত্রও আছে। এইত প্রকৃত ব্যাপার। এই ব্যাপার লইয়া বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে যদি সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল পথ মিথ্যা ইতিহাসের সাহায্যে প্রদর্শন করা হয়, তাহাতে সমাজের যে কি ক্ষতি তাহা বিবেচক মাত্রেই বুঝিতেছেন। আজন্ম বিশুদ্ধ হরিনারায়ণ বাবু বৃদ্ধ বয়সে মরণের পথে অগ্রসর হইয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম প্রভৃতির হ্রাসে ও অনাচারে প্রশ্রয় দানে যে পাপ সঞ্চয় করিতেছেন, তাহার প্রতিকার কি উপায়ে হইবে, ইহা হরিনারায়ণ বাবু চিন্তা করুন, পাপ কেবল কর্ত্তার হয় না, প্রয়োজয়িতা এবং অনুমন্তাও পাপভাগী হইয়া থাকে। সমগ্র ব্রাহ্মণগণের ব্যাভিচারিণী বিবাহের অপবাদ ঘোষণা করা সহজ পাপ নহে। এই জন্যই হরিনারায়ণ বাবুকে চিন্তা করিতে বলিতেছি যে তাঁহার কাগজ ব্রাহ্মণজাতির মুখপত্র ত নহেই হিন্দুরপাঠ্য কিনা তাহাতেই সন্দেহ।

সংবাদ।

১৩২৩ সালের ১৮ই ভাদ্র বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত পরিষদ্ ও কার্য্যকরী-সমিতির সদস্যগণের নামের তালিকা—

পারিষদ্‌গণ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত রঘুরাম শিরোমণি, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র স্মৃতিকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ শিরোমণি, শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। শ্রীযুক্ত বৈকণ্ঠ নাথ তর্কভূষণ ও শ্রীযুক্ত অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী।

কার্য্যকরী-সমিতির সদস্যগণ।

সহকারী সভাপতি—১। শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি। ২। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন। ৩। রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। ৪। মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ হাইকোর্ট (বিচারপতি) ৫। শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়। ৬। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জমীদার অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী জমীদার।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, অনারেবল শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়, তাহেরপুর রাজকুমার শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জমীদার।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত বীরভদ্র রায়চৌধুরী।

ব্রাহ্মণ-সভার ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশাস্ত্রী (বেদবিদ্যালয় আচার্য্য) শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ। শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত শশিকুমার শিরোমণি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম,এ, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জমীদার, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার, শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় জমীদার, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, (হাইকোর্ট), রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়, বি,এ শ্রীযুক্ত চিরসুহৃদ লাহিড়ী ম্যানেজার (ঠাকুর ষ্টেট), শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল, (হাইকোর্ট), শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, (হাইকোর্ট), শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম,এ, শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম,এস্‌সি, পি, আর, এস্, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম,এ, বি-এল, (হাইকোর্ট), শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম,এ, শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী (জমীদার), শ্রীযুক্ত হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এম,এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায় (জমীদার), শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বসুমতী সম্পাদক), শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ (হিতবাদী সম্পাদক) ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত তরঙ্গবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থাপিত

ব্রাহ্মণ শাখা-সভার বিবরণ।

গণকর শাখা-সভা—২৩শে শ্রাবণ, ১৩২৩ সাল।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় (পেন্সন প্রাপ্ত হেড্‌মাষ্টার।)

সম্পাদক—বসন্তকুমার রায়।

সহকারী সম্পাদক—বন্দেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী কোষাধ্যক্ষ—ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত বহুবল্লভ বাগচী।

ধর্ম্মব্যবস্থাপক—শ্রীযুক্ত হরিহর স্মৃতিরত্ন।

গ্রাম—১। গণকর, ২। মৃজাপুর, ৩। দক্ষিণপাড়া, ৪। খোজারপাড়া, ৫। আমগাছি, ৬। বিজয়পুর, ৭। জগন্নাথপুর।